2/179
7441

7/41

~~8~~ 7/41

LIBRARY
No. ~~6~~ 7/41
Shri Shri Ashram
BANARAS

বিবেকানন্দ
চরিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-সহচর
শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম

7/41

সেবক
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

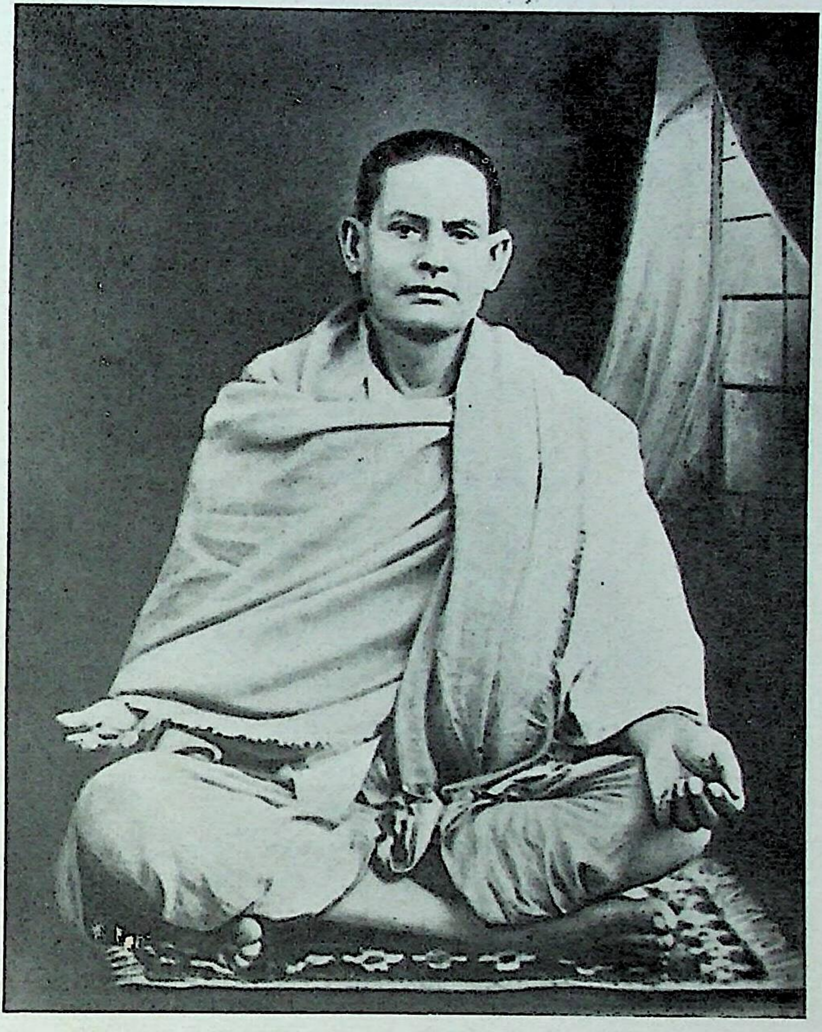

LIBRARY
No. 7/41
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

বিবেকানন্দ চরিত

7/41

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

LIBRARY
No. 7/41
Shri Shri [illegible] nayee Ashram
BANARAS.

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

একাদশ মুদ্রণ : চৈত্র, ১৩৭৮

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দাম : দশ টাকা

সূচীপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক

১। বালক বিবেকানন্দ (১৮৬৩—১৮৮০) ১
২। সংস্কার যুগ (১৮০০—১৮৮০) ১৭
৩। সাধক বিবেকানন্দ (১৮৮০—১৮৮৬) ৩৫
৪। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ (১৮৮৬—১৮৯২) ৬০
৫। আচার্য বিবেকানন্দ (১৮৯৩—১৮৯৬) ৯৯
৬। যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ (১৮৯৭—১৮৯৯) ১৪৮
৭। মানবমিত্র বিবেকানন্দ (১৮৯৯—১৯০২) ২১১
৮। পরিশিষ্ট—স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম বক্তৃতা ২৬১

LIBRARY
No.... 612.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কোন গ্রন্থ যদি নিজগুণে পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারে, তবে অন্য কোনরূপ কৌশলেই তাহা সম্ভবপর নয়। অনেক নামজাদা বড়লোক ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন এমন গ্রন্থও বাজারে চলিল না, ইহা নিত্য দেখা যাইতেছে। ইহা জানিয়াও এই নবীন গ্রন্থকার আমার মত খ্যাতিহীন ব্যক্তিকে কেন যে এই কার্যে ব্রতী হইবার জন্য উপর্যুপরি উৎপীড়ন করিলেন তাহা তিনিই জানেন।

গ্রন্থকার আমার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বিষয় কতদিন আলোচনা করিয়াছি—কতদিন তিনি আমার নিকট স্বামিজীর জীবন সম্বন্ধে সামান্য একটা নূতন হয়তো বা কোন পুস্তকে কিংবা স্বামিজীর কোন সতীর্থ গুরুভাই অথবা শিষ্যের মুখে শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জানাইয়াছেন, অথচ জীবনচরিত লেখার পক্ষে যে সে তথ্যটি একেবারে অপরিহার্য এমনও নহে, তথাপি একদিন অপেক্ষাও তাঁহার সহ্য হইত না। স্বামিজীর জীবনের অতি অকিঞ্চিৎকর ঘটনাগুলিও তিনি এমন উৎসাহ ও আবেগের সহিত বলিয়া যাইতেন এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক এমন অনেক কথা তাঁহার মুখ হইতে সতেজে নির্গত হইত যে অনেক সময় আমার আশঙ্কা হইত, কি জানি বা, এ সমস্তই তিনি জীবন-চরিতে লিখিয়া বসেন। কিন্তু গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিলাম, আমার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক, কেননা গ্রন্থকার একজন প্রকৃত শিল্পী এবং তাঁহার রচনাও সেইজন্য একটা সৃষ্টি।

জীবন-চরিত লিখিবার অনেক রকম নমুনা গ্রন্থকারের সম্মুখে ছিল, তাহা আমি জানি। কিন্তু কোন নমুনাকে তিনি অবিকল অনুসরণ করেন নাই, ইহা আমি স্পষ্ট দেখিতেছি; সুতরাং তাঁহার এই রচনার দোষ ও গুণের জন্য আমরা নিঃসন্দেহে তাঁহাকে দায়ী করিতে পারি। আজকাল বাঙ্গলা-সাহিত্যে যে কোন গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

জীবন-চরিত বিভাগে বাঙ্গলা-সাহিত্য খুব সমৃদ্ধিশালী এমন কথা বলা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক অথবা কবি কিংবা কোন নিষ্কর্মা ধনীলোকের যে সমস্ত জীবন-চরিত আমরা দেখি, তাহার বিশেষত্ব এত অল্প, অসঙ্গতি এত বেশী যে, এই গ্রন্থগুলি জীবন-চরিত বিভাগের গৌরব কি কলঙ্ক, তাহা ভাবিয়া উঠা শক্ত। ত্রুটি সকল গ্রন্থেই কিছু না কিছু থাকে, তথাপি বর্তমান গ্রন্থখানি জীবন-চরিত বিভাগে যে নূতন করিয়া কোন কলঙ্কের ভাগ বৃদ্ধি করিবে না. একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। তার বেশীও পারিতাম, কিন্তু নাই বা বলিলাম। কেননা আশা আছে, পাঠকগণ প্রথমতঃ লেখকের খাতিরে না হইলেও অন্ততঃ স্বামী বিবেকানন্দের খাতিরে এই গ্রন্থখানি অবশ্য একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।

এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি একের পর আর যেভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে

আলোচ্য মহাপুরুষের জীবন-নাট্য প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় আলেখ্যের মত অপূর্ব বৈচিত্র্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ সর্বত্রই সুসংবদ্ধ, দৃঢ় ও সুগঠিত। বিলাপ বা প্রলাপ ইহাতে আদৌ নাই।

বালক বিবেকানন্দ উদ্যতফণা সর্পের সম্মুখে মুদিত নেত্রে ধ্যানস্থ, এই ছবি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার ছাত্র-জীবনের বিপুল অধ্যবসায়, তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত, যুক্তিপন্থী তরুণ যুবকের মনে ব্রাহ্ম-সমাজ-কথিত ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ,—ধর্মপিপাসায় দিগ্‌বিদিকে অন্বেষণ, পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ, পরমহংসদেব সম্বন্ধেও তাঁহার বিস্তর সন্দেহ ও পরীক্ষা, তারপর পিতৃবিয়োগে দারিদ্র্যের সহিত হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে বুভুক্ষিত যুবকের এক দারুণ সংগ্রাম, পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর সন্ন্যাসী যুবকের ভারত ভ্রমণ, কত রাজা মহারাজার আসিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ; তারপর আমেরিকা গমন, কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবন সংশয়াপন্ন করিয়া কপর্দকহীন নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর অপ্রত্যাশিত অভ্যুদয়, বিজয়ী বীরের ইয়োরোপীয় শিষ্য ও শিষ্যাগণ সমভিব্যাহারে ভারতে প্রত্যাগমন, বেলুড়ে মঠ স্থাপন, তারপর ভারতে প্রচার, ক্ষীর-ভবানীর মন্দিরের অদ্ভুত দৈববাণীর পর হইতে এক আশ্চর্য পরিবর্তন, দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ গমন, পুনরায় হঠাৎ একদিন রাত্রে বেলুড়ে প্রত্যাবর্তন, পূর্ববঙ্গে প্রচার, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও শেষে একদিন সেই দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করিয়া অনন্ত শয়ন—এই সমস্তই এমন নিপুণভাবে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, ইহাতে একদিকে প্রত্যেক অধ্যায়টি যেমন মনোরম তেমনি অন্যদিকে সমগ্র জীবনের একটা ধারাবাহিক বিকাশের চিত্রটিও পাঠকের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

জীবনের ঘটনাবলীর শৈলস্তূপ একস্থানে আনিয়া সংগ্রহ করিতে পারিলেই জীবন-চরিত লেখা হয় না। গ্রন্থকার তাহা করেন নাই। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিবিধ ঘটনাবলী একটা জীবনস্রোতের উপর ভাসাইয়া বিবিধ তরঙ্গ-ভঙ্গীতে সেগুলিকে পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, ইহা কম লিপিচাতুর্যের পরিচয় নহে। কেবল ঘটনার পর ঘটনা আসিয়া জীবনকে আবর্জনায় ঢাকিয়া ফেলে নাই, আবার জীবনের প্রকৃত ঘটনার সহিত সম্পর্কশূন্য এক বস্তুতন্ত্রহীন কাল্পনিক জীবনের নিরর্থক অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক বিতণ্ডার অবতারণায় ইহা সত্য হইতেও ভ্রষ্ট হয় নাই। স্কুলপাঠ্য পুস্তকে যে নীতির "ক্যাটিগরী" ছাত্রেরা মুখস্থ করেন, সেই সমস্ত মামুলী ক্যাটিগরীর মধ্যেও জীবনকে আনিয়া পাটের বস্তার মত বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয় নাই। জীবনের উদ্দাম, এমন কি উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার গতিকে সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশের পথে ছাড়িয়া দিয়া শিল্পী তাঁহার নিপুণ তুলিকা সাহায্যে সেই জীবনকে চিত্রিত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমি দুঃসাহসিক বলিব এবং সর্বত্রই সফলকাম না হইলেও—এই দুঃসাহসের জন্য তাঁহাকে নিঃসন্দেহে প্রশংসা করিব।

বস্তুতঃই জীবনের আলেখ্য লেখনীর মুখে ফুটাইয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন। এই কঠিন কার্য বাঙ্গলা-সাহিত্যে আরো কঠিন। কেননা বাঙ্গলাদেশে সংবাদপত্র আছে,

বক্তৃতা আছে, তৎসংশ্লিষ্ট ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আছে, থিয়েটার আছে, তাহার অভিনেতা ও অভিনেত্রী আছে,—কিন্তু জীবন নাই। যাহা নাই, তাহাই লিখিতে হইবে; কোন দেশের সাহিত্যিকের কপালে এত বড় দারুণ অভিশাপ বোধ হয় বিধাতাও কল্পনা করেন নাই। এমন দু'চারখানা আত্মজীবনী, আমার জীবন বা জীবনস্মৃতি আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে যে, তাহা আত্ম বা আমার হইতে পারে, তাহা স্মৃতিও হইতে পারে, কিন্তু তাহা জীবন নহে।

এই জীবনহীন মৃতের দেশে সত্যই স্বামী বিবেকানন্দ একটা জীবন লইয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার জন্য বাঙ্গলা-সাহিত্য নিঃসন্দেহে এক অতি গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিবে। এই দায়িত্ববোধ হইতেই গ্রন্থকার যে এই জীবন-চরিতখানি লিখিয়াছেন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

ভূমিকা সমালোচনা নহে। তথাপি হয়তো সমালোচনা হইয়া পড়িয়াছে। অভ্যাসদোষ বড় দোষ। গ্রন্থকার হয়তো আশা করিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার গ্রন্থখানিকে পাঠকের নিকট ভালরকম পরিচয় করাইয়া দিব। তাহা আমি পারি না, কেননা, তাহা আমার সাধ্যাতীত। এই গ্রন্থ লিখিবার দুঃসাহস যাঁহার আছে, সেই দুঃসাহসই তাঁহার পরিচয়। আর এই গ্রন্থ লিখিয়া তিনি যাঁহাকে পরিচয় করিয়া দিবার ভার লইয়াছেন, তাঁহাকে লেখক যত জানেন আমি তত জানি না।

১৯শে আষাঢ়, ১৩২৬ সাল
ভবানীপুর, কলিকাতা

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

গ্রন্থকারের নিবেদন

বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাগণ জানিয়া আনন্দিত হইবেন, 'বিবেকানন্দ চরিত'-এর হিন্দী ও মারাঠী অনুবাদ নাগপুর ধানতলীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দীর দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। বাঙ্গলা হইতে হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় যাঁহারা যথাযথ অনুবাদ করিয়াছেন এবং প্রকাশক স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দকে এই অবসরে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

৩বি, সদানন্দ রোড,
কলিকাতা ২৬
১৫ই আষাঢ়, ১৩৬১

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রথম অধ্যায়

বালক বিবেকানন্দ

(১৮৬৩-১৮৮০)

ওঁ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-বেদান্তাম্বুজ ভাস্করম্।
নমামি যুগকর্তারং আর্তনাথং বীরেশ্বরম্॥

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মঙ্গলাশিস মস্তকে ধারণ করিয়া যে মহাপুরুষ এই উন্মার্গগামী, পরানুকরণমোহাচ্ছন্ন আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অদ্বৈতসিংহনাদে সনাতন ধর্ম পুনঃ প্রচার করিয়াছেন—যাঁহার সমাধিপূত অপূর্ব জ্ঞান তপঃসম্ভূত অমিত তেজের দীপ্ত প্রভা বিকীর্ণ করিয়া দশবর্ষকাল মধ্যাহ্নসূর্যের মত সমগ্র জগতে কিরণ বর্ষণ করিয়াছে—যাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা, নির্ভীক আত্মোৎসর্গ ভারতের এক গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনা করিয়া দিয়াছে—কেবল ভারত কেন—যিনি বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায় মহান্ যুগাদর্শকে স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই জগদ্গুরু আচার্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর আবির্ভাব ও তিরোভাব দুই-ই আজ অতীতের ঘটনা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে এই পরশাসিত পতিত জাতির অধঃপতনের চরম অবস্থায়,—সন্ন্যাসের মহাবীর্যকে আশ্রয় করিয়া যে মহাপুরুষ ধর্মে সমাজে রাষ্ট্রে সমষ্টি-মুক্তির মহান্ আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবন ও উপদেশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত অল্পকালের ব্যবধানে পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা অতি কঠিন ব্যাপার। সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে উচ্চনীচ ভেদ যখন মর্মান্তিক হইয়া উঠে, রাজদণ্ড যখন অন্যায়রূপে দুর্বলকে অযথা নিপীড়িত করে, মনুষ্য-সমাজে যখন ধর্মের গ্লানি প্রকট হয়, অত্যাচারীর অধীনে সর্বপ্রকার দুর্নীতি সহস্র শির লইয়া দেখা দেয়, ধ্বংস যখন অনিবার্য ও আসন্ন তখন পুরাতনের জীর্ণ মৃতভার শ্মশান-চুল্লীতে ভস্মীভূত করিয়া সেই ভগ্নস্তূপের বেদীর উপর নূতন স্ফুলিঙ্গ লইয়া আবার নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত দেখা দেয়। মনুষ্য-সমাজকে মাঝে মাঝে ঢালিয়া সাজিবার প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজনে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মানুষ মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা দেন।

একদিন ভারতবর্ষে স্ত্রী, শূদ্র ও ব্রাহ্মণের ভেদ ঐকান্তিক হইয়া উঠিয়াছিল,—অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ যজ্ঞাড়ম্বরে ভারতভূমি রুধিরাক্ত হইয়া উঠিতেছিল, রাজচক্রবর্তী সম্রাট প্রজা-শক্তির কবন্ধের উপর তাঁহার বিজয়ী রথচক্র ঘর্ঘর শব্দে চালনা করিতেছিলেন, প্রজাশক্তি পর্যুদস্ত হইতেছিল। বেদ ও শাস্ত্রজ্ঞান কেবল ব্রাহ্মণের শ্রেণীতে আবদ্ধ ছিল। সভ্যতা কৃত্রিম হইয়া উঠিতেছিল, ইহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ভগবান বুদ্ধদেব আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। বেদ অস্বীকৃত হইল, ব্রাহ্মণ দূরে সরিয়া গেল, স্ত্রী, শূদ্র ধর্মের নামে সঙ্ঘবদ্ধ হইল, রাজচক্রবর্তী সম্রাট সিংহাসন ও রাজদণ্ড ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সামান্য ভিক্ষুকের বেশে

ভারতবর্ষের পথে পথে ভগবান বুদ্ধদেবের চরণচিহ্ন অনুসরণ করিয়া জীবন-সন্ধ্যায় ভ্রমণ করিয়া গেলেন। সভ্যতার কৃত্রিম আবর্জনা দূরে অপসারিত হইল, আপামর সাধারণের মধ্যে জ্ঞানরশ্মি ছড়াইয়া পড়িল, ভারতবর্ষের মানুষ এক অতুলনীয় সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম ও সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই সাম্যবাদ প্রভাব বিস্তার করিল।

ইউরোপের রঙ্গমঞ্চেও একদিন এইরূপ এক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। রোম-সাম্রাজ্যে যখন উচ্চনীচের ভেদ প্রবল হইল, বিলাস ব্যাভিচার স্রোতের মত প্রবাহিত হইল, রোমক সম্রাট যখন সাম্রাজ্যের মধ্যে শাসনের নামে পীড়ন আরম্ভ করিলেন, দুর্বল যখন নিষ্পেষিত আর্ত ভীত মুমূর্ষু, ধর্মের যখন অত্যন্ত গ্লানি, রোমক প্রধানেরা যখন ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও ভোগবাদী, তখন সভ্যতার সেই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে, সেই অধর্মের বিরুদ্ধে দুর্বলের রক্ষাকল্পে প্রতিক্রিয়ার ফলে আর-এক শক্তির স্ফুরণ হইল। এক দীন দরিদ্র মূর্খ ছুতারের পুত্র ইউরোপের ইতিহাস অঙ্গুলী হেলনে পরিবর্তন করিয়া দিয়া গেলেন। গ্রীস ও রোমের সভ্যতার পরে ইউরোপ যখন বর্বরতার প্লাবনে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল তখন সেই প্রলয়-পয়োধি হইতে মহাত্মা যীশু ইউরোপকে তুলিয়া ধরিয়া রক্ষা করিয়া গেলেন।

আমরা স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ", আরও শুনিয়াছি, "হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজায় আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি, বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও। যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর।"

বিবেকানন্দের চিন্তা ও চরিত্র মানব-সভ্যতার রূপান্তরের ইতিহাসের পারম্পর্য রক্ষা করিয়াই একের পর আর স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে। সেই বিকাশের বৈচিত্র্য-জটিল ধারাগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সংগৃহীত উপাদানগুলির যথাযথ বিন্যাসে হয়তো সকল স্থানেই আমি কৃতকার্য হইতে পারি নাই। তথাপি "লোকোত্তর-চরিত্র মহাপুরুষগণের পবিত্র জীবনকথা আলোচনা করিলে আমাদের প্রভূত কল্যাণই হইয়া থাকে"—এই মহাপুরুষবাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াই এমন দুঃসাহসিক কার্যে অগ্রসর হইয়াছি।

কলিকাতা নগরীর উত্তরাংশে শিমুলিয়া পল্লীর গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটে দত্তবংশের বিশাল ভবনের এক জীর্ণ তোরণদ্বার এখনো অতীত বৈভবের সাক্ষ্য-স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। দত্তবংশের ঐশ্বর্য ও খ্যাতি, বার মাসে তের পার্বণের আড়ম্বর এককালে কলিকাতার ধনীসমাজের ঈর্ষা উৎপাদন করিত। কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠাবান ব্যবহারজীবী রামমোহন দত্তের আমলে সহরে শিমুলিয়ার দত্তরা প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহনের পুত্র দুর্গাচরণ তৎকালীন প্রথায় সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া এবং কাজ চালাইবার মত ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া তরুণ বয়সেই আইন ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কিন্তু রামমোহনের বিষয়লিপ্সা ও অর্থোপার্জনের প্রবৃত্তি ছিল না। তৎকালীন ধনী সন্তানদের মত নবনাগরিক সভ্যতার ইন্দ্রিয়ভোগমূলক

বিলাস তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। এই ধর্মানুরাগী যুবক অবসর ও সুযোগ মত ধর্মশাস্ত্র চর্চা করিতেন, সাধুসঙ্গ করিতেন। উত্তর-পশ্চিম দেশাগত হিন্দুস্থানী বৈদান্তিক সাধুদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সেই সমস্ত ঐশ্বর্য ও পার্থিব প্রতিষ্ঠা-লোভ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; গৃহে রাখিয়া যান, চিরবিরহিণী ধর্মপত্নী ও একমাত্র শিশুপুত্র। কথিত আছে, বারাণসীধামে দুর্গাচরণ-পত্নী একবার বিশ্বেশ্বরজীর মন্দিরদ্বারে চকিতে পতিকে দর্শন করেন। সন্ন্যাসীদের নিয়মানুসারে দ্বাদশবর্ষ পরে দুর্গাচরণ একবার স্বীয় জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং বালকপুত্র বিশ্বনাথকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহাকে আর কেহ দেখে নাই। পিতার আগমনের এক বৎসর পূর্বেই বিশ্বনাথ জননীকেও হারাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর পুত্র বিশ্বনাথ দত্তই বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দের জনক।

বিশ্বনাথ রামমোহনের ধারা বজায় রাখিয়া আইন ব্যবসায় অবলম্বন করেন। বিশ্বনাথ প্রগতিশীল পুরুষ ছিলেন, আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলেও তাঁহার প্রবল পাঠানুরাগ ছিল। তিনি পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, হাফেজের কবিতা তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠের ফলে গোঁড়া-হিন্দুয়ানী তাঁহার ছিল না। অনেক অভিজাত মুসলমান তাঁহার মক্কেল ছিলেন এবং লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া তিনি তৎকালীন বহু অভিজাত মুসলমান পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ফলে আহারে বিহারে তিনি মুসলমানী আদব-কায়দা অনুকরণ করিতেন। অথচ ধর্ম বিষয়ে বাইবেল পাঠ করিয়া তিনি খৃষ্টধর্মের অনুরাগী ছিলেন। মোটকথা, ধর্ম ঈশ্বর প্রভৃতি লইয়া তিনি বড় একটা মাথা ঘামাইতেন না। অর্থোপার্জন করা এবং জীবনটাকে ভোগ করার একটা সাধারণ আদর্শে তিনি চলিতেন। যেমন উপার্জন করিতেন তেমনি ব্যয় করিতেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের নিত্য সমাগম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাস দাসী, গাড়ি ঘোড়া লইয়া বিশ্বনাথ দত্ত বেশ জাঁকজমকের সহিত বাস করিতে ভালবাসিতেন। স্বাধীনচেতা, উদার, বন্ধুবৎসল, আশ্রিতপ্রতিপালক বিশ্বনাথের ধনজনপূর্ণ বিশাল ভবনে কোন পার্থিব সুখের অভাব ছিল না।

কিন্তু স্বামিসৌভাগ্যগর্বিতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন প্রাচীনপন্থী হিন্দু মহিলা। বুদ্ধিমতী কর্মকুশলা গৃহকর্ত্রীর স্নেহ ও শাসনে এই সুবৃহৎ পরিবারের সমস্ত কার্য অতি শৃঙ্খলার সহিত নির্বাহ হইত। তিনি বাঙলা লেখাপড়া ভালই জানিতেন। রামায়ণ, মহাভারত, বিবিধ পুরাণ নিয়মিতরূপে পাঠ করিতেন; অন্যদিকে স্বামী এবং পরবর্তীকালে পুত্রদের সহিত আলোচনায় আধুনিক ভাবধারার সহিত পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার তেজস্বী চরিত্রে আভিজাত্যের একটা সহজ গৌরব ছিল, যাহা অনায়াসেই প্রতিবেশিনীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। তিনি মধুরভাষিণী অথচ গম্ভীরা ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে কোন রমণী প্রগল্‌ভা হইবার সাহস পাইতেন না। সর্বোপরি, তিনি ধর্মপরায়ণা ছিলেন এবং প্রত্যহ স্বহস্তে শিবপূজা করিতেন। তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠা দেখিয়া পরিবারস্থ অন্যান্য মহিলারাও সংযত ধর্মজীবন যাপন করিতেন।

দেবী ভুবনেশ্বরীর চিত্তে এক ক্ষোভ ছিল—পুত্রাভাবে তিনি মাঝে মাঝে অত্যন্ত ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িতেন। ক্রমে পুত্রমুখ দর্শনাভিলাষ তাঁহাকে নিরতিশয় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় শিবমন্দিরে পুত্র-কামনায় কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতে লাগিলেন। সরল ভক্তি ও সহজ বিশ্বাসে দেবাদিদেবের

তুষ্টির জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্ত শান্ত হইল না। দত্ত পরিবারের জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা সেই সময় কাশী বাস করিতেন। ভুবনেশ্বরী তাঁহার নিকট স্বীয় মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন তাঁহার হইয়া প্রত্যহ শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর সমীপে পুত্র-সন্তান-কামনায় পূজা ও হোমাদির ব্যবস্থা করেন। তাঁহার অভিপ্রায়মত কার্য হইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া জননী আনন্দিতা ও আশ্বস্তা হইলেন। তাঁহার শ্রদ্ধামুগ্ধ আশা-উন্মুখ হৃদয় দেবাদিদেব মহাদেবের চিন্তায় বিভোর হইয়া উঠিল। গৃহকর্ম অপেক্ষা গৃহদেবতার মন্দিরেই তিনি অধিকাংশ সময় শিবপূজায় নিযুক্তা থাকিতেন।

একদিন প্রভাতে শিবপূজান্তে দেবী ভুবনেশ্বরী ধ্যানস্থা হইলেন। মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। দেবী যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত সত্তা শিবভাবনায় তন্ময়। ক্রমে সন্ধ্যার ধূসর আলোক তাঁহার তপঃক্লিষ্ট সংযমপুণ্যোজ্জ্বল বদনখানি স্বর্গীয় বিভায় মণ্ডিত করিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। গভীর রজনীতে শ্রান্তদেহা জননী নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। বহুদিনের ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ হইল। ভুবনেশ্বরী স্বপ্নে দেখিলেন—তুষারধবল রজতভূধরকান্তি কৈলাসেশ্বর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! ধীরে ধীরে দৃশ্য পরিবর্তিত হইল; ভক্তের বিস্ময়মুগ্ধ হৃদয় অপূর্ব আনন্দে পরিপ্লুত করিয়া তিনি ক্ষুদ্র শিশুমূর্তি ধারণ করিয়া জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দিব্যানন্দকণ্টকিত দেহে নিদ্রাভঙ্গে জননী যখন ভূমিশয্যা ত্যাগ করিলেন, তখন উগ্র উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে চরাচর ভরিয়া গিয়াছে। “হে শিব—হে শঙ্কর—হে করুণাময়”—বলিতে বলিতে সতী ভক্তিভরে ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী। কুজ্ঝটিকাবৃত হিমমলিন পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যপ্রভাতে দলে দলে নরনারী ত্রস্তপদে, স্পন্দিত দেহে মকরসপ্তমী স্নানের জন্য ভাগীরথী অভিমুখে ধাবিত। এমন সময়ে, সূর্যোদয়ের ৬ মিনিট পূর্বে, ৬টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ডে দেবী ভুবনেশ্বরী বিশ্ববিজয়ী পুত্র প্রসব করিলেন। পুলকোচ্ছল হর্ষকোলাহলে দত্তগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। পুরনারীরা মঙ্গলশঙ্খ বাজাইয়া হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। বঙ্গের ঘরে ঘরে পৌষ পার্বণের আনন্দোৎসব। যেন নবজাত শিশুকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ বালক-বালিকার হর্ষবহুল কলরবে দীনা বঙ্গজননীর প্রতি গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল।

ক্রমে নামকরণের দিবস উপস্থিত হইল। বালকের আকৃতি অনেকটা তাহার সন্ন্যাসী পিতামহের মত দেখিয়া পরিবারস্থ কেহ কেহ নবজাতক শিশুর নাম ‘দুর্গাদাস’ রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু জননী স্বীয় স্বপ্ন স্মরণ করিয়া কহিলেন, “উহার নাম বীরেশ্বর রাখা হউক।” আত্মীয়স্বজনবর্গ উক্ত নামকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ‘বিলে’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অবশেষে শুভ অন্নপ্রাশনের সময় বালকের নাম রাখা হইল শ্রীনরেন্দ্রনাথ। প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের দুইটি করিয়া নাম থাকে; একটি রাশিনাম—অপরটি সাধারণে প্রচলিত নাম। সেই কারণে শিশু উত্তরকালে নরেন্দ্রনাথ নামেই সর্বসাধারণে সুপরিচিত হইয়াছিলেন।

অশান্ত নরেন্দ্রনাথ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্দান্ত হইয়া উঠিলেন। স্বেচ্ছাচারী বালকের অশিষ্ট আচরণে প্রত্যেকেই উত্ত্যক্ত হইতেন। শাসনবাক্য প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি কিছুতেই জননী উদ্ধত সন্তানকে সংযত করিতে না পারিয়া

এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিলেন। “শিব” “শিব” বলিতে বলিতে মস্তকে কিছু জল ঢালিয়া দিলেই মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বালক নরেন্দ্র শান্তভাব অবলম্বন করিতেন। আশুতোষ সলিলধারায় অভিষিক্ত হইলেই তুষ্ট হন এই বিশ্বাসেই জননী যে এই অভিনব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বালকের যে শিবাংশে জন্ম ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও বুদ্ধিমতী জননী কাহারও নিকট উহা প্রকাশ করিতেন না। একদিন বালকের ঔদ্ধত্যে সমধিক বিচলিত হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, “মহাদেব নিজে না এসে কোত্থেকে একটা ভূত পাঠিয়েছেন।” ইচ্ছামত কার্য করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বালক এক এক সময়ে এমন বিষম ক্রন্দন জুড়িয়া দিতেন যে, বাড়িসুদ্ধ লোক অস্থির হইয়া উঠিত; তখন জননী যদি বিরক্ত হইয়া বলিতেন, “দ্যাখ্ বিলে, অমন ধারা দুষ্টুমি কর্‌লে মহাদেব তোকে কৈলাসে প্রবেশ কর্‌তে দেবেন না।” বালক সভয় দৃষ্টিতে জননীর দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হইতেন।

বিরক্তিকর বালকের যন্ত্রণায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া সময় সময় তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদ্বয় প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইতেন। চতুর বালক দ্রুতপদে নর্দমায় নামিয়া সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অপবিত্র হইবার ভয়ে তাঁহারা যখন বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেন, শুচি-অশুচিজ্ঞানহীন বালক বিজয়-গর্বে কলহাস্যে করতালি দিয়া বলিতেন, “কৈ আমায় ধর দিকি?”

বালক নরেন্দ্র গাড়িতে চড়িয়া ভ্রমণ করিতে পারিলে অতীব আনন্দিত হইতেন। মাতৃক্রোড়ে উপবেশন করিয়া গাড়ি হইতে উভয় পার্শ্বস্থ বিবিধ বস্তু দর্শনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জননীকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। গাড়ি তিনি এত ভালবাসিতেন যে, প্রত্যহ বাড়ির সম্মুখে বসিয়া প্রত্যেকখানি গাড়ি লক্ষ্য করিতেন। একদিন তাঁহার পিতা প্রশ্ন করিলেন, “নরেন, তুই বড় হলে কি হবি বল দিকি?” নরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, “ঘোড়ার সহিস কি কোচোয়ান হব।” কোচোয়ানের স্ফীতবক্ষে উপবেশনভঙ্গী, তেজস্বী অশ্ব রশ্মি আকর্ষণে সংযত করিয়া পরিচালন-কৌশল, বিশেষত্বজ্ঞাপক পোষাক পরিচ্ছদ, চাপরাস্, জরীর পাগ্‌ড়ী ইত্যাদি বালকের মনে যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? কোচোয়ান হইবার আশায় বালক পিতার বৃদ্ধ শকট-চালকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া লইয়াছিলেন এবং সুযোগ পাইলেই অশ্ব-শালায় উপস্থিত হইয়া সহিস ও কোচোয়ানগণের কার্যপ্রণালী দর্শন করিতেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যানগুলি জননীর নিকট শ্রবণ করিতে নরেন্দ্রনাথ বড়ই ভালবাসিতেন। ভুবনেশ্বরী নয়নানন্দ পুত্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া সীতারামের কাহিনী শুনাইয়া অবসরকাল যাপন করিতেন। দত্তভবনে প্রায় প্রত্যহই মধ্যাহ্নকালে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ হইত। জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা পাঠ করিতেন—কখনও বা ভুবনেশ্বরী স্বয়ং পাঠ করিতেন—গৃহকার্য সমাপন করিয়া অপরাপর মহিলাবৃন্দ পাঠিকাকে ঘিরিয়া বসিতেন। এই ক্ষুদ্র মহিলাসভায় দুর্দান্ত নরেন্দ্রকে শান্ত-শিষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। পুরাণোক্ত উপাখ্যানাবলী বালকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সুদূর অতীত যুগের ধর্মবীরগণের পূত চরিতাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিশুহৃদয়ে না জানি কি ভাবতরঙ্গ উঠিত, যাহাতে তিনি স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডের পর দণ্ড মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন।

রামায়ণ শ্রবণ করিতে করিতে সরল শিশুহৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত। একদিন জনৈক খেলার সাথী সমভিব্যাহারে তিনি বাজার হইতে শ্রীশ্রীসীতারামের

একটি যুগল প্রতিমূর্তি ক্রয় করিয়া আনিলেন। বাটীর ছাদের উপর একটি নির্জন কক্ষে উহা স্থাপন করিয়া বালক মূর্তিটির সম্মুখে ধ্যানস্থবৎ বসিয়া থাকিতেন। বালকের সীতারামে প্রীতি তাঁহার হিন্দুস্থানী কোচোয়ান বন্ধুটিকে অতীব আনন্দ প্রদান করিত। শিশু-হৃদয়ের যে কোন সমস্যা, যে কোন প্রশ্ন মীমাংসা করিয়া দিতে সে বিরক্তি বা অবসাদ বোধ করিত না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বিবাহের কথা উঠিল। কোচোয়ান কোন অজ্ঞাত কারণে বিবাহের উপর বিরক্ত ছিল, কাজেই সে বিবাহিত জীবনের অশান্তিসঙ্কুলতার এমন একটি জীবন্ত চিত্র বর্ণন করে যে, বালক নরেন্দ্রনাথের সুকুমার চিত্তে তাহা গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। নানা চিন্তায় আকুল হইয়া নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ লোচনে জননীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া জননী কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র ক্রন্দন-কম্পিত কণ্ঠে কোচোয়ানের নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন বিস্তারিত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, “মা, আমি সীতারামের পূজো কেমন করে কর্‌বো—সীতা রামের বৌ ছিল যে?”—স্নেহবিকলা জননী প্রিয়তম পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, “সীতারামের পূজা নাই কর্‌লে, কাল থেকে শিবপূজা করো বাবা।”

জননীকে কার্যান্তরে ব্যাপৃত দেখিয়া বালক ধীরে ধীরে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। প্রিয়তম শ্রীশ্রীসীতারামের মূর্তিটি লইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ছাদের উপর উপনীত হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ক্রমে নিবিড় হইয়া আসিতেছে—ঊর্ধ্বে-ভ্রাম্যমাণ অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীপরিশোভিত ধূসর আকাশ—নিম্নে আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শখানি উভয় হস্তে ধারণ করিয়া সংশয়সঙ্কুলচিত্তে ভাবী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ! একদিকে গভীর সীতারামভক্তি, অপর দিকে তীব্র বিবাহবিতৃষ্ণা—বালকের ক্ষুদ্র হৃদয় আলোড়িত হইল। আর না—বিবাহিত জীবন উন্নত—যত পবিত্র হউক না কেন, তাঁহার আদর্শ নহে। প্রতিমূর্তিখানি ঊর্ধ্ব হইতে রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইয়া শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। বিজয়ী বীরের মত গর্বিত পদক্ষেপে বীরেশ্বর ভবনশিখর পরিত্যাগ করিলেন।

শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্র হিন্দুগৃহে চিরাচরিত দেশাচার ও লোকাচারসম্মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার নিয়মগুলি মানিয়া চলিতেন না। তজ্জন্য জননী শাসন করিলে নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ ঐগুলির কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। “ভাতের থালা ছুঁয়ে গায়ে হাত দিলে কি হয়?” “বাঁ হাতে করে গেলাস তুলে জল খেয়ে হাত ধোয় কেন? হাতে তো এঁটো লাগে নি?”—ইত্যাদি প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে গিয়া জননী বিব্রত হইয়া পড়িতেন। সন্তোষজনক উত্তর না পাইলেই নরেন্দ্রের অনাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইত।

বিশ্বনাথবাবুর জনৈক পেশোয়ারী মুসলমান মক্কেল ছিলেন। এই ভদ্রলোক নরেন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি আসিয়াছেন জানিতে পারিলেই নরেন্দ্র তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া হস্তিপৃষ্ঠে ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে পাঞ্জাব ও আফগানিস্থানের অপূর্ব ভ্রমণকাহিনীসমূহ মুগ্ধহৃদয়ে শ্রবণ করিতেন। এক এক দিন বালক নরেন্দ্র তাঁহার সহিত উক্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বসিতেন। ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিতেন, “তুমি আর দু আঙ্গুল বড় হ’লেই তোমাকে একবার নিয়ে যাব।” আকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে বালক হয় তো পরদিনই বলিয়া বসিতেন, “আজ রাত্রে আমি দু’ আঙ্গুল বড় হ’য়ে গেছি; অতএব আমায় নিয়ে চলুন।” ফলতঃ নরেন্দ্র তাঁহার এত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে সন্দেশ, ফল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র

ইতস্ততঃ করিতেন না। ইহা লইয়া পরিজনবর্গ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। বিশ্বনাথবাবু গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না; সকল জাতির লোকই তাঁহার সমান প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, সুতরাং পুত্রের এই “জাতনাশা কদাচার” তাঁহার দৃষ্টিতে শাসনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না, বরং হাস্য সহকারে উপেক্ষা করিতেন।

বিভিন্ন জাতির মক্কেলগণ মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহার পিতৃভবনে সমাগত হইতেন; কাজেই তৎকালিক রীত্যনুযায়ী বৈঠকখানার একপার্শ্বে কতকগুলি রৌপ্যমণ্ডিত হুঁকা সাজানো থাকিত। মুসলমান ভদ্রলোকটির হস্ত হইতে সন্দেশ ভক্ষণ করিয়া নরেন্দ্র পরিজনবর্গ কর্তৃক তীব্রভাবে ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন। সেইদিন হইতে জাতিভেদ তাঁহার নিকট একটা বিশেষ সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কেন একজন মানুষ আর একজনের হাতে খাইবে না? যদি কেহ ভিন্ন জাতির হাতে খায়, তাহা হইলে তাহার কি হইবে? তাহার মাথায় কি ঘরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িবে? সে কি মরিয়া যাইবে? ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে নরেন্দ্র বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। অপর কেহ উপস্থিত নাই দেখিয়া তিনি সাহস সহকারে একে একে হুঁকাগুলি টানিতে লাগিলেন। কৈ তাঁহার তো কোন পরিবর্তন হইল না? আগে যেমন ছিলেন তেমনি তো আছেন। এমন সময় সহসা বিশ্বনাথ আসিয়া পুত্রকে তদবস্থায় দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, “কি কর্‌ছিস্ রে বিলে?” নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “যদি জাতিভেদ মানি, তা'হলে আমার কি হবে—তাই পরীক্ষা কর্‌ছিলাম।” পিতা হাসিয়া করুণার্দ্রনয়নে পুত্রের প্রতি চাহিয়া চিন্তিতভাবে স্বীয় পাঠাগারে চলিয়া গেলেন।

নরেন্দ্র শ্রীসীতারামের মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পরদিনই তৎস্থানে একটি শিবমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। মাতার অনুকরণ করিয়া প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন, কখনও বা পদ্মাসনে ধ্যানে বসিতেন; কখনও খেলার সাথীদিগকে ডাকিয়া সকলে মিলিয়া শিবমূর্তিটি ঘিরিয়া ধ্যান করিতে বসিতেন। এই খেলাটি তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। এইরূপে ধ্যানে বসিয়া বালক নরেন্দ্র কি ভাবিতেন, তাহা তিনিই জানেন। পরবর্তীকালে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, ঐ সময়ে একদিন ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার জননীর কথা মনে পড়িল। তিনি দুঃখিতভাবে ভাবিতে লাগিলেন, সত্যই কি আমি দুষ্ট বলিয়া শিব আমাকে তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া দিয়াছেন? চিন্তামগ্ন বালক বিষণ্ণচিত্তে মাতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “মা, আমি যদি সাধু হই, তা'হলে শিব আমাকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে দেবেন না?” জননী সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “হাঁ দেবেন বৈকি?” কথাটা অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিয়া সহসা একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় জননীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নরেনও যদি সংসার ত্যাগ করিয়া যায়! সর্বদা ভাবগোপনে অভ্যস্তা, দৃঢ়হৃদয়া ভুবনেশ্বরী শিব স্মরণ করিয়া ক্ষণিক স্নেহের দৌর্বল্য হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিলেন। ভাবিলেন, ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমি বাধা দিবার কে?

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সঙ্গিগণসহ নরেন্দ্র তাঁহার খেলাঘরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেখাদেখি বালকগণ সকলেই অঙ্গে ছাই মাখিয়া ধ্যানে বসিল। এমন সময় একটি বালক চক্ষু মেলিয়া দেখে সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড সর্প! ভীত বালক “সাপ সাপ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বালকগণ ব্যস্ততার সহিত ছুটিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নরেন্দ্র বাহ্যজ্ঞানশূন্য—চীৎকার, কোলাহল, আহ্বান কিছুই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। বালকগণ তাড়াতাড়ি নামিয়া

সকলকে সংবাদ প্রদান করিল। নরেন্দ্রের জনক, জননী ও অন্যান্য সকলেই ছুটিয়া ছাদের উপর আসিলেন। তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে।

নরেন্দ্রনাথের কৈশোরলাবণ্যস্নিগ্ধ তরুণসুন্দর মুখমণ্ডলে মৃদু চন্দ্ররশ্মি প্রতিফলিত হইয়া স্বর্গীয় বিভা বিকীর্ণ করিয়াছে—দেহ স্পন্দহীন; কুমার যোগী পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন—সম্মুখে বিষধর সর্প ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল। এ ভীষণ-মধুর দৃশ্যের সম্মুখে আচম্বিতে উপস্থিত দর্শকবৃন্দও শঙ্কা-স্তম্ভিত হৃদয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়বৎ দণ্ডায়মান হইলেন। কিয়ৎকাল পর সর্প ফণা গুটাইয়া অন্তর্হিত হইল, অন্বেষণ করিয়াও সর্পটিকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। নরেন্দ্র ধ্যানভঙ্গে নয়ন উন্মীলন করিয়া পরিবারবর্গকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সর্পের কথা শুনিয়া বালক বিস্মিতভাবে উত্তর করিলেন, “আমি সাপের কথা কিছুই জানি না, আমি এক অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম!”

এ ঘটনা অদ্ভুত বটে। কিন্তু সদাচঞ্চল ক্রীড়াপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইতেন—আহ্বান দূরে থাকুক, অনেক সময়ে অঙ্গে হস্তার্পণ করিলেও টের পাইতেন না। সংযতমনা যোগীর বহুবর্ষ সাধনার ফল বালক কেমন করিয়া লাভ করিলেন? এরূপ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক!

স্মরণাতীত শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিবামাত্র ভ্রূদ্বয় মধ্যে এক গোলাকার দিব্য জ্যোতিঃপিণ্ড দর্শন করিতেন। শয়নের সময় চক্ষু মুদ্রিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জ্যোতিঃগোলক তাঁহার ভ্রূমধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত এবং ক্রমে বিস্তৃত হইয়া তাঁহার সমস্ত দেহ আচ্ছন্ন করিত। চিন্ময় জ্যোতিঃসাগরে তাঁহার আমিত্ব ডুবিয়া যাইত—বালক নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন। এইরূপ ঘটনা প্রত্যহই ঘটিত—কাজেই ইহা অসাধারণ বলিয়া তাঁহার মনে কোন প্রশ্ন আইসে নাই। দশ বৎসর বয়সের সময়েও তাঁহার ধারণা ছিল যে, প্রত্যেকেরই বুঝি নিদ্রা যাইবার প্রাক্কালে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। এই অদ্ভুত জ্যোতিঃগোলক সহায়ে তাঁহার মন স্বতঃই একাগ্র হইয়া পড়িত—কাজেই মনের সহিত বাসনার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কোন দিন ধ্যানস্থ হইবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিতে হয় নাই।

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্র সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই আনন্দিত হইতেন। তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করিতে নরেন্দ্র সর্বদাই মুক্তহস্ত। কখনও কখনও উলঙ্গ হইয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত দান করিয়া ফেলিতেন। গৃহস্থালীর নিত্য-আবশ্যক দ্রব্যাদি দান করিয়া সময় সময় লাঞ্ছিত হইলেও কার্যকালে বালকের তাহা মনে থাকিত না। কখনও বা পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া কৌপীন ধারণ করতঃ সুঠাম নরেন্দ্র “শিব” “শিব” বলিয়া করতালি দিতে দিতে প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতেন—সে অদ্ভুত নৃত্য, হাস্যপ্রফুল্ল কমনীয় মুখমণ্ডল, বিভূতিভূষিত বালকসন্ন্যাসীকে অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে দেখিতে স্নেহমুগ্ধা জননী শাসন করিবার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতেন।

শৈশবকাল হইতে রামায়ণ ও মহাভারত ক্রমাগত শ্রবণ করিতে করিতে অধিকাংশ স্থানই তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। বালক সুললিত কণ্ঠে সময় সময় উহা আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিতেন। কখনও বা ভিক্ষুক গায়কগণের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণ বা সীতারাম লীলাবিষয়ক সঙ্গীত বা সঙ্গীতাংশ মধুর কণ্ঠে গাহিয়া পরিজনবর্গের এবং পিতৃবন্ধুগণের চিত্তবিনোদন করিতেন! সদা-প্রফুল্ল নরেন্দ্র সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন; আদর-সোহাগে বর্ধিত

বালক স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীনতাপ্রিয় হইলেও পিতামাতার বিবিধ সদ্‌গুণাবলী তাঁহার কৈশোর-চরিত্রে স্থানলাভ করিয়াছিল। পদে পদে নীতিশাস্ত্রের রূঢ় অনুশাসনে প্রতিহত না হওয়ায় তাঁহার চরিত্র লোকলোচনের অন্তরালে আপন মাধুর্যে স্বাভাবিক ভাবেই ফুটিয়া উঠিতেছিল।

শ্রীরামকার্যে উৎসর্গীকৃত-জীবন বীরভক্ত হনুমানের অলৌকিক কার্যাবলী শ্রবণ করিতে বালক বড়ই ভালবাসিতেন। জননীর নিকট তিনি শুনিলেন যে, হনুমান অমর, এখনও জীবিত আছেন। তদবধি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নরেন্দ্রের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একদিন নরেন্দ্র কথকতা শ্রবণ করিতে গিয়াছেন, কথকঠাকুর নানাপ্রকার অলঙ্কারমণ্ডিত করিয়া হাস্যরসের সহিত হনুমানের চরিত্র বর্ণন করিতেছেন, এমন সময় নরেন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি যে বলিলেন হনুমান কলা খাইতে ভালবাসেন এবং কলাবাগানে থাকেন, আমি তথায় গেলে কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব?" কি গভীর বিশ্বাস—কি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সহিত যে বালক প্রশ্ন করিল, তাহা বুঝিবার মত অবসর ও শক্তি কথক মহাশয়ের ছিল না। তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ খোকা, তুমি কলাবাগানে খুঁজিলে তাঁহাকে পাইতে পার।"

নরেন্দ্র আর বাড়িতে ফিরিলেন না। সত্য সত্যই বাটীর পার্শ্বস্থিত বাগানে প্রবেশ করিয়া কদলীবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া হনুমানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, তথাপি হনুমান আসিলেন না, অগত্যা গভীর রাত্রে ভগ্নহৃদয়ে তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। অভিমানভরে জননীর নিকট সমস্ত খুলিয়া বলিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকের বিশ্বাসের মূলে আঘাত করা বুদ্ধিমতী জননী সঙ্গত মনে করিলেন না. তাঁহার বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি দুঃখ করিও না, আজ হয়তো হনুমান রামকার্যে অন্যত্র গিয়াছেন, আর এক দিন দেখা হইবে।" আশামুগ্ধ বালক শান্ত হইলেন—তাঁহার মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল। ইহার পর বালক আর কখনও ঐ ভাবে হনুমান দর্শনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি; কিন্তু হনুমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই. ইহা নিশ্চয়। উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মচর্যব্রতগ্রহণাভিলাষী যুবকমাত্রকেই মহাবীরের চরিত্র আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে বলিতেন। পরার্থে আত্মত্যাগে কৃতসঙ্কল্প শিষ্যবৃন্দকে দাস্যভক্তির জীবন্তবিগ্রহ হনুমানের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল দীপ্ত আবেগে রক্তিম হইয়া উঠিত; সিংহগর্জনে বলিয়া উঠিতেন, "দে দিকি দেশে মহাবীর হনুমানের পূজা চালিয়ে! দুর্বল বাঙ্গালী জাতের সম্মুখে এই মহাবীর্যের আদর্শ ধর! দেহে বল নেই, হৃদয়ে সাহস নেই—কি হবে এই সব জড়পিণ্ডগুলো দিয়ে! আমার ইচ্ছে ঘরে ঘরে মহাবীরের পূজো হোক্।" একদা তিনি বেলুড়মঠে মহাবীরজীর একটি প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

এদিকে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পরই যথানিয়মে নরেন্দ্রনাথের বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক 'গুরুমহাশয়' এই ছাত্রটিকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মারিয়া ধরিয়া পড়া শিখাইবার যে সনাতন নীতি তিনি অবাধে তাঁহার ছাত্রদিগের উপর প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন. তাহাতে কিছুমাত্র সুফল ফলিল না। গুরুমহাশয় অগ্নিশর্মা হইলে নরেন্দ্রনাথ একেবারে বাঁকিয়া বসিতেন। অগত্যা গুরুমহাশয়কে সনাতন প্রথা ছাড়িয়া এই ক্ষুদ্র ছাত্রটিকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে হইত। এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত

হইলে নরেন্দ্র মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসানে প্রেরিত হইলেন। সমবয়স্ক সহপাঠিবৃন্দের সঙ্গলাভ করিয়া নরেন্দ্রের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। নূতন খেলার সাথীদের লইয়া নরেন্দ্রের নেতৃত্বে শীঘ্রই একটি ক্ষুদ্র দল গড়িয়া উঠিল। প্রভাতে ও অপরাহ্ণে ক্রীড়ামত্ত বালকগণের কৌতুককোলাহলে দত্তভবনের সুবিস্তীর্ণ অঙ্গন মুখরিত থাকিত।

অপরদিকে, স্কুলে গিয়া প্রথম প্রথম নরেন্দ্রনাথ বড়ই বিপদে পড়িলেন। পদে পদে তাঁহার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। একভাবে তিনি বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। কখনও দাঁড়াইতেন, কখনও বসিতেন, কখনও বা অকারণে কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিতেন, কখনও বা করিবার কিছু না পাইয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র অথবা পুস্তক ছিন্ন করিতেন। সময় সময় তাঁহার পিতামাতার মত শিক্ষকগণও বিব্রত হইয়া উঠিতেন এবং শাসনবাক্যে সংযত হইবার পাত্র নরেন্দ্রনাথ নহেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া মিষ্ট কথায় তাঁহাকে শান্ত করিতেন; চঞ্চল প্রকৃতির বালক হইলেও তাঁহার চরিত্রে বাল্যকাল হইতেই সাধারণ বালকগণ অপেক্ষা বহু স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইত। খেলিবার সময়ে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া কেহ বিবাদরত হইলে তিনি মহা বিরক্ত হইতেন; এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া মীমাংসা করিয়া দিতেন। যদি তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বালকগণ পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইত, নরেন্দ্রনাথ নির্ভীকভাবে তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেন। শারীরিক শক্তিতে নরেন্দ্রনাথ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। বরং তাঁহার অসম সাহসিকতা দর্শনে অনেকেই চমৎকৃত হইতেন। ঘুষি চালাইতে সিদ্ধহস্ত নরেন্দ্র অনেক দুষ্ট বালকের ভীতির পাত্র ছিলেন। ন্যায়বিচারক, উদার ক্ষমাশীল, শক্তিমান, প্রতিভাশালী নরেন্দ্রনাথকে সহপাঠিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নেতার আসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। যখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর মাত্র তখন তিনি একদিন সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে চড়কের মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। মহাদেবের কতকগুলি মৃত্তিকানির্মিত প্রতিমূর্তি ক্রয় করিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় একটি ক্ষুদ্র বালক দলভ্রষ্ট হইয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় পড়িল। ঠিক সেই সময় সম্মুখে একখানি গাড়ি দেখিয়া হতভম্ব বালক কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। পথিকগণ বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। গোলমাল শুনিয়া পিছনে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র নরেন্দ্র আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিলেন। তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া মহাদেবের মূর্তিটি বগলে ফেলিয়া দ্রুতবেগে প্রায় অশ্ব-পদতল হইতে বালকটিকে টানিয়া বাহির করিলেন। মুহূর্তকাল বিলম্ব হইলেই বালকের অস্থি-মজ্জা চূর্ণ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র বালকের এই নির্ভীক কার্য দর্শনে সকলেই মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ভাবের আতিশয্যে তাঁহার মস্তকে হস্তপ্রদান করিয়া আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। জননী সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া অঞ্চলে আনন্দাশ্রু মুছিতে মুছিতে সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া বাষ্পবিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, “সব সময় এই রকম মানুষের মত কাজ করিও বাবা।” কি করিয়া সন্তানকে মানুষ করিয়া গঠন করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। এই মহীয়সী মহিলার নিজ হস্তে গড়িয়া তোলা নরেন্দ্র, মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র নামক পুত্রত্রয়ের যশোরাশি বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় পৃষ্ঠা! একদিন বাল্যকালের বিষয় কোন শিষ্যকে বলিতে বলিতে স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—“ছোট বেলা থেকেই একটা একগুয়ে দানা ছিলুম আর কি? নৈলে

কি আর কপর্দকশূন্য অবস্থায় সমস্ত দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম রে?”

যে সমস্ত বালক জুজু, ভূত ইত্যাদি শুনিলে ভয়ে আড়ষ্ট না হইয়া ভূত দেখিতে চায় নরেন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর বালক ছিলেন। ভয় দেখাইয়া নরেন্দ্রকে নিরস্ত করা অসম্ভব ছিল। নরেন্দ্রদের প্রতিবেশী এক খেলার সাথীর বাড়িতে একটি চাঁপা ফুলের গাছ ছিল। ঐ গাছের ডালে পা বাধাইয়া মাথা ও হাত ঝুলাইয়া দোল খাওয়া নরেন্দ্রের একটা প্রিয় খেলা ছিল। বাড়ির বুড়ো-কর্তা একদিন নরেন্দ্রকে উঁচু ডালে ঐরূপ দোল খাইতে দেখিয়া ভীত হইলেন—বিশেষতঃ নরেন্দ্রের উৎপাতে গাছটিও ভাঙিবার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। তিনি নরেন্দ্রের স্বভাব জানিতেন, ধমক দিলে বিপরীত ফল হইবে। কাজেই মিষ্ট কথায় বলিলেন. “ছিঃ ও গাছটায় উঠো না!” নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, এ গাছটায় উঠলে কি হয়?” বৃদ্ধ বলিলেন, “ও গাছে একটা ব্রহ্মদত্যি থাকেন।” এই বলিয়া বৃদ্ধ ব্রহ্মদৈত্যের বিকট আকৃতি বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহার আশ্রিত বৃক্ষের অপমান যে ব্রহ্মদৈত্য কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না, তাহা দু’ একটা দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া দিলেন। নরেন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ মনে করিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বৃদ্ধ প্রস্থান করিবামাত্র নরেন্দ্র পুনরায় গাছের ডালে উঠিয়া বসিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ব্রহ্মদৈত্য মশাইকে একবার দেখতে পেলে হয়। নরেন্দ্রের খেলার সাথী যথেষ্ট ভীত হইয়াছিল, সে কাতরকণ্ঠে বলিল, “না ভাই, অপদেবতার কথা বলা যায় না, কোন্ দিক থেকে কখন যে ঘাড় মট্‌কে দেবে তার ঠিক নেই।” নরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “তুই একটা আস্ত বোকা। তোর ঠাকুরদাদা ভয় দেখাবার জন্য বানান গল্প বলে গেলেন। যদি সত্যি সত্যি এই গাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকত, তা’হলে সে এতদিন নিশ্চয় আমার ঘাড় মট্‌কে দিত।”

লোকমুখে শুনিয়া যাহা-তাহা বিশ্বাস করা নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতেই কোন কথা তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। যৌবনে ঐ ভাবের প্রেরণাতেই নরেন্দ্রনাথ পুঁথিগত দার্শনিক তত্ত্বগুলির আলোচনায় তৃপ্ত না হইয়া সত্য লাভ করিবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় নরেন্দ্রনাথ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন। ক্রমাগত বহুদিবস রোগে ভুগিয়া তাঁহার দেহ অস্থিচর্মসার হইল। তখন বিশ্বনাথ কর্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে অবস্থান করিতেন। বায়ুপরিবর্তনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে অনুমান করিয়া তিনি পরিবারবর্গ রায়পুরে লইয়া আসিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্র রায়পুরে পিতার নিকট গমন করেন।

মধ্যপ্রদেশের সর্বত্র তখনো রেললাইন হয় নাই। এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হইয়া নাগপুর পর্যন্ত রেলে যাওয়া চলিত। নাগপুর হইতে রায়পুর যাইতে হইলে প্রায় পক্ষাধিককাল গো-শকটে যাইতে হইত। সুদীর্ঘ পথ ঘুরিয়া অর্ধ ভারতবর্ষ অতিক্রমণের ফলে নরেন্দ্রনাথের তরুণ মনে দেশ-জননীর বিচিত্র রূপ এক মোহময় ইন্দ্রজাল বিস্তার করিল। বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রূপের ভাণ্ডার আজ তাঁহার সম্মুখে কে যেন থরে থরে সাজাইয়া দিল। কিশোর কবি-হৃদয়ের প্রথম জাগ্রত সৌন্দর্যতৃষ্ণা অনন্ত অফুরন্তের মধ্যে তৃপ্তির আনন্দে ডুবিয়া গেল। এই দিব্যানুভূতির কথা নরেন্দ্রনাথ জীবনে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার গুরুভ্রাতা পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজী, বিবেকানন্দের নিকট ঐ কথা যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তাহা ‘লীলাপ্রসঙ্গে’ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হইলে নরেন্দ্র মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসানে প্রেরিত হইলেন। সমবয়স্ক সহপাঠিবৃন্দের সঙ্গলাভ করিয়া নরেন্দ্রের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। নূতন খেলার সাথীদের লইয়া নরেন্দ্রের নেতৃত্বে শীঘ্রই একটি ক্ষুদ্র দল গড়িয়া উঠিল। প্রভাতে ও অপরাহ্নে ক্রীড়ামত্ত বালকগণের কৌতুককোলাহলে দত্তভবনের সুবিস্তীর্ণ অঙ্গন মুখরিত থাকিত।

অপরদিকে, স্কুলে গিয়া প্রথম প্রথম নরেন্দ্রনাথ বড়ই বিপদে পড়িলেন। পদে পদে তাঁহার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। একভাবে তিনি বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। কখনও দাঁড়াইতেন, কখনও বসিতেন, কখনও বা অকারণে কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিতেন, কখনও বা করিবার কিছু না পাইয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র অথবা পুস্তক ছিন্ন করিতেন। সময় সময় তাঁহার পিতামাতার মত শিক্ষকগণও বিব্রত হইয়া উঠিতেন এবং শাসনবাক্যে সংযত হইবার পাত্র নরেন্দ্রনাথ নহেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া মিষ্ট কথায় তাঁহাকে শান্ত করিতেন; চঞ্চল প্রকৃতির বালক হইলেও তাঁহার চরিত্রে বাল্যকাল হইতেই সাধারণ বালকগণ অপেক্ষা বহু স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইত। খেলিবার সময়ে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া কেহ বিবাদরত হইলে তিনি মহা বিরক্ত হইতেন; এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া মীমাংসা করিয়া দিতেন। যদি তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বালকগণ পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইত, নরেন্দ্রনাথ নির্ভীকভাবে তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেন। শারীরিক শক্তিতে নরেন্দ্রনাথ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। বরং তাঁহার অসম সাহসিকতা দর্শনে অনেকেই চমৎকৃত হইতেন। ঘুষি চালাইতে সিদ্ধহস্ত নরেন্দ্র অনেক দুষ্ট বালকের ভীতির পাত্র ছিলেন। ন্যায়বিচারক, উদার ক্ষমাশীল, শক্তিমান, প্রতিভাশালী নরেন্দ্রনাথকে সহপাঠিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নেতার আসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। যখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর মাত্র তখন তিনি একদিন সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে চড়কের মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। মহাদেবের কতকগুলি মৃত্তিকানির্মিত প্রতিমূর্তি ক্রয় করিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় একটি ক্ষুদ্র বালক দলভ্রষ্ট হইয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় পড়িল। ঠিক সেই সময় সম্মুখে একখানি গাড়ি দেখিয়া হতভম্ব বালক কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। পথিকগণ বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। গোলমাল শুনিয়া পিছনে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র নরেন্দ্র আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিলেন। তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া মহাদেবের মূর্তিটি বগলে ফেলিয়া দ্রুতবেগে প্রায় অশ্ব-পদতল হইতে বালকটিকে টানিয়া বাহির করিলেন। মুহূর্তকাল বিলম্ব হইলেই বালকের অস্থি-মজ্জা চূর্ণ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র বালকের এই নির্ভীক কার্য দর্শনে সকলেই মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ভাবের আতিশয্যে তাঁহার মস্তকে হস্তপ্রদান করিয়া আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। জননী সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া অঞ্চলে আনন্দাশ্রু মুছিতে মুছিতে সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া বাষ্পবিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, “সব সময় এই রকম মানুষের মত কাজ করিও বাবা।” কি করিয়া সন্তানকে মানুষ করিয়া গঠন করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। এই মহীয়সী মহিলার নিজ হস্তে গড়িয়া তোলা নরেন্দ্র, মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র নামক পুত্রত্রয়ের যশোরাশি বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় পৃষ্ঠা! একদিন বাল্যকালের বিষয় কোন শিষ্যকে বলিতে বলিতে স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—“ছোট বেলা থেকেই একটা একগুঁয়ে দানা ছিলুম আর কি? নৈলে

কি আর কপর্দকশূন্য অবস্থায় সমস্ত দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম রে?"

যে সমস্ত বালক জুজু, ভূত ইত্যাদি শুনিলে ভয়ে আড়ষ্ট না হইয়া ভূত দেখিতে চায় নরেন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর বালক ছিলেন। ভয় দেখাইয়া নরেন্দ্রকে নিরস্ত করা অসম্ভব ছিল। নরেন্দ্রদের প্রতিবেশী এক খেলার সাথীর বাড়িতে একটি চাঁপা ফুলের গাছ ছিল। ঐ গাছের ডালে পা বাধাইয়া মাথা ও হাত ঝুলাইয়া দোল খাওয়া নরেন্দ্রের একটা প্রিয় খেলা ছিল। বাড়ির বুড়ো-কর্তা একদিন নরেন্দ্রকে উঁচু ডালে ঐরূপ দোল খাইতে দেখিয়া ভীত হইলেন—বিশেষতঃ নরেন্দ্রের উৎপাতে গাছটিও ভাঙিবার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। তিনি নরেন্দ্রের স্বভাব জানিতেন, ধমক দিলে বিপরীত ফল হইবে। কাজেই মিষ্ট কথায় বলিলেন, "ছিঃ ও গাছটায় উঠো না।" নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, এ গাছটায় উঠলে কি হয়?" বৃদ্ধ বলিলেন, "ও গাছে একটা ব্রহ্মদত্যি থাকেন।" এই বলিয়া বৃদ্ধ ব্রহ্মদৈত্যের বিকট আকৃতি বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহার আশ্রিত বৃক্ষের অপমান যে ব্রহ্মদৈত্য কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না, তাহা দু' একটা দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া দিলেন। নরেন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ মনে করিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বৃদ্ধ প্রস্থান করিবামাত্র নরেন্দ্র পুনরায় গাছের ডালে উঠিয়া বসিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ব্রহ্মদৈত্য মশাইকে একবার দেখতে পেলে হয়। নরেন্দ্রের খেলার সাথী যথেষ্ট ভীত হইয়াছিল, সে কাতরকণ্ঠে বলিল, "না ভাই, অপদেবতার কথা বলা যায় না, কোন্‌দিক থেকে কখন যে ঘাড় মট্‌কে দেবে তার ঠিক নেই।" নরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তুই একটা আস্ত বোকা। তোর ঠাকুরদাদা ভয় দেখাবার জন্য বানান গল্প বলে গেলেন। যদি সত্যি সত্যি এই গাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকত, তা'হলে সে এতদিন নিশ্চয় আমার ঘাড় মট্‌কে দিত।"

লোকমুখে শুনিয়া যাহা-তাহা বিশ্বাস করা নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতেই কোন কথা তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। যৌবনে ঐ ভাবের প্রেরণাতেই নরেন্দ্রনাথ পুঁথিগত দার্শনিক তত্ত্বগুলির আলোচনায় তৃপ্ত না হইয়া সত্য লাভ করিবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় নরেন্দ্রনাথ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন। ক্রমাগত বহুদিবস রোগে ভুগিয়া তাঁহার দেহ অস্থিচর্মসার হইল। তখন বিশ্বনাথ কর্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে অবস্থান করিতেন। বায়ুপরিবর্তনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে অনুমান করিয়া তিনি পরিবারবর্গ রায়পুরে লইয়া আসিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্র রায়পুরে পিতার নিকট গমন করেন।

মধ্যপ্রদেশের সর্বত্র তখনো রেললাইন হয় নাই। এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হইয়া নাগপুর পর্যন্ত রেলে যাওয়া চলিত। নাগপুর হইতে রায়পুর যাইতে হইলে প্রায় পক্ষাধিককাল গো-শকটে যাইতে হইত। সুদীর্ঘ পথ ঘুরিয়া অর্ধ ভারতবর্ষ অতিক্রমণের ফলে নরেন্দ্রনাথের তরুণ মনে দেশ-জননীর বিচিত্র রূপ এক মোহময় ইন্দ্রজাল বিস্তার করিল। বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রূপের ভাণ্ডার আজ তাঁহার সম্মুখে কে যেন থরে থরে সাজাইয়া দিল। কিশোর কবি-হৃদয়ের প্রথম জাগ্রত সৌন্দর্যতৃষ্ণা অনন্ত অফুরন্তের মধ্যে তৃপ্তির আনন্দে ডুবিয়া গেল। এই দিব্যানুভূতির কথা নরেন্দ্রনাথ জীবনে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার গুরুভ্রাতা পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজী, বিবেকানন্দের নিকট ঐ কথা যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তাহা 'লীলাপ্রসঙ্গে' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"তিনি বলিতেন, 'বনমধ্যগত পথ দিয়া যাইতে যাইতে ঐ কালে যাহা দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা স্মৃতির পত্রে চিরকালের জন্য দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ একদিনের কথা। উন্নতশীর্ষ বিন্ধ্যগিরির পাদদেশ দিয়া সেদিন আমাদিগকে যাইতে হইতেছিল। পথের দুই পার্শ্বেই গিরিশৃঙ্গসকল গগন স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান; নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতা ফল-পুষ্প-সম্ভারে অবনত হইয়া পর্বতপৃষ্ঠের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়া রহিয়াছে। মধুর কাকলীতে দিক্ পূর্ণ করিয়া নানাবর্ণের বিহগকুল কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গমন অথবা আহার অন্বেষণে কখনো কখনো ভূমিতে অবতরণ করিতেছে। ঐ সকল বিষয় দেখিতে দেখিতে মনে একটা অপূর্ব শান্তি অনুভব করিতেছিলাম। ধীর-মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে গো-যান সকল ক্রমে ক্রমে এমন একস্থলে উপস্থিত হইল, যেখানে পর্বতশৃঙ্গদ্বয় যেন প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে এককালে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তখন তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, এক পার্শ্বের পর্বতগাত্রে মস্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সুবৃহৎ ফাট রহিয়াছে এবং ঐ অন্তরালকে পূর্ণ করিয়া মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তর পরিশ্রমের নিদর্শনস্বরূপ একখানি প্রকাণ্ড মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে। তখন বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকারাজ্যের আদি অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন ত্রিজগৎনিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত উপলব্ধিতে এমনভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের নিমিত্ত বাহ্যসংজ্ঞার এককালে লোপ হইল। কতক্ষণ ঐ ভাবে গো-যানে পড়িয়াছিলাম, স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম, উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। গো-যানে একাকী ছিলাম বলিয়া ঐ কথা কেহ জানিতে পারে নাই।' প্রবল কল্পনা সহায়ে ধ্যানরাজ্যে আরূঢ় হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে বোধ হয় ইহাই প্রথম।"

রায়পুরে তখন স্কুল ছিল না, বিশ্বনাথ স্বয়ং পুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মামলা-মোকদ্দমা লইয়া মাথা ঘামাইতে ও আদালতে ছুটাছুটি করিতে হইত না বলিয়া তিনি প্রচুর অবসর পাইতেন। পুত্রের প্রতিভা তাঁহার অবিদিত ছিল না; নিয়মিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাড়াও ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক পুত্রকে পড়াইতে লাগিলেন; তাঁহার ভবনে প্রত্যহ অপরাহ্নে রায়পুরের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আসিতেন। প্রায় অধিকাংশ সময়েই নরেন্দ্র উপস্থিত থাকিয়া সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি আলোচনা মনোযোগ দিয়া শুনিতেন। কখনও কখনও বিশ্বনাথ পুত্রকে আলোচনায় যোগদান করিয়া মতামত প্রকাশ করিতে আদেশ করিতেন। বয়সে নিতান্ত বালক হইলেও প্রবীণগণ অনেক সময় তাঁহার যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যগুলি শুনিয়া আনন্দিত হইতেন। পুত্রের যোগ্যতা দেখিয়া বিশ্বনাথও আনন্দের সহিত তাঁহাকে আলোচনায় উৎসাহ দিতেন। একদিন তাঁহার পিতৃবন্ধু জনৈক খ্যাতনামা লেখক বাঙ্গলাসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন; নরেন্দ্রনাথও পিতার ইঙ্গিতে আলোচনায় যোগদান করিলেন। সাহিত্যিকপ্রবর কিছুক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন, অধিকাংশ প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থই বালক অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি বিস্ময়ে ও আনন্দে নরেন্দ্রকে বলিলেন, "বৎস! আশা করি একদিন তোমার দ্বারা বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত হইবে।" স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত "বর্তমান ভারত", "পরিব্রাজক", "ভাব্‌বার কথা", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য" ইত্যাদি পুস্তক তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীকে সফল করিয়াছে সন্দেহ নাই।

পুত্রের বিকাশোন্মুখ বুদ্ধি ও প্রতিভার সহিত সম্যক্ পরিচয়ের ফলে বিশ্বনাথ নরেন্দ্রের শিক্ষার ধারা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া লইলেন। পুঁথিগত

বিদ্যার ভারে পুত্রের প্রখর স্মৃতিশক্তিকে ক্লান্ত না করিয়া তিনি পুত্রের সহিত নানা বিষয়ে তর্কের অবতারণা করিতেন এবং নরেন্দ্রকে স্বাধীনভাবে স্বমত প্রকাশ করিবার সুযোগ দিতেন। অপরদিকে নরেন্দ্রনাথও পিতার জ্ঞানগরিমার গভীরতায় মুগ্ধ হইলেন। শ্রদ্ধাবান জগতে চিরদিনই ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিয়া থাকেন। মুক্তহৃদয়, দয়ালু, পরদুঃখকাতর বিশ্বনাথ পার্থিব সম্পদ দুহাতে বিলাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বহুকষ্টার্জিত জ্ঞানসম্পদ অজস্র ধারায় যোগ্য পুত্রকে দান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া পিতার নিকট কেবল জ্ঞানলাভই করেন নাই, তাঁহার কিশোর চরিত্রের উপর পিতার মহত্ত্বের ছাপ গভীর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তেজস্বিতা, পরদুঃখকাতরতা, আপদ-বিপদে ধৈর্য না হারাইয়া অনুদ্বিগ্নচিত্তে ধীরভাবে কার্য করিয়া যাওয়া, নরেন্দ্র পিতার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পিতার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলিও ধীরে ধীরে নরেন্দ্রনাথ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। বিশ্বনাথ অমিতব্যয়ী ছিলেন; কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। নরেন্দ্রের যে বয়স তাহাতে ভবিষ্যতের কথা তাহার মনে উদয় হওয়া সম্ভব নহে। হয়ত কোন আত্মীয় বা স্বজনের পরামর্শে নরেন্দ্র একদিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাবা, আপনি আমাদের জন্য কি রাখিতেছেন?" এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র বিশ্বনাথ কক্ষগাত্রবিলম্বিত সুবৃহৎ দর্পণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন,—"যা, আর্শিতে নিজের চেহারাটা দেখে আয়, তাহলেই বুঝবি, তোকে আমি কি দিয়েছি।" বুদ্ধিমান কিশোর বালক বুঝিয়া লইলেন। পুত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়ার, তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য বিশ্বনাথ কখনো তিরস্কার করিতেন না, কটুবাক্য বলিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আর একটা কথা বলা যায়। একদিন বালকসুলভ চপলতাবশতঃ নরেন্দ্র জননীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ এজন্য পুত্রকে তিরস্কার না করিয়া যে ঘরে নরেন্দ্র সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবদের লইয়া গল্পগুজব ও পড়াশুনা করিতেন, সেই ঘরের দেওয়ালে কয়লা দিয়া বড় বড় হরপে লিখিয়া রাখিলেন, "নরেন্দ্রবাবু তাঁহার মাতাকে এই সকল কটুবাক্য বলিয়াছেন।" ইহাতে নরেন্দ্রনাথ যে লজ্জা ও মনস্তাপ ভোগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার আজীবন মনে ছিল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, দত্ত-ভবনে বহু দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় ও অনাত্মীয় স্থায়ীভাবে আস্তানা ফেলিয়া অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান করিয়াছিল; ইহার মধ্যে আবার কয়েকটি ব্যক্তিকে নিয়মিত মাদক দ্রব্য সেবনের ব্যয়ও বিশ্বনাথকে দিতে হইত। অলস ও নেশাখোর-দিগকে এ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে পিতার নিকট একদিন নরেন্দ্র অভিযোগ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ সস্নেহে পুত্রকে বাহুডোরে বাঁধিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, "জীবন যে কত দুঃখের তা তুই এখন কি বুঝবি। যখন বড় হবি, তখন দেখ্‌বি, কি গভীর দুঃখের হাত থেকে, জীবনের শূন্যময় ব্যর্থতার গ্লানির হাত থেকে ক্ষণিক নিষ্কৃতির জন্য তারা নেশা ভাঙ করে; আর এ যখন জানবি তখন তাদের উপর তোরও দয়া হবে।"

এইরূপ শিক্ষার মধ্য দিয়া নরেন্দ্রের চিত্তে পিতার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল। সময় সময় তিনি বন্ধুবর্গের নিকট জনকের গুণাবলী কীর্তন করিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। আমি একজন মহৎ ব্যক্তির পুত্র, ইহা তিনি দম্ভের সহিত ঘোষণা করিতেন এবং এই কারণেই একটা প্রবল আত্মাভিমান তাঁহার প্রত্যেক বাক্য ও আচরণে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। কেহ বালক বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলে অত্যন্ত চটিয়া উঠিতেন। তাঁহার ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কারের মধ্যে

ঈর্ষাদ্বেষ ছিল না—ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর প্রতিবেশিগণই তাঁহার সমান প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সত্যবাক্য, সত্যব্যবহার তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—নির্ভীকভাবে অপ্রিয় সত্য লোকের মুখের উপর দ্বিধাহীন চিত্তে বলিয়া ফেলিতেন। সেজন্য সময় সময় শাসিত হইতেন বটে, কিন্তু তথাপি সত্য গোপন করিতে পারিতেন না।

কৈশোরে নিজেকে শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচয় দিতে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করিতেন। কেহ তাঁহার যুক্তিপূর্ণ কথা বালকের ধৃষ্টতা জ্ঞানে উপেক্ষা করিলে নরেন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হইতেন। তর্কের সময়ে তাঁহার গুরুলঘু জ্ঞান থাকিত না। এমন কি, অবজ্ঞাত হইলে বালকের কঠোর সমালোচনা হইতে তাঁহার পিতৃবন্ধুগণ পর্যন্ত নিষ্কৃতি পাইতেন না। অবশ্য বিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে জব্দ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার মত হীনতা তাঁহার ছিল না। গভীর আঘাত না পাইলে তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইতেন না। তাঁহার এই সমস্ত ঔদ্ধত্য বিশ্বনাথ মার্জনা করিতেন না, বরং যথাযথ শাসন করিতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিতেন বটে, কিন্তু পুত্রের প্রবল আত্মনিষ্ঠা দেখিয়া অন্তরে অন্তরে হৃষ্ট হইতেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই নরেন্দ্র পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহখানি দেখিয়া তাঁহার বয়স অনেকেই বিশ বৎসর অনুমান করিতেন। নিয়মিতভাবে শরীর চালনার জন্য কুস্তি ইত্যাদিতে তিনি বাল্যকাল হইতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তৎকালে হিন্দুমেলা প্রবর্তক নবগোপাল মিত্র মহাশয় শিমলা-পল্লীতে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর একটি ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ এই আখড়াতে নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিতেন। প্রথম যৌবনে তিনি একবার "বক্সিং" খেলায় সর্বপ্রথম হইয়া একটি রৌপ্যনির্মিত প্রজাপতি উপহার পাইয়াছিলেন। তৎকালীন ছাত্রসমাজে উত্তম ক্রিকেট খেলোয়াড় বলিয়াও তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল।

বিশ্বনাথ উত্তম রন্ধন করিতে পারিতেন। নরেন্দ্র রায়পুরে অবস্থানকালীন পিতার নিকট নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন। কলেজে পাঠকালীন তিনি সময় সময় বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করাইতেন। নরেন্দ্র আজীবন রন্ধনপ্রিয় ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াও তিনি এই রন্ধনপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রায়ই বিবিধপ্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শিষ্যবর্গকে যত্নের সহিত স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আনন্দানুভব করিতেন।

প্রায় দুই বৎসর পর প্রিয়দর্শন নরেন্দ্রনাথ শারীরিক ও মানসিক বিচিত্র পরিবর্তন লইয়া রায়পুর হইতে বন্ধুবর্গের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। বহুদিন পর তাঁহাকে পাইয়া সকলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। প্রায় দুই বৎসর অনুপস্থিত থাকার দরুণ তাঁহাকে প্রবেশিকা শ্রেণীতে ভর্তি হইতে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইল। অবশেষে তাঁহার গুণমুগ্ধ শিক্ষকগণ কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষভাবে অনুমতি লইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি দুই বৎসরের পাঠ্যপুস্তক কঠোর পরিশ্রমের সহিত এক বৎসরেই আয়ত্ত করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং প্রশংসার সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ নরেন্দ্রের কৃতকার্যতায় সমধিক প্রীতিলাভ করিলেন, কারণ সেবার একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসানে অধ্যয়নকালীন একজন পুরাতন সুদক্ষ শিক্ষক

কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন উদ্যোগী ছাত্র তাঁহাকে বিদায়াভিনন্দন দিবার জন্য প্রস্তুত হন। আগামী পুরস্কার-বিতরণী সভায় তাঁহারা শিক্ষক মহাশয়কে অভিনন্দিত করিবেন স্থির হইল। দেশবিখ্যাত বাগ্মিপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কে বক্তৃতা করিবে ভাবিয়া লাজকুণ্ঠিত বালকগণ আকুল হইল। অবশেষে সকলের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথই বক্তারূপে নির্বাচিত হইলেন। নরেন্দ্র সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রায় অর্ধঘণ্টা স্বীয় স্বভাবমধুরকণ্ঠে সুললিত ইংরাজীতে উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের গুণাবলী বর্ণনা করিলেন। তিনি বক্তৃতা শেষ করিলে সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া গভীর প্রীতির সহিত নরেন্দ্রের বক্তৃতার প্রশংসা করিলেন। সেকালে ষোড়শ কি সপ্তদশবর্ষীয় কিশোর বালকের পক্ষে জননেতা সুরেন্দ্রনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা কম দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতার পরিচায়ক নহে।

যে সমস্ত মহাপুরুষ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের চিন্তা-রাজ্যে পরিবর্তন আনিয়াছেন, দেশের ও দশের কল্যাণকামনায় অমিত বীর্য লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে কর্ম করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে বাল্যকাল হইতেই স্বীয় অসাধারণত্ব স্বল্পবিস্তর অনুভব করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথেরও যে সময় সময় ঐরূপ চিন্তা না আসিত এমন নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অন্যান্য বালকগণের সহিত তুলনায় অনেক সময় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতেন। সেইজন্যই তাঁহার আত্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সাধারণের দৃষ্টিতে অহঙ্কার বলিয়া মনে হইত। অহঙ্কার হইলেও উহা পরপীড়ক ছিল না—তাহা হইলে তিনি সহপাঠী এবং প্রতিবেশী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয় আকর্ষণ করিতে কখনও সমর্থ হইতেন না।

নরেন্দ্রনাথের চরিত্রে যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর, সমস্তই তাঁহার সুশিক্ষিতা মার্জিতরুচি জননীর সুশিক্ষা ও যত্নের ফল। সন্তানগণের চরিত্রে যাহাতে কোনপ্রকার নীচতা স্থান না পায়, সেজন্য তিনি সর্বদা সাবধানে থাকিতেন। মাতৃভক্ত নরেন্দ্র কোনদিন জননীর আদেশ লঙ্ঘন করিতেন না। সন্তানকে মানুষের মত মানুষ দেখিবার জন্য কোন্ জননীর না আগ্রহ হয়? কিন্তু সকলে কেমন করিয়া মানুষ গড়িয়া তুলিতে হয় জানেন না। আধুনিক বঙ্গজননিগণ পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হইয়া যখন অজ্ঞাতসারে দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের হৃদয় ঈর্ষা-বিষে কলুষিত করিয়া তুলিতে থাকেন, তখন তাঁহারা ভাবিবার অবসর পান না যে, দৈবজ্ঞ কথিত "অসাধারণ লক্ষণাক্রান্ত" বালক ভবিষ্যতে একজন পরশ্রীকাতর, সঙ্কীর্ণচেতা, হীন বিলাসী "বাবু"তে পরিণত হইবে মাত্র! বাঙ্গলার জনকজননী সন্তান উৎপাদন করিতে ও প্রসব করিতে সুদক্ষ, কিন্তু কেমন করিয়া মানুষ গড়িয়া তুলিতে হয় জানেন না, শিখেন না, ভাবেনও না। গতানুগতিকভাবে তিন-বেলা আহার করাইয়া বিশ্বসংসারে পরের এঁটোপাত হইতে দুমুঠো খুঁটিয়া খাইবার জন্য সন্তানগণকে ছাড়িয়া দেন—ফলে দেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য, কিন্তু "মানুষ" ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে।

জননী ভুবনেশ্বরী সিংহিনী ছিলেন বলিয়াই না নরেন্দ্রনাথের মত পুরুষ-সিংহ প্রসব করিয়াছিলেন! নারীসুলভ কোমলতার অন্তরালে তাঁহার চরিত্রে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল, যাহা অন্যায়, অসত্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বদা সদর্পে শির উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হইত। স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিবার পরেও এই মহিমময়ী মহিলা নয় বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার আদরের পুত্র নরেন্দ্রনাথকে জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দে পরিবর্তিত হইতে দেখিয়াছিলেন। জগৎ মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখিয়াছে, এই তেজস্বিনী রমণী, পূত ভাগীরথী-তীরে স্বীয়

পুত্রের চিতাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অকম্পিতপদে শেষ প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছেন। তিনি বিবেকানন্দের জননী, এ গৌরবগর্ব তাঁহার সংযম-সাধন-ক্লিষ্ট সৌম্যমুখ-মণ্ডলে সর্বদা জাগ্রত থাকিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাবিমিশ্র সম্ভ্রম-দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তাঁহার দেহান্ত হয়।

পিতা ও মাতার স্নেহ-ক্রোড়ে প্রাচুর্যের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর-জীবন হাসি, আনন্দ, খেলাধূলায় কাটিয়াছে। তাঁহার বাল্যজীবন অলৌকিক বা অসাধারণ না হইলেও অনুপম। ষোল বৎসর বয়সেই তিনি যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রবল আত্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানার্জনের প্রবল আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহা দুর্লভ। পিতার নিকট তিনি বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং গীতবাদ্যেও তাঁহার অধিকার ঐ কালে নিতান্ত কম ছিল না। এই মেধাবী, তেজস্বী, চঞ্চল-চপল বালক, একদিকে যেমন পরিহাসরসিক, ক্রীড়াপ্রিয়, উগ্রস্বভাব ছিলেন, অপর দিকে তেমনি গভীর চিন্তাশীল, দয়ালু, বন্ধুবৎসলও ছিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা অকপট সারল্য ফুটিয়া উঠিত, যাহাতে তিনি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রিয় হইতেও প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করিবার পর হইতেই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নরেন্দ্রের সহজ ও স্বাভাবিক জীবনের এক বিচিত্র রহস্য-জটিল অধ্যায় আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংস্কার যুগ

(১৮০০-১৮৮০)

> "সংস্কারকেরা বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন, আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রসূতিকে' বুঝিবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের মধ্য দিয়া যান নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যা মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি।"
>
> —বিবেকানন্দ

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে আদর্শভ্রষ্ট আত্মবিস্মৃত দুইটি মহাজাতির বংশধরগণ নিশ্চয় ধর্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অধঃপতনের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বিধাতার অলক্ষ্য বিধানে এই দৌর্বল্য ও জড়ত্বের শাস্তি অতি নিদারুণ হইয়া দেখা দিল। মোগল-সাম্রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠিত ময়ূর-সিংহাসন দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল, নববল-দৃপ্ত মহারাষ্ট্র জাতির গৌরবময় অভুত্থানের উন্নত মস্তক ইতিহাসের নির্মম বজ্রদণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল, বণিক ইংরাজের মানদণ্ড সহসা ভারতবাসীর মস্তকের উপর রাজদণ্ড হইয়া দেখা দিল, শিখ-গরিমা-সূর্য উদয়াচল-শিখরেই নিভিয়া গেল। দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যেমন নিঃসহায়ভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ একসঙ্গে নতশিরে ইসলাম রাজশক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঠিক তেমনিভাবে হিন্দু ও মুসলমান—দুই নিরুপায় সম্প্রদায় একরূপ অপ্রতিবাদেই ইংরাজের পদানত হইয়া পড়িল। এই অভিনব রাজনৈতিক পরিবর্তনে পশ্চিমদেশাগত বণিক-ব্যাধ-নিকরের সুলভ-মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত ভারতবর্ষের দৈন্য ও দৌর্বল্যের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

আদর্শভ্রষ্ট ছত্রভঙ্গ হিন্দুজাতি সমগ্র মুসলমান-যুগেও প্রাণপণ বলে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে অব্যাহত রাখিয়া আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে এক বিপরীত শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে প্রাচীন সমাজের পুরাতন রক্ষণশীলতা কোনই কাজে আসিল না। মুসলমান-শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে যে কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, সেইগুলির বিচারহীন অনুকরণ এই অভিনব শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবকে বাধা দিতে পারিল না। কাল ও অবস্থাভেদে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার নব নব ব্যবস্থা করিতে একান্ত অপারগ হিন্দুসমাজ বহু-শতাব্দী-সঞ্চিত কুসংস্কারের ভারে প্রায় সকল দিক দিয়া পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। বিজিত জাতি সহজেই বিজয়ী জাতির গুণ-গরিমায় অভিভূত হইয়া পড়ে। কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে আত্মবিস্মৃত হিন্দুজাতির সম্মুখে পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা ও সভ্যতা যেদিন মরু-মরীচিকার সম্মোহিনী শক্তি লইয়া সুরঞ্জিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বৈচিত্র্যময় দৃশ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সেদিন ভারতের ইতিহাসে—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ইতিহাসে এক নবীন অধ্যায় আরম্ভ হইল। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর কথা

বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এ জাতির উচ্চশ্রেণীর মত ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসী এত অসংযতভাবে প্রতীচী-সভ্যতা-স্রোতে ভাসিয়া যাইবার চেষ্টা করে নাই। ফলে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সহিত প্রাচ্যের সংঘর্ষণে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, দাসসুলভ পরানুকরণ-প্রবৃত্তির চাপল্য সমাজ-জীবনে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল, তাহা বাঙ্গলাদেশেই প্রবলাকার ধারণ করিল, আর এই আন্দোলনসমূহের কেন্দ্রস্থল হইল—ভারতের নব-প্রতিষ্ঠিত রাজধানী কলিকাতা-নগরী।

এদেশে ইংরাজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান মিশনরীরা নিরুদ্বেগে 'হিদেন'দিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন, দলে দলে মিশনরী আসিতে লাগিলেন। ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়া প্রথমেই তাঁহাদিগকে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইত। ক্রমে ধর্মপ্রচারের বাধাগুলি চিন্তা করিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে. শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে প্রচারকার্য অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে চলিবে। এইরূপে তাঁহারা স্থানে স্থানে বিদ্যালয় খুলিতে লাগিলেন এবং শিক্ষার ভিতর দিয়া কোমলমতি বালক ও তরলমতি যুবকবৃন্দের চিত্তে প্রাণপণে খৃষ্টধর্মের মহিমা মুদ্রিত করিতে প্রয়াসী হইলেন। অবশ্য কোন কোন উদারহৃদয় মিশনরী বা ইংরাজ যে কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের জন্যই শিক্ষাপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং বাধা ও বিপত্তির সহিত যথেষ্ট যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীজাতি এত অকৃতজ্ঞ নহে যে, তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি সহজে জাতীয় ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিবে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম কলিকাতা সহরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। ঠিক সেই বৎসর আধুনিক শিক্ষার অন্যতম জনক ডেভিড্ হেয়ার বাঙ্গলা দেশে আগমন করিলেন। এই মহাপুরুষ নাস্তিক নীতিপরায়ণ ও মানবহিতৈষী ছিলেন। কিছুদিন পর ইনি বিষয়কর্ম ছাড়িয়া একমাত্র শিক্ষাপ্রচারকল্পেই আত্মনিয়োগ করিলেন।

খৃষ্টান মিশনরীগণ রাজশক্তির আনুকূল্যে ক্রমে সাহস পাইয়া হিন্দুধর্মবিদ্বেষবিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। প্রাচীন স্থবির জড়পিণ্ডবৎ হিন্দুসমাজ কান পাতিয়া শুনিল যে, তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্তই মন্দ, ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ। ইহার ফলে তাহারা ইহলোকে সর্বপ্রকার ভোগসুখ হইতে বঞ্চিত এবং পরলোকে অনন্ত নরকে যাইবে। যত প্রকার নিন্দা করা যাইতে পারে, মিশনরীগণ তাহার কোনটিই বাকী রাখিলেন না। জনৈকা ইংরাজ মহিলা-মিশনরী হিন্দুধর্মকে গালাগালি ও অভিশাপ দিবার জন্য ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে প্রাণের জ্বালা মিটাইবার জন্য অনেক গবেষণা করিয়া স্থির করিলেন,—
“Crystallized immorality and Hinduism are same thing.”
অর্থাৎ স্ফটিকাকারে ঘনীভূত অপবিত্রতা ও হিন্দুধর্ম একই জিনিস।

প্রাচীণ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এই অভিনব আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার কোন চেষ্টাই করিল না। পাঠান ও মোগল-যুগে ইসলামধর্মপ্রচারকদিগকে রাজনৈতিক কারণে বাধা দেওয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অসাধ্য ছিল। এক্ষেত্রেও তাঁহারা হয়তো ভাবিয়াছিলেন, পাদ্রীগণের প্রচারকার্যের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিলে খৃষ্টান রাজশক্তির কোপে পড়িতে হইবে। আরো একটা প্রধান কারণ, ইসলাম অথবা খৃষ্টধর্মের মত হিন্দুধর্ম প্রচারশীল ছিল না। হিন্দুসমাজ কৃত্রিম জাতিভেদ প্রথার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত ও বিভিন্ন বলিয়া ধর্ম, নীতি. সদাচার প্রভৃতি সর্বস্তরে সমান নহে এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞাও প্রচুর। সমাজের এই

অবস্থায়, সমগ্রের জন্য মমত্ববোধ সমাজ-জীবন হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। গত দুই তিন শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে সহস্র সহস্র পরিবার মুসলমানধর্ম গ্রহণ করার ফলে যেমন হিন্দুসমাজ উৎকণ্ঠিত হয় নাই তেমনি পাদ্রীদের আক্রমণেও তাহারা বিচলিত হইল না। গতানুগতিক হিন্দুসমাজ সেকেলে কতকগুলি প্রথা নিষেধ মানিয়া চলা, বার মাসে তের পার্বণ, তীর্থযাত্রা, গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দান, অন্ন-পানীয়ের আদান-প্রদানের কতকগুলি নিয়মকে মানিয়া চলাই ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চা করিতেন মাত্র, বেদ ও বেদান্ত আলোচনা বাঙ্গলা দেশে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। ধনী ও বড়লোকদের ধর্মকর্মের নামে শোষণ এবং তাহাদের গুণকীর্তন করিয়া অর্থোপার্জন, মন্ত্র দিয়া শিষ্যবিত্ত অপহরণ, দেশাচার, লোকাচার, স্ত্রী-আচার পালন, সামাজিক দলাদলি লইয়া ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। সর্বসাধারণ হিন্দুদের মধ্যে জ্ঞান-বিদ্যা আলোচনার কোন চেষ্টা ছিল না। আরবী পার্শী পড়িয়া চাকুরী অথবা বিষয়কার্য চালাইবার মত পত্রলেখা ও হিসাব রাখিতে পারাই শিক্ষার চরম আদর্শ ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ধনী ও বাবু বাঙ্গালীদের চরিত্র নানাদিকে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; অর্থ থাকিলে পত্নীর বা পত্নীদের গোচরেই অনেকে উপপত্নী রাখিতেন, বিদ্যাসুন্দর, কবি ও তর্জার লড়াইয়ের অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীত অভিনয়ে তৃপ্ত হইতেন। কলিকাতার বাবুরা বুলবুলি ও ঘুড়ির খেলা, বারবনিতা লইয়া বাগানবাড়িতে আমোদ, বেশভূষা প্রভৃতিতেও মত্ত থাকিতেন। এই সময় সহসা এক মেধাবী মহাপুরুষ কলিকাতা সহরে আবির্ভূত হইলেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন বাঙ্গালী জাতি এক রূঢ় আঘাতে চৈতন্য পাইয়া দেখিল, মহা মনীষী রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার-আন্দোলনে কলিকাতা নগরী বিক্ষুব্ধ হইল—বাঙ্গলার সর্বত্র আলোচনার তরঙ্গ ছড়াইয়া পড়িল। “বাবুদিগের বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে, পল্লীগ্রামের চণ্ডী-মণ্ডপে যেখানে সেখানে রামমোহনের কথা। অন্তঃপুরের মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইতে অবশিষ্ট থাকিল না।”

রামমোহন ধনী ও অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পাটনায় তিনি আরবী ও পার্শী ভাষা শিক্ষা করেন এবং ঐ ভাষায় কোরান, ইউক্লিড ও আরিষ্টটলের গ্রন্থাদি পাঠ করেন। পরে কাশীতে গিয়া সংস্কৃত ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। বেদান্ত ও কোরান পাঠ করিবার ফলে তিনি মূর্তিপূজাবিরোধী ও একেশ্বরবাদী হইয়া উঠেন। প্রচলিত ধর্মের নিন্দা করিয়া আরবী ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ফলে তিনি পিতা ও আত্মীয়বর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। পরে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিয়া বাইবেল ইত্যাদি পাঠ করেন। বহুভাষাবিদ্ এবং বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্বজ্ঞ রামমোহনই সর্ব-প্রথম বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইতিপূর্বে পাশ্চাত্ত্যদেশেও কোন পণ্ডিত এইরূপ যুক্তিবাদ সহায়ে বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনা-মূলক আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। যাহা হউক, পিতার মৃত্যুর পর ১৮০৩ সালে রামমোহন পুনরায় পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হন এবং ১৮০৫ হইতে ১৮১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে কালেক্টরের সেরেস্তাদারী করেন। রঙ্গপুরে (১৮০৯-১৪) থাকার সময়ই রামমোহন বেদান্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং উপনিষদের অনুবাদকার্যে হস্তক্ষেপ করেন। পরে চাকুরী ছাড়িয়া ১৮১৪ সালে কলিকাতায় আসিয়া “আত্মীয়সভা” বলিয়া একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অনুরাগী ব্যক্তিবর্গকে লইয়া বহুদিন বিলুপ্তপ্রায় উপনিষদ প্রচার এবং

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিপূজা ও প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। কেবল হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও অযৌক্তিক মতবাদ নহে; খৃষ্টানধর্ম, বিশেষভাবে মিশনরী প্রচারিত মতবাদের, অসারতাও প্রমাণ করিয়া তিনি প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে প্রাচীন-পন্থী হিন্দু-সমাজ এবং মিশনরীবৃন্দ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। ১৮২১ সালে উইলিয়ম আডাম নামক জনৈক মিশনরী রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগপূর্বক একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিলেন। এই ব্যাপার লইয়া মিশনরী সমাজেও একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। মিশনরীগণ দেখিলেন, "পৌত্তলিকতা" বা তথাকথিত আচার-ব্যবহারের উপর হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়; উহার মূল ভিত্তি হইতেছে বেদান্ত-দর্শন। ম্যার্সম্যান, কেরী প্রভৃতি শ্রীরামপুরস্থ মিশনরীগণ বেদান্ত-দর্শনকে আক্রমণ করিলেন। রামমোহনও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ধীরভাবে তাঁহাদের অযৌক্তিক মতগুলি একে একে খণ্ডন করিতে লাগিলেন। এই বিখ্যাত বেদান্তযুদ্ধ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। মিশনরীগণের বাঙ্গালীকে খৃষ্টান করিবার প্রাণপণ চেষ্টার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন একক দাঁড়াইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেদিন তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়ান তো দূরের কথা, হিন্দুসমাজ বরং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। একদিকে স্বজাতির শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কার, অপরদিকে খৃষ্টানী ধর্মান্ধতাপ্রসূত হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের ভ্রান্ত-ব্যাখ্যা—এই উভয়ের বিরুদ্ধে যুগপৎ রামমোহনকে শাস্ত্র ও যুক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অসীমশক্তিশালী রামমোহনের চিন্তা ও চরিত্র সমাজের অভ্যস্ত জড়ত্বের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া এক নবজীবনের চাঞ্চল্য জাগ্রত করিল। ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে অধঃপতিত জাতিকে হীনতার পঙ্কশয্যা হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য রাজা সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে একক দাঁড়াইয়া যে কি অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, শতাব্দীর ব্যবধানে নানা কারণে আজ তাহা ধারণা করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয়, "তিনি কি না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, বঙ্গ-সমাজের যে কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র।"

তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে রামমোহন রায়ের প্রতিভা, সুগভীর স্বদেশপ্রেম উপলব্ধি করিবার মত লোক অতি অল্পই ছিল। সেই অল্পসংখ্যক সহচর লইয়া তিনি কুসংস্কার, অর্থহীন প্রথা, প্রাণহীন আচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে নির্মম হইয়া সংগ্রামের সূচনা করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজার বা জাতিভেদের বিরুদ্ধে রাজার আন্দোলন অপেক্ষা, সহমরণ-প্রথার কদর্য নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাঁহার আন্দোলন, রক্ষণশীল সমাজকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। শোকার্তা সদ্যবিধবাকে ছলে কৌশলে এবং বলপূর্বক প্রকাশ্য দিবালোকে মৃত পতির সহিত দাহ করাকে মহাপুণ্য কার্য বলিয়া সমর্থন করিবার লোকের অভাব ছিল না। প্রথার এমনি প্রভাব। সাধারণতঃ দয়ালু ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরাও প্রথার মোহে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নিষ্ঠুর আচরণ করিতে গ্লানিবোধ করিতেন না। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, রক্ষণশীলদল রাজা স্যার রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে এক 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করিয়া 'সতীদাহ' প্রথা সমর্থন করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহারা জানিতেন যে, কদাচিৎ কোন নারী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হয়। অধিকাংশস্থলেই সম্পত্তি ও বিত্তের লোভে, উপবাসক্লিষ্টা শোকার্তা বিধবাকে ভাঙ-ধুতুরাদি

খাওয়াইয়া সহমরণের সম্মতি লওয়া হইত এবং বিধবাকে চিতার সহিত বাঁধিয়া বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া দাহ করা হইত। তথাপি সত্যের অপলাপ করিয়া তাঁহারা যুক্তিহীন জিদ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, ইতিপূর্বে অনেক ইংরাজ শাসক ঐ কুপ্রথা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিলেও রামমোহনের দীর্ঘ দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী আন্দোলনের ফলে ১৮২৯এর ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ-প্রথা নিবারণ করিয়া আইন বিধিবন্ধ হইল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক রামমোহনের যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিলেন। রাজার পরামর্শে গবর্ণর জেনারেল গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথাও আইন দ্বারা নিবারণ করিলেন। প্রাচীন সমাজ সদ্য-বিধবাদিগকে জীয়ন্তে পোড়াইয়া মারিবার সুযোগ হারাইয়া 'হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হইল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। হিন্দুজাতির ললাট হইতে রাম-মোহনের চেষ্টায় দুইটি দুরপনেয় কলঙ্করেখা মুছিয়া গেল। স্যার রাধাকান্তের দল ব্যর্থকাম হইয়া রামমোহনের মূর্তিপূজা অস্বীকার ও বেদান্ত আন্দোলনের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই বাদানুবাদের মধ্যে কুরুচি, ঈর্ষা প্রভৃতি যথেষ্টই ছিল, কিন্তু ইহার ভাল ফল হইল এই যে, বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন শাস্ত্রগুলি শিক্ষিতবর্গের মধ্যে আলোচিত হইতে লাগিল এবং রক্ষণশীল সমাজের মধ্যেও সংস্কারকের দল জাগ্রত হইল। এমন কি রামমোহন-প্রতিদ্বন্দ্বী স্যার রাধাকান্তই তৎকালে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য প্রণালীতে এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানকল্পে বিদ্যালয়াদি স্থাপনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়া রাজা তৎকালীন রাজপুরুষদিগের আনুকূল্য এবং সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন; স্বদেশীয় কতিপয় মহানুভব ব্যক্তিও রামমোহনকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ, ১৮১৭ সালে যখন তাঁহারই চেষ্টায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল তখন প্রাচীন-পন্থিগণ রামমোহনকে উহার মেম্বর করিতে অস্বীকৃত হইলেন। মহানুভব রাজা অম্লানবদনে দেশের মুখ চাহিয়া সে অপমান সহ্য করিলেন। তিনি কেবল বলিলেন, "সে কি কথা? আমার নাম থাকা কি এতবড় কথা যে, সেজন্য একটা ভাল কাজ নষ্ট করিতে হইবে?" ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হওয়ার বিরুদ্ধেও অনেকে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন বটে, কিন্তু তাহা টিকিল না।

কালক্রমে হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন, স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃংখলতা আরম্ভ হইল। অখাদ্যভক্ষণ, সুরাপান, প্রকাশ্য স্থানে মুসলমানের দোকান হইতে গোমাংসাদি ক্রয় করিয়া আহার করা ইত্যাদি সৎসাহসের কার্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। কলিকাতা সহরের এই ক্ষুদ্র সমাজবিপ্লবটির সহায়ক হইলেন কলেজের খৃষ্টান অধ্যাপকবৃন্দ। এই সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীবিপ্লব-সাগরমথিত অমৃত ও গরল লইয়া আসিলেন প্রতিভাশালী শিক্ষক ডিরোজিও (Derozio) । ইনি ইউরেশিয়ন। ধর্মে যে কি ছিলেন তাহা বলা বা নির্বাচন করা সুকঠিন। অপ্রতিহত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সর্বতোভাবে উপভোগ করিতে হইবে—ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল।

দৃঢ়হৃদয় শক্তিশালী শিক্ষক ডিরোজিওকে নেতারূপে পাইয়া হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ উৎসাহে অধীর হইলেন। ইঁহাদের আচার-ব্যবহার ক্রমে সমাজের সকল শ্রেণীরই অসহনীয় হইয়া উঠিল। যাহা কিছু হিন্দুর বা হিন্দুত্ব তাহাই কুসংস্কার, এই অদ্ভুত ধারণা লইয়া তাঁহারা "কুসংস্কার ভঞ্জন ও চরিত্রের উন্নতি সাধনের এক প্রধান উপায় মনে করিয়া" অবাধ সুরাপানের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। হিন্দু কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ ক্রমে বঙ্গের বিভিন্ন নগরীতে গিয়া

তাঁহাদের আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগের হঠকারিতা ও উচ্ছৃংখলতা ক্রমে ধীরতার সীমা অতিক্রম করিল। ইতিমধ্যে ১৮৩০ সালে পাদ্রী আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্‌ কলিকাতায় আসিলেন। রামমোহন ইঁহাকে একটি স্কুল করিয়া দিলেন। ইতিপূর্বে রামমোহনের বন্ধু আডাম সাহেবও একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইত না, ছাত্রগণের নৈতিক চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, এই দুরবস্থা দেখিয়াই যাহাতে শিক্ষা ধর্মানুগ হয়, সেজন্য রামমোহন চেষ্টিত হইলেন। এই সময় রামমোহনকে বিবিধ কার্যের জন্য বিলাত যাইতে হইল। ভারতবর্ষ হইতে সর্বপ্রথম হিন্দুসন্তান রামমোহন বিলাত গমন করিলেন—ইহা একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং ইহাতেও রামমোহনের দুঃসাহসের অন্ত ছিল না।

হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের উচ্ছৃংখলতা—তাঁহার বড় আদরের পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষময় বিকৃত ফল দেখিয়া রামমোহন ব্যথিত হইলেন। তাঁহার জীবনচরিতকার লিখিয়াছেন*—

অর্থাৎ—তিনি (রামমোহন) প্রথম জীবনে স্বদেশবাসিগণের অত্যধিক বিশ্বাস-প্রবণতা দেখিয়া হৃদয়ে গভীর বেদনানুভব করিতেন। এবং ইহার বিরুদ্ধে স্বীয় সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি বুঝিতে লাগিলেন যে, তত সাংঘাতিক না হইলেও অত্যল্প বিশ্বাসও বিপজ্জনক। কলিকাতায় বিশেষভাবে যুবকগণের দ্বারা গঠিত একটি দলের কথা তিনি প্রায়ই ক্ষোভের সহিত উল্লেখ করিতেন। এই যুবকগণের মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধিমানও ছিলেন এবং সর্বতোভাবে সন্দেহবাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, এই দল হিন্দু ও ফিরিঙ্গী যুবকগণের সমবায়ে গঠিত হইয়াছিল; ইঁহারা অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাবে স্বীয় ধর্মমত পরিবর্জন করিতেন, কিন্তু অন্য কোন ধর্ম-মতাবলম্বী হইতেন না। এইরূপ কোন ধর্মে আস্থাহীন অবস্থা, একান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর অবস্থা হইতেও শোচনীয়তর এবং তাঁহাদের মতবাদ সর্ব-প্রকার নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী। (রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত। লণ্ডন—১৮৩৩-৩৪)

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার তরঙ্গাভিঘাতে এক সুপ্রাচীন সভ্যতার বংশধরগণ একেবারে অসহায়ভাবে ভাসিয়া না যায়, যাহাতে তাহারা যুগোপযোগী উপায় অবলম্বনে জাতীয় জীবনাদর্শ রক্ষা করিয়া জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে, এই মহদ্ভাবের প্রেরণায় রাজা রামমোহন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্যকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিবার অবসর পান নাই; তাঁহার আদর্শ সেই কারণে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় নাই। দেশের দুর্ভাগ্য তিনি ইংলণ্ড হইতে আর ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। ১৮৩৩-এর

---

* "In his younger years, his mind had been deeply struck with the evils of believing too much, and against that he directed all his energies: but, in his latter days, he began to feel, that there was as much, if not greater, danger in the tendency to believe too little. He often deplored the existence of a party which had sprung up in Calcutta, composed principally of imprudent younger men, some of them possessing talent, who had avowed themselves sceptics in the widest sense of the term. He described it as partly composed of East Indians, partly of the Hindu youths who, from education had learnt to reject their own faith without substituting any other, these he thought more debased than the most bigoted Hindu, and their principles the bane of all morality."—*Biography of Raja Ram Mohon Roy*, London, 1833-34.

২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার দেহান্ত হইল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "ব্রহ্মসভা" আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের চেষ্টায় কোন প্রকারে জীবনধারণ করিয়া রহিল মাত্র। যাঁহারা তৎকালে রাজার সহকর্মী ছিলেন তাঁহারা কেহই এই প্রচণ্ড ভাবধারাকে বহন করিবার জন্য তেমন ভাবে অগ্রসর হন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ রামমোহনের শিক্ষার তিনটি মূলসূত্র বলিয়া নির্দেশ করিতেন—তাঁহার বেদান্ত-গ্রহণ, স্বদেশপ্রেম প্রচার এবং হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে ভালবাসা। এই সকল বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা ও ভবিষ্যদর্শিতা যে কার্যপ্রণালীর সূচনা করিয়াছিল, তিনি নিজে মাত্র তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেন।

হিন্দুধর্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন শাঙ্কর-অদ্বৈতবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। উপনিষদ্ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্যকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়া বেদকে যে ভাবে মর্যাদা দিয়া রামমোহন হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নানারূপ মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও একথা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হয়, তাঁহার সিদ্ধান্ত তাঁহার অনুবর্তিগণ ঠিক ঠিক গ্রহণ করেন নাই, অথবা করিতে পারেন নাই। অথচ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে রামমোহন যে সকল দিক দিয়া অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এমন কথাও সাহস করিয়া বলা যায় না। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যেগুলি অদ্যাপি আছে, তাহা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে অর্থাৎ পরবর্তী ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণের চক্ষু দিয়া না দেখিলে, মোটামুটি বোঝা যায় :—

(১) বাঙ্গলার শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই প্রধান সম্প্রদায় কালবশে নানাভাগে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল, দেশের জনসাধারণ ধর্ম বলিতে কতকগুলি প্রথা ও নিয়মের বিচারহীন অনুসরণই বুঝিত। ইহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিরোধ ও বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। বেদান্ত অবলম্বনে তিনি এই বিভক্ত বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে এক ঐক্যমূলক দার্শনিক ভিত্তির উপর আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টায় রামমোহন শাক্ত ও বৈষ্ণবের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, গুরু ও অবতারবাদ, মন্ত্র, সাধনা ও সিদ্ধির প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব আদর্শকে তিনি অশ্লীল বলিয়া এক প্রকার উপেক্ষাই করিয়াছেন। স্বয়ং তন্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াও, তান্ত্রিক সাধকের শিষ্য হইয়াও এবং তন্ত্রোক্ত চক্রের সাধনায় শক্তি গ্রহণ ও শৈব বিবাহ সমর্থন করিয়াও তিনি তন্ত্রের মাতৃভাব পরিহার করিয়াছেন।

(২) হিন্দুশাস্ত্ররাশি আলোচনা করিয়া রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, হিন্দুরা ধর্মতত্ত্ব নিরূপণে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিলেও নীতির দিক দিয়া অত্যন্ত অবনত। হিন্দুর ধর্মনীতি অপেক্ষা খৃষ্টানী ধর্মনীতি তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল এবং হিন্দুজাতির পুনরুত্থানকল্পে খৃষ্টানী নীতি-মার্গের পথিক হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, ইহা রাজা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেন।

(৩) বেদান্তোক্ত নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়া রামমোহন হিন্দুর সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিরসন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৪) জাতিভেদ, মাংসাহারে অনিচ্ছা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, বিদেশগমনে অনিচ্ছা, সমুদ্রযাত্রায় পাপবোধ ইত্যাদি রাজার মতে আমাদের জাতীয়

অবনতির কারণ এবং এই সমস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে লেখনী চালনা করিতে কোন প্রতিকূল সমালোচনাতেই ভীত হন নাই।

(৫) রাজা দেশে স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির উন্মেষকল্পে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিক্ষার মধ্য দিয়া তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শারীর-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে যাহাতে এদেশের নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙলা গদ্য রচনায় উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বনে মাতৃভাষার উন্নতিসাধনে রামমোহনের উদ্যমও সামান্য নহে।

রামমোহনের সর্বতোমুখী প্রতিভার প্রখর দৃষ্টি জাতীয়-জীবনের সকল বিভাগেই পতিত হইয়াছিল। স্বধর্মানুরাগী, জাতীয়তাবোধের প্রথম পুরোহিত রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম নব জাগরণের ভেরী-নিনাদে দেশকে জাগ্রত হইবার জন্য আবাহন করিয়াছিলেন। অথচ এই মহাপুরুষের চিন্তা ও চরিত্র নিরপেক্ষভাবে এ পর্যন্ত আলোচনা হয় নাই। আমি সাহস করিয়া বলিব, ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাবশতঃ রামমোহনের উদার সার্বভৌমিক আদর্শ সম্বন্ধে এত ভ্রান্ত ধারণা করিবার সুযোগ দিয়াছেন যে, আজ বাঙালী জাতির এই মহাপুরুষকে না জানার দুর্ভাগ্য অপেক্ষা ভুল করিয়া জানার দুর্ভাগ্যই অধিক।

‘আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ চিন্তনরূপ মুখ্য উপাসনা’কে ভিত্তি করিয়া রামমোহন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্য দিয়াও রামমোহন ভারতের সনাতন সাধনা ও সভ্যতার মর্ম উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই কতকগুলি প্রচলিত লোকাচার এবং ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াও কোন নূতন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। যে ‘ব্রাহ্মধর্ম’ রামমোহনের নামের ছাপ লইয়া এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রণেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫), রাজা রামমোহন নহেন। দেশে এখনো অনেকের রামমোহনই ব্রাহ্মধর্ম-প্রবর্তক ইত্যাকার ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেই জন্য এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

১৮৪৩-এর ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিশজন বন্ধুসহ ‘ব্রাহ্মধর্মে’ দীক্ষা গ্রহণ করেন। ‘ব্রহ্মধর্ম’ রামমোহনের ঈপ্সিত পথে বিকশিত হয় নাই। ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রচারক মনীষী স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় রাজার আদর্শ ও মহর্ষির আদর্শ আলোচনা করিয়া নিম্ন-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

> “* * রাজা একান্তভাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জন করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদকে প্রামাণ্য-মর্যাদাভ্রষ্ট করিয়া শুধু ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরেই ঐকান্তিকভাবে সত্যাসত্য ও ধর্মাধর্ম মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। রাজা ধর্মসাধনে যে গুরুরও একটা বিশেষ স্থান আছে, ইহা কখনো অস্বীকার করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেমন শাস্ত্র সেইরূপ গুরুকেও বর্জন করিয়া, প্রত্যক্ষ আত্মশক্তি ও অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-কৃপার উপরেই সাধনে যথাযোগ্য সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা কি তত্ত্বাঙ্গে, কি সাধনাঙ্গে, ধর্মের কোন অঙ্গেই, স্বদেশের সনাতন সাধনার সঙ্গে আপনার ধর্মসংস্কারের প্রাণগত যোগ নষ্ট করেন নাই। মহর্ষি এক প্রকারের স্বাদেশিকতার একান্ত অনুরাগী হইয়াও প্রকৃতপক্ষে এই যোগ রক্ষা করেন নাই, করিতে চেষ্টাও করেন নাই। রাজা বেদান্তের উপরেই আপনার তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্মকে গড়িয়া তুলেন। রাজা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মকেই ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া প্রচার করেন। মহর্ষি তাঁহার আপনার

আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিপ্রতিপাদ্য ধর্মকেই ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

"* * মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে কেবল উপনিষদের উপদেশই উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ সকল উদ্ধৃত উপদেশের প্রামাণ্য-মর্যাদা শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত নহে, মহর্ষির আপনার স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠিত মাত্র; উপনিষদের যে সকল শ্রুতি মহর্ষির নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, তিনি সেগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া আপনার ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে নিবন্ধ করেন—ঋষিরা কি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন বা জানিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান তিনি করেন নাই। কোন শ্রুতির বা উত্তরার্ধ, কোনওটির বা অপরার্ধ, যার যতটুকু তাঁর নিজের মনোমত পাইয়াছেন, তাহাই কাটিয়া ছাঁটিয়া আপনার ব্রহ্মধর্মগ্রন্থে গাঁথিয়া দিয়াছেন। অতএব মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে বিস্তর শ্রুতি উদ্ধৃত হইলেও, এ গ্রন্থ তাঁহার নিজের, ইহার মতামত তাঁহার, প্রাচীন ঋষিদিগের নহে। সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার না করিয়া কেবল বাংগলাভাষায় এ সকল মতামত লিপিবদ্ধ করিলেও তার যতটুকু মর্যাদা থাকিত, উপনিষদের বুক্‌নী দেওয়াতে ইহা তদপেক্ষা বেশী মর্যাদা লাভ করে নাই।" ('পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ব্রাহ্ম-সমাজ' হইতে উদ্ধৃত)

যাহা হউক, রাজার আদর্শের সহিত প্রভূত অনৈক্য সত্ত্বেও 'ব্যক্তিত্বাভিমানী য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-ধর্মকে' প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিবার জন্য মহর্ষি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। এই কার্যে তাঁহার সহায় হইলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্গভাষার অন্যতম স্রষ্টা অক্ষয়কুমার দত্ত এবং মনীষী রাজনারায়ণ বসু।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের কলিকাতার ধনী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত আভিজাত্য-মর্যাদা ছিল। ঋণমুক্ত হইলে তিনি পুনরায় কলিকাতার ধনী-সমাজের অগ্রণী হইয়া উঠেন এবং তাঁহার অর্থানুকূল্যে ও সবিশেষ চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকার্য চলিতে থাকে। মহর্ষির ধনবল ও জনবলের সহায়েই ব্রাহ্মসমাজ অল্পকালেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

প্রতিমা-পূজাদি ক্রিয়াকাণ্ড বর্জন করিলেও মহর্ষি প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হন নাই, বরং হিন্দু-সমাজের সহিত আপোষের ভাব রক্ষা করিয়াই রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিনব ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

পাদ্রী আলেক্‌জাণ্ডার ডফের অক্লান্ত চেষ্টায় হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে নাস্তিকতার ভাব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, এইবার শিক্ষিত বাংগালীগণকে তাঁহারা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইবেন; এমন সময় তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির পথে প্রবল অন্তরায়স্বরূপ দাঁড়াইল—মহর্ষি-প্রচারিত, ব্রাহ্মধর্ম। পাদ্রী ডফের চেষ্টায় ইতিপূর্বেই ডিরোজিওর শিষ্যগণের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি খৃষ্টান হইয়াছিলেন—তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেকে খৃষ্টান হইলেন: কেহ কেহ হইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন—এমন সময় "যীশুর স্বর্গরাজ্য আনয়নের" দ্বাররোধ করিতে উদ্যত হইলেন—ব্রাহ্মসমাজ। আবার বেদান্তযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। বেদান্তপক্ষ সমর্থন করিয়া মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল; ডফ্ সাহেবও প্রাণপণে সদলবলে বেদান্তকে আক্রমণ করিলেন। এ আন্দোলনে কলিকাতানগরীর 'হিন্দুবর্গ' উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ডফ্ সাহেবকে হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে দেখিয়া হিন্দু কলেজের নেতৃবৃন্দ, ছাত্রগণকে ডফ্ ও ডিয়েলট্রির বক্তৃতা

শুনিতে নিষেধ করিলেন। কারণ-পরম্পরায় কালের গতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া পাদ্রী ডফ্ ভগ্নহৃদয়ে ১৮৬৩ সালে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

১৮৫০ সালে অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণের পরামর্শে মহর্ষি বাধ্য হইয়া বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পরিত্যাগ করিলেন। ফলে চিরদিনের মত ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক হইয়া গেল। যাহা হউক, ইঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানেও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, সমাজের কার্য বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল।

এই সময় আর এক শক্তিশালী পুরুষ বাঙ্গালী সমাজে আবির্ভূত হইলেন, ইনি বীরসিংহ গ্রামের সিংহশিশু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে পরানুকরণমোহ, আর অন্য দিকে আত্মবিস্মরণ—দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া বাঙ্গালী-দুর্লভ বিবিধ সদ্‌গুণমণ্ডিত এই চিরস্মরণীয় চরিত্রে মনুষ্যত্বের এক অত্যুজ্জ্বল মূর্তি অতি আশ্চর্য রকমে আত্মপ্রকাশ করিল। বঙ্গভাষার স্রষ্টা ও পালয়িতা বিদ্যাসাগর, শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী বিদ্যাসাগর, দীন-দরিদ্র দুঃখী-আর্তের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী বিদ্যাসাগর, সর্বোপরি স্বদেশী সমাজের দুর্গতি ও দুর্নীতি পরিহার করাইতে ব্রতী বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় কীর্তি-কাহিনী নব বাঙ্গলার ইতিহাসের অক্ষয় সম্পদ।

বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন, "বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে ইহাপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকার্য করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।"

বাল-বিধবার ব্রহ্মচর্য এবং নারীর সতী-ধর্মের মহিমা কীর্তনে মুখরিত ভারতভূমিতে হতভাগ্য অবলাজাতির উপর যুগান্ত-সঞ্চিত অতি পৈশাচিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেদিন বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইলেন, "সেদিন দেশের পুরুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণসংহারের জন্য গোপন আয়োজন করিতেছিল এব দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটূক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিল।" কিন্তু মাতৃপদধূলি ও আশীর্বাদ শিরে লইয়া পৌরুষের প্রচণ্ড অবতার বিদ্যাসাগর বাল-বিধবার দুঃখমোচনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিচলিত হইলেন না, ক্ষুব্ধ হইলেন না—'সংস্কৃত শ্লোক এবং বাঙ্গলা গালি মিশ্রিত তুমুল কলকোলাহল' খণ্ডন করিয়া ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে বিধবাবিবাহ আইন রাজদ্বারে বিধিবদ্ধ হইল।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচণ্ড মার্তণ্ডের ন্যায় এই একক নিঃসঙ্গ মহাপুরুষ আলোক ও উত্তাপ বিকীর্ণ করিয়া, সমগ্র সমাজের অজ্ঞতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া, ক্ষুধিত দুঃস্থ রোগীর অশ্রু মুছাইয়া, অকৃতজ্ঞগণের সকল ঔদ্ধত্য মার্জনা করিয়া 'আপন পুষ্পকোমল ও বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্ আদর্শ বাঙ্গালী জাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।'

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচারদোষে ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ

উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। * * * তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না। * * * হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশে পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক প্রথা রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।"

বিধবার দুঃখে এতবড় মহত্ত্ব ও পৌরুষের বাণী বাঙ্গলাদেশে আর গর্জে নাই। একদিন অকস্মাৎ যেন হরজটাজাল-নির্মুক্ত ভুবনপাবন ভাগীরথী মর্ত্যে ঝরিয়া পড়িয়া অজস্র ধারায় মুক্তি বহন করিয়া আনিয়াছিল তেমনি একদিন ভারতের অভিশপ্ত নারীজাতি ও বিধবার অপমান ও দুঃখের উপর বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ দয়ার অভয় আশীর্বাদ করুণাবিগলিত ভাবধারায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল। "ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় লইয়া আমরা সকলেই কিছু ধরাতলে অবতীর্ণ হই নাই। বালবিধবার অশ্রুজলে আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না; তাই আমরা ভণ্ড ব্রহ্মচর্যের মলিন পাংশু বিক্ষেপে সেই অশ্রুজল মুছিতে চাই। ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখ মোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের জয়লাভ ঘটিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু ইহাই প্রকৃতির নির্বন্ধ। স্বাভাবিক, সরল, ছদ্মবেশহীন মনুষ্যত্ব ইহাতে ম্রিয়মাণ হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ নিষ্ফল; কেন না ইহা বিধিলিপি।"—১৩০৩ সালের ভাদ্র মাসে, বাঙ্গলার অন্যতম মনীষী-সন্তান আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের এই মর্মভেদী বিলাপও এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসিতেছে।

বাঙ্গলার নবযুগের সাধনা ও সিদ্ধির মূর্তবিগ্রহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বিদ্যাসাগরের সমীপে আসিয়া বলিয়াছিলেন,—"এতদিন খাল ডোবা পুকুর দেখিয়াছি, আজ সমুদ্র দেখিলাম।" সত্যই বিদ্যাসাগর মনুষ্যত্বের মহাপারাবার ছিলেন! কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তাঁহার মত লোক পারমার্থিকতাভ্রষ্ট বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, চতুর্দিকের নিঃসাড়তার পাষাণখণ্ডে বারংবার আহত প্রতিহত হইয়াছিলেন বলিয়া, বিদ্যাসাগর তাঁহার কর্মসংকুল জীবন যেন চিরদিন ব্যথিত ক্ষুব্ধভাবে যাপন করিয়াছেন। তিনি যেন সৈন্যহীন বিদ্রোহীর মত তাঁহার চতুর্দিককে অবজ্ঞা করিয়া জীবন-রঙ্গভূমির প্রান্ত পর্যন্ত জয়ধ্বজা নিজের স্কন্ধে একাকী বহন করিয়া লইয়া গেছেন। তিনি কাহাকেও ডাকেন নাই, তিনি কাহারও সাড়া পান নাই, অথচ বাধা ছিল পদে পদে। * * * তিনি যে শব-সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার উত্তর-সাধকও ছিলেন তিনি নিজে।"

১৮৫৯ সালে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন। সংস্কারযুগের এক অভিনব অধ্যায় আরম্ভ হইল। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কেশবের সহপাঠী, তিনিই কেশবকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া আসেন। প্রখর প্রতিভা ও বাগ্মিতায়, এই একবিংশতিবর্ষীয় যুবক, অতি সহজেই নবীন ব্রাহ্মদের নেতৃত্ব লাভ করিলেন। এই সময় হিমালয় হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলে গুরু-শিষ্যে মিলন (১৮৬৩) হইল। 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিয়া মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে স্বীয় সহকর্মী, পুত্র এবং প্রিয়তম শিষ্যরূপে বরণ করিলেন।

আভিজাত্য ও কাঞ্চন-কৌলিন্যে কেশবচন্দ্র, রামমোহন অথবা দেবেন্দ্রনাথ হইতে পৃথক। ইংরাজ আমলে, ইংরাজী-শিক্ষাকৃষ্ট অভিনব শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সন্তান কেশবচন্দ্রের চিন্তা চরিত্র রুচি ঐ দুই পূর্বগামীর সহিত তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক। ষোড়শ বৎসর বয়সে রামমোহন ইসলাম ধর্মানুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুর

মূর্তিপূজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, আর তরুণ কেশবচন্দ্র খৃষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার আদর্শ ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজকে সেই আদর্শাভিমুখী করিতে প্রস্তুত হইলেন। রামমোহন তো দূরের কথা, এমন কি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়ও সংস্কৃত ভাষা তিনি জানিতেন না, বেদ-বেদান্ত অথবা শাস্ত্রাদির সহিত তৎকালে তিনি একান্ত অপরিচিত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাঁহাকে বরণ করিয়া আনিলেন তাঁহাকে স্বীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারিলেন না। মনীষী বিপিনচন্দ্র বলেন, "শাস্ত্রের প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা, গুরুর প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে অসংস্কৃত ও অসিদ্ধ স্বাভিমতের স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা, সমাজের বিধি-নিষেধাদির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তির স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা—ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনে কর্মচেষ্টার মূলসূত্র ছিল।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয় ও সহজজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের সাধনা এবং সমাজ-সংস্কারে ডেভিড্ হেয়ার ও ডিরোজিওর অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য অন্যনিরপেক্ষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—এই উভয় ধারাকে আত্মসাৎ করিয়া কেশব ও তৎসঙ্গিগণ ব্রাহ্মসমাজকে খৃষ্টানসমাজের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতা রক্ষণশীল ও মধ্যপন্থী দেবেন্দ্রনাথ, কেশব এবং কৈশবগণকে সংযত করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই কালে কেশবচন্দ্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কেবল ব্রাহ্মসমাজেই আবদ্ধ রহিল না। তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত 'উদার' হিন্দু এবং বিশেষভাবে কলেজের ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িলেন। কেশবের ছিল অনুপম বাগ্‌বিভূতি। ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতে তৎকালে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ পর্যন্ত তাঁহার প্রশংসা করিতেন। সেকালে ইংরাজগণ যাঁহার প্রশংসা করিতেন, সমাদর করিতেন, লোক-সমাজে তাঁহার খ্যাতি ও সম্মানের অন্ত ছিল না। কলিকাতার ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের উপর বাগ্মী কেশবচন্দ্রের অসামান্য প্রভাব বিস্তারের ইহাই কারণ। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ কেশবের বক্তৃতার বাত্যাতরঙ্গে কলিকাতানগরী বিক্ষুব্ধ হইল। কৃষ্ণনগরে তাহার প্রতিধ্বনি ছুটিল। তাঁহার প্রতিভায় প্রভাবান্বিত হন নাই, এমন শিক্ষিত যুবক কলিকাতায় অতি অল্পই ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন; অনেকে অল্পবিস্তর ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইলেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ, পানভোজনের প্রাচীন বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন, উপবীতহীন এবং অব্রাহ্মণ আচার্যগণ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রভৃতি সংস্কার প্রস্তাবগুলির সহিত অতিমাত্রায় খৃষ্টপ্রীতি ও খৃষ্টীয় নীতিবাদের প্রতি আকর্ষণ মিলিত হইয়া কেশবচালিত ব্রাহ্মদল যে পথে চলিতে চাহিলেন, সামাজিক ব্যাপারে রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে তাহাদের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিদ্রোহী পুত্রপ্রতিম কেশবচন্দ্রের যুক্তির শরবর্ষণ সংযতধৈর্যে সহ্য করিয়া মহর্ষি অটল রহিলেন। এই বিচ্ছেদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি অনুসারে উৎকর্ষ লাভ করে, তখন সে মনুষ্যত্ব লাভ করে—সাধারণ মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে, খৃষ্টানের মধ্যে বস্তুতঃ একই, তথাপি হিন্দু-বিশেষত্ব মনুষ্যত্বের এক বিশেষ সম্পদ এবং খৃষ্টান-বিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ লাভ, তাহার

কোনটা সম্পূর্ণ বর্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠ ধন তাহাও সার্বভৌমিক, য়ুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠ ধন তাহাও সার্বভৌমিক, তথাপি ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া যায় না। * * * তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুলিয়াছিল, যখন ধর্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত, যখন সে মনে করিয়াছিল, বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থ ঔদার্য রক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব (মহর্ষি) সার্বভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জন দিতে অস্বীকার করিলেন—ইহাতে তাঁহার অনুবর্তী অসামান্য প্রতিভাশালী ধর্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল।"

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মহর্ষির সহিত কেশবচন্দ্রের শিক্ষা ও প্রকৃতির প্রচুর পার্থক্য ছিল—ঘাতসংঘাতে এই পার্থক্যই পরিণতির মুখে বিচ্ছেদরূপে দেখা দিল এবং একটা সামান্য ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া, অর্থাৎ মহর্ষি পৈতাধারী আচার্যদিগকে বেদীর কার্য হইতে তাড়াইয়া দিতে অস্বীকার করায় গুরু দেবেন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করিয়াই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র দল গড়িলেন; ১৮৬৬ সালে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইল। মহর্ষির সমাজ হইল, "আদিসমাজ", আর কেশব বিজয়কৃষ্ণ শিবনাথ প্রভৃতি যে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার নাম হইল "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ"। এই নূতন সমাজ য়ুরোপীয় খৃষ্টানী ঢৌলে সমাজজীবন গঠন করিতে গিয়া জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিলেন, অসবর্ণ বিবাহপ্রথা প্রবর্তন করিলেন, এই শ্রেণীর বিবাহ আইনমত যাহাতে সিদ্ধ হয় তজ্জন্য তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। ১৮৭২ সালে তিন আইন মতে এক প্রকার অসবর্ণ বিবাহ রাজদ্বারে বিধিবদ্ধ হইল। কেশবচালিত এই নূতন সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ব্রাহ্মপ্রচারকগণ, রক্ষণশীল প্রাচীন সমাজকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতাদি দিতে লাগিলেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসাধনাও রূপান্তরিত হইল। কেশবের খৃষ্টধর্মপ্রীতি হইতে পাপবোধ, পাপ-ভীতি, অনুতাপ, ভাবাবেশে ক্রন্দন ইত্যাদি ব্রাহ্মসাধকগণ আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই নিরাকার ও একাকারের বিলাতী ঢংএর নকল করিয়া প্রাচীনপন্থীরা 'হরিসভা' 'ধর্মসভা' প্রভৃতি স্থাপন করিয়া 'হিন্দুয়ানী' রক্ষার জন্য চেষ্টিত হইলেন। এই হিন্দু-আন্দোলনের পশ্চাতে কোন আন্তরিক আবেগ ছিল না। ভূরিভোজন, সঙ্কীর্তন, দান, পয়সা দিয়া বক্তা আনিয়া কতকগুলি বক্তৃতা—আর কি, ধর্মের চূড়ান্ত হইয়া গেল! বার বৎসরের শিশুও হরিসভার বেদী হইতে হরিভক্তির মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিত এবং দর্শকগণ করতালি দিয়া তাহাকে মাতাইয়া তুলিত। একদিকে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য ও উপাচার্যগণ হিন্দুধর্ম ও সমাজের মস্তকে অগ্নিময় অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে গোঁড়ার দল, অতি অশ্লীল ছড়া কাটিয়া, নক্সা, গল্প লিখিয়া ব্রাহ্মসমাজের ভণ্ডামিগুলির অতি কদর্য ভাষায় প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই বাদপ্রতিবাদের ফলে একশ্রেণীর জঘন্য কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হইল, যাহা বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গে এক দুরপনেয় কলঙ্ক।

নবনাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি কলিকাতা সহর যখন এই সমস্ত সংস্কার আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ এবং সমস্ত বাঙ্গলাদেশ বিহ্বল, তখন এই সহরের উপকণ্ঠে, দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে, এক অখ্যাত অজ্ঞাত

পূজারী ব্রাহ্মণ ভারতের সর্বলোককল্যাণকর পারমার্থিক আদর্শকে বিকৃতি ও বিস্মৃতি হইতে উদ্ধার করিবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬)। হুগলী জিলার সুদূর পল্লীগ্রাম কামারপুকুরে, দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে ১৮৩৬-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃবিয়োগের পর তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত কলিকাতায় চলিয়া আসেন, উদ্দেশ্য—কিছু লেখাপড়া শিখিয়া জীবিকার্জনের চেষ্টা করা। জ্যেষ্ঠভ্রাতার একটি টোল ছিল—তিনি সুপণ্ডিত ও উন্নতমনা ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিদ্যাভাসে প্রবৃত্ত হইয়া সহসা বালক রামকৃষ্ণের মনে হইল, এই লৌকিক বিদ্যার প্রয়োজন কি? সাংসারিক উন্নতি? প্রাচীনযুগের ঋষিদের ন্যায় তিনি ভাবিলেন, যাহা অমৃত নহে, তাহা লইয়া আমি কি করিব? তিনি লেখাপড়া ছাড়িলেন এবং পরাজ্ঞানলাভের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই কালে কলিকাতার ধনী ও ধর্মপ্রাণা মহিলা রাণী রাসমণি বহু অর্থব্যয়ে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উদরান্নের জন্য ভ্রাতার নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতা আনন্দময়ীর পূজারীর পদ গ্রহণ করেন। সরলহৃদয় তরুণ পুরোহিত দৈনন্দিন পূজা যথানিয়মে নির্বাহ করিতেন আর ভাবিতেন, সত্যই কি জগন্মাতা আছেন? সত্যই কি তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন? জগন্মাতার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশায় তন্ময় সাধক বাহ্যজগৎ ভুলিলেন,—দিন গেল, মাস গেল, বৎসরও কতবার ঘুরিয়া গেল, অর্ধোন্মাদ ঠাকুর দিব্যভাবে বিভোর। গঙ্গার পশ্চিমপারে অস্তগামী লোহিত সূর্যের পানে চাহিয়া তিনি কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন, মা, আর একটা দিনও তো বৃথা হইল,—তোমার দেখা মিলিল না। ধীরে ধীরে মৃন্ময়ী দেবী চিন্ময়ী হইয়া দেখা দিলেন। আবার মায়ের নির্দেশে সন্তানের সাধনা চলিল। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত সকল মতের, সকল পথের সাধকগণ, সিদ্ধ মহাপুরুষগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী আসিয়া তন্ত্রোক্ত সাধনা করাইলেন; তোতাপুরী আসিয়া বেদান্তের অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন; লোকদুর্লভ নির্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্যলাভ করিয়া সত্যপ্রচারের জন্য সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন,—"ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।"

অবশেষে একদিন সংস্কারযুগের নেতা কেশবচন্দ্রের সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইল। এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল, মূর্তিপূজা-বিরোধী কেশব মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের উপদেশবাণী প্রচার করিয়া তাঁহার কাগজে লিখিতে লাগিলেন, যদি শান্তি চাও, দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের পদতলে উপবেশন করিয়া ধন্য হও। ইহা আশ্চর্য, কিন্তু সত্য। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মরথিবৃন্দ এই মহাপুরুষের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং ইঁহাদের প্রচারের ফলেই কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বিষয় জানিতে পারিল।

১৮৭৯ সালে Theistic Quarterly Review-এর অক্টোবর সংখ্যায় নববিধান সমাজের প্রচারক রেঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সুদীর্ঘ প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"আমার মন এখনও এক উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, যাহা সেই রহস্যময় পুরুষ যেখানে যান, সেইখানেই তাঁহার চতুর্দিকে বিকীর্ণ করেন। যখনই তাঁহার সহিত দেখা হয়, তখনই তিনি যে অনির্বচনীয়, রহস্যপূর্ণ ভাবনিচয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেন, তাহার প্রভাব হইতে আমার মন এ পর্যন্ত মুক্ত হইতে পারে নাই।

"তাঁহার এবং আমার মধ্যে সাদৃশ্য কি? আমি—ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, সভ্য, আত্মাভিমানী, অর্ধসন্দেহবাদী, তথাকথিত শিক্ষিত যুক্তিবাদী এবং তিনি—দরিদ্র, বর্ণজ্ঞানহীন, অমার্জিত-রুচি, অর্ধ-পৌত্তলিক, বন্ধুহীন হিন্দু ভক্ত। কেন আমি তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য বহুক্ষণ বসিয়া থাকি? আমি—যে, ডেস্‌রাইলি, ফসেট, ষ্টেন্‌লী, ম্যাক্সমূলর এবং পাশ্চাত্য-জগতের সমুদয় মনীষী ও ধর্মপ্রচারকগণের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি; আমি—যে, যীশুখৃষ্টের একজন একান্ত ভক্ত ও অনুচর উদারহৃদয় খৃষ্টান মিশনরিগণের বন্ধু ও সমর্থক, যুক্তিপন্থী ব্রাহ্মসমাজের অনুগত ভক্ত ও কর্মী, কেন আমি তাঁহার বাক্য শ্রবণকালে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যাই? এবং একা আমিই নই, আমার মত বহুব্যক্তিই এইরূপ হইয়া থাকেন। * * *

"কিন্তু যতদিন তিনি আমাদের নিকট জীবিত আছেন, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পবিত্রতা, বৈরাগ্য, সংসার-অনাসক্তি, আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততা সম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ উপদেশ শিক্ষা করিব।"

মজুমদার মহাশয় উপরোদ্ধৃত মন্তব্যের আত্মপরিচয় দিতে গিয়া সরলভাবে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মসমাজ যে কতদূর পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না এবং সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র ও সাধনার প্রভাব প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের উপর পতিত হইয়া, পরানুকরণমোহ অনেকাংশে দূর করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল।

একটা জীবন্ত, জাগ্রত জাতির যুগযুগান্তরের চিরপোষিত আশা, আদর্শ-সমূহের জীবন্ত-ঘন-বিগ্রহরূপে—তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল,—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে, ভাগীরথী তীরে পঞ্চবটীমূলে উপবিষ্ট শক্তিসাধক, নির্বিকল্প-সমাধিস্থ মহাযোগী, ভক্ত-চূড়ামণি, বৈষ্ণব, শাক্ত, খৃষ্টান, মুসলমান বিভিন্ন প্রকার ধর্মসাধনে সিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। যাঁহার সম্বন্ধে উত্তরকালে বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান, * * * স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাব-সমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া, যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতপ্রতীয়মান বহুবিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ড-সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়, তাহা দেখাইতে—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্‌ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

১৮৭৫ সালের প্রথম ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কেশবের সাক্ষাৎ হয়। ভক্ত কেশবচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার ধর্মজীবনে এক বিচিত্র পরিবর্তন উপস্থিত হইল। খৃষ্ট-মহিমা কীর্তনকারী কেশবচন্দ্র

ভারতীয় বৈরাগ্যমূলক সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন; দৈহিক কঠোরতা, স্বপাক ভোজন প্রভৃতি আরম্ভ করিলেন; এমন কি হিন্দু দেবদেবীর আধ্যাত্মিক ও রূপক ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতাও দিতে লাগিলেন। যুক্তিপন্থী ব্রাহ্মগণ, কেশবচন্দ্রের ভক্তির আতিশয্য, অত্যধিক খৃষ্টপ্রীতি, বিশেষ সাধনভজন, যোগধ্যান ইত্যাদি পছন্দ করিতেন না। তাহার উপর ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অনুসারে তিনি যখন নববিধান প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন চরমপন্থী ব্রাহ্মরা কেশবের আনুগত্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে" গৃহবিবাদের সূত্রপাত হইল। ১৮৭৮ সালে কেশবের নাবালিকা কন্যার সহিত কোচবেহারের মহারাজার বিবাহ হয়। উক্ত বিবাহোপলক্ষে কেশব ব্রাহ্মসমাজের স্বরচিত নিয়মাবলীর মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ কেশবকে বাধ্য হইয়া হিন্দুমতে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইয়াছিল। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল; একদল ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রকে আচার্যের ও সম্পাদকের পদ হইতে অপসৃত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। এই বিবাদে লজ্জাকর আত্মদৌর্বল্য প্রকট করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হইল; প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মগণ বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠা করিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দলপতিরা কেশবের দ্রুত পরিবর্তিত ধর্মমতের তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। গৃহদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও কেশব তাঁহার "নববিধান" প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'সকল ধর্মই সত্য' এবং 'যত মত তত পথ' ইত্যাদি আংশিকভাবে উপলব্ধি করিয়া হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে স্বীয় শিষ্য ও অনুগতবর্গকে নূতন নূতন সাধন-পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

"নববিধান" সমাজে কেশব পরমহংসদেবের আদর্শে "মা" নাম চালাইয়া দিলেন; নিজেও মাতৃভাবে ভগবানের সাধনায় অগ্রসর হইলেন। মাতৃভাবে ভগবানের উপাসনা কেশববাবু যে পরমহংসদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বহুদিবস পরে উক্ত সমাজের প্রচারকগণ অস্বীকার করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর প্রণীত রামকৃষ্ণজীবনীতে কেশবের ধর্মজীবনের পরিবর্তন, উন্নতি, সাধনাকাঙ্ক্ষার প্রধান কারণ উক্ত মহাপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় তাঁহাদের "আচার্য" ছোট হইয়া গেলেন, এই এক ধারণা লইয়া তাঁহারা বিদ্বেষবিষতিক্ত প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসই কেশবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধর্মজীবনে উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্তী কেশব-শিষ্যগণ বোধ হয় অবগত নহেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন, নববিধান চার্চের অন্যতম মিশনরী বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় বহু পূর্বে লিখিয়াছেন—

> "ভগবানের মাতৃভাব সম্বন্ধীয় ভাব ব্রাহ্মসমাজ পরমহংসের জীবন হইতে প্রাপ্ত হন। বিশেষভাবে আমাদিগের আচার্য (কেশবচন্দ্র সেন) তাঁহার নিকট হইতে ঈশ্বরকে "মা" বলিয়া ডাকিতে এবং শিশুর সরলতা ও অভিমান লইয়া আব্দার করিয়া প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করেন। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মধর্ম জ্ঞানপ্রধান এবং শুষ্ক তর্কযুক্তিতে পূর্ণ ছিল। পরমহংসের জীবনাদর্শ ব্রাহ্মধর্ম হইতে শুষ্কতা দূর করিয়া উহাকে অধিক প্রিয়তর এবং ভক্তিময় করিয়া তুলিল।" (ধর্মতত্ত্ব—১লা আশ্বিন, ১৮০৯ শক)

উদারভাব, সর্বজনীন ধর্ম ইত্যাদির দোহাই দিয়া ব্রাহ্মসমাজে যে লজ্জাকর

দলাদলি আরম্ভ হইল—তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব অতিমাত্রায় খর্ব হইয়া পড়িল।

অপরদিকে ১৮৭০ সাল হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সনাতনপন্থিগণের আন্দোলন ফলপ্রসূ হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে প্রচারক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহোদয়ের চেষ্টা, বক্তৃতাশক্তি এবং কর্মোৎসাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সনাতনধর্ম প্রচার করিয়া ব্রাহ্মভাবাপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে পুনরায় স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মপ্রচারকগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুশাস্ত্র ব্যাখ্যাও কলিকাতা সহরে কম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে নাই। ইতিপূর্বে শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত "সনাতনধর্ম-রক্ষিণী" সভাও নূতন শক্তি লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন শাস্ত্রব্যাখ্যা, সাত্ত্বিকাচার প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রবন্ধাদি পাঠ চলিতে লাগিল। এই সময় হইতেই দেশের শিক্ষিত-সমাজের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর চেষ্টায় রাজনৈতিক আন্দোলন বেশ জাঁকিয়ে উঠায় কেশবের ১৮৬০-৬৬ সালের "ইয়ং বেঙ্গল" সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তথাকথিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবন-সমস্যার মীমাংসা খুঁজিয়া না পাইয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ রাজনীতি-সহায়ে উহা মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময়ে—"ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে—যখন আমরা সংস্কারের আবর্তে পড়িয়া কোন্ পথে যাইব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, পাশ্চাত্যের প্রখর বিদ্যুতের আলোকে যখন আমাদের চক্ষু প্রতিহত হইতেছিল, সমগ্র জাতির যখন প্রায় দিগ্‌ভ্রম হইবার উপক্রম, জাতির সম্মুখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সন্দেহের পরে সন্দেহ যখন ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, বিজাতীয় পথে স্বজাতির সংস্কাররথ যখন আর চলিতে না পারিয়া প্রায় থামিয়া যাইতেছিল, দীর্ঘ এক শতাব্দীর সংস্কারফল চিন্তা করিয়া যখন আমরা একরূপ হতাশভাবে বসিয়া পড়িতেছিলাম, কিন্তু কি করিব ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই, তখন সেই সংস্কারের ঝড়ে আলোড়িত ও মথিত বাঙালী-সমাজের জঠর হইতে আবির্ভূত হইলেন—**স্বামী বিবেকানন্দ।**"

সংস্কার-যুগপ্রবর্তক রামমোহনের কথা ছাড়িয়া দিলে, একাল পর্যন্ত তাঁহার পরবর্তী সংস্কারকগণ ধ্বংসনীতির অনুসরণ করিয়া এত অধিক শক্তিক্ষয় করিলেন যে, গড়িয়া তোলা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া উঠিল; এমন কি, অবশেষে তাঁহারা ভাঙ্গিবার প্রবলতম আগ্রহে আত্মশরীর পর্যন্ত ত্রিধা বিভক্ত করিয়া শক্তিহীন ও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। অনুদার ধর্মমত প্রচার, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, আর প্রাচীন সমাজের ও ধর্মের মস্তকে অকারণ অভিশাপ বর্ষণ—পরবর্তীকালের শক্তিহীন দুর্বল সংস্কারকগণের একমাত্র পেশা হইয়া পড়িল। অন্য গুরুতর কারণের সহিত, বিশেষতঃ এই সমস্ত কারণের সঙ্গেও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী "গণ্ডী" ছাড়িয়া বিশ্ব-বৈকুণ্ঠের পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মসমাজ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার নাম কাটিয়া দিল।

বিগত শতাব্দীর সংস্কারকগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিলেও মোটের উপর সংস্কারযুগকে বিবেকানন্দ বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। বিবেকানন্দ ধ্বংসের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল—সংগঠন। অথচ সংস্কারকদিগের আদর্শে যে গঠনের প্রস্তাব একেবারেই ছিল না, একথা বলিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং বিবেকানন্দের আদর্শ ও কার্যপ্রণালীতে যে আবর্জনাকে পরিহারের চেষ্টা ছিল না—একথা বলিলেও

মিথ্যা বলা হইবে। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম সংস্কারযুগের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কে বলিবে যে, এই প্রতিবাদের আবশ্যক ছিল না? যাহাকে প্রতিবাদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে মানুষ বিশেষরূপেই সজাগ থাকে। সেই হিসাবে ব্রাহ্মযুগ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বিশেষরূপেই সচেতন ছিলেন এবং তাহা ছিলেন বলিয়াই একদিকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্রের সংস্কারের প্রভাব ও প্রতিবাদ যেমন তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে রাজনারায়ণ, বঙ্কিম ও ভূদেবের চিন্তাও সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহার মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। অথচ সমস্ত দিক হইতেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত প্রখরভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে,—এক অতি অনুপম ভাস্বর দীপ্তিতে ইতিহাস আলোকিত করিয়া গিয়াছে। তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার পূর্বগামী সংস্কারযুগকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। প্রত্যেক পরবর্তী যুগপ্রবর্তককেই তাহা করিতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সাধক বিবেকানন্দ

(১৮৮০-৮৬)

> "আজকাল ইহা একটী চলিত কথায় দাঁড়াইয়াছে, আর সকলেই বিনা আপত্তিতে এটী স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা দোষ। আমিও এক সময়ে এইরূপ ভাবিতাম, আর ইহার শাস্তিস্বরূপ আমাকে এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, যিনি পুতুলপূজা হইতেই সব পাইয়াছিলেন।"
>
> —বিবেকানন্দ

১৮৭৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন তিনি অষ্টাদশবর্ষীয় বালকমাত্র! পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার কালে তিন বৎসরের পাঠ্য বিষয় এক বৎসরে শেষ করিতে গিয়া নরেন্দ্রনাথকে গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সে বৎসরের মত তাঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হইল। পর বৎসর তিনি জেনারেল এসেম্বলী ইন্স্টিটিউসানে যোগ দিয়া এফ. এ. পড়িতে লাগিলেন।

প্রখর ব্যক্তিত্বশালী নরেন্দ্রনাথ অতি সহজেই সহপাঠিগণের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নিজের শক্তির উপর গভীর বিশ্বাসপ্রসূত শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান তাঁহার চরিত্রের এক দেদীপ্যমান বৈশিষ্ট্যরূপে সমভাবে সহপাঠী ও অধ্যাপকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কলেজে নরেন্দ্রের বন্ধু ও অনুরক্ত ভক্ত জুটিয়াছিল প্রচুর। তাঁহারা যে কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভা ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখিয়া আকৃষ্ট হইতেন, এমন কথা বলা যায় না। প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, তর্কশক্তি ইত্যাদি মানসিক গুণাবলী অপেক্ষা নরেন্দ্রের মধুর সঙ্গীতের মোহিনী-শক্তি এবং দৃঢ়-সবল নাতিদীর্ঘ সুঠাম দেহখানি সহজেই ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী-যুবক-হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইত। লোকমুখে শুনিয়াছি, তাঁহার পৌরুষ-দৃপ্ত মুখমণ্ডলের স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য এবং সর্বোপরি উজ্জ্বল মর্মভেদী দৃষ্টিপূর্ণ বিশাল নেত্রদ্বয় দেখিয়া মুগ্ধ হইত না, এমন ছাত্র কলেজে অতি অল্পই ছিল।

নরেন্দ্র কোনদিনই শান্ত-শিষ্ট ছিলেন না। লোক-ব্যবহারে, তৎকালপ্রচলিত খৃষ্টানী-কাম-ব্রাহ্ম-নীতিমার্গের পথিকও ছিলেন না। জীবন তাঁহার নিকট ছিল —এক স্বচ্ছন্দ অবিরাম প্রবাহ; তথাকথিত নীতিশাস্ত্রের বিধিনিষেধের বাঁধন জড়াইয়া পঙ্গু হইয়া 'ভালমানুষ' সাজিবার গতানুগতিকতা তাঁহার জীবনের সহজ-প্রবল গতিমুখে কোন বাধা দান করিতে পারে নাই। তিনি পরচর্চা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না, কিন্তু কখনো কাহারও অসাক্ষাতে কোনো কথা বলিতেন না। যাহাকে যাহা বলিবার আবশ্যক হইত, নির্বিচারে মুখের উপর বলিয়া দিতেন। বাল-সুলভ সরলতার সহিত তিনি যখন ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র-সমালোচনায় অগ্রসর হইয়া তীব্র শ্লেষবাক্যে তাহার অন্তর জর্জরিত করিয়া তুলিতেন, তখন বন্ধুবর্গের সম্মুখে অপ্রতিভ হইয়া উক্ত ব্যক্তি সাময়িক তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেও

পরক্ষণেই তাহা ভুলিয়া যাইতেন। কারণ ঐ প্রকার সমালোচনা কঠোর ও নির্ভীক হইলেও তাহার মধ্যে ঈর্ষা বা অন্য কোন নীচ অভিসন্ধি থাকিত না। যুবক বা বালকবৃন্দের একটি অপরাধ নরেন্দ্রের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় ছিল—অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে চাওয়া, মৃদুহাস্য সহকারে ললিতভঙ্গিতে কথোপকথন, দৃষ্টি মিলিত হইবামাত্র লজ্জায় নতনেত্র হওয়া, কোমল অঙ্গভঙ্গী, মন্থর গমন ইত্যাদি অভ্যাস করিয়া পুরুষ চেষ্টা করিয়া স্ত্রীলোক হইবে, ইহা তাঁহার অসহ্য ছিল। তাহার উপর যদি কোন ছাত্র, অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নরেন্দ্রের কঠোর সমালোচনার তীক্ষ্ণবাক্যে মস্তক অবনত করিয়া স্বীয় ত্রুটী স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকিত না।

ডন, কুস্তি, ক্রিকেট খেলা ইত্যাদিতে তাঁহার সমধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। দৈহিক শক্তিতে নরেন্দ্রনাথ সমবয়স্কদিগের মধ্যে অন্য বালক অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। নরেন্দ্রনাথ পাঠশ্রান্ত মস্তিষ্ককে বিশ্রাম প্রদান করিবার জন্য সময় সময় বন্ধুবর্গের সহিত রঙ্গপরিহাসে যোগদান করিতেন। আমোদ-প্রমোদ করিবার নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার এই সমস্ত ব্যবহার ও সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলবৎ আচরণের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অনেকে নানাপ্রকার ধারণা করিয়া বসিতেন, কেহ বা তিক্ত মন্তব্যও প্রকাশ করিতেন। তেজস্বী, স্বাধীনচেতা নরেন্দ্র নিন্দা শ্রবণ করিয়া কখনও বিচলিত হইতেন না; এমন কি, অবজ্ঞাহাস্যে উড়াইয়া দেওয়া ব্যতীত কখনও কোনপ্রকার প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইতেন না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ স্বল্পকাল মধ্যেই নির্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত করিতে পারিতেন বলিয়া সঙ্গীত, হাস্য, পরিহাস ইত্যাদি করিবার জন্য প্রচুর অবসর পাইতেন; অনেক হীনবুদ্ধি বালক তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া স্বীয় সর্বনাশ ডাকিয়া আনিত। চপল-চটুলবাক্য-বিন্যাস-পটু সুরসিক নরেন্দ্রনাথকে বাহ্য আচরণ দিয়া বিচার করিয়া এইকালে যাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বলা বাহুল্য তাঁহারা এই অদ্ভুত যুবকের প্রকৃত পরিচয়, অতি সন্নিকটে থাকিয়াও অতি অল্পই পাইয়াছেন।

কবির উদ্দাম কল্পনা-প্রবণ অধীর প্রতিভা লইয়া নরেন্দ্রনাথ যখন নিবিষ্ট মনে দর্শনশাস্ত্র বা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন তিনি এক স্বতন্ত্র মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হইতেন। এফ. এ. পরীক্ষার পূর্বেই তিনি মিল প্রমুখ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকগণের মতবাদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং হিউম ও হারবার্ট স্পেন্সরের দার্শনিক গ্রন্থসমূহ পড়িতে আরম্ভ করেন।

জেনারেল এসেম্বলী কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেষ্টি সাহেব একাধারে সুপণ্ডিত, কবি ও দার্শনিক ছিলেন। নরেন্দ্র, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাশালী ছাত্র তাঁহার সমধিক প্রিয়তর ছিলেন। ইঁহারা তাঁহার নিকট নিয়মিতভাবে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। হেষ্টি সাহেব নরেন্দ্রকে এত অধিক স্নেহ করিতেন যে, একদিন উক্ত কলেজের “আলোচনা সভায়” নরেন্দ্রের দার্শনিক মতবিশেষের বিশ্লেষণে সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,— “He is an excellent philosophical student. In all the German and English Universities there is not one student so brilliant as he is.”

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রসমূহের আলোচনা তাঁহার হৃদয়ে এক তুমুল ঝড় তুলিয়া দিল। তাঁহার জন্মগত সংস্কার ও মর্মগত বিশ্বাস চারিদিকের পারি-

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংঘর্ষে আসিয়া বিচলিতপ্রায় হইয়া উঠিল। ভিতরের মানুষটির অন্তর্নিহিত ভাবনিচয়ের সহিত এই প্রবল সচেষ্ট যুদ্ধ স্থূলদৃষ্টি ছাত্রবৃন্দের ধারণারও অতীত ছিল। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুই উহা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

ডেকার্টের অহংবাদ, হিউম এবং বেনের নাস্তিকতা, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ —সর্বোপরি স্পেন্সরের অজ্ঞেয়বাদ ইত্যাদি বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তারণ্যে পথহারা হইয়া নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত সত্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুর এই কালের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া ১৯০৭ সালে "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহা পাঠ করিলে নরেন্দ্রনাথের মানসিক অশান্তি ও বিপ্লবের বেশ একটা যুক্তিপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহাকে শেলীর কবিতা, হেগেলের দর্শন এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করিতে পরামর্শ দিলেন। ক্রমবর্ধমান জ্ঞানপিপাসা লইয়া নরেন্দ্র যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি দেখিলেন যে, চরম সত্যলাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বুদ্ধি-বিচার সহায়ে দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্ব মীমাংসায় ব্যাপৃত থাকিলে চলিবে না। কিন্তু উপায় কি?

এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়-জগতের অন্তরালে এমন কোন শক্তিমান পুরুষ আছেন কি না, যাঁহার ইঙ্গিতে এই জড়সমষ্টি পরিচালিত হইতেছে? এই মানবজীবনের উদ্দেশ কি? এবম্বিধ অতীন্দ্রিয়রাজ্যের রহস্যপূর্ণ প্রশ্নসকল পর্যায়ক্রমে তাঁহার মানস-পটে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রসমূহ, যুক্তি ও বিচার সাহায্যে তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে গিয়া অথবা সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া, উহাকে অধিকতর জটিল করিয়াছে মাত্র। কাজেই স্বীয় সত্যানুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তিকে কেবলমাত্র দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনায় নিযুক্ত না রাখিয়া বহির্জগতে জীবন্ত আদর্শের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখনই কোন ধর্মপ্রচারক ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অশান্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা ঢালিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, "মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?"

আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা প্রচারক এই অদ্ভুত প্রশ্নকর্তার উদ্‌গ্রীব মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া "হাঁ" বা "না" এতদুভয়ের কোনটিই উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে প্রয়াসী হইতেন। ফলে, বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি একজনও প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাইলেন না; কেবল পুঁথিগত বিদ্যার আবৃত্তিকারী অথবা পরধর্মছিদ্রান্বেষী জনকতক ব্যক্তির দর্শনলাভ করিলেন মাত্র। ধর্মপ্রচারকগণের সম্প্রদায়গত বাঁধা বুলি শুনিয়া শুনিয়া তিনি প্রবল সন্দেহবাদী হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ধর্মপ্রচারকগণের অন্তঃসারশূন্যতা ও পাশ্চাত্ত্য জড়বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রবল যুক্তিসমূহ কিছুতেই তাঁহার সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষাকে উন্মূলিত করিতে পারিল না। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"
মূঢ় বিদ্যা অভিমানী, অবিদ্যার মাঝে জ্ঞানী, ভাবে আপনায়।
অসার জ্ঞানের গর্বে অন্ধনীত অন্ধসম ভ্রাম্যমাণ হায়!

সত্যলাভের প্রেরণাই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া গিয়াছিল। এই যুক্তিপন্থী, সন্দেহবাদী অথচ সত্যকাম যুবক, আগ্রহসহকারে ব্রাহ্ম-আচার্যগণের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। অবশেষে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন।

কিন্তু কতকগুলি ধরাবাঁধা মতবাদ এবং প্রণালীবদ্ধ উপাসনা ইত্যাদিতে তাঁহা অদ্ভুত আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত হইল না।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিবার পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ে লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধসমূহের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াও তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশববাবুর নিক তত্ত্বালোচনার জন্য গমনাগমন করিতেন। অদ্বিতীয় বক্তা ও শক্তিশালী পুরু কেশবচন্দ্রের অনুরাগী হইয়াও, নব-প্রতিষ্ঠিত নববিধান সমাজে যোগদান করিয়া, তিনি কেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন, আমরা তৎসম্বে চারিটি প্রধান কারণ দেখিতে পাই।

১। বাল্যকাল হইতেই তিনি জাতিগত অধিকার-বৈষম্যকে ঘৃণা করিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকবৃন্দ এই কালে জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদসাধনকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন; ইহাতে তাঁহার পূর্ণ সম্মতি ছিল।

২। নারীগণকে ধর্মকার্যে ও সমাজ-জীবনে পুরুষের সমান অধিকার প্রদা পূর্বক সুশিক্ষিত করিয়া তোলার সংকল্পও তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

৩। নববিধান সমাজের ব্রাহ্মগণের ভাবাবেশ, ক্রন্দন ও ভক্তির আতিশয্যে কেশবকে প্রেরিত পুরুষ ইত্যাদি বলা তাঁহার ভাল বোধ হয় নাই।

৪। রাজা রামমোহনের আদর্শের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কথঞ্চিৎ যো থাকিলেও, উহা যে রাজার ঈপ্সিত পথে বিকশিত হয় নাই, ইহা তিনি স্পষ্ট বুঝি কোন বিশেষ সমাজের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেন নাই।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াও তিনি উপাসনা বিষয়ে সমাজস্থ অন্যান্য সভ গণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। মেধাবী, দৃঢ়চেতা নরেন্দ্রনাথ অপরে মতামত নির্বিচারে গিলিয়া ফেলিবার মত ছেলে ছিলেন না; কাজেই কেহ তাঁহা স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তর্ক উপস্থিত করিলে তিনি পাশ্চাত্য সংশয়বা দার্শনিকগণের যুক্তিসমূহকে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে এমনভাবে প্রক করিতেন যে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত হইতে হইত। নির্ভীক ও কঠোর সমালোচ হইলেও ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সমধিক স্নেহ করিতেন। নরেন্দ্রনা রবিবাসরীয় উপাসনাকালে মধুরকণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া সভ্যগণের চিত্তবিনো করিতেন এবং উপাসনায় যোগ দিতেন; কিন্তু তাঁহার "স্বাভাবিক বৈরাগ্যপ্র মন ত্যাগের ও জ্বলন্ত ধর্মবুদ্ধির অভাববোধে ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীবদ্ধ উপাসন তৃপ্তিলাভ করিত না।"

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ ধ্যানানন্দে তন্ময় হইয়া যাইতেন। মনঃসং তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া করিতে হইত না। একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নরেন্দ্র ধ্যান করিবার উপদেশ দিলেন। বলিলেন, তোমার অবয়বে যোগিজনোচিত চি বিদ্যমান। তুমি ধ্যান করিলেই শান্তি ও সত্যলাভ করিবে। পূতচরিত মহর্ষি প্রতি নরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিমান ছিলেন। কাজেই তাঁহার কথায় নরেন্দ্রে অনুরাগ দ্বিগুণিত হইল। কেবল তাহাই নহে, তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য-পালনে অগ্রসর হইলেন। নিরামিষ ও পরিমিত আহার, ভূমিশয্যায় শয়ন, সাদা ধুতি চাদর পরিধান ইত্যাদি বাহ্য কঠোরতাও অবলম্বন করিলেন। নরেন্দ্রনাথ স্ব বাটীর সন্নিকটে মাতামহীর ভাড়াটিয়া বাটীর একটি কক্ষে থাকিতেন। এইখা কোলাহলহীন নির্জনতার মধ্যে তাঁহার সাধন-ভজনের সুবিধা হইত। বাড়ি লোকেরা মনে করিতেন, হট্টগোলে পড়ার ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই নরেন্দ্রনাথ বাড়ি থাকিতে চাহেন না। পুত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক বিশ্বনা

বাবুও এজন্য কোনদিন কিছু বলেন নাই; কাজেই নরেন্দ্রনাথ একান্তে পড়াশুনা, সংগীত-চর্চা ইত্যাদি করিয়া অবশিষ্ট সময় সাধন-ভজনে ব্যয় করিতেন।

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার সত্য জানিবার ইচ্ছা তো তৃপ্ত হইলই না, বরং উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি বুঝিলেন যে, অতীন্দ্রিয় সত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এমন এক ব্যক্তির চরণতলে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিবার প্রয়োজন, যিনি ঐ সত্য সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। তিনি ইহাও প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন যে, এ জীবনে সত্যলাভ করিতে হইবে, নয় সেই চেষ্টায় প্রাণ দিতে হইবে, নতুবা এ অশান্তি-সংকুল জীবন ধারণ করিয়া লাভ কি? পারিপার্শ্বিক প্রভাবের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াও, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের চিন্তারাশির দ্বারা আলোড়িত হইয়াও এবং যুক্তিপন্থী ব্রাহ্ম হইয়াও তিনি সংগুরুলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। এক মহৎ আধ্যাত্মিক ক্ষুধার আবেশে দিবারাত্র ভাবিতে লাগিলেন, কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে, কোথায় শান্তি!—

"কস্মিন্নু ভগবন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি?"

কিন্তু কোথায় তিনি এমন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইবেন, যিনি স্বীয় জীবনের ও জগতের সমস্যা মীমাংসা করিয়াছেন, যিনি জগৎকারণ সেই ভূমাকে জানিয়াছেন, যাঁহার জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত হইয়াছে এবং যিনি অপরকেও তৃপ্ত করিতে সক্ষম?

কলিকাতাস্থ শিমলাপল্লীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একদিন স্বালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লইয়া আসেন এবং একটি আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন। সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় স্বীয় প্রতিবেশী নরেন্দ্রনাথকে আহবান করেন। ১৮৮০ সালের নভেম্বর মাসে ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সংগীত-শ্রবণে সমধিক প্রীত হইয়াছিলেন ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আগ্রহের সহিত তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিদায়কালে নরেন্দ্রনাথকে একদিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান।

ইতিমধ্যে এফ. এ. পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকায় নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পরীক্ষা হইয়া গেলে তাঁহার পিতা বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, কারণ তাঁহার সঙ্গতিপন্ন ভাবী বৈবাহিক যৌতুকস্বরূপ নগদ দশসহস্র টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আজন্ম বিবাহ-বিতৃষ্ণ নরেন্দ্র বিষম আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা বিশ্বনাথবাবুর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল; কিন্তু তিনি স্বয়ং পুত্রকে অনুরোধ না করিলেও অন্যান্য আত্মীয়গণকে নরেন্দ্রকে সম্মত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ভক্তগণের অন্যতম প্রসিদ্ধ ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত বিশ্বনাথবাবুর গৃহেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। একদিন বিবাহের প্রসঙ্গের আলোচনায় নরেন্দ্র তাঁহাকে স্বীয় অন্তরের অশান্তিগুলি খুলিয়া বলিয়া বিবাহের অন্তরায়গুলি বুঝাইয়া দিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের যুক্তিগুলি শুনিয়া অবশেষে বলিলেন, "যদি প্রকৃত সত্যলাভ করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-সমাজ ইত্যাদি স্থানে না ঘুরিয়া দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকটে চল।" নরেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া সম্মত হইলেন এবং কয়দিন পর দুই চারিজন বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র ঠাকুর তাঁহার সহিত চিরপরিচিতের মত সরলভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন। সংগীত, কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, সহসা ঠাকুর

তাঁহাকে আহ্বান করিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ভাবে বিভোর হইয়া তিনি নরেন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া স্নেহগদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "তুই এতদিন কেমন ক আমায় ভুলে ছিলি! তুই আস্‌বি বলে আমি কতদিন ধরে পথপানে চেয়ে আছি বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ থেকে তো মত যথার্থ ত্যাগীর সঙ্গে কথা কয়ে শান্তি পাব।" বলিতে বলিতে তাঁহা চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল। বিস্ময়-বিমিশ্র বিহ্বল-দৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথ এই অদ্ভু সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন; কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

দেখিতে দেখিতে পরমহংস কৃতাঞ্জলি হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে লক্ষ্য করি বলিতে লাগিলেন, "আমি জানি, তুমি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি, নররূপী নারায়ণ জীবের কল্যাণ-কামনায় দেহধারণ করিয়াছ।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

একি অদ্ভুত উন্মত্ততা! আমি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্র, এসব কি কথা

তারপর যখন ঠাকুর পুনরায় ভক্তবৃন্দের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সহজভা আলাপাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন নরেন্দ্র বিশেষভাবে পরীক্ষা করি দেখিলেন, তাঁহার হাব-ভাব, চাল-চলনের মধ্যে কোনপ্রকার উন্মত্ততার লেশমা নাই। ঠাকুরের কথাগুলি অসম্বদ্ধ-প্রলাপোক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ নহে কিন্তু উহার মধ্যে কি গভীর রহস্য নিহিত আছে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তি বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

স্বামী সারদানন্দ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে" নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে আগমনে বহুপূর্বে ঠাকুরের এক দিব্যদর্শনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ঠাকুর বলি ছিলেন—

"একদিন দেখিতেছি, মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে চন্দ্র সূর্য তারকামণ্ডিত স্থূলজগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূ ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরো করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দু পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসি উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম, এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারি থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘ করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম—সেখানে মূর্তিবিশি কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারী দেবদেবী সকল পর্যন্ত যেন এখা প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করি রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, দিব্যজ্যোতিঃ ঘনতনু সাতজ প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব তো দূরের কথা, দেবদেবীদিগকে পর্যন্ত অতি করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদিগের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এম সময় দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র বিরহিত, সমরস জ্যোতি র্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেবশি ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলে দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল। পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতম বাণীদ্বারা সাদরে আহ্বানপূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশে প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলে এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করি লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক

তাঁহার বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবশিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশ পূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—'আমি যাইতেছি, তোমাকে যাইতে হইবে।' ঋষি তাহার ঐরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারেই শরীর মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতিঃর আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এই সেই ব্যক্তি।"

নরেন্দ্রের বিচারসক্ষম সূক্ষ্মবুদ্ধি, এই অলৌকিক দেব-মানবের চরিত্র-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া পরাজিত হইল। যাঁহার পবিত্র সঙ্গে কেশববাবু, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি শক্তিমান্ আচার্যগণের ধর্ম-জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাকে একজন উন্মাদ বলিয়া স্থির করাটাও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বিষম সমস্যায় পতিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে পারিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, ইঁহাকে ভালরূপে পরীক্ষা না করিয়া কখনও ঈশ্বরদর্শী মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়া লইব না। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই তিনি এমন প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেন, যাহাতে মধ্যে মধ্যে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতে হইত। ঠাকুরের অপূর্ব ত্যাগ, শিশুর মত অভিমানশূন্য সরল ব্যবহার, বিনয়-নম্র মধুর বাক্য, সর্বোপরি রহস্যময় নিষ্কাম ভালবাসা, নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিল। নরেন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, এই দেব-মানবের কৃপায় বহু ব্যক্তির জীবন কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছে; কিন্তু তথাপি সহসা তিনি এই "পাগলকে" জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এমন কি, ক্রমাগত তিন বৎসরকাল তাঁহাকে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, ঠাকুরের নিকট যাতায়াত কালেও নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সমাজের নিয়মিত উপাসনা ইত্যাদিতে যোগদান করিতেন। রাখালচন্দ্র ঘোষ (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) নরেন্দ্রের সহিত একযোগে ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য হইয়াছিলেন। ইনি নরেন্দ্রনাথের কিয়দ্দিবস পূর্ব হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর ইঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং সর্বদা কাছে কাছে রাখিতেন। একদিন নরেন্দ্র, রাখালকে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবমন্দিরে গিয়া প্রতিমা প্রণাম করিতে দেখিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঠাকুরের সমক্ষেই তাঁহাকে "মিথ্যাচারী" ইত্যাদি বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কারণ রাখালও "একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিব"—এই মর্মে সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অপ্রতিভ রাখালকে লজ্জায় অধোবদন হইতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়া বলিলেন, "ওর যদি সাকারে ভক্তি হয়, তা' হ'লে ও কি কর্‌বে? তোমার ভাল না লাগে তুমি করো না। ত'বলে অপরের ভাব নষ্ট করবার তোমার কি অধিকার আছে?" নরেন্দ্র চিন্তিতভাবে নিরস্ত হইলেন; কিন্তু এই ঘটনায় বুঝা যায়, তখনও নরেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা-প্রণালীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

নিরাকার-ধ্যানই নরেন্দ্রের ভাল লাগিত। ঠাকুর তাঁহাকে সেই ভাবেই উপদেশ দিতেন। কখনও জোর করিয়া তাঁহাকে সাকারে বিশ্বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন না; এমন কি, তিনি কোনদিন নরেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতে নিষেধও

করেন নাই। তিনি কখনও কাহারও স্বাধীন ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করিতেন না। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ, দর্শনমাত্রেই কাহার ভিতরে কি আছে বুঝিয়া লইতেন এবং স্ব স্ব ভাবানুযায়ী বিশেষ বিশেষ সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন। জোর করিয়া কাহারও ভাব নষ্ট করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

ঠাকুর প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই যুবককে কালে জগতের শত শত ধর্মপিপাসু নরনারীর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইতে হইবে, লুপ্তপ্রায় সনাতন পথে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণগর্বে অন্ধ স্বদেশবাসীকে ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিতে হইবে, সর্বোপরি নিজ জীবনে প্রকটিত "যত মত তত পথ" রূপ সার্বভৌমিক আদর্শ প্রচারকার্যে নরেন্দ্রনাথই সমধিক উপযুক্ত অধিকারী। ভবিষ্যৎ বুঝিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সর্বমতগ্রাসী বেদান্তোক্ত সাধনমার্গে পরিচালিত করিতে প্রয়াসী হইলেন বটে, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সগুণ নিরাকার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন বলিয়া অদ্বৈতবাদ অনেক বিলম্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্মমতানুসারে তিনি ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, "আমিই ব্রহ্ম একথা বলার মত পাপ আর কিছু নেই।"

পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও নরেন্দ্রনাথ যে আধিকারিক পুরুষ এবং জগদম্বার বিশেষ কার্যসাধনোদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা তিনি নিজে বিশ্বাস করিতেন না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে কেশব, বিজয় প্রভৃতি ব্রাহ্ম-নেতৃবৃন্দ উপবিষ্ট আছেন, নরেন্দ্রও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর ভাবস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন; অবশেষে কেশব ও বিজয় বিদায় গ্রহণ করিলে পর ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাবে দেখ্‌লাম, কেশব যে শক্তিবলে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, নরেন্দ্রের মধ্যে অমন আঠারোটা শক্তি রয়েছে। কেশব ও বিজয়ের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বল্‌ছে, ওর মধ্যে জ্ঞানসূর্য রয়েছে।"

এইরূপ অযাচিত প্রশংসায় সাধারণ মানব অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "বলেন কি মশাই! কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব সেন, আর কোথায় একটা নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া নরেন্দ্র, লোকে শুন্‌লে আপনাকে পাগল বল্‌বে।" ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া সরলভাবে উত্তর করিলেন, "তা' কি করবো বল, মা দেখিয়ে দিলেন, তাই বল্‌ছি।"

জগন্মাতার দোহাই দিয়াও ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সমালোচনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না; কারণ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ সমস্ত অদ্ভুত দর্শন ইত্যাদির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইতে তখনও পারেন নাই, তিনি সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "মা দেখিয়ে দিলেন, না আপনার মাথার খেয়াল কেমন করে বুঝ্‌বো? আমার তো মশাই ওরকম হ'লে, খেয়াল দেখেছি বলেই বিশ্বাস হ'ত।"

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের স্বাধীন চিন্তার পরিপোষক মতসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা নিবন্ধন তিনি প্রথম প্রথম ঠাকুরের জগন্মাতার সহিত বাক্যালাপ, ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন প্রভৃতিকে মস্তিষ্কের ভুল বলিয়া উল্লেখ করায় অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ তর্কে অনেকেই তাঁহার তীক্ষ্ণ যুক্তির সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের কেশব, প্রতাপবাবু, চিরঞ্জীববাবু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ঠাকুরের সঙ্গগুণে ভাবান্তরের কথা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যান্য ভক্তবৃন্দও ঠাকুরের নিকট ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবার অভিলাষে যাতায়াত করিতেন; কিন্তু যখন বিজয় গোস্বামী স্বীয় ধর্মমতের পরিবর্তন হওয়ায় সাধারণ সমাজের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন, তখন শিবনাথ

প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম-নেতা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমনাগমন ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহাদের ভয় হইল, যদি তাঁহারাও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে ধর্মমতের পরিবর্তন করিয়া বসেন! শিবনাথ ব্রাহ্মগণকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমন করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথও যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমনাগমন করিতেন, তাহা শিবনাথবাবুর অবিদিত ছিল না। তিনি নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "ওসব সমাধি, ভাব যা' কিছু দেখ, স্নায়বিক দৌর্বল্যমাত্র; অত্যধিক শারীরিক কঠোরতা অভ্যাস করিবার ফলে পরমহংসের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে।"

নরেন্দ্র নিরুত্তরে শিবনাথবাবুর উপদেশ শ্রবণ করিলেন। তাঁহার অন্তরে তখন যে কি ঝড় বহিতেছিল! ঐ ত্যাগি-কুল-চূড়ামণি, সরল, উদার, প্রেমিক-পুরুষ বিকৃতমস্তিষ্ক? কিন্তু তিনি কি? তিনি কে? কেন তিনি আমার মত ক্ষুদ্র মানবের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকেন? ঠাকুরের অদ্ভুত নিষ্কাম ভালবাসার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইলেন না! একি রহস্যময় সমস্যা! নরেন্দ্র সংশয়-দ্বন্দ্বালোড়িত চিত্তে গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন।

তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের অধিকাংশ নেতার সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি সন্দর্শনে অকপটভাবে শ্রদ্ধাও করিতেন; কিন্তু এতদিন ব্রাহ্ম-সমাজে ইঁহাদের সহিত একত্রে উপাসনা প্রার্থনা ইত্যাদি করিয়াও তাঁহার হৃদয় প্রশান্ত হইল না কেন?

একদিন ঈশ্বরলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতায় নরেন্দ্র গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। মহর্ষি তখন গঙ্গাবক্ষে একখানি বোটে বাস করিতেন। নরেন্দ্র গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া দ্রুতপদে বোটে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ করাঘাতে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল। মহর্ষি তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন, সহসা শব্দে চমকিয়া চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে উন্মাদবৎ তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নরেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান! মহর্ষিকে ক্ষণকাল চিন্তা বা প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই তিনি আবেগাকুলিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" বিস্ময়-স্তম্ভিত মহর্ষি কি যেন একটা উত্তর দিবার জন্য দুইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বাক্যনিঃসরণ হইল না। অবশেষে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "নরেন্দ্র, তোমার চক্ষু দেখিয়া বুঝিতেছি, তুমি যোগী।" তিনি নরেন্দ্রকে বিবিধ-প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন যে, তিনি যদি নিয়মিতরূপে ধ্যানাভ্যাস করিতে থাকেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী হইবেন, ইত্যাদি।

নরেন্দ্র প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া ভগ্নহৃদয়ে বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। যদি মহর্ষির মত ভক্তিমান্ ঈশ্বরপ্রেমিক এ পর্যন্ত ভগবদ্দর্শন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কাহার নিকট যাইবেন? তবে কি এ মিথ্যা? ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি মানবের কল্পনাসৃষ্ট আকাশকুসুমবৎ অলীক?

গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী দূরে নিক্ষেপ করিলেন। যদি উহা তাঁহার ঈশ্বর-লাভের সহায়তা না করিতে পারিল, তবে অনর্থক ঐগুলি পাঠ করিবার ফল কি? বিনিদ্রনয়নে নরেন্দ্রনাথ কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্ভুত প্রেমিকের কথা। সমগ্র রজনী অসহনীয় উৎকণ্ঠায় যাপন করিয়া নরেন্দ্র প্রভাতে দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীশ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সদানন্দময় পুরুষ ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া অমৃত-মধুর উপদেশ প্রদান করিতেছেন!

নরেন্দ্রের হৃদয়ে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইল। যদি ইনিও "না" বলিয়া বসেন তাহা হইলে কি উপায় হইবে? আর কাহার কাছে যাইবেন? অন্তঃপ্রকৃতির সহিত যথেষ্ট সংগ্রাম করিয়া অবশেষে তিনি যে প্রশ্ন বহু ধর্মাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই যে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই, সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?"

মৃদুহাস্য-রঞ্জিত মহাপুরুষের প্রশান্ত বদনমণ্ডল অপূর্ব শান্তি ও পুণ্য-বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর করিলেন, "বৎস! আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি। তোমাকে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতররূপে দেখিয়াছি।" নরেন্দ্রের বিস্ময় শতগুণ বর্ধিত করিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "তুমি দেখিতে চাও? তোমাকেও দেখাইতে পারি, যদি তুমি আমি যাহা বলি তদ্রূপ আচরণ কর।"

শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী শুনিয়া তাঁহার উদ্বেলিত আনন্দ মুহূর্তকাল পরেই সন্দেহের অন্ধকারে বিলয়প্রাপ্ত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মধ্য দিয়া তিনি যে পন্থার ইঙ্গিত পাইলেন, তাহা কুসুমাবৃত নহে। এই অর্ধোন্মাদ ব্যক্তির চরণে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া কঠোর সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত নরেন্দ্রনাথ সহসা ঠাকুরকে গুরুপদে বরণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু কিছুদিন পরে এক বিশেষ ঘটনায় তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অনেকদিন নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। সেদিন রবিবার, ব্রাহ্ম-সমাজে গেলে নিশ্চয়ই নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন, এই আশায় ঠাকুর সন্ধ্যাকালে সাধারণ সমাজের উপাসনায় উপস্থিত হইলেন। আচার্য তখন বেদী হইতে বক্তৃতা করিতেছিলেন। ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণে ভাবোন্মত্ত ঠাকুর অজ্ঞাতসারেই বেদীর সমীপবর্তী হইলেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের আগমনের কারণ অনুমান করিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া পতনোন্মুখ ভাবময় দেহখানি ধারণ করিলেন; কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, পরমহংসকে সম্মুখে দেখিয়া বেদীতে উপবিষ্ট আচার্য গাত্রোত্থান করা তো দূরের কথা, তিনি এবং অন্যান্য ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে সম্ভাষণও করিলেন না এবং সাধারণ ভদ্রতাসূচক শিষ্টাচারও প্রদর্শন করিলেন না। অনেকের মুখে অবজ্ঞাবিমিশ্র বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইতোমধ্যে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ফলে উপাসনালয়ে বিশৃঙ্খল কোলাহল দেখিয়া কর্তৃপক্ষ গ্যাসালোকগুলি নিবাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র বহুকষ্টে মন্দিরের পশ্চাৎ-দ্বার দিয়া ঠাকুরকে বাহিরে আনিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। ঠাকুরের প্রতি ব্রাহ্মগণের এইরূপ ব্যবহারে তিনি হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইলেন এবং তাঁহারই জন্য ঠাকুর এইভাবে লাঞ্ছিত হইলেন দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত নরেন্দ্র আর কখনও ব্রাহ্ম-সমাজে যান নাই।

সূক্ষ্ম যোগজদৃষ্টি-সহায়ে ঠাকুর নরেন্দ্রের মহিমাসমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়াই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; নরেন্দ্রও তাঁহার অসীম নিষ্ঠা, জগজ্জননীর উপর পূর্ণ নির্ভরতা, ত্যাগপূত পবিত্র জীবন ইত্যাদি দর্শন করিয়া একরকম অজ্ঞাতসারেই তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্যান্য রামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দ প্রথম প্রথম নরেন্দ্রকে ততটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। তাঁহার জন্য ঠাকুরের তীব্র ব্যাকুলতা অনেকের নিকটেই রহস্যময় বোধ

হইত। প্রবল আত্মবিশ্বাসের দিক হইতে নরেন্দ্রনাথের অকপট নির্ভীক আচরণগুলি সাধারণের স্থূলদৃষ্টিতে দম্ভ ও ঔদ্ধত্য বলিয়া প্রতিভাত হইত। বিশেষতঃ, ভক্তবৃন্দের ভাবাবেশে ক্রন্দন, কথায় কথায় দয়াময় ভগবানের কৃপা প্রার্থনা, নিজেকে কীটাণুকীটতুল্য হেয়জ্ঞান করিয়া আত্মনিন্দা ইত্যাদির তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করিতেন। পুরুষ পুরুষের মতই শির উন্নত করিয়া, দৃঢ় উদ্যম ও অটুট সঙ্কল্প লইয়া ভগবানের আরাধনা করিবে, ইহাই তিনি সমীচীন মনে করিতেন; কাজেই অনেক ভক্ত নরেন্দ্রের মুখর সমালোচনায় নিরুত্তর হইয়া মনক্ষুণ্ণ হইতেন। সর্ববিষয়ে নিঃসঙ্কোচ স্বাধীন ব্যবহার, স্পষ্টবাদিতা ইত্যাদির জন্য তিনি অনেকের অপ্রিয় হইলেও তাঁহার উদাসীন প্রকৃতি লোকের নিন্দা-প্রশংসার বিষয় ভাবিবার অবসর পাইত না। সাধারণ মানব তাঁহাকে যাহাই ভাবুক না কেন, ঠাকুর জানিতেন, নরেন্দ্র নির্ভীক সত্যবাদী, তাঁহার বাক্যে ও কার্যে কোথাও বিন্দুমাত্র "ভাবের ঘরে চুরি" নাই।

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইলেই তাহা মীমাংসা না করা পর্যন্ত শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। অহোরাত্র চিন্তা করিয়াও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং এই অস্থিরতা হইতেই তিনি দৃঢ়তা ও সতর্কতার সহিত ঠাকুরের নিকট গমনাগমন, এমন কি, তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস পর্যন্ত করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরকে পরীক্ষা করা, তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ইত্যাদি বাহ্য আচরণের মধ্য দিয়া নরেন্দ্রের যে অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিত, তাহাকে দম্ভ মনে করিয়া ঠাকুরের অনেক ভক্ত বিরক্ত হইতেন; কিন্তু যাঁহারা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে নরেন্দ্রের গভীর 'অন্তস্তলের খবর' রাখিতেন, তাঁহারাই জানিতেন, ঠাকুরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, ভক্তি কি অপরিসীম! যে ঠাকুরের কণামাত্র করুণালাভ করিলে অনেক ভক্ত উচ্ছ্বসিত আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, সেই করুণা-মন্দাকিনীধারা নরেন্দ্র অটলভাবে দাঁড়াইয়া মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন। স্বার্থলেশশূন্য ও এ অপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রেমসম্বন্ধ বর্ণনা করি, এমন সাধ্য আমার নাই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তুই যদি আমার কথা না শুন্‌বি, তাহ'লে এখানে আসিস্‌ কেন?" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "আপনাকে ভালবাসি, তাই দেখ্‌তে আসি, কথা শুন্‌তে নয়!" উত্তর শুনিয়া ঠাকুর ভাবানন্দে গদ্‌গদ হইলেন; মনের গোপন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় অপ্রতিভ নরেন্দ্র মরমে মরিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন, তাহা দেখিয়া একদিন তিনি রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "পুরাণে আছে, ভরতরাজা 'হরিণ' ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুর পর হরিণ হইয়াছিলেন; আপনি আমার জন্য যে রকম করেন, তাহাতে আপনারও ঐ দশা হইবে।" এই কথা শুনিয়া বালকের ন্যায় সরল ঠাকুর চিন্তিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তাইতো-রে, তাহ'লে কি হবে, আমি যে তোকে না দেখে থাক্‌তে পারিনে।" সন্দেহের উদয় হইবামাত্র ঠাকুর কালীঘরে মা'র কাছে ছুটিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "যা শালা, আমি তোর কথা শুন্‌বো না; মা বল্‌লেন, তুই ওকে (নরেন্দ্রকে) সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস্‌, তাই ভালবাসিস, যেদিন ওর ভিতর নারায়ণকে না দেখ্‌তে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখ্‌তে পারবি না।"

ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্রই তাঁহাকে উচ্চ-অধিকারী ও দৈবশক্তিসম্পন্ন

বিশুদ্ধচিত্ত সাধক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই স্বীয় অহেতুক প্রেম অজস্র ধারায় ঢালিয়া দিয়া উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

একদিন নরেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের সম্মুখে ভক্তবৃন্দের মধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, "এর (স্বদেহের) ভিতরে যেটা রয়েছে সেটা শক্তি; ওর (নরেন্দ্রের) ভিতরে যেটা আছে, সেটা পুরুষ; ও আমার শ্বশুরঘর।" এ সমস্ত কথা শুনিয়া নরেন্দ্র মৃদুহাস্য করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, আবার পাগলামী আরম্ভ হইল।

ভক্তবৃন্দ ঈশ্বরবিষয়ক সংগীত ও পরমার্থচর্চায় প্রবৃত্ত ছিলেন; ক্রমে দিবাবসানপ্রায় দেখিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন। সম্মুখে সুবিস্তৃত গঙ্গাবক্ষে লহরীমালার শীর্ষে দিগন্তের পীতাভ লোহিত রশ্মিমালা নৃত্য করিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইল; সন্ধ্যার ধূসর ছায়া, পরপারস্থ সৌধশিখর ও বৃক্ষশীর্ষগুলিকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল, তখনও দেবালয়ে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়া উঠে নাই; ঠাকুর একদৃষ্টে নরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা আসন হইতে উঠিয়া দক্ষিণ চরণ তাঁহার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার আশেপাশে দৃশ্যমান পদার্থনিচয় এক অনন্তসত্তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে; কেবল তিনি একা, অবশেষে তাঁহার "আমিত্ব"ও বিলীন হইবার উপক্রম হইল, তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন।"

ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হস্তার্পণ করিবামাত্র তিনি পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দেখেন, অদ্ভুত দেব-মানব তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাস্য করিতেছেন। চিরকাল দৃঢ়হৃদয় বলিয়া নরেন্দ্রনাথের যে গর্ব ছিল, আজ তাহা সমূলে চূর্ণ হইয়া গেল! পিতৃমাতৃ-মমতায় অন্ধ হইয়া, নাম-রূপের গন্ডী ভেদ করিয়া তিনি তো যোগিজন-বাঞ্ছিত চিদানন্দসাগরে ঝাঁপ দিতে পারিলেন না!

যে মহাপুরুষ কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়া একজন সাধারণ ব্যক্তিকে বহুজন্মার্জিত সাধনার ফলস্বরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ্ সমাধি-ধনের অধিকারী করিয়া দিতে পারেন, তিনি কখনও উন্মত্ত নহেন। আবার ভাবিলেন, ইহা সম্মোহন (Hypnotism) নহে তো? নরেন্দ্রনাথ, যাহাতে ঠাকুর ভবিষ্যতে তাঁহার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া ঐ প্রকার ভাবান্তর ঘটাইতে না পারেন, তদ্বিষয়ে সাবধান হইলেন।

এদিকে বি. এ. পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র, পিতার আদেশানুসারে সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী নিমাইচরণ বসুর নিকট এটর্ণীর ব্যবসায় শিখিতে লাগিলেন। পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য বিশ্বনাথবাবু বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র যে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের নিকট যাতায়াত করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু উহা তিনি তত্টা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না। বিশেষতঃ, বি. এ. পড়িবার সময় নরেন্দ্র রামতনু বসু লেনে স্বীয় মাতামহীর ভবনে তাঁহার পাঠগৃহ নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। আত্মীয়, পরিজন ও অন্যান্য লোকের সমাগমে পিতৃভবন সর্বদা কলরবে মুখরিত থাকিত বলিয়া তাঁহার পড়াশুনার বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইত। এই কক্ষে ধনীর সন্তান হইয়াও নরেন্দ্রনাথের সামান্য শয্যা, কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক, একটি তানপুরা ও তামাক খাইবার সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য কোন তৈজসপত্র ছিল না। নির্জনবাস, ধ্যান, দৈহিক

কঠোরতা, সংযম অভ্যাস ইত্যাদি সহকারে তিনি প্রকৃত ব্রহ্মচারীর মত জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। কখন কখন দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুর তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের এত ঘনিষ্ঠতা তাঁহার পরিজনবর্গের ততটা প্রীতিকর ছিল না; কিন্তু কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। স্বাধীনচেতা নরেন্দ্রকে নিষেধ করিয়া নিবৃত্ত করা অসম্ভব, তাহা সকলেই জানিতেন। তাঁহার বিবাহিত জীবনের উপর প্রবল বিতৃষ্ণা, সংসারের প্রতি অনাসক্ত ভাব প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরিজন ও বন্ধুবর্গ সকলেই শঙ্কিত হইলেন।

বি. এ. পরীক্ষার বেশী বিলম্ব নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায় দেখিয়া নরেন্দ্র পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার জনৈক সহাধ্যায়ী বন্ধু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং গম্ভীরভাবে নরেন্দ্রকে নানাপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। দর্শনশাস্ত্র আলোচনা, সাধুসঙ্গ, ধর্মালোচনা ইত্যাদি পাগলামিগুলি পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সাংসারিক "সুখ-সুবিধা" হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করাই কর্তব্য—ইহাই তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল। কিছুদিন হইতে তথাকথিত সাংসারিক বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট নরেন্দ্র এই প্রকার উপদেশ শুনিতেন, সহৃদয় বন্ধুর মুখেও ঐ প্রকার উপদেশ শুনিয়া তিনি ব্যথিতহৃদয়ে স্বীয় মানসিক অশান্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "আমার মনে হয়, সন্ন্যাসই মানবজীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। নিয়ত পরিবর্তনশীল অনিত্য সংসারের পশ্চাতে সুখ-লালসায় ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়ার চেয়ে, সেই অপরিবর্তনীয় 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'কে পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা শতগুণে শ্রেষ্ঠতর।"

বৈরাগ্যপ্রবণ নরেন্দ্রনাথ উৎসাহের সহিত ত্যাগের মহিমা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার বন্ধুর সহিত তর্ক উপস্থিত হইল। ক্রমে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার বন্ধু বলিলেন, "দেখ নরেন, তোমার যে প্রকার বুদ্ধি ও প্রতিভা ছিল, তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করিতে পারিতে, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস তোমার মাথা খাইয়াছেন। যদি ভাল চাও, তাহা হইলে ঐ পাগলের সঙ্গ পরিত্যাগ কর নতুবা তোমার সর্বনাশ হইবে।"

নরেন্দ্র নীরব হইলেন। বন্ধুটি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে নরেন্দ্র গাত্রোত্থান করিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন; তাঁহার ব্যথিত মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পর তিনি মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝিতে পারিতেছ না, আর বলিব কি, আমি নিজেও তাঁহাকে সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবু ঐ সরল, সৌম্যকান্তি মহাপুরুষকে আমি ভালবাসি কেন, তাহা বলিতে পারি না।"

পরমহংসের "সঙ্গদোষে" নরেন্দ্রের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া উক্ত বন্ধু দুঃখিতান্তঃকরণে প্রস্থান করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার প্রতিকূল সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া স্বনির্দিষ্ট পথেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বি. এ. পরীক্ষা হইয়া গেল। বি. এ. পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য তাঁহাকে কঠোর মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। শ্রমক্লান্তি অপনোদনের জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে সমপাঠী বন্ধুবর্গের সহিত সঙ্গীত, হাস্য-পরিহাস ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতেন। নরেন্দ্রকে বাধ্য হইয়াই বন্ধুবর্গের আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে হইত; কারণ তাঁহারা একরকম জোর

করিয়াই তাঁহাকে লইয়া যাইতেন।

ইতোমধ্যে একদিন তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া বরাহনগরে জনৈক বন্ধুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে বয়স্যগণসহ তিনি সঙ্গীত-আলোচনা ইত্যাদিতে রত আছেন, এমন সময় হাস্য-কলরব-মুখরিত কক্ষে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিলেন, নরেন্দ্রনাথের পিতা সহসা হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উজ্জ্বল-আলোকিত কক্ষে নরেন্দ্রনাথ চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, দ্রুতপদে উন্মত্তের ন্যায় বাটীতে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাঁহার গৌরব-গর্বের হিমাচলসদৃশ পিতার মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া জননী ও ভ্রাতা-ভগিনীগণ বিলাপ করিতেছেন। নরেন্দ্রের দৃঢ় হৃদয় বিচলিত হইল, পিতৃশোকে অধীর হইয়া তিনি অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বিশ্বনাথ দত্ত যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন বটে, কিন্তু উদার ও মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। যে সংসারের মাসিক ব্যয় সহস্রাধিক মুদ্রা সে সংসার চলিবে কিরূপে? সদ্যঃবিধবা জননীও সন্তান-সন্ততি-পরিজনবর্গকে লইয়া দশদিক্ অন্ধকার দেখিলেন। সংসার সম্পর্কে উদাসীন নরেন্দ্রনাথ সহসা দারিদ্র্যের কঠোর স্পর্শে চমকিয়া উঠিলেন। চিরদিন আদরে-যত্নে, প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত ভাইবোনদের এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। সম্পদকালে যাঁহারা পরমবন্ধু ছিলেন, সংসারের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহারা বিপদ্‌কালে সরিয়া পড়িলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু আত্মহারা হইলেন না। তিনি সহিষ্ণুধৈর্যে নীরবে দৈন্যের পীড়া সহ্য করিতে লাগিলেন; বন্ধুবর্গকে সাংসারিক শোচনীয় অবস্থার কথা জানিতে দিলেন না। একদিকে আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, অপরদিকে কাজকর্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিন চারিমাস অতীত হইলেও তিনি কোন সুবিধাই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অন্নাভাবনিবন্ধন কোন কোন দিন পরিবারবর্গের আহার জুটিয়া উঠিত না। আহার্যদ্রব্যের অপ্রাচুর্যের বিষয় গোপন-অনুসন্ধানে অবগত হইয়া নরেন্দ্রনাথ মাতাকে, বাহিরে নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া বাটীতে আহার করিতেন না; একরকম উপবাস বা সামান্য কিছু খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমাগত উপবাসে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িল; এমনকি, কোন কোন দিন প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় মূর্ছিতবৎ পড়িয়া থাকিতেন। কতিপয় সহৃদয় বন্ধু অবশ্য এ বিপদে তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু আজন্ম আত্মনির্ভরশীল নরেন্দ্রনাথ বিনীতভাবে ঐ সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতেন। উদরের তাড়নায় তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন, এ চিন্তা তাঁহার অসহনীয় ছিল। কথিত বন্ধুবর্গ নরেন্দ্রনাথের সুগভীর আত্মমর্যাদাজ্ঞানের বিষয় অবগত ছিলেন; কাজেই প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে মাঝে মাঝে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। তিনি কোনদিন বিশেষ কার্যের ভান করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অসমর্থতা জানাইতেন, কোনদিন বা প্রফুল্লতার ভান করিয়া পূর্বের ন্যায় উৎসাহ ও আনন্দের সহিত আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতেন; কিন্তু তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিবামাত্র তাঁহার হাস্যপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিত; তাঁহার ব্যথিত মানসপটে সংসারের দারিদ্র্যদুঃখগুলি একে একে ফুটিয়া উঠিত। মনে পড়িত, প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতাভগিনীগণের অনশনক্লিষ্ট মলিন মুখচ্ছবিগুলি, তাহাদিগকে ফেলিয়া তিনি কেমন করিয়া সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিবেন!

ভাগ্যচক্রের সহসা-বিবর্তনে যাঁহারা কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থানে পিতৃহীন হইয়া কপর্দকশূন্য অবস্থায় পরিজনবর্গের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা নরেন্দ্রনাথের বর্তমান অবস্থা সম্যক্-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ভাগ্য-বিপর্যয়ে বিমুখ পিতৃবন্ধুগণের আচরণ দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। সংসারের শোচনীয় কৃতঘ্নতার কদর্যমূর্তি দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আহত আত্মাভিমানকে অবিচলিত ধৈর্যে সংযত করিয়া বুভুক্ষু যুবক নগ্নপদে নগ্নমস্তকে প্রতপ্ত মধ্যাহ্ন কলিকাতার রাজপথে চাকুরীর সন্ধানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেন, সন্ধ্যার পর অবসন্নদেহে ব্যর্থ-চেষ্টার শ্রম-ক্লান্তি লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন; এইরূপে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে তাঁহার দুঃখকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। তাঁহার জনৈক জ্ঞাতি, তাঁহাদিগকে গৃহচ্যুত করিবার সঙ্কল্প করিয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন।

একদিন প্রভাতে নরেন্দ্রনাথ শ্রীভগবন্নাম উচ্চারণ পূর্বক শয্যাত্যাগ করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, তাঁহার মাতা বলিতেছেন, "চুপ্ কর্ ছোঁড়া, ছেলে-বেলা থেকে কেবল ভগবান্ ভগবান্! ভগবান্ তো সব কল্লেন।"

কথা কয়টি নির্মমভাবে তাঁহার ব্যথিতহৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া প্রচণ্ড অভিমান জাগ্রত করিয়া তুলিল। বাস্তবিকই কি ভগবান্ দরিদ্রের কাতর-ক্রন্দন শুনিতে পান না, অথবা শুনিতে চাহেন না? তিনি কি কেবল নিশ্চল নির্বিকারভাবে হাত গুটাইয়া এই নিষ্ঠুর সৃষ্টির দানবী-লীলা দেখিতেছেন? যে ভগবান্ ইহলোকে বুভুক্ষুকে এক টুক্‌রা রুটি দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন না, তিনি পরকালে অক্ষয় স্বর্গে অনন্ত সুখের অধিকারী করিবেন, ইহা কি সম্ভব? তবে কি ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই? হ্যাঁ, আছেন। তবে তিনি মঙ্গলময় বা দয়াময় নহেন, তিনি নির্বিকার। দুঃখীর ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয় না—তিনি হৃদয়হীন!

বন্ধুবর্গের নিকটে নরেন্দ্র সময় সময় তাঁহার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অভিনব ধারণার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। কি মর্মন্তুদ দুঃখের সহিত তিনি ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের চিরপ্রতিষ্ঠিত প্রভুত্বকে দুঃসহ অভিমানে প্রত্যাখ্যান করিতেন, তাহা সাধারণ মানব কেমন করিয়া বুঝিবে? অনেকেই স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন। পুরুষকার-সহায়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার পশ্চাতে যে গর্বদৃপ্ত আত্মশক্তির প্রেরণা, যে মহিমাসমুজ্জ্বল ত্যাগের বিকাশ, দৃঢ়বিশ্বাসী ভক্তের অসীম অনুরাগ, তাহা সাধারণ মানবের দৃষ্টিতে পড়িতে পারে না।

সে কেবল বুঝিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। বিষয়কর্মে জড়িত থাকিয়া নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারেন নাই; ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে আনিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। কলিকাতার ভক্তবৃন্দ শুনিয়াছিলেন যে, অসৎসঙ্গে মিশিয়া নরেন্দ্রনাথের চরিত্র খারাপ হইয়া গিয়াছে, পূর্বের ন্যায় আর ধর্মভাব নাই! এই সমস্ত মিথ্যা নিন্দাবাদ শ্রবণে সন্দিহান হইয়া ভক্তগণ অনেকে নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের বাক্যালাপের মধ্যে সন্দেহের পরিচয় পাইয়া নরেন্দ্রনাথের রুদ্ধ অভিমান জাগিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য! বাহিরের লোকে যাহা রটায়, ইঁহারা পর্যন্ত তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন। হয়তো ঠাকুরও ঐরূপ মিথ্যা দুর্নাম বিশ্বাস করিয়াই পরীক্ষার্থ ইঁহাদিগকে পাঠাইয়া থাকিবেন, মনে মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইবামাত্র ভক্তের হৃদয়ে সুতীব্র অভিমান জাগিয়া উঠিল। তাঁহার তিক্ত উত্তর-

সমূহ শুনিয়া কোন কোন ভক্ত ঠাকুরের নিকট গিয়া জানাইলেন, নরেন্দ্রের যে অধঃপতন হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঠাকুর প্রাণাধিক নরেন্দ্রের সাংসারিক বিপদ ইত্যাদির কথা ইতোপূর্বেই জানিতে পারিয়া যথেষ্ট মনোকষ্ট পাইতেছিলেন, তাহার উপর নরেন্দ্রনাথের স্বভাব-পবিত্র চরিত্রে নানারূপ কলঙ্ক আরোপিত হইতে চলিয়াছে শুনিয়া ভক্তবৃন্দকে বলিলেন, "চুপ্ কর্ শালারা, মা বলিয়াছেন, সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না, আর কখনও ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখদর্শন কর্‌ব না।"

নরেন্দ্রের উপরে ঠাকুরের কতখানি শ্রদ্ধামিশ্রিত বিশ্বাস ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। একদিন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় নরেন্দ্রের প্রশংসা করিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "এরকম বুদ্ধিমান্ ছেলে আমি খুব কম দেখেছি, এই বয়সে এত পাণ্ডিত্য অথচ কি নম্রতা। এ সমস্ত ছেলে যদি ধর্মের জন্য অগ্রসর হয় তো দেশের অনেক কল্যাণ হবে।" নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা শুনিয়া ঠাকুর বিহ্বল-হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "তা' হবে না কেন গো? ওর জন্যই তো এবার এখানকার (নিজের দেহ দেখাইয়া) আসা!"

দুর্দমনীয় অভিমানে যদিও নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না; কিন্তু চিরকাল দৃঢ়হৃদয় বলিয়া তাঁহার যে অহঙ্কার ছিল, তাহাও নিঃশেষে চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও হৃদয় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। ঐ মহাপুরুষের কৃপায় তিনি যে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন, সেগুলি পুনঃ পুনঃ মানসপটে উদিত হইয়া তাঁহার মনঃকল্পিত নাস্তিকতা দূর করিয়া দিল। তিনি বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, আমি করিতেছি কি?

অর্থোপার্জন ও পরিবার-প্রতিপালন করিয়া কায়ক্লেশে কোনমতে গতানুগতিকভাবে জীবনযাপন করিবার জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য মহান্, তাঁহার লক্ষ্য যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দলাভ! দিন স্থির করিয়া নরেন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করিবার জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সেদিন ঠাকুর কলিকাতাস্থ কোন ভক্তের আলয়ে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন; নরেন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়া তথায় উপনীত হইলেন, ইচ্ছা, গৃহত্যাগ করিবার প্রাক্কালে শ্রীগুরুচরণ বন্দনা করিয়া সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন; কিন্তু তাহা হইল না। ঠাকুরের ব্যাকুল অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইল।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট, নির্নিমেষে নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন, বিশাল নয়নদ্বয়ে দরবিগলিত অশ্রুধারা। বিহ্বল নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের নিহিত ব্যথা গলিয়া নয়নপথে নির্গত হইল। তাঁহার বিদ্রোহী মনের উপর এ কি রহস্যময় প্রাণময় প্রেরণা! উভয়ে নির্বাক! উপস্থিত অন্যান্য ভক্তবৃন্দ বিস্ময়-স্তম্ভিত। বহুক্ষণ পর ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সকরুণ নেত্রে নরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া স্নেহস্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "বাবা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে কিছু হবে না।" ঠাকুরের ভয়, পাছে নরেন্দ্রনাথ সংসারে জড়াইয়া পড়েন। উভয়ে নির্বাক্, অথচ নয়নে অশ্রু—এ অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য জানিবার জন্য জনৈক ভক্ত কৌতূহলবশে প্রশ্ন করায়, ঠাকুর মৃদু হাস্যে উত্তর করিলেন, "আমাদের একটা হয়ে গেল।" রাত্রিতে নরেন্দ্রকে নির্জনে লইয়া ঠাকুর নানাপ্রকার সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, যতদিন তাঁহার দেহ আছে ততদিন সংসারে থাকিতে হইবে এবং তিনি যে বিশেষ কার্যসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে

যখন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বর হইতে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন, একটা অভূতপূর্ব আনন্দের ও আশার বাণী যেন তাঁহার হৃদয়ের পর্বতোপম ভার সরাইয়া দিয়াছে। এখন আর ঠাকুর তাঁহার নিকট রহস্যময় উন্মাদ নহেন, তাঁহার জীবনের চরমাদর্শ, গুরু, পিতা—সর্বস্ব।

নাবালক ও বিধবার সম্পত্তি-গ্রাসের চেষ্টা আমাদের দেশে প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে। জ্ঞাতিদের ষড়যন্ত্রমূলক মোকদ্দমার জন্য নরেন্দ্রনাথ প্রস্তুত হইলেন। তাহারা বাড়ি ভাগ করিয়া লইবার জন্য আদালতের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিল। বাড়ির ভাল অংশটা যাহাতে তাহারা পায়, এই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। জননী ভুবনেশ্বরী দিশাহারা হইলেন। বিপদের পর বিপদের আঘাতে মর্মাহত সিংহের ন্যায় নরেন্দ্রনাথ অন্তিমবলে বিপক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অন্যায় অসত্যের নিকট কিছুতেই মাথা নত করিবেন না, ইহাই ছিল তাঁহার পণ। আদালতে মামলা চলিতে লাগিল। নরেন্দ্রের পিতৃবন্ধু বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মামলা চালাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। এই মামলা উপলক্ষে কতকগুলি ঘটনায় নরেন্দ্রের উপস্থিতবুদ্ধি, চরিত্রের দৃঢ়তা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বিপক্ষপক্ষের উকীল নরেন্দ্রনাথকে জেরা করিবার কালে নরেন্দ্রনাথের নির্ভীক স্পষ্ট ধীর-গম্ভীর উত্তর শুনিয়া এবং তিনি আইন পড়িতেছেন জানিয়া জজ সাহেব সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, 'যুবক, কালে তুমি একজন ভাল উকীল হইবে।' জজ সাহেব সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া নরেন্দ্রের পক্ষেই মামলার রায় দিলেন। জয়ের সংবাদ পাইবামাত্র নরেন্দ্রনাথ আনন্দে আদালত হইতে জননীর নিকট ছুটিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় বিপক্ষের এটর্ণী তাঁহার হাত ধরিয়া নিবারণ করিলেন এবং সানন্দে বলিলেন, "জজ সাহেবের সহিত আমিও একমত। আইনই আপনার যোগ্য ক্ষেত্র, আমি আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিতেছি।"

নরেন্দ্র ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া জননীকে বলিলেন, 'মা, বাড়ি বাঁচিয়াছে।' ভুবনেশ্বরী আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিজয়ী সন্তানকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। দুঃখের মধ্যেও ভগবান এমনি করিয়া অতি কঠিন আনন্দের দৃশ্য ফুটাইয়া তোলেন —ইহাই সংসার।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, সাংসারিক দিক দিয়া বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। একদিন নরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, হয়তো ঠাকুরের কৃপায় ইহার একটা সুবিধা হইতেও পারে। মনে ইহা উদয় হইবামাত্র তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন। নয়নের মণি নরেন্দ্রকে পাইয়া ঠাকুর আনন্দে বিহ্বল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। অগাধ বিশ্বাস লইয়া তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয়! যাহাতে আমার মাতা ও ভাই-ভগিনীদের দুটি খাওয়ার একটু উপায় হয়, সে সম্বন্ধে আপনার মাকে অনুরোধ করিতে হইবে।" ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, আমি কোনদিন মার কাছে কিছু চাই নাই, তবে তোদের যাতে একটু সুবিধা হয়, সেজন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুই তো মাকে মানিস্ না, তাই মা তোর কথায় কান দেয় না।"

কঠোর নিরাকারবাদী নরেন্দ্রের সাকারে বিন্দুমাত্র নিষ্ঠা ছিল না। মূর্তি-পূজাবিরোধী নরেন্দ্রনাথ কি করিবেন। অবিশ্বাস? সেদিন চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বাস! বিনা প্রমাণে? কেমন করিয়া সম্ভব? নরেন্দ্রনাথ নতমস্তকে রহিলেন।

কিন্তু ঠাকুর তাঁহার জন্য কি না করিতে পারেন। যিনি তাঁহার দুঃখকষ্টের বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং ভিক্ষার্থে বহির্গত হইবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনি

কি সেই নরেন্দ্রের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন? কিন্তু লীলাময় ঠাকুরও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন, মায়ের কৃপা ছাড়া কিছু হবে না। নরেন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা' চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন।"

বিশ্বাস থাক আর নাই থাক, ঠাকুরের প্রস্তরময়ী জগন্মাতাটি কি পদার্থ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

দিনান্তের রক্তরশ্মিমালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লঘুমেঘখন্ডগুলির নিকষে কনক-রেখা অঙ্কিত করিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। দেবালয়ে সন্ধ্যার আরতিবাদ্য মৃদুগম্ভীররোলে উত্থিত হইয়া কর্মশ্রান্ত চিত্তের উপর অপূর্ব প্রশান্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। ঠাকুর তখন বারান্দায় পদচারণা করিয়া মধুর কণ্ঠে ভগবন্নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। দীর্ঘসমুন্নতদেহ, আজানুলম্বিতবাহুযুগল, প্রশস্ত ললাটে মহিমার বিচ্ছুরিত দ্যুতি, নেত্রে শান্তোজ্জ্বল করুণা, নরেন্দ্রনাথের মুগ্ধ-দৃষ্টি নিষ্পলক হইল। তিনি কি ভাবিতেছিলেন, ঈশ্বরের চিরজাগ্রত মহিমার ঘনীভূত মূর্তিস্বরূপ এই অদ্ভুত দেব-মানব কি তাঁহার দুর্বল কল্পনা হইতে ঊর্ধ্বে, অতি ঊর্ধ্বে, যেখানে তাঁহার বিচার-বুদ্ধির হাস্যকর মূঢ়তা অগ্রসর হইতে পারে না?

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। নরেন্দ্রনাথ সংশয়দ্বন্দ্বালোড়িত চিত্তে "কালীঘর" অভিমুখে চলিলেন। আজ ঠাকুরের কৃপায় সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হইবে, উৎকণ্ঠিত উল্লাসে তাঁহার বক্ষ ভরিয়া উঠিল।

তিনি দেখিলেন, জগদম্বার ভুবনমোহনরূপে শ্রীমন্দির আলোকিত। প্রস্তর-মূর্তি নয়, "মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী প্রতিমা" বরাভয় কর বিস্তার করিয়া অসীম অনুকম্পাভরে স্নেহকরুণ হাস্য করিতেছেন। তারপর কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন তাহা তিনিই জানেন, আর জানেন তাঁহার অদ্ভুত গুরু পরমহংসদেব। ফলকথা নরেন্দ্র সব ভুলিয়া গেলেন। ভক্তি-বিহ্বল-চিত্তে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "মা বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি দাও! যেন তোমার কৃপায় সর্বদাই তোমাকে দেখিতে পাই মা!"

নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন; ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাইলি? তাঁহার পূর্বসঙ্কল্প স্মৃতিপথে উদিত হইল। তাইতো, তিনি করিয়াছেন কি? ঠাকুরের আদেশে তিনি পুনরায় মন্দিরে গেলেন; দ্বিতীয়, তৃতীয় বারেও তিনি মুখ ফুটিয়া মায়ের চরণে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করিতে পারিলেন না। তাঁহার আজন্ম বৈরাগ্যপ্রবণ মন, সময়ে সময়ে জাগতিক দুঃখকষ্টে বিচলিত হইলেও পার্থিব ভোগসুখের কামনায় ক্ষুব্ধ হয় নাই; তিনি কেমন করিয়া অন্ন-বস্ত্রের জন্য প্রার্থনা করিবেন! কল্পতরুতলে গমন করিয়া, একান্ত মূর্খ ব্যতীত আর কে অমৃতফল ছাড়িয়া লাউ-কুমড়া কামনা করে?

অবশেষে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের নির্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন —"তুই যখন চাইতে পারলি না, তখন তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নেই, তবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।" নরেন্দ্র আশ্বস্ত হইলেন, তাঁহার নিজের সংসারসুখের প্রয়োজন নাই।

সেইদিন হইতে নরেন্দ্রের জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এ অধ্যায় রহস্য-জটিল, সাধারণ মানববুদ্ধির ধারণাতীত। লোক-লোচনের অন্তরালে কি অদৃশ্য কৌশলে যে ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দকে গড়িতেছিলেন তাহা বর্ণ

করিবার শক্তি লেখকের নাই। আশ্চর্য ত্যাগি-কুল-চূড়ামণি সাধক, ততোধিক আশ্চর্য তাঁহার আচার্যদেব!

শ্রীগুরু-কৃপায় নরেন্দ্রনাথের সাংসারিক অভাব অনেকাংশে দূরীভূত হইল। নরেন্দ্র এটর্ণী আফিসে কাজ করিয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদের দ্বারা কিছু কিছু অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন; অবশেষে স্থায়িরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে শিক্ষকতা কার্য গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৩ হইতে ১৮৮৪ সাল। শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। দলে দলে নরনারী তাঁহার দর্শনার্থ, শ্রীমুখের বালবোধ্য সরলমধুর উপদেশবাণী শুনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম কয়েকটি অর্ধস্ফুট কুসুম চয়ন করিয়া ঠাকুর এক গগনোপম উদার আদর্শ ধর্ম-সঙ্ঘ গড়িতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসরব্যাপী কি গভীর সুদুস্তর তপস্যা ও সাধনার মধ্য দিয়া জগদম্বা এই অভিনব আদর্শ-পুরুষকে গঠন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা অল্পবুদ্ধি মানব কেমন করিয়া করিবে? যাঁহার ইচ্ছামাত্র নর-পশু পলকের মধ্যে দেবত্ব প্রাপ্ত হইত, যাঁহার স্পর্শমাত্রে একজন সাধনহীন মানব অনায়াসে সমাধিগত হইয়া সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি করিত, যাঁহার কৃপা-কটাক্ষে এক মুহূর্তে ইষ্টদর্শন হইত; অথচ যিনি অপূর্ব বিনীত-সারল্যের সহিত নিজের দীনাতিদীন বলিয়া কীর্তন করিতেন, যিনি পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মত মাতৃ-নির্ভরতা লইয়া প্রতিটি বাক্য ও কর্মে জগদম্বার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতেন, যিনি নিখিল আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহের সমষ্টি স্বরূপ, সকল ধর্মের সকল মতের ধর্মপিপাসুর চিত্তে শান্তি প্রদান করিতেন, তাঁহার ইয়ত্তা অল্পবুদ্ধি মানব কেমন করিয়া করিবে!

এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-গর্বিত, সন্দিগ্ধ চিত্ত, আর্যধর্মভ্রষ্ট, ভোগৈক-মানস, মোহান্ধগণের পরিত্রাণের জন্য এক মহান্ আদর্শের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহারই পরিপূর্ণ প্রকাশ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব! তাই বিবেকানন্দ একদিন গৈরিক-উষ্ণীষ-মণ্ডিত শির ঊর্ধ্বে তুলিয়া সমগ্র জাতিকে মেঘমন্দ্রে শুনাইয়াছেন, "যদি তোমাদের চক্ষু থাকে, তবেই তোমরা উহা দেখিবে; যদি তোমাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তবেই তোমরা উহার সন্ধান পাইবে। অন্ধ—সে অতি অন্ধ, যে সময়ের চিহ্ন না দেখিতেছে, না বুঝিতেছে। দেখিতেছ না, দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার সুদূর গ্রাম-জাত এই সন্তান এক্ষণে সেই সকল দেশে সত্য সত্যই পূজিত হইতেছে, যাহারা বহু শতাব্দী ধরিয়া পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছে।"

১৮৮৫ সালের মধ্যভাগে ঠাকুরের গলরোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন। অবশেষে চিকিৎসার্থ ঠাকুর কলিকাতায় আনীত হইলেন। সহরে থাকা অসুবিধাজনক দেখিয়া, ভক্তগণ কলিকাতার উত্তরাংশে অবস্থিত কাশীপুরে একটি বাগান-বাটী ভাড়া লইয়া ঠাকুরকে তথায় লইয়া গেলেন। রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী, তারক, লাটু প্রভৃতি বালকভক্তগণ সেবায় রত হইলেন। বলরাম, রামচন্দ্র, গিরিশ, ঈশান প্রভৃতি গৃহী ভক্তবৃন্দ তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। সদাসর্বদা ঠাকুরের খোঁজ লওয়া এবং সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি করার জন্য নরেন্দ্রনাথ আগস্ট মাসেই শিক্ষকতাকার্য পরিত্যাগ করিলেন। ঠাকুর কাশীপুরের বাড়িতে থাকাকালীন তিনিও বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া তথায় আগমন করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বালক-ভক্তগণ প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়া একে একে কাশীপুরের

বাগানে আসিয়া গুরুসেবায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহারা কলেজ ছাড়ি
এমন কি, বাটীতে যে দুইবেলা আহার করিতে যাইতেন, তাহা পর্যন্ত বন্ধ কর
দিলেন। অনেকের অভিভাবকগণ ইহাতে শঙ্কিত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগ
গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। বালকগণকে অভয় দি
নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিবার ভার লইলেন। তাঁহার মুখের সা
কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না, ফলে তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইতে পারিল ন

ঔষধ-পত্র, চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটী নাই, অথচ রোগ ক্রমে ক্রমে প্রবলাক
ধারণ করিতে লাগিল। নিজ শক্তি শিষ্যগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া ঠা
যে লীলা সাঙ্গ করিবার আয়োজন করিতেছেন, অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিলে
তবুও আশা-মুগ্ধ-হৃদয়ে সমস্ত অমঙ্গল-চিন্তা সরাইয়া রাখিয়া ভক্তগণ প্রাণপ
চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কি অপরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা ঠাকুরই জানেন। তি
নরেন্দ্রের কোনপ্রকার সেবা গ্রহণ করিতেন না, করিতে পারিতেন না। প্রত্যক্ষ
গুরুসেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত নরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়াই কেবল পর্যবে
কার্যেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

কাশীপুরের বাগান-বাটী কেবল রোগীনিবাস ও শুশ্রূষাগার নহে, একা
মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিল। ভক্তগণ সাধন-ভজন করিতেছেন; ক
বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রপাঠ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা চলিতে
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম-মদিরাপানে উন্মত্ত প্রেমিকপুরুষগণের জীবনের সর্বো
আনন্দময় দিনগুলি এই পুণ্যতীর্থেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রীগুরু-প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে সাধনপথে দ্
উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। সে প্রবল উৎসাহ, কঠোর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, পরিপ
বিশ্বাসের সহিত সত্যলাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা বর্ণনাতীত। কোন কে
দিন তিনি রজনীযোগে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পঞ্চবটীমূলে ধ্যান করিতেন। নরে
নাথের তীব্র অনুরাগ দর্শন করিয়া ঠাকুর আনন্দিত হইতেন; একদিন নরে
ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ্, সাধনকালে আমার অষ্টৈশ্বর্য লাভ হয়েছিল, তা' ে
কাজে লাগেনি; তুই নে, কালে তোর অনেক কাজে লাগবে।"

নরেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "মশায়, ওতে ভগবান্ লাভ কর্‌বার কোন সা
হবে কি?"

ঠাকুর উত্তর করিলেন, "না, তা' হবে না বটে, কিন্তু ঐহিকের কোন বাস
অপূর্ণ থাক্‌বে না।"

কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ত্যাগিশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "তবে ম
ওতে আমার প্রয়োজন নেই।" বাস্তবিকই এই কালে নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকু
পবিত্র সঙ্গে যেন স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া গিয়াছিলেন। দিবা-রাত্র কেবল ভগবচ্চি
সত্যলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা! তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত, পিঞ্জরাবদ্ধ সি
যেন কারাগার ভাঙ্গিয়া বহির্গত হইবার অসীম আগ্রহে ছট্‌ফট্ করিতেছে।

ত্যাগে পবিত্র, চরিত্রে উন্নত, সঙ্কল্পে অটল, তরুণ যুবকগণ শ্রীশ্রীরামকৃ
আদর্শ করিয়া কাশীপুরের বাগান-বাটীতে সুদুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলে
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেবা-উপলক্ষে গৃহ-পরিজন-ত্যাগী বালকগণ একত্র বসবাসের ফ
এক অপরূপ আধ্যাত্মিক প্রেমসম্বন্ধে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইয়া পড়ি
এইখানেই ভাবী রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পত্তন হইল। এই সময় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁ
কুমার শিষ্যদিগকে সন্ন্যাস দিবার সঙ্কল্প করিলেন। শুভদিনে শিষ্যগণকে স্ব

গৈরিক দান করিয়া ঠাকুর নেতা নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সম্পূর্ণ নিরভিমান হইয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে রাজপথে ভিক্ষা করিতে পারিবে কি?" তাঁহারা শ্রীগুরুর আদেশে তৎক্ষণাৎ ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে আনয়ন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেদিন ঠাকুরের কি আনন্দ! উচ্চশিক্ষা ও আভিজাত্যের গৌরব-বুদ্ধি-বর্জিত বালসন্ন্যাসিগণের তীব্র বৈরাগ্যদর্শনে ঠাকুর আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর অতীতযুগের যুগপ্রবর্তক সন্ন্যাসীদের জীবন ও উপদেশ আলোচনাই নরেন্দ্রের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। ধ্যানাভ্যাসের ফলে একাগ্রমানস নরেন্দ্র যখন যে বিষয় আরম্ভ করিতেন, তাহা লইয়াই মাতিয়া উঠিতেন। ভগবান্ বুদ্ধদেবের অপূর্ব ত্যাগ, অলৌকিক সাধনা ও অসীম করুণা, নিশিদিন নরেন্দ্রের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। জন্ম, জরা, দুঃখ, ব্যাধির নির্মম পেষণে প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবকুলের কাতর হাহাকারে, করুণা-বিগলিত রাজপুত্রের বিশাল হৃদয়ের বেদনা বর্ণনা করিতে করিতে নরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিত। বুদ্ধদেবের ধ্যানে বিভোর নরেন্দ্রনাথ গোপনে দুইজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধগয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রজনীযোগে গাত্রোত্থান করিয়া নিঃশব্দে নরেন্দ্র, তারক (স্বামী শিবানন্দ) ও কালী (স্বামী অভেদানন্দ) গঙ্গা পার হইয়া বালী স্টেশনে আসিয়া ট্রেণে উঠিলেন।

১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাস, তরুণ সন্ন্যাসীরা গয়ায় পবিত্র ফল্গুনদীতে স্নান করিয়া ভক্তিভরে ৮ মাইল দূরবর্তী বোধিসত্ত্বের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে প্রভাতে নরেন্দ্রনাথকে না দেখিয়া ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন। চারিদিকে অনুসন্ধান করা হইল, নরেন্দ্রের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ঠাকুরের নিকট ভক্তবৃন্দ ঐ বিষয় নিবেদন করিতে তিনি মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না, সে ফিরে এলো বলে; তার কি এ জায়গা ছেড়ে থাক্‌বার জো আছে!"

বুদ্ধগয়ায় উপনীত হইয়া নরেন্দ্র বোধিসত্ত্বের মন্দির দর্শন করিলেন। এই সেই স্থান যেখানে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণক্লিষ্ট জীবগণের দুঃখ-নিবারণকল্পে সমাধিস্থ হইয়া বোধি লাভ করিয়াছিলেন! বোধিদ্রুমমূলে পবিত্র প্রস্তরাসনে নরেন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতাদ্বয় ধ্যানভঙ্গে চাহিয়া দেখেন, নরেন্দ্র পাষাণবৎ নিশ্চল, দেহ স্পন্দনহীন। বহুক্ষণ অতীত হইলে তিনি একবার অর্ধবাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; পরক্ষণেই আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে সত্যের বিমল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল; তিনি কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তাহা গুরুভ্রাতাদ্বয়ের নিকট প্রকাশ করিলেন না। ক্রমাগত তিন দিবস কঠোর তপস্যায় যাপন করিয়া তাঁহারা বুদ্ধগয়া হইতে কাশীপুরের বাগান-বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাদিগের প্রাণ-স্বরূপ নরেন্দ্রনাথকে পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন।

বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, যে অতৃপ্ত পিপাসায় কাতর হইয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছেন, সে পিপাসা একমাত্র ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত তৃপ্ত হইতে পারে না। নরেন্দ্র সংকল্প স্থির করিয়া লইলেন; কিন্তু অপরাপর ভক্তগণের ন্যায় বিশ্বাস-সহকারে শ্রীগুরুর চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলেন না। তিনি চাহেন, সত্য উপলব্ধি করিতে। নরেন্দ্র তীব্র তপশ্চর্যায় রত হইলেন। সে প্রবল উৎসাহ, কঠোর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দৈহিক ভোগ-বিলাস বর্জন করিয়া অনন্যমানসে আত্মদর্শন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা বর্ণনাতীত!

পূর্বগ মহাপুরুষচরিতসমূহ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই; তাঁহারা দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া মুক্তির নব নব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে কামকাঞ্চনের প্রবল আকর্ষণে অবিচলিত থাকিয়া স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিয়াছে তাঁহাদের জপ, তপ, সাধন, ভজন, যা'-কিছু সবই পরহিতায়, নিজের মুক্তি কি অপর কিছু কামনায় নহে। ঠাকুর নরেন্দ্রকে তাই বিভিন্ন প্রকার সাধনা আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্য দিয়া ধর্মজীবনের চরমাদর্শের অভিমুখী করিয়া তি লাগিলেন। ঠাকুরের নিজ জীবনের অনুভূত আধ্যাত্মিক সত্যগুলির সহিত প্রত ভাবে পরিচিত হইবার পূর্বে, নরেন্দ্র কিছুতেই ঐ সমস্তের প্রতি আস্থাবান্ নাই।

একদিন কাশীপুরের বাগান-বাটীতে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে নরেন্দ্র ধ্যানমগ্ন। এমন সময়ে তিনি অনুভব করিলেন যে, স্পর্শমাত্রে অপরের মনোরা আমূল পরিবর্তন আনিয়া ধর্মভাববিশেষ সঞ্চার করিবার শক্তি তাঁহাতে উদ্ব হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্পর্শ দ্বারা ঐরূপ করিতে তিনি বহুবার প্র করিয়াছেন। একি সেই শক্তি? বাল-সুলভ কৌতূহলবশতঃ অগ্রপশ্চাৎ না ভা তিনি পার্শ্বে ধ্যানমগ্ন জনৈক গুরুভাইয়ের উপর উহা পরীক্ষা করিতে তাঁহার ধর্মজীবনে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিলেন। দ্বৈতবাদী, সগুণ সা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ভক্ত মুহূর্ত মধ্যেই অদ্বৈতবাদী ও জ্ঞানযোগী হইলেন। ঠা ঐ বিষয় অবগত হইয়া নরেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "না জম্‌তেই খরচ? ওর কি অনিষ্টটা কর্‌লি বল দিকি?" পরে ঐ শক্তি কিরূপে প্রয়োগ করিতে তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

সেদিন চলিয়া গিয়াছে। সেই দার্শনিক, তার্কিক, উদ্ধত নরেন্দ্রনাথ গুরুভক্ত সাধক। পাশ্চাত্যদর্শনের যুক্তিজাল, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব তাঁহার চি যে আবরণ দিয়াছিল, তাহা খসিয়া গিয়াছে। ঠাকুরের আদেশে এখন তাঁ পাঠ্যপুস্তক কেবল পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান নহে, তিনি গভীর শ্রদ্ধার স উপনিষদ্, সংহিতা, পঞ্চদশী, বিবেক-চূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতেছে স্বীয় সমস্ত বিদ্যার অভিমান হেয়জ্ঞান করিয়া পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সহিত ঠাকু অপূর্ব বাণীসমূহের মধ্য দিয়া অভিনব, শ্রেষ্ঠতর শিক্ষালাভ করিতেছেন। অ নিদ্রাদি জৈবিক-ধর্ম-বিবর্জিত নরেন্দ্রনাথের কঠোর তপস্যা উপস্থিত অ বালকভক্তমণ্ডলীর আদর্শস্বরূপ হইল। যাঁহাকে দেখিবার জন্য ঠাকুর উন্ম হইয়া উঠেন, যাঁহার কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মহারা হন, যাঁহার প্রশংসা করিতে গিয়া ভাষা খুঁ না পাইয়া ঠাকুর বলেন, "ও সাক্ষাৎ নারায়ণ—জীবোদ্ধারের জন্য দেহধারণ কর তাঁহাকেও যদি এত কঠোর সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যের আর কি! সাধনপথে বহুদূর-অগ্রসর নরেন্দ্রনাথ অবশেষে বুঝিতে পারিলেন, নির্বি সমাধিলাভ ব্যতীত তাঁহার এ বিশ্বশোষী আধ্যাত্মিক পিপাসা পরিতৃপ্ত না; কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, পরিপূর্ণ উদ্যমের সহিত করিয়াও ঐ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারিলেন না।

নীরব গভীর রাত্রি। কাশীপুরের উদ্যান-বাটিকার দ্বিতলের কক্ষে রোগশয্যায় শায়িত। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ। কক্ষে অপর কেহ নাই। নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন, যে-কোন উপায়ে হউক নির্বিকল্প সম লাভ করিবেন। চিরদিন পুরুষকারের উপাসক আজ কৃপাভিক্ষা করিতে আসিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে তাঁহার বাক্যনিঃসরণ হইল না। অন্তর্যামী পুরুষ,

মনোভাব বুঝিলেন। কয় বৎসর পূর্বে যে নরেন্দ্রনাথ বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "যে বইএ মানষুকে ভগবান্ বলতে শিক্ষা দেয়, সে বই পড়বার কোন প্রয়োজন নেই। নিজেকে ভগবান্ বলার (সোঽহং) চেয়ে আর পাপ নেই।" আজ তিনিই বেদান্তোক্ত সর্বোচ্চ অনুভূতি লাভের জন্য লালায়িত! সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিনি গুরুর সহিত, নিজের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত কি বিরামহীন সংগ্রামই না করিয়াছেন!

ঠাকুর সস্নেহে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "নরেন, তুই কি চাস?" সুযোগ বুঝিয়া নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—"শুকদেবের মত সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিযোগে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকিতে চাই।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নেত্রপ্রান্তে ঈষৎ অধীরতা প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, "বার বার ঐ কথা বলিতে তোর লজ্জা করে না! কোথায় কালে বটগাছের মত বর্ধিত হ'য়ে শত শত লোককে শান্তিছায়া দিবি, তা' না, তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্; এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর!"

নরেন্দ্রের বিশাল নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল। তিনি অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, "নির্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে না; আর যদি তা' না হয়, তবে আমি ওসব কিছুই করতে পারবো না।"

"তুই কি ইচ্ছায় কর্‌বি, জগদম্বা তোর ঘাড় ধরে করিয়ে নেবেন! তুই না করিস্, তোর হাড় কর্‌বে।"

নরেন্দ্রের ব্যাকুল অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ঠাকুর অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা যা, নির্বিকল্প সমাধি হ'বে।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক জড়পুঞ্জ যেন মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল; দেশকাল নিমিত্তের পরপারে অবস্থিত নিজবোধস্বরূপ আত্মা স্বমহিমায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। এ যে কি অবস্থা, তাহা মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই, হইতে পারে না।

বহুক্ষণ পর তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব করিলেন, তাঁহার মন ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে কামনাশূন্য হইলেও একটা অলৌকিক শক্তি তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যজগতে নামাইয়া লইয়া আসিতেছে। অনুভব করিলেন, "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় কর্ম করিব, অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করিব"—এই মহতী কামনার সূত্র ধরিয়া তাঁহার মন নির্বিকল্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনুভব করিলেন, জগতের দুঃখ-দৈন্যপ্রপীড়িত মোহভ্রান্ত জীবকুলকে, স্বয়ং জ্ঞানামৃতে পরিতৃপ্ত হইয়া উক্ত অমৃত পান করাইবার জন্য ভারতের অতীত যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুলের ন্যায় তাঁহাকেও জলদমন্দ্রে ডাকিতে হইবে—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

* * *

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্,
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ;
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

আজ নরেন্দ্রের হৃদয়ের সমস্ত অশান্তি ও আকাঙ্ক্ষার অবসান হইয়াছে;

ব্রহ্মবিদের ন্যায় দিব্যজ্যোতিঃ-উদ্ভাসিত বদন লইয়া, আত্মকাম সন্ন্যাসী আসি শ্রীগুরু-চরণে প্রণত হইলেন। ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, “এখনকার মত তবে চা দেওয়া রইল, চাবি আমার হাতে; কাজ শেষ হ'লে তবে খুলে দেওয়া হবে।”

সেদিন নরেন্দ্রগত-প্রাণ বালক-ভক্তগণের আনন্দ দেখে কে! অহর্নিশ ভজ গান চলিতে লাগিল। নরেন্দ্র ভাবোন্মত্ত হইয়া রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম ও চৈতন্যলী বিষয়ক সংগীত গাহিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে পুলকবহুল উদ্দীপনা আনিয়া দি লাগিলেন। এদিকে ঠাকুর জগজ্জননীর নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলে “মা, ওর (নরেন্দ্রের) অদ্বৈত-অনুভূতি তোর মায়াশক্তি দিয়ে আবরণ ক'রে মা, আমার ওকে দিয়ে যে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।”

যে সমস্ত ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ মানবজাতির কল্যাণ-কাম নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে মধ্যে কিছু না কিছু আমিত্বের অহঙ্কার ছিল। তাই ঠাকুর বলিতেন, “খাদ দিলে গড়ন হয় না।” অবশ্য এ “আমিত্ব” “কাঁচা আমি” নয়, এ “পাকা আমি আমি প্রভুর দাস, তাঁহার লীলার সহায়ক।

নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুর যে সকল রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে তাহা আমরা ইতোপূর্বে স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। একদিন, নরেন্দ্র দেখাইয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “এই যে ছেলেটি দেখ্ছো, এ জন্ম থেকেই ব্রহ্মজ্ঞানী, এর মত ছেলেরা নিত্যসিদ্ধের থাক। কখনও কামিনী-কাঞ্চনের মায়ায় বদ্ধ হয় না।” আবার কখনও বা “শুকদে কখনও বা “শঙ্কর,” “নারায়ণ ঋষি” ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিতে ঠাকুরের এই আপাতবিরুদ্ধ উক্তিগুলি কি সাময়িক স্নেহের উচ্ছ্বাস! স্থূল দেখিতে গেলে তাহাই অনুমান হয় বটে এবং সাধারণ মানবের পক্ষে ঐগু সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াও বিচিত্র নহে। আজন্ম সত্যবাদী ঠাকুর, পরিহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই, যিনি জগন্মাতার পদতলে স উৎসর্গ করিতে গিয়া “এই নে মা তোর মিথ্যা”—পর্যন্ত বলিয়াই স্তব্ধ হইয়া “এই নে মা তোর সত্য” বলিতে পারেন নাই, তিনি কি ইতর সাধারণের স্নেহে মুগ্ধ হইয়া প্রিয়তম শিষ্যকে লোকচক্ষে বড় করিবার জন্য ঐ সব বলিয়াছেন? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? “অভিমানং সুরাপানং, গৌরবং রৌরবং, প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা”—ইহাই যে তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। এ সম পূজনীয় শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামিজী একদা বলিয়াছিলেন, “স্বামীজীর ঋষির সমাধিতৃষ্ণা, শুকের মায়ারাহিত্য, শঙ্করের জ্ঞান ও নারদের ভক্তি মিলিত হইয়াছিল; তাই ঠাকুর তাঁহার বিভিন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া এক এক এক এক নামে অভিহিত করিতেন।” এই মীমাংসাই আমাদের সর্বাপেক্ষা যুক্তি ও সমীচীন মনে হয়।

১৮৮৬ সাল, জুলাই মাসের শেষ ভাগ। ঠাকুরের গলরোগ ক্রমশঃ ভী ভাব ধারণ করিল। মৃদুস্বরে ফিস্ ফিস্ করিয়া কোনমতে দুই চারিটি কহিতে পারেন মাত্র; আহার জল-বার্লি; তাহাও গিলিতে পারেন না। তথ মহাপুরুষের কৃপার অবধি নাই, সদাসর্বদা বালক-ভক্তগণকে উপদেশ দিতে কখনও বা নরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিতেছেন, “নরেন, আমার এই সব ছেলেরা র তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান্, শক্তিমান্, ওদের রক্ষা করিস্, সৎপথে চা আমি শীগ্গীরই দেহত্যাগ করবো।”

আর একদিন রাত্রে নরেন্দ্রের দিকে সজল নয়নে চাহিয়া বলিলেন, “

আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকীর হলুম।” নরেন্দ্র বুঝিলেন, ঠাকুরের লীলাবসানকাল আসন্নপ্রায়; তিনি বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিরহে কেমন করিয়া জীবনধারণ করিবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন; ভাবাবেগ দমন করিতে অসমর্থ হইয়া নরেন্দ্রনাথ কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

অবশেষে সত্য সত্যই সে ভীষণ দিন উপস্থিত হইল। ১৫ই আগস্ট, রবিবার। মহাপুরুষের শয্যা ঘিরিয়া ভক্ত শিষ্যবৃন্দ শোকভারাক্রান্ত স্তম্ভিত-হৃদয়ে মহাসমাধির প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের ব্যথিত অন্তরে কি ভাবের প্রবাহ খেলিতেছিল তাঁহারাই জানেন।

নরেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিলেন, রামচন্দ্র, গিরিশ প্রমুখ ভক্তগণ যে ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে কথা কি সত্য! এই একটি সমস্যা এখনও তো অমীমাংসিত রহিয়াছে। এখন যদি ঠাকুর স্বয়ং এ সমস্যা ভঞ্জন করিয়া দেন, তবেই বিশ্বাস করিব, নচেৎ নহে। যে শক্তি যুগে যুগে ধর্ম-স্থাপনের জন্য করুণায় অবতীর্ণ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাঁহার সমষ্টিস্বরূপ? সত্যই কি শ্রীরামকৃষ্ণ যুগধর্মপ্রবর্তক অবতার-পুরুষ? অন্তর্যামী ভগবান্ চক্ষু মেলিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “কি নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস হয় নাই? যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ—কিন্তু তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।”

সহসা যদি কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত তাহা হইলেও নরেন্দ্র বোধ হয় অতখানি চমকিয়া উঠিতেন না।

ক্রমে রজনী গভীর হইতে গভীরতর হইল। উপাধান আশ্রয়ে ঠাকুরের কৃশতনুখানি মৃদু কাঁপিতেছে, জীর্ণ-পঞ্জর-পিঞ্জর ছাড়িয়া মহান্ আত্মা মহাকাশে বিলীন হইবার জন্য যেন পাখা মেলিয়াছে। নাসাগ্র-নিবন্ধ দৃষ্টি স্থির, বদন মৃদুহাস্যে অনুরঞ্জিত; এমন সময় তিনবার কালীনাম উচ্চারণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিযোগে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার সেই অন্তিম বাণী নরেন্দ্রের হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া রহিল। তাই আমরা অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকেও জলদনির্ঘোষে বলিতে শুনিয়াছি—

“প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তঃ যস্য প্রকরণে হরিহরব্রহ্মাদি-দেবৈর্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাম্,
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণ-পাত্রমিদং ভোঃ॥”

চতুর্থ অধ্যায়

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

(১৮৮৬—১৮৯২)

* * *

ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।
ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ॥

—বিবেকচূড়াম

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপ্রকট হইবার কয়েকদিন পরই কাশীপুরের বাগানবা ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু নরেন্দ্র দেখিলেন, বালসন্ন্যাসীরা যদি চারিদি বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই মহাপুরুষের আদর্শ প্রচারের প বিঘ্ন ঘটিবে। তাঁহারা শ্রীগুরুর নিকট প্রত্যেকে পৃথকভাবে যে সাধনা, যে আদ লাভ করিয়াছেন, তাহা কেন্দ্রসংহত করিতে হইবে। কতিপয় গৃহী ভক্ত নরেন্দ্রে এই মত সমর্থন করিলেন। এই সকল বৈরাগ্য-প্রবণ তরুণ-সন্ন্যাসী আশ্রয়হী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, ইহা তাঁহাদের মনঃপূত হইল না। গুরুগতপ্রা উদারহৃদয় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বরাহনগরে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া দিলে ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েকদিন পরই, তাঁহার দেহাবশিষ্ট ভস্মাস্থিপূর্ণ তাম্রকল মস্তকে লইয়া, বালসন্ন্যাসিগণ শোকাশ্রু মোচন করিতে করিতে পুণ্যলীলার ব পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত কাশীপুরের বাগানবাটী ত্যাগ করিলেন।

ঠাকুরের সেবা উপলক্ষ করিয়া দীর্ঘকাল একত্র বাস, সাধন-ভজন ইত্যা দ্বারা পরস্পর যে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ছিন্ন হইবার নহে বিশেষ শ্রীগুরুর আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য নরেন্দ্র সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়ো বোধ করিয়া বালকগণকে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। কোন কে গৃহী ভক্ত, তাঁহাদিগকে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দি লাগিলেন। কয়েকজন বালক পরীক্ষা ইত্যাদির জন্য অভিভাবকগণের অনুরো পুনরায় বাটীতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। নরেন্দ্রনাথ তখনও সাংসারি বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কাজেই সর্বদা মঠে থাকি সুযোগ পাইতেন না। তাঁহাদের বাড়িখানি লইয়া যে মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছি তাহার জের তখনও শেষ হয় নাই; কাজেই নরেন্দ্রকে বাধ্য হইয়া বাটীতে থাকি হইত। নরেন্দ্রের অনুপস্থিতিকালে অভিভাবকগণ বালকগণকে তাঁহার দৃষ্টা দেখাইয়া সংসারে ফিরাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র নি সংসারের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, কাজেই ততটা জোরের সহিত প্রতিবাদ করি পারিলেন না।

ইতোমধ্যে এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল! মহাত্মা রামচন্দ্র দ প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত প্রস্তাব করিলেন যে, "তোমরা সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, ক

কোথায় থাকিবে, তাহার স্থিরতা নাই। শ্রীগুরুর দেহাবশেষ আমাদিগকে প্রদান কর, আমরা উহা যথাস্থানে সমাহিত করিয়া তদুপরি মন্দির নির্মাণ করিব।” রামবাবু স্বীয় কাঁকুড়গাছি বাগানবাটীখানি শ্রীগুরুর চরণে উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীভক্তগণ কিছুতেই শ্রীগুরুর দেহাবশেষ গৃহী ভক্তগণের হস্তে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। ফলে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। শশী ও নিরঞ্জন উক্ত তাম্রাধারের রক্ষক ছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই উহা হস্তান্তর করিতে সম্মত হইলেন না। রামবাবুও উহা পাইবার জন্য সদলবলে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আসন্ন ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিয়া বুদ্ধিমান নরেন্দ্র, স্বীয় গুরুভ্রাতাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, “মহাপুরুষগণের দেহাবশেষ লইয়া শিষ্যগণের বিবাদ ধর্মজগতে বহুবার ঘটিয়াছে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদেরও সেই পন্থার অনুসরণ করা কর্তব্য নহে। আমরা সন্ন্যাসী, ঠাকুরের পবিত্রতম জীবন হইতে যে মহানাদর্শ পাইয়াছি, সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবন গঠন করাই আপাততঃ আমাদের প্রধান কর্তব্য এবং উহাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ দেহাবশেষ লইয়া কলহ করিয়াছেন, এরূপ একটা লজ্জাকর ব্যাপারের স্মৃতি ভবিষ্যৎবংশধরগণের জন্য রাখিয়া যাওয়া অতীব অসঙ্গত, অতএব উঁহাদের ইচ্ছামত কার্যই হউক। আমরা যদি তাঁহার আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিবে সমগ্র জগৎ আমাদের পদতলে আসিবে।”

শশী মহারাজ নরেন্দ্রের কথার প্রতিবাদ করিলেন না। দেহাবশিষ্ট ভস্মাস্থির কিয়দংশ রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগ তাম্রকলসীসহ প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে শুভদিন দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী সন্ন্যাসী ভক্তগণ একত্র মিলিত হইয়া কাঁকুড়গাছি “যোগোদ্যানে” পবিত্র তাম্রাধার সমাহিত করিলেন। গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইতেছিল, নরেন্দ্রনাথ তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিলেন।

একটি গুরুতর বিরোধ দূর করিয়া নরেন্দ্রনাথ কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ সাংসারিক অভাব-অভিযোগের জন্য বাধ্য হইয়া বাটীতে থাকিতেন বটে, কিন্তু রাত্রিতে, এমন কি, অধিকাংশ দিবসই বরাহনগর মঠে যাপন করিতে লাগিলেন। কলিকাতাতেও নরেন্দ্রনাথ কেবল সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন না; যে সমস্ত সন্ন্যাসী বালক, অভিভাবকগণের তাড়নায় বাড়িতে গিয়া আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত বাস করিতেছিলেন এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, অবসর পাইলেই তাঁহাদিগের সহিত তিনি দেখা করিতেন এবং সংসারের সহিত সমস্ত প্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার পরামর্শ দিতেন। নরেন্দ্রনাথের “দৌরাত্ম্যে” অভিভাবকগণ চিন্তিত ও অস্থির হইয়া উঠিলেন। ভয়প্রদর্শন, তাড়না ইত্যাদির দ্বারা তাঁহারা নরেন্দ্রনাথকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার উৎসাহে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যুবকগণ পুনরায় একে একে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। নরেন্দ্রও যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত সংসারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বাটীর অধিকার লইয়া তাঁহার জ্ঞাতিগণ যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; উক্ত মোকদ্দমার আপীলেও নরেন্দ্রনাথ জয়ী হইলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে সংসারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া তিনি স্থায়ীভাবে মঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সর্বোপরি সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রাণপণে তরুণ সন্ন্যাসিবৃন্দকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন।

আহার নাই, নিদ্রা নাই, দৈহিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন দিব্যভাবে বিভোর কুমারসন্ন্যাসিগণ, শ্রীগুরুর পবিত্রচরিত্র ও উপদেশের আলোচনা, দর্শনশাস্ত্র, বেদান্ত, পুরাণ, ভাগবত পাঠ, ধ্যান, জপ, কঠোর তপস্যা ইত্যাদিতে রত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর অদর্শনে ব্যথিত ভক্তগণের একমাত্র আশা-ভরসাস্থল!

ধন্য গুরুভক্তির জীবন্ত আদর্শ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী)! যিনি কেবলমাত্র ঠাকুরের পূজা, আরতি এবং গুরুভ্রাতৃগণের সেবাকার্যেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত মঠের মাতা, পিতা, রক্ষক, ভৃত্য, পাচক সবই একাধারে শশী মহারাজ! কখনও ধর্মালোচনায় মগ্ন ভ্রাতৃগণকে ভয় দেখাইয়া আহার করিতে বাধ্য করিতেছেন, কাহাকেও বা জোর করিয়া স্নান করাইতেছেন, আবার ক্রমাগত রাত্রিজাগরণরত ধ্যানস্থ কোন সন্ন্যাসীকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিতেছেন। যদি তিনি ঐরূপভাবে প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য না রাখিতেন, তাহা হইলে যে সমস্ত মহাপুরুষের নিষ্কাম কর্ম, অক্লান্ত জনহিতৈষণা ও অপূর্ব ত্যাগশক্তিতে আজ জগৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেরই কঠোর তপস্যায় শরীরপাত হইয়া যাইত।

প্রমত্ত সিংহের ন্যায় অশান্ত নরেন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র অবসর নাই। ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি জলদমন্দ্রে গুরুভ্রাতাগণকে আহ্বান করিতেন, "হে অমৃতের পুত্রগণ! অমৃত পান করিবার জন্য জাগরিত হও—জাগরিত হও।" ধ্যান, জপাদি সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা সকলে 'দানাদের ঘরে' সমবেত হইতেন। নরেন্দ্রনাথ কোনদিন গীতা, কোনদিন টমাস্, এ, কেম্পিসের ঈশানুসরণ (The Imitation of Christ) পাঠ করিতেন। নরেন্দ্র যখন ভাবোন্মত্ত হইয়া গর্জন করিয়া উঠিতেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

তখন তরুণ সন্ন্যাসিগণের তপোমার্জিত চিত্তদর্পণে সুদূর অতীতের এক মহিমময় দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; তাঁহারা যেন মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেন, সাক্ষাৎ গীতামূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শান্তোজ্জ্বলনেত্রে, প্রশান্ত দৃঢ়তার সহিত কর্তব্য-বিমুখ মোহভ্রান্ত সব্যসাচীকে মেঘগম্ভীরস্বরে, স্বীয় কর্তব্য পথ বাছিয়া লইবার জন্য মৃদু ভর্ৎসনা করিতেছেন। তখন তাঁহাদের মুগ্ধমন বাহ্য-জগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইত, কেবল একটা অগাধ বিশ্বাস, মধুর ভক্তির কোমল স্পর্শ তাঁহাদের উন্মুখ আগ্রহপূর্ণ হৃদয়গুলিকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিত।

কখনও বা নরেন্দ্রনাথ "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" মন্ত্রে গুরু-ভ্রাতাগণকে অনুপ্রাণিত করিয়া আদর্শ কর্মযোগীর মত বিশ্বমানবের কল্যাণযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানকল্পে প্রস্তুত হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন।

কখনও বা গীতা বন্ধ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিতেন, "কি হবে আর গীতা পাঠ করে! ঠাকুর বল্‌তেন, গীতা দশবার বল্লে যা' হয় তাই! গীতা, গীতা, গীতা—ত্যাগী, ত্যাগী, ত্যাগী। চাই ত্যাগ—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ! ত্যাগই গীতার আদর্শ!"

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রবিদ্, সন্দেহবাদী নরেন্দ্রনাথ ক্রমাগত ছয় বৎসরকাল শ্রীগুরুর সহিত তর্ক করিয়াছেন; আজ তাঁহার কি বিচিত্র পরিবর্তন! আজ তিনি সন্ন্যাসী! রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নেতা! শ্রীগুরুর পবিত্র জীবনের ভাস্বর দ্যুতিতে আজ সনাতন ধর্ম তাঁহার চক্ষে মহিমময়, উদার, সার্বভৌমিক! আজ তাঁহার নিকট বেদ অপৌরুষেয় আপ্তবাক্য, নিত্যবর্তমান সত্য! উপনিষদের কল্যাণপ্রদ সত্য-

সমূহের গূঢ়ার্থ, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আলোকে আজ তাঁহার নিকট সহজবোধ্য। উপনিষদ্‌ বা বেদান্ত বুঝিবার জন্য তিনি কোন বিশেষ ভাষ্যকারকে অনুসরণ করেন নাই, করিবার প্রয়োজনও হয় নাই। তিনি স্বাধীনভাবে শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্বামীজী উত্তরকালে বলিয়াছিলেন, "বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সাহচর্যের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, তেমনি অপরদিকে ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন; যিনি একদিকে যেমন পরম ভক্ত, অপরদিকে তেমনি পরমজ্ঞানী ছিলেম। ইঁহার শিক্ষাফলেই আমি উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্র কেবল অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টতররূপে বুঝিতে শিখিয়াছি।"

একদিন বেলুড়মঠে, প্রসঙ্গক্রমে এই কালের কথা বলিতে গিয়া পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আজ যে এই এত বড় মঠ দেখছো, কোথায় এর আরম্ভ! ঠাকুর যখন অপ্রকট হ'লেন, লাটু আর কয়টি ছেলে কোথায় দাঁড়ায় তার স্থান নেই, শেষে সুরেশ মিত্তির* বরাহনগরে একটি বাড়ি ঠিক করে দিলেন। নীচের একতলাটা অব্যবহার্য, উপরের তলায় তিনটে ঘর। ঠাকুরকে কোন-দিন বা দু'টো নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হ'ত। কি আর জুটবে? একবেলা ভাত কোনদিন জুটতো, কোনদিন জুটতো না। থালাবাসন তো কিছু নেই, বাড়ির সংলগ্ন বাগানে লাউগাছ, কলাগাছ ঢের ছিল। দুটো লাউপাতা কি একখানা কলাপাতা কাট্‌তে গেলে উড়েমালী যা' তা' গাল দিত। শেষে মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হ'ত। তেলাকুচোর পাতা সিদ্ধ আর ভাত, তা' আবার মানপাতায় ঢালা। কিছু খেলেই গলা কুট্‌কুট্‌ করতো। এত যে কষ্ট, ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ভক্তের সংখ্যা দু'টি একটি করে বাড়তে লাগলো। উৎসাহ কত? পূজা, ধ্যান, জপ সর্বক্ষণ চলছে। হয়তো কীর্তন লেগে গেল। ঘরের দোর বন্ধ করে ভিতরে জমাট কীর্তন। এমন জমে গেছে যে, বাইরে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা কীর্তন ছেড়ে দিয়েছি, বাইরে লোক তখনও দাঁড়িয়ে, চীৎকার করে বলছে, ছাড়বেন না, ছাড়বেন না, চমৎকার শুনছি, ছাড়বেন না।"

গুরুভাইদের উপদেশ দান, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির ভার শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রের স্কন্ধেই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারও বিরাম নাই, আলস্য নাই, নানাপ্রকারে বালকগণকে উৎসাহিত করিতেছেন। "জয় রামকৃষ্ণ! মানুষ গড়ে তোলাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হোক্‌! মনে রেখো, এই আমাদের একমাত্র সাধনা। বৃথা বিদ্যার গর্ব পরিত্যাগ কর। উৎকৃষ্টতম মতবাদ অথবা সূক্ষ্মযুক্তিসমন্বিত তর্কের আবশ্যক কি? ঈশ্বরানুভূতিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে এ আদর্শ দেখিয়ে গেছেন; আমরা তাঁর আদর্শজীবনই অনুকরণ করবো। একমাত্র ভগবল্লাভই আমাদের চরম লক্ষ্য।" নরেন্দ্র-গতপ্রাণ নবীন সন্ন্যাসিগণও তাঁহার প্রত্যেকটি বাক্য শ্রীগুরুর আদেশ-বাণীর মতই শ্রদ্ধাসহকারে পালন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র সন্ন্যাসিগণের দৈহিক অভাব পূরণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বিষয়কর্মে ব্যস্ত থাকায় তিনি স্বয়ং গিয়া মঠের অভাবাদি স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না। সন্ন্যাসিগণ তণ্ডুলাভাবে অনাহারী থাকিলেও সুরেনবাবুকে খবর দিতেন না। ভগবানের ইচ্ছায় যেদিন যাহা অযাচিতভাবে উপস্থিত হইত, তাহাই তৃপ্তির সহিত ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। কিয়দ্দিন পরে সুরেনবাবু

---

* বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেশ বলিয়া সম্বোধন করিতেন; সেহেতু তিনি রামকৃষ্ণ ভক্ত-সঙ্ঘে ঐ নামেই সুপরিচিত।

ঐ বিষয় জানিতে পারিয়া চিন্তিত হইলেন। অবশেষে গোপাল নামক জনৈক রামকৃষ্ণভক্তের মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়া সুরেনবাবু তাঁহাকে মঠে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার উপদেশক্রমে গোপাল যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংবাদ দিতেন। সুরেন সর্বদাই বলিতেন, “ইঁহাদের সর্ববিধ অভাব দূর করা আমার অবশ্যকর্তব্য কর্ম, কারণ ইঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান, আমার ভাই।” গুরুভ্রাতৃপ্রীতির কি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত!

মধ্যে মধ্যে গৃহী ভক্তবৃন্দ মঠে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ ও ধর্মালোচনা করিতেন। অনেক অপরিচিত ব্যক্তিও কৌতূহলবশে, কেহ বা তর্ক করিতে, কেহ বা পরীক্ষা করিতে বরাহনগর মঠে আগমন করিতেন। নরেন্দ্রের যুক্তিপূর্ণ উত্তরের সম্মুখে বড় কেহ দাঁড়াইতে পারিতেন না। সাধারণের অশিষ্ট সমালোচনায় উত্তেজিত না হইয়া নরেন্দ্রনাথ হাস্যসহকারে গুরুভ্রাতৃগণকে বলিতেন, “ওরে, ঠাকুর বল্‌তেন, লোক্ না পোক্। তার মানে কি জানিস্? কাম-কাঞ্চনের ক্রীতদাসেরা কি বল্‌ছে না বল্‌ছে, তাই শুনে সন্ন্যাসীদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়।”

এই সমস্ত বালসন্ন্যাসিগণের অভিভাবকগণ প্রায়ই তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য মঠে উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদিগকে বাধা দিবার জন্য নরেন্দ্রনাথকেই সম্মুখীন হইতে হইত। কেহ কেহ গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য তর্কজাল বিস্তার করিতেন। নরেন্দ্র দৃপ্তসিংহের মত গ্রীবা উন্নত করিয়া উত্তর দিতেন, “কি, যদি আমরা ঈশ্বর লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে কি ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া জীবনযাপন করিব? সন্ন্যাসের মহিমময় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইব? অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, ত্যাগের মহান্ আদর্শ আমরা প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিব। দেহপাত হইয়া যাউক, সর্বস্ব যাউক, উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না। আমরা রামকৃষ্ণতনয় নহি?”

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস। ঠাকুরের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম ঘোষ) জননীর আহ্বানে সন্ন্যাসীরা তাঁহার পল্লীভবন আঁটপুরে (হুগলী) সমবেত হইয়াছেন। রাত্রিতে বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে বিরাট ধুনী জ্বালাইয়া নরেন্দ্র গুরুভাইদের সহিত ধ্যানে বসিয়াছেন। নিস্তব্ধ পল্লী—ঊর্ধ্বে নির্মল আকাশে গ্রহতারা ঝলমল করিতেছে। চারিদিকের গাঢ় অন্ধকারে ধুনীর অগ্নিশিখায় কেবল সন্ন্যাসীদের তপোনির্মল ঋজুদেহ, প্রশান্ত বদন, নির্মল ললাট উদ্ভাসিত। এমন সময় নরেন্দ্র চক্ষু মেলিয়া যীশুখৃষ্টের জীবন আলোচনা করিতে লাগিলেন। জন্ম হইতে মৃত্যু, সেই অপূর্ব আত্মদান ও পুনরুত্থানের কাহিনী জীবন্ত ভাষায় বর্ণনা করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উঠিল। যীশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ! যীশুর দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্য সাধু পল কি জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া নবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। উৎসাহে ও উন্মাদনায় অধীর হইয়া নরেন্দ্র তাঁহাদের জীবনের পথ যেন সেই আলোকে দেখিতে পাইলেন। তিনি এবং তাঁহার বাক্যে অনুপ্রাণিত গুরুভ্রাতাগণ যেন আরেক বার অনুভব করিলেন, যখন ভারতবর্ষের জনমণ্ডলী আদর্শকে বিভক্ত, খণ্ডিত ও আংশিকরূপে দর্শন করিয়া পরস্পরের সহিত বিবাদরত, যখন বৈষম্য ও ভেদের মধ্যে আমরা কোন সামঞ্জস্য খুঁজিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিতেছিলাম না, যখন নষ্টবুদ্ধি দ্বারা বিকৃত, ভ্রষ্টচরিত্রের দ্বারা কলঙ্কিত হইয়া সমস্ত উচ্চাদর্শ কর্মহীন তামসিক জড়ত্বের মধ্যে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইতেছিল সেই সঙ্কটের দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করিয়া, সমস্ত বিচিত্র ও বিশিষ্ট সাধনাগুলিকে এক সমন্বয়ের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান দিয়া, আদর্শের পরিপূর্ণ রূপ স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিলেন; এই প্রাচীনা পৃথিবী

ধর্মের নামে, জাতির নামে, দেশপ্রেমের নামে নরশোণিতে রুধিরাক্ত হইয়া যাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেই বহুপ্রার্থিত, বহুঈপ্সিত মহাসমন্বয়ের বার্তা প্রচার করিব আমরা, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকাবাহী সর্বত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী! মানব-কল্যাণব্রতে নিজেদের একান্তভাবে উৎসর্গ করিবার পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নিজেদের কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। প্রথমে যীশুখৃষ্টের প্রসঙ্গ এবং প্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের গভীর আত্মবিশ্বাসের কথা সেই রাত্রিতে যখন নরেন্দ্রাদি ভক্তমণ্ডলী আলোচনা করিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহারা জানিতেন না যে, উহা যীশুখৃষ্টের জন্মরাত্রি। পরে তাঁহারা উহা জানিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আঁটপুর হইতে সন্ন্যাসিগণ তারকেশ্বরে গিয়া শিব আরাধনান্তে বরাহনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুদিন বরাহনগর মঠে যাপন করিবার পর সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ে তীর্থ-ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল। দুই একজন বাধাপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্কায় নরেন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারেই মঠবাটী পরিত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। একদিন নরেন্দ্রনাথকে কোন বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল; তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুনিলেন যে, সাংসারিক অভিজ্ঞতাহীন বালক সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) গোপনে মঠবাটী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বালক না জানি কি বিপদে পড়িবে, এই আশঙ্কায় তিনি আকুল হইলেন এবং রাখালকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেন তুমি তাহাকে যাইতে দিলে? দেখ রাজা! আমি কি ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াছি। এক সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এখানে আর এক নূতন মায়ার সংসার পাতিয়াছি। এই ছেলেটির জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।" এমন সময় একজন তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন, সারদা যাইবার সময় উহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে; কে জানে কখন মনের গতি পরিবর্তন হইবে! আমি মাঝে মাঝে পিতামাতা, গৃহ, পরিজন বিষয়ক স্বপ্ন দেখি। আমি স্বপ্নে মূর্তিমতী মায়ার দ্বারা প্রলোভিত হইতেছি। আমি যথেষ্ট সহ্য করিয়াছি; এমন কি, প্রবল আকর্ষণে আমাকে দুইবার বাটীতে গিয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা করিতে হইয়াছিল। অতএব এখানে থাকা আর কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে; মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য দূরদেশে যাওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।"

পত্র পাঠ করিয়া স্বামিজীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। রাখাল বলিলেন, "এখন বুঝিতেছি, কেন সারদা মঠ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।" তিনি চিন্তিতভাবে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমিও উহা অনুভব করিতেছি।"

নরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিলেন, এক্ষণে দেখিতেছি, সকলেই তীর্থভ্রমণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। ইহাতে এই মঠ ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে—যাউক। আমি কে যে, ইঁহাদিগকে আমার আদেশ অনুসারে চলিতে হইবে! না, এ মধুর মায়ার বন্ধন আমাকে ছিন্ন করিতে হইবে। সারদার পত্রখানি তাঁহাকে অতিমাত্রায় ভাবাইয়া তুলিল। সকলে একত্রে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে মায়ার বন্ধনে জড়াইয়া পড়িতেছেন, ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া তিনিও মঠবাটী পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবশেষে একদিন গুরুভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়া, শ্রীগুরুর মহতী ইচ্ছায় পরিচালিত নরেন্দ্রনাথ পরিব্রাজক বেশে মঠবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

এই স্থলে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। নরেন্দ্র ১৮৮৮'র প্রথম ভাগে তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা লইয়া বরাহনগর মঠ হইতে বহির্গত হন।

ইতোপূর্বে দুই বৎসর কাল তিনি আঁটপুর ব্যতীত কয়েকবার বৈদ্যনাথ ও শিমুলতলায় গিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-কাহিনীর অনেক কথাই জানিবার উপায় নাই। কেননা, তিনি কোন রোজ-নামচা লেখেন নাই। পরে তাঁহার প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য শুনিয়া অথবা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এমন ব্যক্তিদের বর্ণনা শুনিয়া যথাসম্ভব গুছাইয়া পরবর্তী বিবরণগুলি লিখিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভ্রমপ্রমাদ থাকা অনিবার্য। প্রত্যেক পরবর্তী সংস্করণে এই সকল ভ্রমসংশোধনের আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আর একটি কথা—অতঃপর আমরা আর নরেন্দ্রনাথ না বলিয়া আচার্যদেবকে স্বামিজী অথবা বিবেকানন্দ এই নামে উল্লেখ করিব।

সূর্য উদিত হইলে কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে, প্রভাত হইয়াছে। সূর্যরশ্মির ক্রমসঞ্চারণ কোন ঘোষণাকারীর অপেক্ষা রাখে না, তদ্রূপ স্বামিজীও যেখানে যাইতেন, তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণ দীর্ঘ তপোজ্জ্বল তনুখানি সকলেরই মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিত। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তিনি হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কাশীধামে উপনীত হইলেন।

কাশীধামে তিনি দ্বারকাদাসের আশ্রমে থাকিতেন। ভিক্ষান্নে উদর পূরণ, দেবস্থানসমূহ দর্শন, শাস্ত্রচর্চা, ধ্যান, জপ, সাধুসঙ্গ ইত্যাদি তাঁহার নিত্যকর্ম হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাকালে যখন তিনি ভাগীরথী-তীরে প্রস্তর-সোপানোপরি বসিয়া সায়ংকালীন উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতেন তখন অগণিত মন্দির হইতে সন্ধ্যারতির প্রাণমাতানো শঙ্খঘণ্টার মধুর নিনাদ উত্থিত হইয়া তাঁহাকে ভাবে বিভোর করিয়া তুলিত; সেই ভাগীরথী তীর, সেই দক্ষিণেশ্বর, সেই অদ্ভুত প্রেমিক পুরুষ——একে একে তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত। সে আনন্দের মেলা ভাঙিয়া গিয়াছে! আজ আর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের শিশু নরেন্দ্রনাথ নহেন—আজ তিনি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ! ভবিষ্যৎ জগৎ নব-যুগাদর্শ পাইবার আশায় তাঁহার প্রতীক্ষ করিতেছে—কি গুরুভার দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে! ভাবুক ভক্তকবি বিবেকানন্দের হৃদয়দুর্গে অবরুদ্ধ ভুবন-পাবন যুগধর্ম, ঈশানের জটাজূট মধ্যস্থিত অলকানন্দার মতই নির্গমপথ না পাইয়া গভীর আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। বিচলিত হৃদয়ে বিবেকানন্দ এ কর্মভার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরুচরণে প্রার্থনা করিতেন।

একদিন জনৈক গুণমুগ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাকে পণ্ডিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। অদ্ভুত ধীশক্তিশালী তরুণ সন্ন্যাসীর সহিত ধর্ম, সমাজনীতি ও ভারতের উন্নতিবিষয়ক আলোচনা করিয়া ভূদেববাবু এতাদৃশ মুগ্ধ হন যে, উক্ত ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "আমি আশ্চর্য হইতেছি যে এই তরুণ যুবক কি করিয়া এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। ইনি ভবিষ্যতে একজন মহদ্ব্যক্তি হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

বারাণসীর বিখ্যাত সাধু শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের দ্বিতীয় বিগ্রহতুল্য শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দর্শনলাভ করিয়া স্বামিজী কৃতার্থ হইলেন। ইঁহার ত্যাগ ও তপস্যার বিষয় স্বামিজী বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার দর্শনে ভক্তি-বিনম্রচিত্তে পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দজীর গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া স্বামিজী একদিন তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি তখন শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন; স্বামিজী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। বিবেকানন্দের

মনোহর অঙ্গকান্তি প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ক্রমে সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে স্বামিজীকে উপদেশ দিতে দিতে ভাস্করানন্দ বলিয়া উঠিলেন, “কেহই সম্পূর্ণরূপে ‘কামিনী-কাঞ্চন’ ত্যাগ করিতে পারে না।” স্বামিজী বিনীতভাবে বলিলেন, “বলেন কি মহাশয়, এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কাম-কাঞ্চনের বন্ধন হইতে বিমুক্ত, কারণ উহাই সন্ন্যাসজীবনের প্রথম সাধনা এবং আমি অন্ততঃ এমন একজন ব্যক্তি দেখিয়াছি, যিনি কাম-কাঞ্চন-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।” তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিলেন। ভাস্করানন্দ হাসিয়া বলিলেন, “তুমি বালক মাত্র, এ বয়সে ওসব বুঝিতে পারিবে না।” ক্রমে স্বীয় গুরুর পবিত্রতম চরিত্র সমালোচিত হইতে দেখিয়া স্বামিজী নির্ভীক দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার তেজোগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ও স্বয়ং ভাস্করানন্দ বিস্মিত হইলেন। যাঁহার চরণতলে রাজা, মহারাজা, ধনী, পণ্ডিত, শত শত ব্যক্তি মস্তক অবনমিত করিয়া কৃতার্থ, যাঁহার অলৌকিক পাণ্ডিত্য অপ্রতিহত গৌরবে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিত, সেই ভাস্করানন্দের প্রতিপক্ষ হইয়া তর্কে অগ্রসর হওয়া কম সাহসের বিষয় নহে! উদারহৃদয় সন্ন্যাসী, স্বামিজীর বাক্যে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার সম্মুখেই স্বীয় শিষ্য ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ইহার কণ্ঠে সরস্বতী আরূঢ় হইয়াছেন। ইহার হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়াছে।” গুরুনিন্দায় ব্যথিতহৃদয় বিবেকানন্দ সত্বর উক্তস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

কিয়দ্দিবস কাশীধামে বাস করিয়া স্বামিজী বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। বারাণসীধাম, হিন্দু-ভারতের হৃদ্‌পিণ্ড! এখানে মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দুস্থানী বিভিন্ন আচার ও বিভিন্ন ভাষা সত্ত্বেও, একই ভাবের ভাবুক হইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে মিলিত হইয়াছে। স্বামিজী পরমার্থিকতাভ্রষ্ট বিচারহীন বাহ্য আচারপরায়ণ এই মানবসমষ্টির মধ্যেও ভারতবর্ষের যুগ যুগ সঞ্চিত ঐক্যের মহিমাকে উপলব্ধি করিলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, বরাহনগর মঠে ফিরিয়া তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে প্রচারকার্যের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষকে দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, এই লক্ষ কোটি নরনারীর জীবনযাত্রার কত বিভিন্ন স্তরে কি বেদনা, কি অভাব অহোরাত্র অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা লইয়া রোদন করিতেছে তাহার ভাষা বুঝিতে হইবে, ইহাদের কল্যাণব্রতের সাধনা শুধু স্বার্থত্যাগের কথা নহে, সর্বত্যাগের কথা। এমন কি স্বীয় মুক্তির কামনা পর্যন্ত বিস্মৃত হইতে হইবে। তেজস্বী বিবেকানন্দের প্রশস্ত হৃদয়ের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি পুনরায় তাঁহাকে আকর্ষণ করিল, তিনি মঠবাটী ত্যাগ করিয়া পুনরায় কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। কাশীধামে, অখণ্ডানন্দজী স্বামিজীকে প্রমদাদাস মিত্রের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। এই ভদ্রলোক সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য এবং বেদান্তদর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রথম পরিচয়েই স্বামিজী প্রমদাদাসের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে শাস্ত্রার্থ মীমাংসায় কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট পত্রযোগে উপদেশ প্রার্থনা করিতেন। কাশী হইতে তাঁহার তীর্থযাত্রা সুরু হইল। ১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে দণ্ডকমণ্ডলুহস্ত সন্ন্যাসী উত্তর ভারতের নানাস্থানের মধ্য দিয়া সরযূ নদীতীরে অযোধ্যায় উপনীত হইলেন।

অযোধ্যা—যাহার প্রতি ধূলিকণার সহিত সূর্যবংশীয় পরাক্রান্ত নরপালগণের গৌরবস্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকির কল্পনানন্দনের

পারিজাত-কুসুম, শ্রীরামচন্দ্র, আদর্শ রাজা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ পতি, আদর্শ ভ্রাতারূপে এই পুণ্যভূমিতেই পরিপূর্ণ মহিমায় প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তেজস্ব ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের পৌরোহিত্য, ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ প্রাপ্তি, ব্রহ্মজ্ঞানী মিথিলাধিপতি জনক, সুদূর অতীতের কীর্তিসমুজ্জ্বল সহ কাহিনী স্বামিজীর স্মৃতিপথে উদিত হইল। সীতারামের পুণ্য লীলাভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার বাল্যস্মৃতি উছলিয়া উঠিল। সেই রামায়ণপ্রীতি-সীতারামের মূর্তির সম্মুখে তন্ময়চিত্তে ধ্যান, বীরভক্ত হনুমানের প্রতি গভী শ্রদ্ধা, একে একে তাঁহার মানসপটে উদিত হইয়া তাঁহাকে ভাবানন্দে বিভোর করি তুলিল। কিয়দ্দিবস অযোধ্যায় রামাইত সন্ন্যাসিগণের সহিত শ্রীশ্রীরামনাম কীর্তনে অতিবাহিত করিয়া স্বামিজী লক্ষ্ণৌ ও আগ্রার পথে শ্রীবৃন্দাবনধাম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

আগ্রায় ভুবনমোহিনী তাজমহল. এবং বিশাল মোগলদুর্গ দর্শন করি স্বামিজী আগ্রা হইতে মাত্র ৩০ মাইল দূরবর্তী বৃন্দবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন স্বামিজী বৃন্দাবনের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন এমন সময় দেখিলেন পথের পার্শ্বে এক ব্যক্তি নিশ্চিন্তমনে তামাক সেবন করিতেছে। কৈশোর উত্তী না হইতেই তিনি ধূমপানে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন; পথশ্রমে ক্লান্ত স্বামিজী এক টান তামাক খাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া কলিকাটি চাহিলেন। লোকটি সন্ত্র সঙ্কুচিত হইয়া বলিল. 'মহারাজ. ম'য় ভাঙ্গী হ্যায়।' মেথর—আজন্মের সংস্কারব স্বামিজীর হস্ত অজ্ঞাতসারেই সরিয়া আসিল, তিনি পুনরায় পথ চলি লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল। তাইতো, আ না জাতিকুলমান বিসর্জন দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি; তবে মেথর শুনিয়া আ প্রসুপ্ত জাতি-অভিমান কেন জাগিল, কেন মেথরস্পৃষ্ট কলিকাটি গ্রহণ করি বিমুখ হইলাম! অভ্যাসগত সংস্কারের কি প্রভাব! স্বামিজী ফিরিলেন এ দ্রুতপদে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মধুর বচনে তাহার দ্বারা এক কলি তামাক সাজাইয়া আনন্দে ধূমপান করিলেন। এই ঘটনাটি তিনি জীবনে কখ বিস্মৃত হন নাই। পরবর্তীকালে স্বীয় শিষ্যদিগকে আত্মাভিমানহীন সর্বমা সমবুদ্ধি রক্ষা করার কঠিন আদর্শ কত সতর্ক হইয়া রক্ষা করিতে হয়, ত বুঝাইতে এই গল্পটি বলিতেন।

বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি লালাবাবুর কুঞ্জে অতিথি হইলেন। বৃন্দাবনে তাঁহ মন টিকিল না। ১২ই আগস্ট এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন, "সহরে মন ক্ষু হইয়া আছে, শুনিয়াছি রাধাকুণ্ডাদি স্থান মনোরম।" সত্যই শ্রীবৃন্দাবন অপে নন্দীগ্রাম, বর্ষণা, গোকুল, রাধাকুণ্ডাদি স্থান মনোরম। পল্লীবাসিরা সরল, উদা পল্লীশ্রী মনোরম। শ্যামল প্রান্তরে পরিপুষ্ট মসৃণদেহ ধেনুগণের নির্ভয় বিচ শ্রীকৃষ্ণলীলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাধাকুণ্ডে আসিয়া স্বামিজীর এক অপূ অভিজ্ঞতা হইল।

একদিন পরিধানের একমাত্র সম্বল কৌপীনখানি ধৌত করিয়া তীরপ্রা রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া স্বামিজী স্নান করিতে পবিত্রসলিলা রাধাকুণ্ডে অবত করিলেন। স্নানের পর স্বামিজী চাহিয়া দেখেন কৌপীনখানি নাই। বিস স্বামিজী দেখিতে পাইলেন, এক বানর কৌপীনখানি লইয়া তীরস্থিত এক বৃ শাখায় বসিয়া আছে। সলিলমধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি উক্ত বানরকে অনেক অনু করিলেন, কিন্তু বানর মুখভঙ্গী করিয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিল মাত্র, কৌপ ফিরাইয়া দিল না। সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় তিনি কিরূপ পরিভ্রমণ করি

ভাবিয়া বালকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহা কি শ্রীশ্রীরাধারাণীর ইচ্ছা? তাঁহার ব্যথিতহৃদয়ে অভিমান জাগিয়া উঠিল; সলিল হইতে উত্থিত হইয়া স্বামিজী নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন; মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যতক্ষণ না পরিধেয় বস্ত্র পাইবেন, ততক্ষণ অরণ্যমধ্যে প্রায়োপবেশন করিয়া রহিবেন। এমন সময় তিনি দূর হইতে আহূত হইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখেন, একব্যক্তি দ্রুতপদে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আগমন করিতেছেন। স্বামিজী তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনে চলিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই তিনি ছুটিয়া আসিয়া স্বামিজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বিস্ময়ে চাহিয়া দেখেন, নবাগতের হস্তে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও একখানি নূতন গৈরিকবসন। তাঁহার অনুরোধে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বামিজী উক্ত উপহার দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিবামাত্র তিনি ঘন বনান্তরালে অদৃশ্য হইলেন। সম্ভবতঃ ঐ ব্যক্তি স্বামিজীর দুর্দশা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি রাধাকুণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অপহৃত কৌপীনখানি পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। এই ঘটনায় সমস্ত যুক্তি-বিচার ছাপাইয়া একটা দিব্য প্রেমানন্দে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল; তন্ময়চিত্তে তিনি রাধাকুণ্ড-তীরে কৃষ্ণগুণগানে রত হইলেন।

তখনও প্রভাত হয় নাই। পূর্বাকাশে ঊষার রক্তিমচ্ছটা ঈষৎ বিকশিত—দীর্ঘপথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর স্বামিজী পথিপার্শ্বে এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। হাতরাস রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত কার্যসমাপনান্তে বাসায় ফিরিতেছেন। এমন সময় স্বামিজীর প্রভাতারুণ-রাগরঞ্জিত শ্রীঅংগের দিব্যকান্তিচ্ছটা নেত্রপথে পড়িবামাত্র তাঁহার মুগ্ধদৃষ্টি অজ্ঞাতসারে নিষ্পলক হইল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পদধূলি গ্রহণান্তর শরৎচন্দ্র বিনয়-নম্রবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত দেখিতেছি। দয়া করিয়া আমার গৃহে চলুন, সেইখানেই বিশ্রাম করিবেন।" মৃদুহাস্যে করুণা-স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া স্বামিজী ভূম্যাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং নীরবে শরৎচন্দ্রের পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।

শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ বলেন যে, ভাগ্যবান সাধকের দীক্ষার কাল সমুপস্থিত হইলে তাঁহাকে আর গুরু অন্বেষণে বহির্গত হইতে হয় না; গুরুই শিষ্যকে কৃতার্থ করিবার জন্য তৎসকাশে উপস্থিত হন। আধ্যাত্মিক রাজ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্বামিজীর সর্বপ্রথম শিষ্য পুণ্যচরিত শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দের জীবনেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

প্রথম দর্শনেই শরৎচন্দ্র স্বামিজীর শ্রীপাদপদ্মে মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। স্বামিজী আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইলে তিনি দুই এক কথার পর বলিলেন, "বহুদিন হইতে আত্মজ্ঞান লাভের স্পৃহা বলবতী হইয়াছে; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজিয়া পাইতেছি না। যখন দয়া করিয়া আপনি দর্শন দিয়াছেন, তখন আমাকে কৃপা করিয়া আত্মজ্ঞান প্রদান করুন।"

স্বামিজী প্রত্যক্ষভাবে তাহার কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে একটি গান গাহিতে লাগিলেন। তাহার ভাবার্থ এই, "যদি তুমি আমার ভালবাসা লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার সুন্দর মুখখানিতে ছাই মাখিয়া আইস; পারিবে কি?"

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "স্বামিজী! আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য; যাহা আদেশ করিবেন, নির্বিচারে তাহাই পালন করিব।" তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে মুমুক্ষু যুবকের বৈরাগ্যোদ্দীপ্ত মুখখানির প্রতি চাহিলেন, কি বলিবেন

ভাবিয়া পাইলেন না।

একদিন স্বামিজীকে একান্তে গভীর চিন্তামগ্ন দেখিয়া শরৎচন্দ্র জিজ্ঞা করিলেন, "স্বামিজী! আপনাকে আজ বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" দীর্ঘশ্বাস ত্যা করিয়া স্বামিজী উত্তর করলেন, "বৎস! মহৎ কার্য সম্পাদন করিবার ভার আমা স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে; কিন্তু আমি ক্ষুদ্রশক্তি, আমার দ্বারা উহা সম্ভবপ নহে ভাবিয়া হতাশ হইয়াছি। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন স্পষ্টতরর বুঝিতেছি, সনাতন ধর্মের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করাই তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম হায়! ধর্মের কি শোচনীয় অধঃপতন! আর তাহার সঙ্গে অনশনক্লিষ্ট ভারতবাসী কি মর্মভেদী দুরবস্থা! ভারতকে পুনরায় ধর্মের বৈদ্যুতিক শক্তিতে সঞ্জীবি করিতে হইবে, তাহার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে; কি উপায় কি, উপায় কি?"—বলিতে বলিতে তাঁহার জ্যোতির্ময় বিশাল নেত্র ব্যথিত করুণায় সমধিক প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র গভীর শ্রদ্ধার সহি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আমি কি আপনার কোন কাজে লাগিতে পারি না?"

সন্ন্যাসী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এই মহৎকা আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তুমি কি ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু সম্বল করিয়া প দাঁড়াইতে প্রস্তুত আছ? তুমি কি প্রকৃত ত্যাগীর জীবনের দুঃসহ কঠোরতা স করিতে পারিবে?"

দৃঢ়তার সহিত শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "অবশ্য আপনার কৃ হইলে আমি নিশ্চয়ই সহ্য করিতে পারিব।"

* * *

কিছুদিন গুপ্ত-পরিবারের মধ্যে যাপন করিয়া স্বামিজী হাতরাস ত্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদিন শরৎচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ব সন্ন্যাসীর পক্ষে একস্থানে অধিক দিন থাকা অন্যায়, বিশেষ তোমাদের প্র আমি একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছি, অতএব আমার সত্বর এস্থান পরি করাই শ্রেয়স্কর।"

স্বামিজীর পবিত্র সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় শরৎচন্দ্র শোক হৃদয়ে বলিলেন, "স্বামিজী! আমাকে আপনার শিষ্য করিয়া সঙ্গে লউ স্বামিজী উত্তর করিলেন, "তুমি কি মনে কর যে, আমার শিষ্য হইলেই তো আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত হইবে? কাহারও গুরু হইবার যোগ্যতা আমাতে আ কিনা সন্দেহ। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ম করিয়া যাও, তি কল্যাণ বিধান করিবেন। আমি আপাততঃ শ্রীশ্রীবদরী-কেদার দর্শনে যাত্রা ক সংকল্প করিয়াছি, তুমি দুঃখিত হইও না, প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দাও, আ পুনরায় হাতরাসে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিব।"

শরৎচন্দ্র স্তোকবাক্যে ভুলিবার পাত্র নহেন। তিনি উত্তর করিলেন, "আপ যাহাই কেন বলুন না, আপনি যেখানে যাইবেন, আমিও আপনার অনু করিব। আমাকে দীক্ষা প্রদান করিতেই হইবে।"

স্বামিজী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সত্য সত্যই কি তুমি আ অনুগমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?" শরৎচন্দ্র সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলে স্বামিজী গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "উত্তম; এই আমার ভিক্ষার ঝুলি ল তোমার স্টেশনের কুলিগণের কুটীর হইতে ভিক্ষা করিয়া আইস।"

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন চিত্তে ঝুলিটি স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষার্থে বহি হইলেন। ভিক্ষালব্ধ বস্তুসহ শরৎচন্দ্রকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া স্বামিজী আনন্দো

তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। অতঃপর শরৎচন্দ্র পিতা-মাতার সম্মতি গ্রহণপূর্বক স্বামিজীর সহিত হাতরাস পরিত্যাগ করিয়া হৃষীকেশে উপনীত হইলেন।

নবদীক্ষিত শিষ্য স্বামী সদানন্দ, গুরু-নির্দিষ্ট পন্থাবলম্বনে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইলেন; কিন্তু দৈহিক কঠোরতায় অনভ্যস্ত নবীন সন্ন্যাসী কিছুদিন পরেই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। স্বামিজী বাধ্য হইয়া শিষ্যসহ হাতরাসে ফিরিয়া আসিলেন। হাতরাসে আসিয়া স্বামিজীও পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় উৎসাহী যুবকবৃন্দ ও গুপ্ত-পরিবারের যত্ন ও চেষ্টায় স্বল্পকাল মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়া বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। সদানন্দজীও কিছুদিন পরেই অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া নবেম্বর মাসে মঠে আগমন করিলেন এবং অপরাপর সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক স্নেহে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে গৃহীত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ বহুদিন পর তাঁহাদের প্রিয়তম "নরেন্দ্র"কে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। স্বামিজী পুনরায় প্রবল উৎসাহের সহিত সন্ন্যাসিবৃন্দকে শিক্ষাদান ও আগতপ্রায় ভবিষ্যৎ কর্মের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন। যে অ-মানব প্রতিভা, অসীম অনুকম্পা ও উদার হৃদয় উত্তরকালে সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা-মুগ্ধ-বিস্মিত-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দ বহুপূর্বেই তাহা অনুভব করিয়াছিলেন।

একদিকে বেদান্তদর্শন, ধ্যান ধারণা যোগ সমাধি, ইহলোকবিমুখ সন্ন্যাসের আদর্শ, অন্যদিকে ভারতের বিশাল জনসমষ্টির দুর্গতি মোচনের সেবাব্রত; এই দুই আপাতঃ বিপরীত ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান যদি না করিতে পারিলাম, তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার কি অধিকার আমাদের আছে? সাধনভজন শাস্ত্রপাঠের মধ্যে এই প্রশ্ন স্বামিজী গুরু-ভ্রাতাদের সহিত আলোচনা করিতেন। বহু বিকৃতি, প্রাণহীন অনুষ্ঠান সত্ত্বেও ভারতে ধর্ম আছে; কিন্তু সামাজিক ও সাংসারিক দুর্গতিই ভারতবাসীর বর্তমান দুর্দশার কারণ।

বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পল্লীনগর পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া এবং তীর্থস্থানগুলিতে তিনি বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, ধর্মের প্রতি অনুরাগের অভাব নাই; কিন্তু সমাজ-জীবনে স্বাভাবিক গতিশীলতা নাই। ইহা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর সমস্যা নহে—ভারতের বিশাল জনসমষ্টির সমস্যা। পূর্বগামী সংস্কারকগণের মত তিনি জাতীয় সমস্যাকে, তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকে দেখিবার সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও জীবন বিশ্লেষণ করিয়া তিনি গুরুভ্রাতাদের বলিতেন, দোষ ধর্মের নহে, ধর্মের নামে ধর্ম-ব্যবসায়ী গুরু-পুরোহিত-পান্ডাদের সমাজের উপর আধিপত্যই সমাজ-জীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। বহু শতাব্দীর প্রথা-নিষেধের অন্ধ অনুবর্তনায়, সমাজের একদিকে বংশ ও রক্তের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান, অন্যদিকে হীনতাবোধ, বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বহুতর শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত কৃত্রিম জাতি-বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবাসীকে এক অখন্ড জাতিতে পরিণত করিতে হইলে আমাদিগকে ঐ সকল বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, ধর্মসাধনায় এবং সামাজিক সুখ-সুবিধালাভে সর্বমানবের সমান অধিকারবাদ প্রচার করিতে হইবে। এই ভাব লোকে সহজে গ্রহণ করিবে না। কাজ সহজ নহে, কিন্তু ঠাকুর এই কঠিন ব্রতেই আমাদের দীক্ষা দিয়াছেন।

এই সময়ে প্রায় একবৎসর কাল স্বামিজী বরাহনগর মঠ অথবা কলিকাতায় বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে যাপন করেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি শাস্ত্রাধ্যয়নে যাপন করিতেন। স্বীয় সুপণ্ডিত গুরুভ্রাতাদের লইয়া বেদান্ত ও পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। কাশীর প্রমদাদাস বাবু এই দরিদ্র সন্ন্যাসী-দিগকে বেদান্ত ও অষ্টাধ্যায়ী দান করিয়াছিলেন, স্বামিজীর একখানি পত্রে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার উল্লেখ আছে। ১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামিজী একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রাম এবং শ্রীশ্রীমার জন্মভূমি জয়রামবাটীতে গিয়াছিলেন এবং পরে কিছুদিন শিমুলতলায় থাকিয়া জুলাই মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই কালে আমরা দেখিতে পাই, স্বামিজী উৎসাহের সহিত উপনিষদ্ ও শাঙ্করভাষ্য অধ্যয়ন করিতেছেন এবং প্রত্যেক সমস্যা ও সংশয় ভঞ্জনের জন্য কাশীতে প্রমদাদাস বাবুর নিকট পত্র লিখিতেছেন। এই সময়ে ৪ঠা জুলাই তারিখের একখানি পত্রে তাঁহার মানসিক অবস্থা বর্ণ করিয়া প্রমদাদাস বাবুকে লিখিতেছেন, "নানাপ্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধার জন্য যে সময়ে সময়ে ভুগিতে হয়, ইহা অতি যথার্থ এবং অনেক সময় দেখিয়াছি কিন্তু এবার অন্য প্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাস টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আমার জীবনের গত ৬।৭ বৎসর ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্ন-বাধার সহিত সংগ্রামে পরি পূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।

"বিশেষ কলিকাতার নিকট থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্স্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট। ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছি কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ; এমন কি, কখনো কখ উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল—হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া যদিও সেই বাটীর অং পাইয়াছেন—কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মোকদ্দমার দস্তুর।

"কখন কখন কলিকাতার নিকট থাকিলে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণে প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সম মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে; তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা ভয়ঙ্ক এবার তাহাদের মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া সক মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইতে পারি, আপনি সেই আশীর্বা করুন। আশীর্বাদ করুন, যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সক প্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া যায়।"

স্বামিজী ডিসেম্বর মাসের পূর্বে কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই কলিকাতা হইতে বৈদ্যনাথ গিয়া স্বামিজী কাশীদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ১৮৮৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর তিনি প্রয়াগ হইতে প্রমদাদাস বাবুকে লিখিতেছেন, "দু'একদিনের মধ্যে কাশী যাইতেছি বলি আপনাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডাইবে যোগানন্দজী নামক আমার একটি গুরুভ্রাতা চিত্রকূট ওঙ্কারনাথাদি দর্শন করি এস্থানে আসিয়া বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন সংবাদ পাই; তাহাতে তাঁহা সেবা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই। আমার গুরুভাই সম্পূ সুস্থ হইয়াছেন। * * আমার মন কিন্তু কাশী কাশী করিয়া অত্যন্ত ব্যা

হইয়াছে।" এখান হইতে স্বামিজী কাশী হইয়া ১৮৯০ সালের ২২শে জানুয়ারী গাজীপুরে উপস্থিত হইলেন। অভিপ্রায়—বিখ্যাত সাধু পওহারীবাবার দর্শন লাভ করিবেন। ২৪শে জানুয়ারী স্বামিজী লিখিতেছেন, "এস্থানে আমার বাল্য-সখা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে আছি, স্থানটি মনোরম। * * আমার বড় ইচ্ছা ছিল, পুনর্বার কাশী যাই। কিন্তু যে জন্য আসিয়াছি, অর্থাৎ বাবাজীকে দেখা, তাহা এখনো হয় নাই।" ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লিখিতেছেন, "বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ * * * বিচিত্র ব্যাপার এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না।"

পওহারীবাবা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় অবগত ছিলেন, স্বামিজীকে তাঁহারই শিষ্য জানিয়া আদর করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পরস্পর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহারা ধর্মরাজ্যের উচ্চতর অনুভূতি ও জটিল দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন, উহা এরূপ অবস্থায় উপনীত হইত যে, উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে কেহই উক্ত কথোপকথনের মর্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

স্বামিজীর গাজীপুরে আগমনের পর হইতেই প্রতি রবিবার গগনচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে একটি ক্ষুদ্র ধর্ম-সভা বসিত। স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের অধিকাংশই স্বামিজীর সঙ্গ-সুখ ও মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে তথায় একত্র হইতেন। স্বামিজী রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত গাহিতেন বলিয়া গাজীপুরের সকলেই তাঁহাকে 'বাবাজী' বলিয়া ডাকিতেন। একদিন এই সভায় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামিজী বলিয়াছিলেন যে, সমাজের মস্তকে অগ্নিময় অভিশাপ বর্ষণ করিয়া এবং প্রত্যেক আচার-ব্যবহারের তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া কোনপ্রকার সংস্কার সম্ভব নহে। অসীম প্রেম ও অনন্ত ধৈর্যের সহিত শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ভিতরের দিক হইতে জাতিকে উন্নত করিতে হইবে। হিন্দুধর্মের মহান্ সার্বভৌমিক আদর্শসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-প্রচার করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম একটা ভ্রম-প্রমাদের সমষ্টি নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দৃষ্টি দিয়া বিচার না করিয়া, গভীর অধ্যবসায়ের সহিত সনাতন ধর্মের মহত্ত্ব অনুধাবন করিতে চেষ্টিত হইতে হইবে। এই সনাতন হিন্দু-জাতির উদ্দেশ্য কি এবং ইহার প্রকৃত জীবনীশক্তি কোথায়, তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমরা অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে অন্ধ হইয়া মনে মনে কল্পনা করি, ভারতবর্ষ তাহার জাতীয় জীবনাদর্শ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে, অথবা উহার এমন কোন সর্বজনীন আদর্শ নাই, যাহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একটা সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করা যায়। বর্তমান সমাজ-সংস্কারকগণের ইহাই প্রধান দৈন্য—আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসভ্যতার প্রকৃত রূপ দেখিবার মত দৃষ্টি তাঁহারা হারাইয়াছেন। যখন আমরা ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া বৈদেশিক-ভাববহুল সংস্কারের হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইব, তখনি আমাদের বর্তমান জাতীয়-সমস্যার সমাধান হইবে।

মহাতপস্বী ও জ্ঞানী পওহারীবাবার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে স্বামিজী মুগ্ধ হইলেন। ভাবিলেন, "ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক কৃপার অধিকারী হইয়াও

আজ পর্যন্ত শান্তি পাইলাম না কেন? হয়তো এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সাহায্যে আমি শান্তিলাভ করিতে পারিব।”

কে বলিবে, এই কালে প্রবলতম ব্যাকুলতায় তিনি শ্রীগুরুর আদেশবাণী বিস্মৃত হইয়াছিলেন কি না? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “তোর নির্বিকল্প সমাধি চাবি দেওয়া রইল, কাজ শেষ হ'লে তবে পাবি।” ইহা কি তিনি ক্ষণিক দৌর্বল্যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন?

স্বামিজী শুনিয়াছিলেন, পওহারীবাবা যোগ-মার্গ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পওহারীবাবার সহিত আলাপ-পরিচয়ে তাঁহার হৃদয়ে যোগশিক্ষার বাসনা বলবতী হইল। তিনি বাবাজীকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে যোগশিক্ষা দিতে হইবে। আগ্রহাতিশয়ে পওহারীবাবাও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। স্বামিজী শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

গভীর নিশীথে স্বামিজী পওহারীবাবার গুহায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ‘শ্রীরামকৃষ্ণ না পওহারীবাবা?’ এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র তাঁহার হৃদয় দমিয়া গেল। বিহ্বল হৃদয়ে সংশয়-দ্বন্দ্বালোড়িত চিত্তে বিবেকানন্দ ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপা, গভীর ভালবাসা, সস্নেহ ব্যবহার, পর্যায়ক্রমে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহার ব্যথিতচিত্ত আত্মধিক্কারে ভরিয়া উঠিল! সহসা তাঁহার অন্ধকারময় কক্ষ দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বামিজী অশ্রু-সজল নেত্র তুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনের আদর্শ দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্ভুত দেব-মানব সম্মুখে দাঁড়াইয়া! তাঁহার উজ্জ্বল আয়তনেত্রদ্বয়ে স্নেহ-সকরুণ-ব্যথিত-ভর্ৎসনা, বিবেকানন্দের বাক্যস্ফূর্তি হইল না, প্রহরকাল প্রস্তর-মূর্তির মত ভূমিতলে বসিয়া রহিলেন। প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত দর্শন তিনি মস্তিষ্কের দৌর্বল্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া আগামী রজনীতে পুনরায় পওহারীবাবার নিকট যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। সেদিনও সেই পূর্ব-দৃষ্ট জ্যোতির্ময় মূর্তি তেমনিভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া!! এইরূপে সপ্ত-বিংশতিদিবস অতিবাহিত হইলে পর, একদিন তিনি মর্মবেদনায় ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “না, আমি আর কাহারও নিকট গমন করিব না। হে রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্য, আমি তোমার ক্রীতদাস! আমার এ আত্মহারা দৌর্বল্যের অপরাধ ক্ষমা করো প্রভো!”

এতৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেই স্বামিজীর অব্যক্ত-বেদনা-ক্লিষ্ট-মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিত। বিশেষ কোন উত্তর করিতেন না; করিতে পারিতেন না। বহুদিন পরে রচিত “গাই গীত শুনাতে তোমায়” শীর্ষক কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত অংশে আমরা এই ঘটনার কিঞ্চিৎ আভাস পাই—

> “কভু ছেলেখেলা করি তোমা সনে,
> কভু ক্রোধ করি তোমা 'পরে যেতে চাই দূরে পলাইয়ে,
> শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে—নির্বাক আনন, ছলছল আঁখি
> চাহ মম মুখপানে:
> অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি, কিন্তু ক্ষমাভিক্ষা নাহি মাগি।
> তুমি নাহি কর রোষ।
> পুত্র তব—অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা?
> প্রভু তুমি—প্রাণসখা তুমি মোর!
> কভু দেখি, তুমি—আমি; আমি—তুমি!!”

কাশীধাম হইতে স্বামী অভেদানন্দজীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া স্বামিজী

গাজীপুর পরিত্যাগ করিলেন। কাশীধামে উপস্থিত হইয়া অভেদানন্দজীর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে স্বামী প্রেমানন্দজীকে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া স্বামিজী বাবু প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের বাগানবাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহী ভক্ত বাবু বলরাম বসু মহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া স্বামিজী শোকে মুহ্যমান হইলেন। গুরু-ভ্রাতৃ-বিয়োগব্যথায় কাতর স্বামিজীকে বিলাপ করিতে দেখিয়া প্রমদাবাবু বলিলেন, "এ কী স্বামিজী! আপনি সন্ন্যাসী, আপনার শোকার্ত হওয়া শোভা পায় না।"

স্বামিজী গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "আপনি কি মনে করেন, সন্ন্যাসীর হৃদয় বলিয়া একটা জিনিসও থাকিতে নাই? প্রকৃত সন্ন্যাসী পরের জন্য সাধারণ অপেক্ষা অধিক অনুভব করেন। বিশেষ আমি মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহি। সর্বোপরি তিনি যে আমার গুরুভাই। আমরা যে একত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার বিয়োগে যে আমি কাতর হইব, ইহাতে আর বিচিত্র কি? প্রস্তরের ন্যায় অনুভূতিহীন সন্ন্যাস-জীবন আমার স্পৃহনীয় নয়!"

বলরামবাবুর মৃত্যুর পর শোকার্ত বসু-পরিবারকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এবং বরাহনগর মঠের সুব্যবস্থার জন্য স্বামিজী কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে ২৫শে মে মঠের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ঠাকুরের গৃহী শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের পরলোকগমনে মঠের ব্যয়-নির্বাহের জন্য স্বামিজী চিন্তিত হইলেন। দুইমাস কাল কলিকাতা ও বরাহনগরে অবস্থান করিয়া স্বামিজী মঠের খরচ চলিবার উপযোগী ব্যবস্থা করিলেন। আবার তাঁহার চিত্তে ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। একদিকে নবগঠিত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রতি তীব্র মমত্ববোধ, অন্যদিকে সত্যকাম সন্ন্যাসীর নিঃসঙ্গ সাধনার আবেগ, এই দুই বিরুদ্ধ ভাব-সংঘাতে বিচলিত বিবেকানন্দ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, সমস্ত বন্ধন, এমন কি, গুরুভাইদের স্বার্থলেশহীন প্রেমবন্ধন পর্যন্ত ছিন্ন করিতে হইবে। যে শক্তিবলে শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্ আদর্শ প্রচার করা যায়, সেই শক্তি অর্জন করিব অন্যথা সেই চেষ্টায় প্রাণ দিব, এই সঙ্কল্প তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল।

তখন রামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ঘুষুড়ী গ্রামে বাস করিতেছিলেন। স্বামিজী মঠ পরিত্যাগ করিয়া যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার আশীর্বাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় তথায় আগমন করিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পবিত্রচরণ-যুগল বন্দনা করিয়া তিনি গভীর শ্রদ্ধার সহিত বলিলেন, "মা! যে পর্যন্ত শ্রীগুরুর ঈপ্সিত কার্য সম্পন্ন করিতে না পারি, সে পর্যন্ত আর ফিরিয়া আসিব না; তুমি আশীর্বাদ কর, যাহাতে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।"

করুণাময়ী জননী বীরসন্তানের শিরে কল্যাণ-হস্ত রক্ষা করিয়া ঠাকুরের নাম গ্রহণপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন। সে পুণ্যস্পর্শে স্বামিজীর হৃদয় এক দিব্যভাবে পূর্ণ হইল। তাঁহার মনে হইল, তিনি এমন এক মহাশক্তিবলে বলীয়ান হইলেন, যাহা বাধা, বিপত্তি, সংশয়দ্বন্দ্বে তাঁহার হৃদয় অবিচলিত রাখিবে; এমন কি, মৃত্যুর বিভীষিকা পর্যন্ত তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না।

১৮৯০-এর জুলাই মাসে মঠবাটী পরিত্যাগ করিবার পর স্বামিজী প্রথম ভাগলপুরের উকীল মথুরানাথ সিংহ মহাশয়ের ভবনে কয়েকদিন যাপন করিলেন। সেখান হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দজীর সহিত দেওঘরে আসিলেন। এখানে স্বামিজী শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একদিন তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করেন। দেওঘর হইতে কাশীতে আসিয়া তিনি

প্রমদাদাস বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিমালয় তাঁহাকে তখন আকর্ষণ করিতেছে, অধিকদিন তিনি কাশীতে ছিলেন না। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি প্রমদাদাস বাবুকে বলিয়া গেলেন, "যখন আমি ফিরিয়া আসিব, তখন সমাজের উপর বোমার মত ফাটিয়া পড়িব এবং সমাজ আমার অনুবর্তী হইবে।" তার পর অযোধ্যা ও নৈনীতাল হইয়া তিনি বদরী, কেদারের পথে আলমোড়ায় উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী লালা বদরী সাহা সন্ন্যাসীদ্বয়ের বাসের জন্য একটি উদ্যান-বাটিকা ছাড়িয়া দিলেন। কয়েকদিন পর সংবাদ পাইয়া স্বামী সারদানন্দ ও কৃপানন্দজী আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। এইকালে বরাহনগর মঠের অধিকাংশ সন্ন্যাসীই তীর্থভ্রমণে বিহর্গত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ হৃষীকেশ, হরিদ্বার ইত্যাদি স্থানে কুটির নির্মাণ করিয়া অথবা গিরিগুহায় বাস করিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় রত হইয়াছিলেন।

হিমালয়ের বৈরাগোদ্দীপক মনোহর গম্ভীর শ্রী স্বামিজীর সমাধিলিপ্সু মনকে অন্তর্মুখীন করিয়া তুলিল। তিনি প্রত্যহ রজনীযোগে গোপনে গিরিগুহায় ধ্যান করিতেন।

* * *

বিবেকানন্দের ধ্যান-স্তিমিত-লোচনে সত্যধর্ম মূর্তিমান হইয়া উঠিল। আগতপ্রায় নবযুগের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা বহন করিতে হইবে, ভবিষ্য ভারতের উদ্বোধনকল্পে সত্ত্ব-রজের মিলনবেদীর উপর সেবাধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ইহার পূর্বে নির্বিকল্প সমাধিলাভ হইবে না। এ দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি প্রবল সচেষ্ট যুদ্ধঘোষণা করিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে বিরক্তির সহিত গিরিগুহা ত্যাগ করিয়া আলমোড়ায় ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বল্পকাল পরেই গুরুভ্রাতৃগণসহ উত্তরখণ্ড পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

এই সময় স্বামী তুরীয়ানন্দজী কর্ণপ্রয়াগে, অলকানন্দাতীরে আশ্রম রচনা করিয়া তপস্যায় রত ছিলেন। স্বামিজী গুরুভ্রাতৃগণসহ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্ট হইলেন। তথা হইতে বদরীনারায়ণ অভিমুখে প্রস্থান করিবেন এমন সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজী পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ দেরাদুনে ফিরিয়া আসিলেন। অখণ্ডানন্দজী সুস্থ হইলে স্বামিজী গুরুভ্রাতৃগণসহ হৃষীকেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বেদান্তাদি শাস্ত্র চর্চা, ধ্যান, জপ ইত্যাদিতে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। হৃষীকেশ স্বামিজীর অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ বোধ হইত। এই সময়ের আনন্দময় দিনগুলির স্মৃতি তিনি শেষ দিবস পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার 'পরিব্রাজক' নামক পুস্তকে মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিয়াও গিয়াছেন :—

"হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশহাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোণা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদ হিম-শীতল 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারী', আর সেই অদ্ভুত 'হর্ হর্ হর্' তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সাম্‌নে গিরি-নির্ঝরের 'হর্ হর্' প্রতিধ্বনি। সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ! সে গঙ্গাজলপ্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ!!*** গেলবারে আমি একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান কর্‌তাম। পান কল্লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জল

স্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদ-সঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বীসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, সে অমরাবতীসম প্যারিস, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত; আর শুনতাম—সেই 'হর্ হর্', দেখতাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে মস্তিষ্কে শিরায় শিরায় সঞ্চার কর্ছেন, আর গর্জে গর্জে ডাক্ছেন—'হর্ হর্, হর্'!!"

স্বামিজীর দীর্ঘপথভ্রমণ-শ্রান্ত দেহ উগ্র তপস্যার ভার সহ্য করিতে পারিল না। প্রবল জ্বর ও ডিপথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন নাড়ীর গতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঘর্ম আরম্ভ হইল; তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ অন্তিম সময় নিকটবর্তী ভাবিয়া শোকে ও উদ্বেগে অধীর হইয়া উঠিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলে মিলিয়া কাতরভাবে ভগবচ্চরণে তাঁহার প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক অজ্ঞাতনামা অপরিচিত সন্ন্যাসী দৈবযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সকলকে ক্রন্দনপরায়ণ দেখিয়া কৌতূহলের সহিত কুটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। রোগীর অবস্থা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া সন্ন্যাসিগণকে অভয় দিয়া একটা ঔষধ খাওয়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, স্বামিজী কিয়ৎকাল পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন এবং কথা বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একজন সন্ন্যাসী তাঁহার মুখের নিকট কান লইয়া শুনিলেন, তিনি বলিতেছেন "ভাই তোমরা ভয় পাইও না, আমি মরিব না।" ক্রমে স্বামিজী সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "অজ্ঞানাবস্থায় আমি অনুভব করিলাম এখনও আমার বহু কর্ম অবশিষ্ট আছে, তাহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেহত্যাগ হইবে না।"

হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বামিজী হিমালয়ের চির-ঈপ্সিত লোভনীয় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া 'আর্যদের আদিবাস, সামনিনাদিত' পঞ্চনদে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং স্বামিজী মীরাটে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া একে একে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অখন্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, কৃপানন্দ ও অদ্বৈতানন্দজী আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। শেঠজীর উদ্যানবাটিকা দ্বিতীয় বরাহনগর মঠ হইয়া উঠিল। কীর্তন, ধ্যান, জপ, বেদান্তচর্চা, শাস্ত্রালাপ, উপস্থিত জিজ্ঞাসুগণকে ধর্মোপদেশ দান অবিরাম চলিতে লাগিল। গুরুভ্রাতৃবৃন্দের স্নেহমোহে ভুলিয়া তিনি অযথা সময় নষ্ট করিতেছেন না তো? এইরূপ চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র স্বামিজী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি সত্বরই এস্থান পরিত্যাগ করিব এবং একাকী ভ্রমণ করাই আমার অভিপ্রায়; অতএব তোমরা কেহ আমার অনুসরণ করিও না।" স্বামী অখন্ডানন্দজী স্বামিজীর সহচর হইবার আশায় বিনীতভাবে তাঁহার সম্মতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। স্বামিজী উত্তর দিলেন, "আমি লক্ষ্য করিতেছি, তোমাদের স্নেহবন্ধনও কর্ম করিবার পথে প্রবল অন্তরায়স্বরূপ। অতএব যাহাকে দেখিলে স্নেহমায়ার উদ্রেক হইবে, তাহাকে সঙ্গী করা কর্তব্য নহে। গুরুভ্রাতৃপ্রীতিও মায়া কিম্বা তদপেক্ষাও বেশী।" এইরূপে নানা প্রকারে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া স্বামিজী মীরাট পরিত্যাগ করিলেন।

এতদিন পরে শ্রীগুরুর ইঙ্গিত সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসী শিক্ষাদাতা আচার্যরূপে ভারতভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং ক্রমে পঞ্চনদ অতিক্রম করিয়া 'সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত' মিশ্রিত 'প্রতাপের দেশ—পদ্মিনীর ভূমি' বীরপ্রসবিনী রাজপুতনায় প্রবেশ করিলেন।

১৮৯১, ফেব্রুয়ারী মাস। স্বামিজী আলোয়ার স্টেশনে অবতরণ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার বাবু গুরুচরণ লস্কর মহাশয় এবং তাঁহার বন্ধুস্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের মৌলবীসাহেব আনন্দের সহিত স্বামিজীর থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। স্বামিজী বাজারের উপরে যে ক্ষুদ্র ঘরখানিতে থাকিতেন, প্রচুর লোকসমাগম নিবন্ধন তথায় স্থানাভাব ঘটিতে লাগিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়র পণ্ডিত শম্ভুনাথজী আগ্রহের সহিত তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসিলেন।

প্রত্যহ বেলা নয়টা হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত, হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রযুবকগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার উদার ধর্মমতসমূহ শ্রবণ করিতেন। দার্শনিক আলোচনা অথবা কোন কূটপ্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে স্বামিজী সহসা ভাবোন্মত্ত হইয়া জ্ঞানদাস, সুরদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভক্তকবিগণের রচিত সঙ্গীত মধুর কণ্ঠে গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া তুলিতেন। ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামীর তীব্র সমালোচক স্বামিজীর যুক্তিপূর্ণ উত্তরগুলি শ্রবণে জিজ্ঞাসুমাত্রেই সন্তুষ্ট হইতেন। সাজাইয়া গুছাইয়া অথবা অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া বা লোকের মনরক্ষা করিয়া কথা বলিতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত স্বামিজী জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেন; তাঁহার মধ্যে পাণ্ডিত্য বা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত হইত না। এই প্রশ্নোত্তরসভায় নানাপ্রকার আলোচনার মধ্যে একজন হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "বাবাজী! আপনি গেরুয়া পরিধান করিয়াছেন কেন?"

"কারণ, গেরুয়া ভিক্ষুকের বসন।" স্বামিজী সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "যদি আমি সাধারণের মত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া ভ্রমণ করি, তাহা হইলে দরিদ্র ভিক্ষুকগণ আমাকে অর্থশালী মনে করিয়া ভিক্ষা চাহিবে। আমি নিজেই একজন ভিক্ষুক, বিশেষ আমার হাতে এক পয়সাও নাই। প্রার্থীকে নিরাশ করিতে আমি হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাই; কিন্তু আমার গৈরিকবসন দেখিয়া তাহারা তাহাদেরই মত একজন ভিক্ষুক মনে করিয়া আমার নিকট আর ভিক্ষা চাহিবে না।" স্বামিজীর এই উত্তরটির মধ্যে দরিদ্রের প্রতি কি গভীর সমবেদনার আকুল উচ্ছ্বাস লুক্কায়িত! কি সুন্দর, কি হৃদয়গ্রাহী!!

এই অদ্ভুত শক্তিশালী সন্ন্যাসীর বিষয় অবগত হইয়া, একদিন আলোয়ার রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর তাঁহাকে স্বালয়ে আহ্বান করিলেন। স্বামিজীর সহিত পরিচিত হইয়া দেওয়ান বাহাদুর অতীব আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বালয়ে রাখিয়া পরদিনই মহারাজ বাহাদুরের নিকট এক পত্র লিখিলেন, "এখানে একজন মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অদ্ভুত অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। মহারাজ বাহাদুর ইঁহার সহিত আলাপ করিলে সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।" মহারাজ মঙ্গলসিংহ তখন রাজধানী হইতে দুই মাইল দূরবর্তী এক প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে তৎপর দিবসই তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। দেওয়ান বাহাদুরের ভবনে স্বামিজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহারাজ স্বামিজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। দুই এক কথার পরই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী

মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, আপনি একজন বিদ্বান ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। আপনি ইচ্ছা করিলেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন কেন?”

স্বামিজী বলিলেন, “মহারাজ! অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। আপনি রাজকার্য অবহেলা করিয়া কেন সাহেবদের সহিত মৃগয়া ইত্যাদি বৃথা আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করেন?”

রাজানুচরগণ স্পন্দিত-হৃদয়ে এই অসমসাহসিক সাধুর অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া মহারাজ উত্তর করিলেন, “হ্যাঁ, কিন্তু কেন করি, তাহা বলিতে পারি না। তবে উহা আমার ভাল লাগে, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।”

স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন, “ভাল লাগে বলিয়া আমিও ফকীরের বেশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াই।”

কিছুকাল বাক্যালাপের পরই মহারাজ বুঝিতে পারিলেন যে, এই কৃতবিদ্য সন্ন্যাসী কেবলমাত্র সুপণ্ডিত নহেন, নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। কৌতূহলবশেই হউক, আর প্রকৃত সত্য জানিবার আগ্রহেই হউক, মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, “দেখুন বাবাজী মহারাজ! মূর্তিপূজায় আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, ইহার জন্য আমার কি দুর্গতি হইবে?” মহারাজকে হাস্য করিতে দেখিয়া স্বামিজী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “মহারাজ কি আমার সহিত রহস্য করিতেছেন?”

মহারাজের মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর হইল, তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, “না—না স্বামিজী! প্রকৃতই আমি কাঠ, মাটি, পাথর বা ধাতুর মূর্তিগুলিকে সাধারণের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে পারি না; ইহার জন্য কি আমাকে পরকালে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে?”

—“নিজের বিশ্বাসানুযায়ী উপাসনা করিলে পরকালে শাস্তি পাইতে হইবে কেন? মূর্তিপূজায় আপনার বিশ্বাস নাই, মন্দ কি?” স্বামিজীর উত্তর শুনিয়া উপস্থিত অনেকেই বিস্ময়ের সহিত ভাবিতে লাগিলেন, যাঁহাকে তাঁহারা বহুবার শ্রীশ্রীবিহারিজীর মন্দিরে শ্রীমূর্তির সম্মুখে ভজন গাহিতে গাহিতে ভাবাবেশে অশ্রুবিগলিত নেত্রে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইতে দেখিয়াছেন, তিনি কেন মূর্তিপূজার সমর্থনকল্পে যুক্তিপ্রদর্শন করিলেন না? স্বভাবতঃই তাঁহাদের হৃদয় নানা সন্দেহে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সহসা কক্ষবিলম্বিত মহারাজের একখানি আলোক-চিত্রের উপর স্বামিজীর দৃষ্টি পতিত হইল। স্বামিজীর ইচ্ছাক্রমে চিত্রখানি আনীত হইলে, তিনি উহা হস্তে লইয়া দেওয়ান বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানি বোধ হয় মহারাজ বাহাদুরের প্রতিকৃতি?” দেওয়ান বাহাদুর সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলেন।

“উত্তম,”—স্বামিজী চিত্রখানি ভূমিতলে রাখিয়া দেওয়ান বাহাদুরকে বলিলেন, “আপনি ইহার উপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করুন।” কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেওয়ান বাহাদুর শঙ্কাবিমিশ্র-বিস্মিত-দৃষ্টিতে স্বামিজীর প্রতি চাহিলেন। উপস্থিত সকলেই স্বামিজীর অদ্ভুত কার্যের কারণ নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া রুদ্ধশ্বাসে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বামিজী উচ্চকণ্ঠে সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আপনাদের মধ্যে যে-কেহ ইহার উপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করুন। ইহা তো একখণ্ড কাগজ ব্যতীত আর কিছুই নহে? আপনারা অগ্রসর হইতেছেন না কেন?” সকলেই একবার স্বামিজীর একবার মহারাজের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। দেওয়ান বাহাদুর অবশেষে বলিয়া উঠিলেন, “আপনি বলেন কি

স্বামিজী! মহারাজের চিত্রের উপর আমরা কি থুৎকার প্রদান করিতে পারি?”

“মহারাজের চিত্র হউক, তাহাতে কি আসে যায়? ইহাতে তো আর মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত নাই, এ একটুকরা কাগজ মাত্র। ইহা মহারাজের মত নড়িতে চড়িতে অথবা কথা বলিতে পারে না; তথাপি আপনারা অসম্মত হইতেছেন কেন?” স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন, “আপনারা থুৎকার প্রদান করিতে পারিবেন না, তাহা জানি, কারণ আপনারা মনে করিতেছেন ইহার উপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলে মহারাজের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা হইবে। কেমন ঠিক কি না?” সমবেত জনসঙ্ঘ কুণ্ঠিত-আনন্দে নীরবদৃষ্টিভঙ্গীতে স্বামিজীর উক্তি সমর্থন করিলেন। তখন স্বামিজী মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “দেখুন মহারাজ! একদিক দিয়া বিচার করিলে ইহা আপনি নহেন, অপর দিক দিয়া দেখিলে এই চিত্রের মধ্যেও আপনার অস্তিত্ব আছে, সেই কারণেই কেহ নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইলেন না; কারণ ইঁহারা আপনার অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত সেবক, মহারাজের অসম্মানজনক কোন কার্য করিতে ইঁহাদের পক্ষে সঙ্কুচিত হওয়া স্বাভাবিক। ইঁহারা আপনাকে ও চিত্রখানিকে তুল্য সম্ভ্রমদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। সেইরূপ প্রস্তর বা ধাতুর প্রতিমাগুলিও শ্রীভগবানের বিশেষ গুণবাচক মূর্তি। ঐগুলি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র ভক্তের মনে সেই ভগবানের কথাই উদয় হয়। ভক্ত মূর্তির ভিতর দিয়া ভগবানেরই উপাসনা করেন, ধাতু বা প্রস্তর পূজা করেন না। আমি বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কখনও কোন হিন্দুকে বলিতে শুনি নাই, ‘হে ধাতু! হে প্রস্তর! আমি তোমাকে পূজা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।’ মহারাজ! একই অনন্ত ভাবময় ভগবান—যিনি সর্বজনোপাস্য ও সচ্চিদানন্দরূপ—ভক্তগণ তাহাকেই স্ব স্ব ভাবানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন।” বলিতে বলিতে স্বামিজীর বদনমণ্ডল এক দিব্যবিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মহারাজ কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে চাহিয়া যুক্তকরে বলিলেন, “স্বামিজী! আপনার কৃপায় মূর্তিপূজা সম্বন্ধে এক অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। বাস্তবিকই আপনার দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে আমিও এ পর্যন্ত একজনও কাষ্ঠ বা প্রস্তরাদির উপাসক দেখি নাই। এতদিন আমি মূর্তিপূজার প্রকৃত রহস্য বুঝি নাই বা বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। অদ্য আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিলেন।” স্বামিজী বিদায় হইবেন এমন সময় মহারাজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্বক বলিলেন, “স্বামিজী! কৃপা করিয়া আমাকে আশীর্বাদ করুন।”

স্বামিজী স্নিগ্ধহাস্যে কল্যাণ বর্ষণ করিয়া বলিলেন, “একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও কৃপা করিবার অধিকার নাই। আপনি সরলভাবে তাঁহার চরণে শরণাগত হউন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে কৃপা করিবেন।”

স্বামিজী প্রস্থান করিলে মহারাজ বলিলেন, “দেওয়ানজী, আমি কখনও এরূপ একজন মহাপুরুষের দর্শনলাভ করি নাই। ইঁহাকে আরও কিছুদিন আপনার আলয়ে রাখিতে চেষ্টা করুন।” দেওয়ানজী বলিলেন, “এই অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা সন্ন্যাসী কোনপ্রকার অনুরোধ শুনিবেন কি না সন্দেহ, তবে চেষ্টার ত্রুটি করিব না।”

দেওয়ান বাহাদুরের আগ্রহাতিশয্যে তিনি তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু কথা রহিল, সর্বদা সকল অবস্থায় নির্বিচারে সকলেই তাঁহার সহিত প্রয়োজন হইলে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। বলা বাহুল্য, দেওয়ানজী আনন্দের সহিত স্বামিজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

আলোয়ারবাসী কয়েকজন বিশ্বাসী ও পবিত্রহৃদয় যুবক ইতোপূর্বেই স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর উপদেশে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের সহিত মহানন্দে যাপন করিয়া স্বামিজী সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। গুরুগতপ্রাণ শিষ্যবৃন্দ নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন; অগত্যা তাঁহাদিগের সহিত স্বামিজী আলোয়ার হইতে আঠার মাইল দূরবর্তী পাণ্ডুপোল গ্রামে উপস্থিত হইয়া হনুমানজীর মন্দিরে রাত্রিযাপন করিলেন। প্রভাতে শ্রীশ্রীমহাবীরজীর পূজা করিয়া শিষ্যবৃন্দকে আলোয়ারে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন; স্বয়ং একাকী যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে জয়পুরে উপনীত হইলেন।

এদিকে স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামিজীর বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি জয়পুরে উপনীত হইয়া শুনিলেন, রাজপ্রাসাদে একজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ সাধু বাস করিতেছেন, যিনি ইংরেজী ও সংস্কৃতে অনর্গল কথা বলিতে পারেন। স্বামিজী ব্যতীত আর কেহই নহেন, ইহা মনে মনে স্থিরনিশ্চয় করিয়া অখণ্ডানন্দজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দপ্রকাশ করা দূরে থাকুক বরং ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "তুমি আমার অনুসরণ করিয়া ভাল কর নাই, সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থান কর।" অখণ্ডানন্দজী দুঃখিতান্তঃকরণে জয়পুর পরিত্যাগ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, গুরুভ্রাতৃগণের প্রতি এরূপ নির্মম হওয়ার নিশ্চয়ই কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে।

জয়পুররাজের জনৈক সভাপণ্ডিত অসাধারণ ব্যাকরণবিদ্ ছিলেন। স্বামিজী তাঁহার নিকট পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিতজী বিবিধ প্রকারে বুঝাইয়া দিলেও ক্রমাগত তিন দিবস চেষ্টা করিয়াও স্বামিজী প্রথম সূত্রটির ভাষ্য আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। চতুর্থ দিবস পণ্ডিতজী বলিলেন, "স্বামিজী! আমার নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়া আপনার বিশেষ লাভ হইবে না, যেহেতু তিন দিবস ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও আপনাকে একটি সূত্র বুঝাইতে পারিলাম না।" স্বামিজী পণ্ডিতজীর বাক্যে লজ্জিত হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যে পর্যন্ত না সূত্রার্থ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইতেছি, ততক্ষণ আহার, পানীয় ইত্যাদি গ্রহণ করিব না।

একপ্রহর পরেই স্বামিজী পণ্ডিতজীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি স্বামিজীর মুখে উক্ত সূত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর অনন্যচিত্ত হইয়া স্বামিজী অধ্যয়নে রত হইলেন এবং দুই সপ্তাহ মধ্যেই অষ্টাধ্যায়ীর সমস্যাগুলির নিরসন করিয়া অধ্যাপক সমীপে বিদায়গ্রহণ করিলেন। কেহ যেন না মনে করেন, মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সমগ্র পাণিনি অধ্যয়ন শেষ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, বরাহনগর মঠে তিনি দুই বৎসরকাল পাণিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, জয়পুরে পণ্ডিতজীর নিকট কোন কোন অংশের ব্যাখ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন মাত্র। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া উত্তরকালে অনেকেই সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন করিতেন। তিনি উত্তর দিতেন, "যোগীর পক্ষে ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। আত্মার সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া এক বিষয়ে নিয়োগ করিলে ত্রিলোকে এমন কি রহস্য আছে যাহা অবগত না হওয়া যায়?"

জয়পুরের প্রধান সেনাপতি সরদার হরসিংহের সহিত স্বামিজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার আলয়ে স্বামিজী প্রায়ই ধর্মালোচনা করিতেন। কথিত

আছে, সরদার সাহেব মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। একদিন রাজপথে শ্রীকৃ বিগ্রহসহ শোভাযাত্রা চলিয়াছে, স্বামিজী সহসা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “দেখুন, শ্রীভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ।” সরদারজীর ভাবান্তর হইল, অশ্রুসি নয়নে তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরি পাইয়া বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, “স্বামিজী, বহুবার তর্ক করিয়া যে বিষয় বুঝিতে পারি নাই, আজ আপনার কৃপায় সেই অপূর্ব দর্শন লাভ হইল।”

স্বামিজী পরিহাস-রসিক ছিলেন। অবিশ্বাসী অথচ তার্কিকদিগকে জব করিয়া তিনি সর্বদাই আমোদ পাইতেন। একদিন তিনি কতিপয় ব্যক্তির সহিত ধর্মালোচনা করিতেছেন, এমন সময় জয়পুরের বিখ্যাত পণ্ডিত সূরজ নারায় সেখানে আসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, “আমি একজন বেদান্তী। আমি অবতার পুরুষদের বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করি না। পৌরাণি অবতারেও আমার বিশ্বাস নাই। আমরা সকলেই ব্রহ্ম। আমার সহিত একজ অবতারের পার্থক্য কি?” স্বামিজী উত্তর দিলেন, “আপনার কথাই সত্য। তব হিন্দুরা মৎস্য কচ্ছপ বরাহকেও অবতার বলে। তাহার মধ্যে আপনি কোন্‌টি?” সভায় হাসির রোল উঠিল, পণ্ডিতজী অপ্রস্তুত হইয়া নিরস্ত হইলেন।

জয়পুর হইতে বিদায় লইয়া স্বামিজী আজমীঢ়ে আসিলেন এবং মনোহর আবু পর্বতে এক গুহায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কোটা-দরবারের একজ মুসলমান উকীল স্বামিজীকে তদবস্থায় দেখিয়া স্বালয়ে লইয়া গেলেন। এ ধর্মপ্রাণ উদারহৃদয় মুসলমান ভদ্রলোক স্বামিজীর গুণাবলীর পরিচয় পাই কোটার প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাঁহা আলাপ করাইয়া দেন। একদিন মৌলবী সাহেবের আহ্বানে, খেতরির রাজ বাহাদুরের সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন লাল তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে কেবল মাত্র কৌপীন পরিহিত স্বামিজী তখন একখানি খাটিয়ায় শুইয়া মুদি নেত্রে বিশ্রাম করিতেছিলেন। মুন্সীজী মনে মনে ভাবিতেছেন, “অতি সাধার ভবঘুরে সাধু, ভেকধারী চোর জুয়াচোরও হইতে পারে।” এমন সময় স্বামি উঠিয়া বসিলেন। আলাপ আরম্ভ হইল। জগমোহন প্রশ্ন করিলেন, “স্বামিজী আপনি হিন্দু-সন্ন্যাসী হইয়া মুসলমানের বাড়িতে আছেন; আপনার খাদ্য পানী মাঝে মাঝে এই মুসলমান ভদ্রলোক ছুঁইয়া ফেলিতে পারেন।” স্বামিজী উত্ত দিলেন, “মহাশয়, আপনার একথা বলিবার অর্থ কি? আমি সন্ন্যাসী; আমি সমস্ত সামাজিক আচার নিয়মের ঊর্ধ্বে। আমি একজন মেথরের সহিত বসি আহার করিতে পারি। ইহা ঈশ্বরের নির্দেশ, অতএব আমি নির্ভয়। শাস্ত্রে আমার ভয় নাই কেননা শাস্ত্র ইহা সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার জ আপনাদের মত সবজান্তা ইংরাজীনবিশদিগকে। আপনারা শাস্ত্র ও ভগবানের ধ ধারেন না। আমি সর্বভূতে ব্রহ্ম জ্ঞান করি। আমার নিকট আবার উচ্চনী স্পৃশ্যাস্পৃশ্য কি?” ‘শিব শিব’ উচ্চারণ করিয়া স্বামিজী তন্ময় হইলেন, তাঁহা বদনমণ্ডল স্বর্গীয় বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ আলাপের পর জগমোহন মুগ্ধ হইলেন। রাজা বাহাদুর সেক্রেটারীর নিকট স্বামিজীর বৃত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শন কামনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

স্বামিজী মুন্সীজীর সহিত রাজভবনে আসিলেন। রাজা গভীর শ্রদ্ধার সহি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করাইলেন এবং স্বয়ং তাঁহার সম্মু দাঁড়াইয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, “স্বামিজী! জীবনটা কি?”

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসিল, “একটা অন্তর্নিহিত শক্তি যেন ক্রমাগত স্ব স্বরূ

ব্যক্ত হইবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছে, আর বহিঃপ্রকৃতি তাহাকে দাবাইয়া রাখিতেছে; এই সংগ্রামের নামই জীবন।”

রাজা আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, স্বামিজীও তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। রাজা তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গভীর আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং কয়েকদিন পর তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন। ধর্মপ্রাণ রাজা অজিতসিংহ ও তাঁহার সেক্রেটারী মুন্সীজী স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গুরুভক্ত শিষ্যের ব্যাকুল আগ্রহ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্বামিজীকে কিছুদিন রাজপ্রাসাদে বাস করিতে হইল।

রাজার সভাপণ্ডিত নারায়ণ দাস তৎকালে সমগ্র রাজপুতানায় সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। স্বামিজী এই সুযোগে তাঁহার নিকট পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রতিভায় বিস্মিত হইয়া পণ্ডিতজী একদিন তাঁহাকে বলিলেন, “স্বামিজী! আমার যাহা শিখাইবার ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। এরূপ প্রতিভা মানবে সম্ভব, ইহা আপনাকে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।” স্বামিজী এই পণ্ডিতজীকে চিরদিন অধ্যাপকের মত শ্রদ্ধা করিতেন।

খেতরির রাজা অপুত্রক ছিলেন। একদিন গুরুসদনে স্বীয় দুঃখ নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, “যাহাতে আমার একটি পুত্রসন্তান হয়, আপনি দয়া করিয়া আমাকে সেই আশীর্বাদ করুন।” রাজার প্রার্থনা শুনিয়া স্বামিজী চিন্তিত হইলেন। অবশেষে কাতর আবেদন উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বলিলেন, “শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে।”

কিয়দ্দিবস পর স্বামিজী পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। রাজা বাহাদুর দুঃখিতান্তঃকরণে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

গুজরাটের মরুময় প্রদেশ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া ক্রমে আহ্মেদাবাদ, লিম্বড়ি, জুনাগড়, ভোজ, ভেরাওল, প্রভাস ও সোমনাথের বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া স্বামিজী পোরবন্দরে উপনীত হইলেন। লিম্বড়ির মহারাজ বাহাদুর ইতোমধ্যে স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন স্বামিজীকে পোরবন্দরের রাজপথে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া মহারাজা তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসিলেন।

পোরবন্দরের বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ মহোদয়ের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার পুনরায় পাঠস্পৃহা জাগিয়া উঠিল। সন্ন্যাসি-ছাত্রের সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতজীও তাঁহাকে মহাভাষ্য পড়াইতে লাগিলেন। পণ্ডিত নারায়ণ দাসের নিকট স্বামিজী উহার অধিকাংশই পাঠ করিয়াছিলেন; এক্ষণে অবশিষ্টভাগ শেষ করিয়া উৎসাহের সহিত বেদান্তের ব্যাসসূত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঘটনাক্রমে এই সময় গোবর্ধন মঠের জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য মহারাজ পোরবন্দরে আগমন করেন। তদুপলক্ষে তাঁহার সভাপতিত্বে লিম্বড়ি রাজভবনে স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর এক বিচারসভা আহূত হয়। পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ মহোদয় স্বামিজী সমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

স্বামিজীর প্রতিভার খ্যাতি ইতোপূর্বেই পণ্ডিতমণ্ডলী শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেজন্য অনেকেই তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। দুই একজন বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত অন্যান্য পণ্ডিতগণের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহা মহা পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে সহসা বাদে আহূত

হইয়া সম্ভ্রম-সঙ্কুচিত লজ্জায় স্বামিজীর বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল। অবশেষে স্বীয় অধ্যাপকের সম্মতি গ্রহণ করিয়া তিনি ধীরভাবে উত্থাপিত কূটপ্রশ্নগুলি একে একে মীমাংসা করিয়া দিতে লাগিলেন। স্বামিজীর বিনয়, পাণ্ডিত্য ও তেজস্বিতা প্রভৃতি সন্দর্শনে পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য মহারাজও তাঁহাকে সন্নিকটে আহ্বান করিয়া হর্ষোচ্ছল কণ্ঠে আশীর্বাদ এবং সস্নেহ ব্যবহারে আপ্যায়িত করিলেন।

স্বামিজীর অসাধারণ ধীশক্তি ও পবিত্র চরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া একদিন তাঁহার অধ্যাপক পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গজী বলিলেন, "স্বামিজী! এদেশে ধর্মপ্রচার করিয়া আপনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। আপনার উদারভাবসমূহ আমাদের দেশের লোক অনেকে বিলম্বে বুঝিবে। বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া আপনি পাশ্চাত্যদেশে গমন করুন। সেখানকার লোক মহত্ত্বের ও প্রতিভার সম্মান করিতে জানে। আপনি নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উপর সনাতন ধর্মের অপূর্ব জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করিয়া এক অভিনব যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেন।"

স্বামিজী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, "একদিন প্রভাসে সমুদ্র-তীরে দাঁড়াইয়া দূর দিক্‌চক্রবালে আলোকমণ্ডিতশীর্ষ তরঙ্গমালার নৃত্যভঙ্গী দেখিতেছিলাম; সহসা যেন মনে হইল এই বিক্ষোভিত সিন্ধু অতিক্রম করিয়া আমাকে কোন সুদূর দেশে যাইতে হইবে; কিন্তু তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে বুঝিতে পারি না।"

এই সময় ঘটনাচক্রে স্বামী ত্রিগুণাতীত হিঙ্গুলাজ তীর্থে যাইবার পথে তথায় উপনীত হন। লিম্বডি রাজপ্রাসাদে একজন মহাপণ্ডিত 'পরমহংস' অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া দর্শনার্থে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, পরমহংস আর কেহই নহেন, তাঁহাদের প্রিয়তম নেতা নরেন্দ্রনাথ। কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিলেন, "ভাই সারদা! ঠাকুর যেসব কথা বলিতেন, যাহা আমি চপলতাবশতঃ তখন হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, এক্ষণে সেগুলির সত্যতা ক্রমে ক্রমে অনুভব করিতেছি। আমার মনে হয়, আমার ভিতর যে শক্তি আছে, তাহা দ্বারা জগৎ ওলট-পালট করিয়া দিতে পারি।" স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রস্থান করিলে পাছে অন্যান্য গুরুভাইগণ তাঁহার সংবাদ জানিয়া বিরক্ত করেন, এই আশঙ্কায় স্বামিজী পোরবন্দর পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকা, মাণ্ডবী, পালিটানা ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করিয়া বরোদায় আসিয়া বরোদারাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর মণিভাই-এর অতিথি হইলেন। এখানে তিনি তিন সপ্তাহ ছিলেন এবং মাঝে মাঝে দুই-এক দিনের জন্য মধ্যভারতের কয়েকটি স্থান দর্শন করেন। এইকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনসমষ্টির পরিচয় লাভের জন্য তাঁহার আগ্রহ যেন শতগুণ বর্ধিত হইয়াছিল। গুজরাট, কাথিয়াবাড় এবং বোম্বাই অঞ্চলের বহু ছোট বড় দেশীয় নৃপতি ও শাসকমণ্ডলীর সহিতও তিনি ইচ্ছা করিয়া পরিচিত হন। জনসাধারণের দারিদ্র্য, দুঃখ ও অজ্ঞতার প্রতিকারকল্পে ধনী রাজা মহারাজারা অগ্রসর হইলে কার্য অধিকতর সহজ হইবে, তৎকালে এই ধারণা তাঁহার ছিল। বরোদা হইতে খাণ্ডোয়া হইয়া একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পরিচয়পত্রসহ তিনি বোম্বাইয়ের ব্যারিষ্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসের অতিথি হন। এই সময় বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা কলিকাতার একখানি ইংরেজী খবরের কাগজে প্রকাশিত সহবাস-সম্মতির বয়স নির্ধারণ আইন সম্পর্কে বাদানুবাদের প্রতি স্বামিজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাঙ্গলার শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও যে নির্লজ্জভাবে এমন একটা আইনের প্রতিবাদ

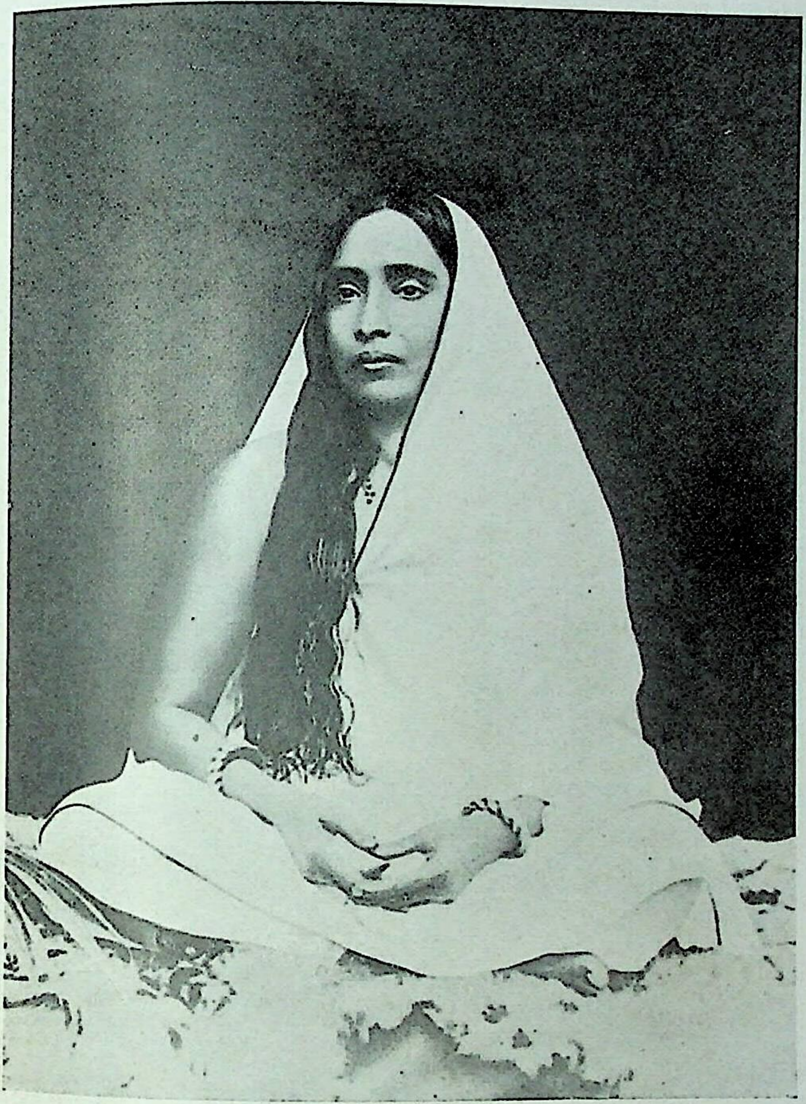

করিতে পারেন, ইহা দেখিয়া স্বামিজী মরমে মরিয়া গেলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বাল্যবিবাহের অসামঞ্জস্য ও কুফলের তীব্র সমালোচনা করিলেন। গৈরিকধারী একজন হিন্দু-সন্ন্যাসীর উদারভাব দর্শনে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত রাজনীতিক বিস্মিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

১৮৯২, সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে পুণাগামী ট্রেণের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে স্বামিজী বসিয়া আছেন, গাড়িতে আরও তিনজন মারাঠী যুবক যাত্রী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘোর তর্কযুদ্ধ চলিয়াছে। তর্কের বিষয় ছিল—সন্ন্যাস। দুইজন যুবক, রাণাডে ইত্যাদি সংস্কারকগণের প্রতিধ্বনি করিয়া সন্ন্যাসের অকর্মণ্যতা ও নানা দোষ প্রদর্শন করিতেছিলেন, অপর একজন তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া ভারতের সুপ্রাচীন সন্ন্যাসের মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন। এই যুবকই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। পার্শ্বে উপবিষ্ট সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তর্করত যুবকগণের যুক্তি ও উক্তি মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলেন; অবশেষে লোকমান্য তিলকের পক্ষাবলম্বন করিয়া তিনিও তর্কযুদ্ধে যোগ দিলেন। এই 'ইংরেজী-জানা' সন্ন্যাসীর প্রখর প্রতিভায় যুবকগণ বিশেষভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। স্বামিজী ধীরভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, সন্ন্যাসীরাই ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করিয়া জাতীয় জীবনের উচ্চাদর্শ সমগ্র ভারতে এতাবৎকাল প্রচার করিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি এই সন্ন্যাসই জাতীয় জীবনের আদর্শকে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও এতকাল শিষ্য পরম্পরায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ভণ্ড স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে মাঝে মাঝে সন্ন্যাস লাঞ্ছিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের সমগ্র সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে ব্যক্তিবিশেষের ভণ্ডামীর জন্য দায়ী করা অসঙ্গত। এই সুপণ্ডিত সন্ন্যাসীর বাক্‌বিভূতি ও গভীর পাণ্ডিত্য দর্শনে লোকমান্য তিলক মহারাজ মুগ্ধ হইলেন এবং পুণে ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া স্বামিজীকে স্বালয়ে লইয়া গেলেন। স্বামিজীও তিলক মহারাজের প্রখর প্রতিভা ও বেদাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখিয়া সানন্দে তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উভয়ে পরাধীন ভারতের সমস্যাগুলির আলোচনায় তৃপ্ত হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পুণায় তিলক-ভবনে যাপন করিয়া স্বামিজী মহাবালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একদিন লিম্বডির ঠাকুর সাহেব স্বীয় গুরুকে রাজপথে দীনবেশে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "এইরূপ অনর্থক ভ্রমণক্লেশ সহ্য করিতেছেন কেন? আর আপনাকে ছাড়িয়া দিব না। দয়া করিয়া আমার সঙ্গে চলুন, লিম্বডিতে আপনার স্থায়ীভাবে থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

স্বামিজী উত্তর করিলেন, "মহারাজ! একটা অদ্ভুত শক্তি আমাকে জোর করিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। ঠাকুর আমার স্কন্ধে এক মহান্ কার্যভার অর্পন করিয়া গিয়াছেন। যে পর্যন্ত না উহা শেষ হইবে, ততদিন বিশ্রাম করিবার আশা বৃথা। যদি জীবনে কখনও বিশ্রাম করিবার অবসর পাই, তাহা হইলে আপনার সহিত আসিয়া বাস করিব।"

বিবেকানন্দ আবার পথে বাহির হইলেন। মারমাগোয়া হইয়া বেলগামে উপস্থিত হইয়া একজন মারাঠী ভদ্রলোকের অতিথি হইলেন। তাঁহার পুত্র অধ্যাপক জি. এম. ভাটে তাঁহাদের অভিনব অতিথি সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা দেখি যে, সরল, উদার, অকপট স্বামিজীর পাণ্ডিত্য, নিরভিমান বিনয় এবং তীব্র জাতীয়তাবোধে স্থানীয় শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

বেলগামের বন-বিভাগের কর্মচারী হরিপদ মিত্র মহাশয় বাঙ্গালী সন্ন্যা পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ধর্মানুরাগে মুগ্ধ হইয়া সস্ত্রীক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইখানে স্বামি আমেরিকায় গিয়া শিকাগো-ধর্মসভায় যোগদানের অভিপ্রায় হরিপদবাবুর নি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিপদবাবু যখন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাঁদা সং করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন স্বামিজী তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। কয়েক পর মিত্র-দম্পতির নিকট বিদায় লইয়া স্বামিজী বেলগাম হইতে বাঙ্গালো উপস্থিত হইলেন।

মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান আর. কে. শেষাদ্রি বাহাদুর স্বামিজীর সঙ্গ আলাপ করিয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে মহারাজা চামরাজে ওয়াডিয়ারের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। মহারাজা তরুণ সন্ন্যাস অলৌকিক প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলেন। ব বাহুল্য, স্বামিজী শ্রদ্ধাস্পদ অতিথিরূপে রাজভবনে বাস করিতে লাগিলে মহীশূরাধিপ অত্যন্ত সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্বামিজী স সময় বালকের মত সরলভাবে মহারাজার কোন কার্যে ত্রুটি দেখিলে তাহ তীব্র সমালোচনা করিতেন; মহারাজা তাহাতে বড়ই আনন্দানুভব করিতে একদিন স্বামিজীর সস্নেহ ভর্ৎসনায় মহারাজা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করি কহিলেন, "স্বামিজী! আমি এত বড় একজন মহারাজা, আমাকে আপনার করা উচিত, খোসামোদ করা উচিত। ভবিষ্যতের জন্য আপনি সাবধান হই নতুবা আপনার জীবন সংকটাপন্ন হইতে পারে।"

স্বামিজী বালকোচিত সরলতার সহিত মহারাজার কথাগুলি বিশ্বাস করি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "আপনার অসংগত কার্য ও উক্তি সমর্থন করি জন্য তো বহু পারিষদ আছেন। আমি সন্ন্যাসী—সত্যই আমার তপস্যা। স জড়দেহের অনিষ্টাশংকায় সত্যকে পরিত্যাগ করিব? আপনি হিন্দুরাজা হ একজন হিন্দুসন্ন্যাসীর নিকট কি এইরূপ হীনোচিত কার্য প্রত্যাশা করেন

এইরূপ নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্যই স্বামিজী মহীশূরাধিপের প হইতে পারিয়াছিলেন। মহারাজা একদিকে যেমন তাঁহার সহিত পরিহাস রহস্যালাপ করিতেন, অপরদিকে তেমনি গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন; এমন একদিন মহারাজা স্বামিজীর পাদপূজা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কি স্বামিজী এমন প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, মহারাজাকে বাধ্য হ উক্ত সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। এই পার্থিব যশ-সম্মান ও ঐশ্ব আকাঙ্ক্ষাহীন সন্ন্যাসী যে স্বীয় অমল চরিত্রের প্রভাবে রাজাধিরাজ হইতে মেথরের পর্যন্ত হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

একদিন দেওয়ানজীর সভাপতিত্বে রাজপ্রাসাদে এক দার্শনিক বিচার আহূত হয়। বাঙ্গালোর নগরের প্রায় সমস্ত পণ্ডিতবর্গ এই বিচারসভায় যো করেন। স্বামিজীও মহারাজার অনুরোধে সভায় যোগদান করিলেন। বেদা বিচার আরম্ভ হইল। পণ্ডিতবর্গ বেদান্তের বিভিন্ন প্রকার মতবাদ স করিয়া বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বমত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় অপরের সম মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য তুমুল তর্কের ঝড় বহিল—তি বহুক্ষণেও তাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নিস্তব্ধ হই

অবশেষে দেওয়ানজীর অনুরোধে স্বামিজী দণ্ডায়মান হইয়া স পণ্ডিতমণ্ডলীকে শ্রদ্ধা সহকারে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় ল

মণ্ডিত মুখশ্রী ও বিদ্যুৎবর্ষী উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় অনতিবিলম্বেই বয়োবৃদ্ধ সুবিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। স্বামিজী স্বভাব-সুমধুর-কণ্ঠে সুললিত সংস্কৃতে, সর্বসংশয়চ্ছেদী বিভিন্ন প্রকার মতবাদগুলি যে পরস্পর-বিরোধী নহে, পরন্তু একে অন্যের পরিপূরক, ইহা অপূর্ব যুক্তিবলে প্রমাণ করিয়া বুঝাইলেন। বেদান্তশাস্ত্র কতকগুলি দার্শনিক মতবাদের সমষ্টি নহে, উহা সাধক-জীবনের বিভিন্নাবস্থায় অনুভূত সত্যসমূহ। অতএব একটিকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে হইলে আপাতবিরুদ্ধ অপরটিকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। স্বামিজীর অভিনব বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী চমৎকৃত হইলেন এবং সমস্বরে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজা বলিলেন, "স্বামিজী! আপনার জন্য কিছু করিতে পারিলে বড়ই সন্তুষ্ট হইতাম; আপনি তো কিছুই গ্রহণ করিবেন না।"

স্বামিজী তাঁহার ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে দেশের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আমাদের বর্তমান প্রয়োজন পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সহায়ে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করা; কিন্তু ইউরোপীয়দিগের দ্বারে দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র ক্রন্দন ও ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। উহারা যেমন বর্তমান উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দিবে, বিনিময়ে আমাদেরও উহাদিগকে কিছু দিতে হইবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে দিবার মত এক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্যতীত আর কি আছে? সেইজন্য সময় সময় আমার ইচ্ছা হয় যে, বেদান্তের অত্যুদার ধর্ম প্রচার করিতে পাশ্চাত্য-দেশে গমন করিব। যাহাতে এই আদান-প্রদান সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীরই স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় চেষ্টা করা কর্তব্য। আপনার ন্যায় মহাকুলপ্রসূত শক্তিশালী রাজন্যবর্গ চেষ্টা করিলে অল্পায়াসেই কার্য আরম্ভ হইতে পারে। আপনিই এই মহৎকার্যে অগ্রসর হউন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

মহারাজা অভিনিবেশ সহকারে স্বামিজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, স্বামিজী যদি পাশ্চাত্যদেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে গমন করেন, তাহা হইলে তিনি সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন; এমন কি, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কয়েক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। স্বামিজী প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি এখনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। আমি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই পরিব্রাজব্রত উদ্‌যাপিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিব না—এমন কি, তাহার পর কি করিব, কোথায় যাইব, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।"

অবশেষে একদিন স্বামিজীকে বিদায় লইতে উদ্যত দেখিয়া মহারাজা তাঁহাকে বিবিধ বহুমূল্য দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন। স্বামিজী উহার মধ্য হইতে বহু অনুরোধে বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি ধাতবদ্রব্যের সংস্রবহীন ক্ষুদ্র চন্দন-কাষ্ঠের হুঁকা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। দেওয়ানজী স্বামিজীর ক্ষুদ্র পুঁটলীর মধ্যে একতাড়া নোট গুঁজিয়া দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া স্বামিজী অগত্যা তাঁহার নিকট হইতে কোচিন পর্যন্ত একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে টিকিট লইলেন। দেওয়ানজী কোচিন রাজ্যের দেওয়ানজীর নিকট একখানি পরিচয়-পত্র দিয়া

বলিলেন, "স্বামিজী! আমার একটি অনুরোধ দয়া করিয়া রাখিবেন। আ
পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া কষ্টভোগ করিবেন না; কোচিন রাজ্যের দেওয়ানজী আপ
শ্রীশ্রীরামেশ্বর পর্যন্ত যাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।"

মহীশূরের দেওয়ান স্যার শেষাদ্রি আয়ারের সহিত স্বামিজীর প্রগাঢ় ব
আমরণ অক্ষুণ্ণ ছিল। স্বামিজী আমেরিকা হইতে স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করি
এবং ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে দেওয়ানজীর সহিত পত্রালাপ করিতে
স্বামিজী আমেরিকায় সাফল্যলাভ করিবার পর কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় ধ
প্রচারক তাঁহার কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করেন। বিবেকানন্দ প্রত্যাশা করি
ছিলেন, ভারত হইতে ইহার প্রতিবাদ হইবে। কিন্তু তাহা হইতেছে না দেখি
তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া দেওয়ানজীকে একখানি পত্র লেখেন। দেওয়ানজী
উত্তর পাইবার পর স্বামিজী (২০শে জুন, ১৮৯৪) শিকাগো হইতে তাঁহ
যে পত্র লেখেন, তাঁহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব, আপনার সহৃদয় পত্রখানি আজই পাইলাম। আ
হঠকারিতার সহিত কঠিন কথা লিখিয়া আপনার মহৎ হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি, তজ্জ
দুঃখ বোধ করিতেছি। আপনার মৃদুভাষায় সংশোধনগুলি শিরোধার্য করিলা
"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"—গীতা। কিন্তু আপনি ভাল করি
জানেন, আমি ভালবাসার প্রেরণা হইতেই ঐরূপ লিখিয়াছি। নিন্দুকেরা পরো
ভাবেও আমার কোন উপকার করে নাই, অন্যদিকে আমার গুরুতর ক্ষ
করিয়াছে। একথা তো সত্য যে হিন্দুরা, আমি যে তাহাদের প্রতিনিধি এ
আমেরিকানদের জানাইবার জন্য একটি অঙ্গুলীও উত্তোলন করে নাই। আ
প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য আমেরিকানদের ধন্যবাদ দিয়া এবং আমি যে তাহা
প্রতিনিধি একথা জানাইবার জন্য আমার স্বদেশবাসী কি করিয়াছে? * *
তাহারা আমেরিকানদের বলিতেছে, আমি আমেরিকায় আসিয়া সন্ন্যাসী সাজি
আসলে আমি একজন প্রতারক ছাড়া কিছুই নই। ইহাতে আদর অভ্যর্থনার
হইতে কোন ইতরবিশেষ হয় নাই, কিন্তু আমার কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ ব্যা
অনেকে ইহার ফলে হাত গুটাইয়া লইতেছেন। আমি এক বৎসর হইল এ
আসিয়াছি, অথচ ভারতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও আমেরিকানদের এ
বলিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না যে, আমি প্রতারক নহি। ইহা ছাড়া এখন
পাদ্রীরা আমার বিরুদ্ধে প্রচারিত মতামত সংগ্রহ করিতেছে, ভারতের খৃ
কাগজগুলি হইতে আমার নিন্দাসূচক উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া প্রচার করিতে
আপনি ভাল করিয়াই জানেন যে এখানকার লোকেরা ভারতে খৃষ্টান ও হি
মধ্যে পার্থক্য কতখানি তাহা অল্পই বুঝে।

"আমি প্রধানতঃ এদেশে আমার স্বদেশের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করি
আসিয়াছি। * * * দেওয়ানজী সাহেব, ইহার জন্য সঙ্ঘ ও অর্থ দুইই আব
—প্রথম দিকে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য কিছু অর্থ চাই। কিন্তু ভারতে আমা
কে টাকা দিবে? *** এই কারণেই আমি আমেরিকায় আসিয়াছি। আপ
মনে আছে, আমি দরিদ্রদের নিকট ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়াছি, ধনী
টাকা লই নাই, কেননা তাঁহারা আমার ভাব ও আদর্শ বুঝে না। * * *
বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীরা আমেরিকানদের এটুকু পর্য
বলিতে পারিল না যে, আমি প্রতারক নহি, সত্যসত্যই সন্ন্যাসী এবং হিন্দু
প্রতিনিধি। ইহাতে কয়েকটি কথা মাত্র খরচ—ইহাও তাহারা করিল না। ধ
আমার স্বদেশবাসিগণ! দেওয়ানজী সাহেব, আমি ইহাদের ভালবাসি। *

আমার দীর্ঘ পত্রে আমার কর্মপ্রণালী বিস্তারিত লিখিলাম। * * * প্রিয় বন্ধু, আপনি আমাকে কল্পনা-বিলাসী বা স্বপ্নাতুর ভাবিতে পারেন, কিন্তু অন্ততঃ এটুকু বিশ্বাস করিবেন, আমি অকপট এবং আমার সর্বপ্রধান দোষ এই আমি আমার স্বদেশকে সর্বহৃদয় দিয়া ভালবাসি—গভীরভাবে ভালবাসি।”

কোচিনের রাজধানী ত্রিচুড়ে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া রমণীয় মালবার প্রদেশের মধ্য দিয়া স্বামিজী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে উপস্থিত হইলেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহশিক্ষক অধ্যাপক সুন্দরম্ আয়ার তাঁহাকে সমাদরের সহিত অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী তাঁহার মধ্যস্থতায় ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, দেওয়ান বাহাদুর এবং প্রিন্স মার্তণ্ড বর্মার সহিত আলাপ করেন। উক্ত রাজকুমারের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী উত্তর ভারত, রাজপুতানা এবং পশ্চিম ভারতের দেশীয় নৃপতিদের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে বরোদার গাইকোয়াড়ের বিদ্যাবত্তা, কর্মকুশলতা ও দেশপ্রীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি স্বামিজীর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় মুগ্ধ হন। এইকালের কথা স্মরণ করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের এস. কে. নায়ার লিখিয়াছেন—

“বিখ্যাত পণ্ডিত মহারাজা-কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক রঙ্গচারিয়ার এবং স্বামিজী উভয়েই ইংরাজী ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত; তাঁহারা পরস্পরের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া সুখী হইতেন। স্বামিজীর সহিত কিছুকাল আলাপ করিলেই তাঁহার প্রখর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইত না এমন ব্যক্তি বিরল। সম্মিলিত বা পৃথকভাবে বহু ব্যক্তির বিভিন্ন শ্রেণীর প্রশ্নের যুগপৎ উত্তর দিবার তাঁহার পরমাশ্চর্য দক্ষতা ছিল। কখনো স্পেনসার, কখনো সেক্সপীয়র, কখনো কালিদাস, কখনো বা ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, ইহুদী জাতির ইতিহাস, আর্যসভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তি, বেদ, ইস্‌লাম ধর্ম অথবা খৃষ্টান ধর্ম—যে কোন বিষয়েই প্রশ্ন হউক না কেন, স্বামিজী সঙ্গত উত্তর দিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। তাঁহার সর্বাবয়ব মহত্ত্ব ও সরলতা মণ্ডিত। পবিত্র হৃদয়, অনাড়ম্বর জীবন, উদার ও প্রাণখোলা ব্যবহার, দূরপ্রসারী জ্ঞান ও গভীর সহানুভূতিই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব।”

মাদুরায় রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সুপণ্ডিত রাজা স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য শিক্ষা বিস্তার ও কৃষির উন্নতি বিষয়ে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীকে আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত আলোচনা করিতে দেখিয়া রাজা বিস্মিত হন। স্বামিজী বলিলেন, মোক্ষ সন্ন্যাসীর লক্ষ্য হইলেও ভারতবর্ষের জনমণ্ডলীর উন্নতি সাধনের চেষ্টাও যে মোক্ষলাভের সোপান, আমি গুরুর নিকট এই আদর্শই পাইয়াছি। মাদুরায় কয়েকদিন কাটাইয়া বন্ধনমুক্ত সিংহের ন্যায় স্বামিজী দক্ষিণ ভারতের বারাণসী রামেশ্বরে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিব এবং সুবৃহৎ মন্দিরাদি দর্শন করিয়া কন্যাকুমারী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

স্বামিজীর অপূর্ব ভারত-ভ্রমণ-কাহিনী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব বিধায় সংক্ষেপে সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলাম। কখনও বা রাজাধিরাজের শীতল মর্মর-হর্ম্যে বিশ্রামরত স্বামিজী—পার্শ্বে নরপতি আদেশ পালনের জন্য যুক্তকরে দণ্ডায়মান; কখনও বা রৌদ্রদীপ্ত প্রচণ্ড-মরুর তপ্ত-বালুকাপূর্ণ বক্ষে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর স্বামিজী—সম্মুখে সামান্য বণিক খাদ্য-পানীয়ের লোভ দেখাইয়া ব্যঙ্গপরায়ণ। কখনও বা রাজা, মহারাজা, উচ্চবংশজাত

ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আগ্রহপূর্ণ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া দরিদ্র চর্মক গৃহে ভিক্ষা গ্রহণপূর্বক তাহাকে কৃতার্থ করিতেছেন; আবার কখনও বা ক্রমা পাঁচ ছয় দিবস নিয়মিত আহার-পানীয় বিবর্জিত হইয়া তরুতলে ব প্রসন্নহাস্যে, ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। আদর, সম্মান, ভক্তি, উপেক্ষ তাড়না কিছুতেই তাঁহার চিত্ত বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। সে অপূ তিতিক্ষা, অসীম ধৈর্য, অলৌকিক ত্যাগশক্তি, অপার পরদুঃখকাতরতা মান ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমরা যাহাকে দুঃখকষ্ট বলি, যাহার সামান্য স্প আমরা ব্যথিত চিত্তে আর্তনাদ করিয়া "ভগবানের বিচার নাই" বলিয়া ধি দেই. মূর্তিমান সন্ন্যাস এই মহাপুরুষ অবিচলিতভাবে তাহা সহ্য করিয়াছেন কেবল সহ্য নয়—ঐগুলি লইয়া তিনি যেন আনন্দে উন্মত্ত। তিনি দুঃখকষ্ট হই পলায়নের চেষ্টা কোনদিন করেন নাই, বরং স্বীয় সমগ্র যোগৈশ্বর্য গোপন করি মানবজাতির সমগ্র দুর্বলতা সমগ্র পাপভার সমগ্র দুঃখকষ্ট নিজস্কন্ধে বহন করি আমাদের মত মানুষ সাজিয়া, জগতের কল্যাণ কামনায় নবজাগরণের পুণ্যবা লইয়া প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া গিয়াছেন। ইহাপেক্ষা অধিক স্বার্থত্য অধিক তপস্যা বর্তমান যুগে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। স্বামিজী ভারত-ভ্র বহির্গত হইবার প্রাক্কালে জনৈক ভক্তিভাজন বন্ধুকে এক পত্রে লিখিয়াছিলে "আশীর্বাদ করিবেন, যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং স প্রকার মায়া আমা হইতে দূরাপহত হইয়া যায় —for 'we have take up the cross, Thou has laid it upon us and grant us streng that we bear it unto death. Amen'—The Imitation of Chri

কারণ—"আমরা জগতের দুঃখকষ্টরূপ ক্রুশ ঘাড়ে করিয়াছি, হে পিতঃ, তু আমাদিগকে বল দাও, যেন উহা আমরণ বহন করিতে পারি।"

এই অশান্ত ভ্রমণের মধ্য দিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আচার-ব্যব রীতি-নীতির পরিচয় পাইয়া স্বামিজী যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, ত সামান্য নহে। কিন্তু সর্বোপরি জনসাধারণের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কা ফলস্বরূপ দুঃখই তাঁহার বিশাল হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। আম দেখিতে পাই, তাঁহার পরিব্রাজক জীবনে তিনি প্রায় সর্বদাই রাজ-রাজড়া অতিথি হইয়াছেন, যাচিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়াছেন। এই কালে তাঁহ ধারণা ছিল, পাশ্চাত্যভাবে উন্মত্ত, অপরিমিত বিলাসী এবং অমিতব্যয়ী দে রাজাদিগের চিত্তে জাতির প্রতি সহানুভূতি সঞ্চারিত হইলে জনসাধারণের ক হইবে।* তিনি মনে করিতেন, ইহারা বিলাসে যে অর্থ ব্যয় করে তাহার কিয়দ

---

* ১৮৯৪ সালের ২৩শে জুন শিকাগো হইতে স্বামিজী মহীশূরের মহারাজাকে এ পত্রে লিখিয়াছিলেন—" * * * ভারতের সর্ববিধ দুর্গতির মূল কারণ দরিদ্র জনসাধা দুরবস্থা। পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্ররা বর্বর, তুলনায় আমাদের দেশের দরিদ্ররা দেব-প্রকৃতি; এ কারণে আমাদের দেশের দরিদ্রের উন্নতিবিধান সহজে সম্ভবপর। আমাদের নিম্নশ্রেণীগ প্রতি একমাত্র কর্তব্য তাহাদের শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের প্রনষ্ট ব্যক্তিত্বকে বিকশিত ক তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, তোমরাও মানুষ; চেষ্টা করিলে সকলের মত তোমরাও উন্ন লাভ করিতে পার। এই বোধ তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের জনসাধারণ এ নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে সেবার এই বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র। এ-পর্যন্ত এদিক দিয়া কিছুই করা হ নাই। গুরু-পুরোহিতকুল এবং বিদেশী রাজশক্তি দ্বারা শত শত শতাব্দী পদদলিত হও ফলে, তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ।

"তাহাদিগকে আদর্শ ideas দিতে হইবে: তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে যাহা জগতে কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই মুক্তির প

শিক্ষা বিস্তার ও কৃষির উন্নতিতে নিয়োগ করিলে জনসাধারণের সুনিশ্চিত কল্যাণ হইতে পারে, এবং ইহারা পাশ্চাত্য বিলাসের অনুকরণ না করিলে, ইহাদের দেখাদেখি সাধারণ ধনীরাও স্বজাতির সহিত সামাজিকতা ছিন্ন করিয়া সাহেবীয়ানায় অভ্যস্ত হইবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহার এই ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছিল। দেশের কল্যাণের জন্য রাজা মহারাজা ধনী অপেক্ষা তিনি চরিত্রবান শিক্ষিত যুবকদের প্রতিই অধিক নির্ভরশীল হইয়াছিলেন। যুবক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিন্তা ও চরিত্রের অতি দ্রুত পরিবর্তন এই কালে হইয়াছিল। ১৮৮৮-তে যে অশান্ত পরিব্রাজক বরাহনগর মঠ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়াছিল, আর ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে যে বিবেকানন্দকে আমরা দাক্ষিণাত্যের পথে পথে ভ্রমণ করিতে দেখিলাম, এই দুই সম্পূর্ণ না হইলেও পৃথক ব্যক্তি। এমন আশ্চর্য মানসিক বিকাশ অতি অল্প মানবেই সম্ভব। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মংগলহস্ত যেন আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করিয়া, তাঁহাকে ভারত ভ্রমণের ছলে জাতীয় জীবনের মর্মান্তিক সমস্যার সহিত মুখোমুখি করিয়া দিলেন।

সম্মুখে অনিলান্দোলিত বীচি-বিক্ষোভময়ী উচ্ছ্বসিত সুনীল জলধি; পশ্চাতে মরু-গিরি-কান্তার-পরিশোভিতা শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ—আর তাহার সর্বশেষ প্রস্তরখানির উপর যোগাসনে সমাসীন নব্য ভারতের মন্ত্রগুরু—পরিব্রাজকাচার্য বিবেকানন্দ! কি মহিমময় দৃশ্য!

স্বামিজী ভাবিতেছেন, শ্রীগুরুর আদেশবাণী শিরোধার্য করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি; ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ, রাজা, মহারাজা, পণ্ডিত, মূর্খ

বাছিয়া লইতে পারিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক পুরুষ ও নারী প্রত্যেককেই স্ব স্ব মুক্তিবিধানের পথ করিয়া লইতে হয়। তাহাদের কেবল এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে যে কতকগুলি কার্যকরী আদর্শ দেওয়া,—অবশিষ্ট যাহা কিছু তাহার ফলস্বরূপ আপনিই আসিবে। আমাদের কাজ হইল রাসায়নিক উপাদানগুলি একত্র সমাবেশ করা, প্রাকৃতিক নিয়মেই সেগুলি দানা বাঁধিয়া উঠিবে। আমাদের কর্তব্য তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব ঢুকাইয়া দেওয়া। বাদ বাকী যা কিছু তাহারাই করিয়া লইবে। ভারতের জন্য ইহাই প্রয়োজন। অনেকদিন হইল, আমার মনে এই কার্যপ্রণালীর ভাবগুলি রহিয়াছে। ভারতে তাহার সার্থকতার উপায় না দেখিয়া আমি এদেশে আসিয়াছি।

“আমাদের দেশের দরিদ্রদের শিক্ষাদানের পথে বিঘ্ন প্রচুর। ধরিয়া লওয়া যাক, মহারাজা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইবে না। কেননা, ভারতে দারিদ্র্য এত ভয়াবহ যে গরীবের ছেলেরা পিতার সাহায্যের জন্য কৃষিক্ষেত্রে যাইবে, অথবা অন্যত্র কিছু উপার্জন করিবার চেষ্টা করিবে। বিদ্যালয়ে আসা তাহার পরের কথা। যদি দরিদ্র বালক শিক্ষাকেন্দ্রে না আসিতে পারে, তাহা হইলে শিক্ষা তাহার গৃহে লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের দেশে হাজার হাজার একাগ্রলক্ষ্য আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া ধর্মপ্রচার করিয়া থাকেন। ইহাদের একটা অংশকে যদি লৌকিকবিদ্যা-শিক্ষকরূপে সংঘবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে গিয়া ধর্মপ্রচারের সহিত শিক্ষাও দিতে পারিবেন।

“মনে করুন এমন দুইজন শিক্ষক ম্যাজিক লণ্ঠন, ভূগোলক, মানচিত্র, প্রভৃতি লইয়া অপরাহ্ণে কোন গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা অজ্ঞলোকদের জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, বিভিন্ন দেশ ও জাতির গল্প শুনাইতে পারেন। সাধারণ লোক এক জীবনে বই পড়িয়া যাহা না শিখিতে পারে, কানে শুনিয়া তার চেয়ে বেশী শিখিতে পারিবে। ইহার জন্য প্রয়োজন একটি সংঘের এবং সংঘ গঠন করিতে অর্থের আবশ্যক। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার মত মানুষ ভারতে যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের অর্থ নাই। চাকা ঘুরানই কঠিন, একবার ঘুরাইয়া দিতে পারিলে ক্রমশঃ তাহার গতিবেগ বর্ধিত হয়। আমি আমার স্বদেশে সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিয়াছি, ধনীদের সহানুভূতি উদ্রেক করিতে পারি নাই।”

ঈর্ষাদ্বেষ ছিল না—ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর প্রতিবেশিগণই তাঁহার সমান প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সত্যবাক্য, সত্যব্যবহার তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—নির্ভীকভাবে অপ্রিয় সত্য লোকের মুখের উপর দ্বিধাহীন চিত্তে বলিয়া ফেলিতেন। সেজন্য সময় সময় শাসিত হইতেন বটে, কিন্তু তথাপি সত্য গোপন করিতে পারিতেন না।

কৈশোরে নিজেকে শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচয় দিতে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করিতেন। কেহ তাঁহার যুক্তিপূর্ণ কথা বালকের ধৃষ্টতা জ্ঞানে উপেক্ষা করিলে নরেন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হইতেন। তর্কের সময়ে তাঁহার গুরুলঘু জ্ঞান থাকিত না। এমন কি, অবজ্ঞাত হইলে বালকের কঠোর সমালোচনা হইতে তাঁহার পিতৃবন্ধুগণ পর্যন্ত নিষ্কৃতি পাইতেন না। অবশ্য বিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে জব্দ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার মত হীনতা তাঁহার ছিল না। গভীর আঘাত না পাইলে তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইতেন না। তাঁহার এই সমস্ত ঔদ্ধত্য বিশ্বনাথ মার্জনা করিতেন না, বরং যথাযথ শাসন করিতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিতেন বটে, কিন্তু পুত্রের প্রবল আত্মনিষ্ঠা দেখিয়া অন্তরে অন্তরে হৃষ্ট হইতেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই নরেন্দ্র পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহখানি দেখিয়া তাঁহার বয়স অনেকেই বিশ বৎসর অনুমান করিতেন। নিয়মিতভাবে শরীর চালনার জন্য কুস্তি ইত্যাদিতে তিনি বাল্যকাল হইতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তৎকালে হিন্দুমেলা প্রবর্তক নবগোপাল মিত্র মহাশয় শিমলা-পল্লীতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর একটি ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ এই আখড়াতে নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিতেন। প্রথম যৌবনে তিনি একবার “বক্সিং” খেলায় সর্বপ্রথম হইয়া একটি রৌপ্যনির্মিত প্রজাপতি উপহার পাইয়াছিলেন। তৎকালীন ছাত্রসমাজে উত্তম ক্রিকেট খেলোয়াড় বলিয়াও তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল।

বিশ্বনাথ উত্তম রন্ধন করিতে পারিতেন। নরেন্দ্র রায়পুরে অবস্থানকালীন পিতার নিকট নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন। কলেজে পাঠকালীন তিনি সময় সময় বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করাইতেন। নরেন্দ্র আজীবন রন্ধনপ্রিয় ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াও তিনি এই রন্ধনপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রায়ই বিবিধপ্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শিষ্যবর্গকে যত্নের সহিত স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আনন্দানুভব করিতেন।

প্রায় দুই বৎসর পর প্রিয়দর্শন নরেন্দ্রনাথ শারীরিক ও মানসিক বিচিত্র পরিবর্তন লইয়া রায়পুর হইতে বন্ধুবর্গের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। বহুদিন পর তাঁহাকে পাইয়া সকলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। প্রায় দুই বৎসর অনুপস্থিত থাকার দরুণ তাঁহাকে প্রবেশিকা শ্রেণীতে ভর্তি হইতে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইল। অবশেষে তাঁহার গুণমুগ্ধ শিক্ষকগণ কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষভাবে অনুমতি লইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি দুই বৎসরের পাঠ্যপুস্তক কঠোর পরিশ্রমের সহিত এক বৎসরেই আয়ত্ত করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং প্রশংসার সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ নরেন্দ্রের কৃতকার্যতায় সমধিক প্রীতিলাভ করিলেন, কারণ সেবার একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসানে অধ্যয়নকালীন একজন পুরাতন সুদক্ষ শিক্ষক

কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন উদ্যোগী ছাত্র তাঁহাকে বিদায়াভিনন্দন দিবার জন্য প্রস্তুত হন। আগামী পুরস্কার-বিতরণী সভায় তাঁহারা শিক্ষক মহাশয়কে অভিনন্দিত করিবেন স্থির হইল। দেশবিখ্যাত বাগ্মিপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কে বক্তৃতা করিবে ভাবিয়া লাজকুণ্ঠিত বালকগণ আকুল হইল। অবশেষে সকলের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথই বক্তারূপে নির্বাচিত হইলেন। নরেন্দ্র সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রায় অর্ধঘণ্টা স্বীয় স্বভাবমধুরকণ্ঠে সুললিত ইংরাজীতে উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের গুণাবলী বর্ণনা করিলেন। তিনি বক্তৃতা শেষ করিলে সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া গভীর প্রীতির সহিত নরেন্দ্রের বক্তৃতার প্রশংসা করিলেন। সেকালে ষোড়শ কি সপ্তদশবর্ষীয় কিশোর বালকের পক্ষে জননেতা সুরেন্দ্রনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা কম দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতার পরিচায়ক নহে।

যে সমস্ত মহাপুরুষ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের চিন্তা-রাজ্যে পরিবর্তন আনিয়াছেন, দেশের ও দশের কল্যাণকামনায় অমিত বীর্য লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে কর্ম করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে বাল্যকাল হইতেই স্বীয় অসাধারণত্ব স্বল্পবিস্তর অনুভব করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথেরও যে সময় সময় ঐরূপ চিন্তা না আসিত এমন নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অন্যান্য বালকগণের সহিত তুলনায় অনেক সময় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতেন। সেইজন্যই তাঁহার আত্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সাধারণের দৃষ্টিতে অহঙ্কার বলিয়া মনে হইত। অহঙ্কার হইলেও উহা পরপীড়ক ছিল না—তাহা হইলে তিনি সহপাঠী এবং প্রতিবেশী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয় আকর্ষণ করিতে কখনও সমর্থ হইতেন না।

নরেন্দ্রনাথের চরিত্রে যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর, সমস্তই তাঁহার সুশিক্ষিতা মার্জিতরুচি জননীর সুশিক্ষা ও যত্নের ফল। সন্তানগণের চরিত্রে যাহাতে কোনপ্রকার নীচতা স্থান না পায়, সেজন্য তিনি সর্বদা সাবধানে থাকিতেন। মাতৃভক্ত নরেন্দ্র কোনদিন জননীর আদেশ লঙ্ঘন করিতেন না। সন্তানকে মানুষের মত মানুষ দেখিবার জন্য কোন্ জননীর না আগ্রহ হয়? কিন্তু সকলে কেমন করিয়া মানুষ গড়িয়া তুলিতে হয় জানেন না। আধুনিক বঙ্গজননীগণ পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হইয়া যখন অজ্ঞাতসারে দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের হৃদয় ঈর্ষাবিষে কলুষিত করিয়া তুলিতে থাকেন, তখন তাঁহারা ভাবিবার অবসর পান না যে, দৈবজ্ঞ কথিত "অসাধারণ লক্ষণাক্রান্ত" বালক ভবিষ্যতে একজন পরশ্রীকাতর, সঙ্কীর্ণচেতা, হীন বিলাসী "বাবু"তে পরিণত হইবে মাত্র! বাঙ্গলার জনকজননী সন্তান উৎপাদন করিতে ও প্রসব করিতে সুদক্ষ, কিন্তু কেমন করিয়া মানুষ গড়িয়া তুলিতে হয় জানেন না, শিখেন না, ভাবেনও না। গতানুগতিকভাবে তিনবেলা আহার করাইয়া বিশ্বসংসারে পরের এঁটোপাত হইতে দুমুঠো খুঁটিয়া খাইবার জন্য সন্তানগণকে ছাড়িয়া দেন—ফলে দেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য, কিন্তু "মানুষ" ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে।

জননী ভুবনেশ্বরী সিংহিনী ছিলেন বলিয়াই না নরেন্দ্রনাথের মত পুরুষসিংহ প্রসব করিয়াছিলেন! নারীসুলভ কোমলতার অন্তরালে তাঁহার চরিত্রে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল, যাহা অন্যায়, অসত্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বদা সদর্পে শির উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হইত। স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিবার পরেও এই মহিমময়ী মহিলা নয় বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার আদরের পুত্র নরেন্দ্রনাথকে জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দে পরিবর্তিত হইতে দেখিয়াছিলেন। জগৎ মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখিয়াছে, এই তেজস্বিনী রমণী, পূত ভাগীরথী-তীরে স্বীয়

পুত্রের চিতাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অকম্পিতপদে শেষ প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছেন। তিনি বিবেকানন্দের জননী, এ গৌরবগর্ব তাঁহার সংযম-সাধন-ক্লিষ্ট সৌম্যমুখ-মন্ডলে সর্বদা জাগ্রত থাকিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাবিমিশ্র সম্ভ্রম-দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তাঁহার দেহান্ত হয়।

পিতা ও মাতার স্নেহ-ক্রোড়ে প্রাচুর্যের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর-জীবন হাসি, আনন্দ, খেলাধুলায় কাটিয়াছে। তাঁহার বাল্যজীবন অলৌকিক বা অসাধারণ না হইলেও অনুপম। ষোল বৎসর বয়সেই তিনি যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রবল আত্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানার্জনের প্রবল আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহা দুর্লভ। পিতার নিকট তিনি বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং গীতবাদ্যেও তাঁহার অধিকার ঐ কালে নিতান্ত কম ছিল না। এই মেধাবী, তেজস্বী, চঞ্চল-চপল বালক, একদিকে যেমন পরিহাসরসিক, ক্রীড়াপ্রিয়, উগ্রস্বভাব ছিলেন, অপর দিকে তেমনি গভীর চিন্তাশীল, দয়ালু, বন্ধুবৎসলও ছিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা অকপট সারল্য ফুটিয়া উঠিত, যাহাতে তিনি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রিয় হইতেও প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করিবার পর হইতেই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নরেন্দ্রের সহজ ও স্বাভাবিক জীবনের এক বিচিত্র রহস্য-জটিল অধ্যায় আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংস্কার যুগ

(১৮০০-১৮৮০)

"সংস্কারকেরা বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন, আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রসূতিকে' বুঝিবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের মধ্য দিয়া যান নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যা মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি।"

—বিবেকানন্দ

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে আদর্শভ্রষ্ট আত্মবিস্মৃত দুইটি মহাজাতির বংশধরগণ নিশ্চয় ধর্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অধঃপতনের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বিধাতার অলক্ষ্য বিধানে এই দৌর্বল্য ও জড়ত্বের শাস্তি অতি নিদারুণ হইয়া দেখা দিল। মোগল-সাম্রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠিত ময়ূর-সিংহাসন দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল, নববল-দৃপ্ত মহারাষ্ট্র জাতির গৌরবময় অভ্যুত্থানের উন্নত মস্তক ইতিহাসের নির্মম বজ্রদণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল, বণিক ইংরাজের মানদণ্ড সহসা ভারতবাসীর মস্তকের উপর রাজদণ্ড হইয়া দেখা দিল, শিখ-গরিমা-সূর্য উদয়াচল-শিখরেই নিভিয়া গেল। দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যেমন নিঃসহায়ভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ একসঙ্গে নতশিরে ইসলাম রাজশক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঠিক তেমনিভাবে হিন্দু ও মুসলমান—দুই নিরুপায় সম্প্রদায় একরূপ অপ্রতিবাদেই ইংরাজের পদানত হইয়া পড়িল। এই অভিনব রাজনৈতিক পরিবর্তনে পশ্চিমদেশাগত বণিক-ব্যাধ-নিকরের সুলভ-মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত ভারতবর্ষের দৈন্য ও দৌর্বল্যের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

আদর্শভ্রষ্ট ছত্রভঙ্গ হিন্দুজাতি সমগ্র মুসলমান-যুগেও প্রাণপণ বলে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে অব্যাহত রাখিয়া আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে এক বিপরীত শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে প্রাচীন সমাজের পুরাতন রক্ষণশীলতা কোনই কাজে আসিল না। মুসলমান-শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে যে কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, সেইগুলির বিচারহীন অনুকরণ এই অভিনব শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবকে বাধা দিতে পারিল না। কাল ও অবস্থাভেদে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার নব নব ব্যবস্থা করিতে একান্ত অপারগ হিন্দুসমাজ বহু-শতাব্দী-সঞ্চিত কুসংস্কারের ভারে প্রায় সকল দিক দিয়া পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। বিজিত জাতি সহজেই বিজয়ী জাতির গুণ-গরিমায় অভিভূত হইয়া পড়ে। কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে আত্মবিস্মৃত হিন্দুজাতির সম্মুখে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সভ্যতা যেদিন মরু-মরীচিকার সম্মোহিনী শক্তি লইয়া সুরঞ্জিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বৈচিত্র্যময় দৃশ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সেদিন ভারতের ইতিহাসে—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ইতিহাসে এক নবীন অধ্যায় আরম্ভ হইল। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর কথা

বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এ জাতির উচ্চশ্রেণীর মত ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসী এত অসংযতভাবে প্রতীচী-সভ্যতা-স্রোতে ভাসিয়া যাইবার চেষ্টা করে নাই। ফলে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সহিত প্রাচ্যের সংঘর্ষণে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, দাসসুলভ পরানুকরণ-প্রবৃত্তির চাপল্য সমাজ-জীবনে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল, তাহা বাঙ্গলাদেশেই প্রবলাকার ধারণ করিল, আর এই আন্দোলনসমূহের কেন্দ্রস্থল হইল—ভারতের নব-প্রতিষ্ঠিত রাজধানী কলিকাতা-নগরী।

এদেশে ইংরাজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান মিশনরীরা নিরুদ্বেগে 'হিদেন'দিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন, দলে দলে মিশনরী আসিতে লাগিলেন। ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়া প্রথমেই তাঁহাদিগকে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইত। ক্রমে ধর্মপ্রচারের বাধাগুলি চিন্তা করিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে প্রচারকার্য অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে চলিবে। এইরূপে তাঁহারা স্থানে স্থানে বিদ্যালয় খুলিতে লাগিলেন এবং শিক্ষার ভিতর দিয়া কোমলমতি বালক ও তরলমতি যুবকবৃন্দের চিত্তে প্রাণপণে খৃষ্টধর্মের মহিমা মুদ্রিত করিতে প্রয়াসী হইলেন। অবশ্য কোন কোন উদারহৃদয় মিশনরী বা ইংরাজ যে কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের জন্যই শিক্ষাপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং বাধা ও বিপত্তির সহিত যথেষ্ট যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীজাতি এত অকৃতজ্ঞ নহে যে, তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি সহজে জাতীয় ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিবে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম কলিকাতা সহরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। ঠিক সেই বৎসর আধুনিক শিক্ষার অন্যতম জনক ডেভিড্ হেয়ার বাঙ্গলা দেশে আগমন করিলেন। এই মহাপুরুষ নাস্তিক নীতিপরায়ণ ও মানবহিতৈষী ছিলেন। কিছুদিন পর ইনি বিষয়কর্ম ছাড়িয়া একমাত্র শিক্ষাপ্রচারকল্পেই আত্মনিয়োগ করিলেন।

খৃষ্টান মিশনরীগণ রাজশক্তির আনুকূল্যে ক্রমে সাহস পাইয়া হিন্দুধর্মবিদ্বেষবিষ উদ্‌গীরণ করিতে লাগিলেন। প্রাচীন স্থবির জড়পিণ্ডবৎ হিন্দুসমাজ কান পাতিয়া শুনিল যে, তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্তই মন্দ, ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ। ইহার ফলে তাহারা ইহলোকে সর্বপ্রকার ভোগসুখ হইতে বঞ্চিত এবং পরলোকে অনন্ত নরকে যাইবে। যত প্রকার নিন্দা করা যাইতে পারে, মিশনরীগণ তাহার কোনটিই বাকী রাখিলেন না। জনৈকা ইংরাজ মহিলামিশনরী হিন্দুধর্মকে গালাগালি ও অভিশাপ দিবার জন্য ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে প্রাণের জ্বালা মিটাইবার জন্য অনেক গবেষণা করিয়া স্থির করিলেন,—"Crystallized immorality and Hinduism are same thing." অর্থাৎ স্ফটিকাকারে ঘনীভূত অপবিত্রতা ও হিন্দুধর্ম একই জিনিস।

প্রাচীণ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এই অভিনব আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার কোন চেষ্টাই করিল না। পাঠান ও মোগল-যুগে ইসলামধর্মপ্রচারকদিগকে রাজনৈতিক কারণে বাধা দেওয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অসাধ্য ছিল। এক্ষেত্রেও তাঁহারা হয়তো ভাবিয়াছিলেন, পাদ্রীগণের প্রচারকার্যের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিলে খৃষ্টান রাজশক্তির কোপে পড়িতে হইবে। আরো একটা প্রধান কারণ, ইসলাম অথবা খৃষ্টধর্মের মত হিন্দুধর্ম প্রচারশীল ছিল না। হিন্দুসমাজ কৃত্রিম জাতিভেদ প্রথার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত ও বিভিন্ন বলিয়া ধর্ম, নীতি, সদাচার প্রভৃতি সর্বস্তরে সমান নহে এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞাও প্রচুর। সমাজের এ

অবস্থায়, সমগ্রের জন্য মমত্ববোধ সমাজ-জীবন হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। গত দুই তিন শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে সহস্র সহস্র পরিবার মুসলমানধর্ম গ্রহণ করার ফলে যেমন হিন্দুসমাজ উৎকণ্ঠিত হয় নাই তেমনি পাদ্রীদের আক্রমণেও তাহারা বিচলিত হইল না। গতানুগতিক হিন্দুসমাজ সেকেলে কতকগুলি প্রথা নিষেধ মানিয়া চলা, বার মাসে তের পার্বণ, তীর্থযাত্রা, গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দান, অন্ন-পানীয়ের আদান-প্রদানের কতকগুলি নিয়মকে মানিয়া চলাই ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চা করিতেন মাত্র, বেদ ও বেদান্ত আলোচনা বাঙ্গলা দেশে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। ধনী ও বড়লোকদের ধর্মকর্মের নামে শোষণ এবং তাহাদের গুণকীর্তন করিয়া অর্থোপার্জন, মন্ত্র দিয়া শিষ্যবিত্ত অপহরণ, দেশাচার, লোকাচার, স্ত্রী-আচার পালন, সামাজিক দলাদলি লইয়া ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। সর্বসাধারণ হিন্দুদের মধ্যে জ্ঞান-বিদ্যা আলোচনার কোন চেষ্টা ছিল না। আরবী পার্শী পড়িয়া চাকুরী অথবা বিষয়কার্য চালাইবার মত পত্রলেখা ও হিসাব রাখিতে পারাই শিক্ষার চরম আদর্শ ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ধনী ও বাবু বাঙ্গালীদের চরিত্র নানাদিকে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; অর্থ থাকিলে পত্নীর বা পত্নীদের গোচরেই অনেকে উপপত্নী রাখিতেন, বিদ্যাসুন্দর, কবি ও তর্জার লড়াইয়ের অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীত অভিনয়ে তৃপ্ত হইতেন। কলিকাতার বাবুরা বুলবুলি ও ঘুড়ির খেলা, বারবনিতা লইয়া বাগানবাড়িতে আমোদ, বেশভূষা প্রভৃতিতেও মত্ত থাকিতেন। এই সময় সহসা এক মেধাবী মহাপুরুষ কলিকাতা সহরে আবির্ভূত হইলেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন বাঙ্গালী জাতি এক রূঢ় আঘাতে চৈতন্য পাইয়া দেখিল, মহা মনীষী রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার-আন্দোলনে কলিকাতা নগরী বিক্ষুব্ধ হইল—বাঙ্গলার সর্বত্র আলোচনার তরঙ্গ ছড়াইয়া পড়িল। "বাবুদিগের বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে, পল্লীগ্রামের চণ্ডী-মণ্ডপে যেখানে সেখানে রামমোহনের কথা। অন্তঃপুরের মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইতে অবশিষ্ট থাকিল না।"

রামমোহন ধনী ও অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পাটনায় তিনি আরবী ও পার্শী ভাষা শিক্ষা করেন এবং ঐ ভাষায় কোরান, ইউক্লিড ও আরিষ্টটলের গ্রন্থাদি পাঠ করেন। পরে কাশীতে গিয়া সংস্কৃত ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। বেদান্ত ও কোরান পাঠ করিবার ফলে তিনি মূর্তিপূজাবিরোধী ও একেশ্বরবাদী হইয়া উঠেন। প্রচলিত ধর্মের নিন্দা করিয়া আরবী ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ফলে তিনি পিতা ও আত্মীয়বর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। পরে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিয়া বাইবেল ইত্যাদি পাঠ করেন। বহুভাষাবিদ্ এবং বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্বজ্ঞ রামমোহনই সর্ব-প্রথম বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইতিপূর্বে পাশ্চাত্ত্যদেশেও কোন পণ্ডিত এইরূপ যুক্তিবাদ সহায়ে বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনা-মূলক আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। যাহা হউক, পিতার মৃত্যুর পর ১৮০৩ সালে রামমোহন পুনরায় পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হন এবং ১৮০৫ হইতে ১৮১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে কালেক্টরের সেরেস্তাদারী করেন। রঙ্গপুরে (১৮০৯-১৪) থাকার সময়ই রামমোহন বেদান্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং উপনিষদের অনুবাদকার্যে হস্তক্ষেপ করেন। পরে চাকুরী ছাড়িয়া ১৮১৪ সালে কলিকাতায় আসিয়া "আত্মীয়সভা" বলিয়া একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অনুরাগী ব্যক্তিবর্গকে লইয়া বহুদিন বিলুপ্তপ্রায় উপনিষদ প্রচার এবং

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিপূজা ও প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। কেবল হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও অযৌক্তিক মতবাদ নহে; খৃষ্টানধর্ম, বিশেষভাবে মিশনরী প্রচারিত মতবাদের, অসারতাও প্রমাণ করিয়া তিনি প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে প্রাচীন-পন্থী হিন্দু-সমাজ এবং মিশনরীবৃন্দ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। ১৮২১ সালে উইলিয়ম আডাম নামক জনৈক মিশনরী রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগপূর্বক একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিলেন। এই ব্যাপার লইয়া মিশনরী সমাজেও একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। মিশনরীগণ দেখিলেন, "পৌত্তলিকতা" বা তথাকথিত আচার-ব্যবহারের উপর হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়; উহার মূল ভিত্তি হইতেছে বেদান্ত-দর্শন। ম্যার্সম্যান, কেরী প্রভৃতি শ্রীরামপুরস্থ মিশনরীগণ বেদান্ত-দর্শনকে আক্রমণ করিলেন। রামমোহনও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ধীরভাবে তাঁহাদের অযৌক্তিক মতগুলি একে একে খণ্ডন করিতে লাগিলেন। এই বিখ্যাত বেদান্তযুদ্ধ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। মিশনরীগণের বাঙ্গালীকে খৃষ্টান করিবার প্রাণপণ চেষ্টার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন একক দাঁড়াইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেদিন তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়ান তো দূরের কথা, হিন্দুসমাজ বরং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। একদিকে স্বজাতির শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কার, অপরদিকে খৃষ্টানী ধর্মান্ধতাপ্রসূত হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের ভ্রান্ত-ব্যাখ্যা—এই উভয়ের বিরুদ্ধে যুগপৎ রামমোহনকে শাস্ত্র ও যুক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অসীমশক্তিশালী রামমোহনের চিন্তা ও চরিত্র সমাজের অভ্যস্ত জড়ত্বের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া এক নবজীবনের চাঞ্চল্য জাগ্রত করিল। ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে অধঃপতিত জাতিকে হীনতার পঙ্কশয্যা হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য রাজা সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে একক দাঁড়াইয়া যে কি অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, শতাব্দীর ব্যবধানে নানা কারণে আজ তাহা ধারণা করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয়, "তিনি কি না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, বঙ্গ-সমাজের যে কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র।"

তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে রামমোহন রায়ের প্রতিভা, সুগভীর স্বদেশপ্রেম উপলব্ধি করিবার মত লোক অতি অল্পই ছিল। সেই অল্পসংখ্যক সহচর লইয়া তিনি কুসংস্কার, অর্থহীন প্রথা, প্রাণহীন আচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে নির্মম হইয়া সংগ্রামের সূচনা করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজার বা জাতিভেদের বিরুদ্ধে রাজার আন্দোলন অপেক্ষা, সহমরণ-প্রথার কদর্য নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাঁহার আন্দোলন, রক্ষণশীল সমাজকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। শোকার্তা সদ্যবিধবাকে ছলে কৌশলে এবং বলপূর্বক প্রকাশ্য দিবালোকে মৃত পতির সহিত দাহ করাকে মহাপুণ্য কার্য বলিয়া সমর্থন করিবার লোকের অভাব ছিল না। প্রথার এমনি প্রভাব। সাধারণতঃ দয়ালু ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরাও প্রথার মোহে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নিষ্ঠুর আচরণ করিতে গ্লানিবোধ করিতেন না। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, রক্ষণশীলদল রাজা স্যার রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে এক 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করিয়া 'সতীদাহ' প্রথা সমর্থন করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহারা জানিতেন যে, কদাচিৎ কোন নারী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হয়। অধিকাংশস্থলেই সম্পত্তি ও বিত্তের লোভে, উপবাসক্লিষ্টা শোকার্তা বিধবাকে ভাঙ-ধুতুরাদি

খাওয়াইয়া সহমরণের সম্মতি লওয়া হইত এবং বিধবাকে চিতার সহিত বাঁধিয়া বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া দাহ করা হইত। তথাপি সত্যের অপলাপ করিয়া তাঁহারা যুক্তিহীন জিদ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, ইতিপূর্বে অনেক ইংরাজ শাসক ঐ কুপ্রথা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিলেও রামমোহনের দীর্ঘ দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী আন্দোলনের ফলে ১৮২৯এর ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ-প্রথা নিবারণ করিয়া আইন বিধিবদ্ধ হইল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক রামমোহনের যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিলেন। রাজার পরামর্শে গবর্ণর জেনারেল গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথাও আইন দ্বারা নিবারণ করিলেন। প্রাচীন সমাজ সদ্য-বিধবাদিগকে জীয়ন্তে পোড়াইয়া মারিবার সুযোগ হারাইয়া 'হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হইল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। হিন্দুজাতির ললাট হইতে রামমোহনের চেষ্টায় দুইটি দূরপনেয় কলঙ্করেখা মুছিয়া গেল। স্যার রাধাকান্তের দল ব্যর্থকাম হইয়া রামমোহনের মূর্তিপূজা অস্বীকার ও বেদান্ত আন্দোলনের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই বাদানুবাদের মধ্যে কুরুচি, ঈর্ষা প্রভৃতি যথেষ্টই ছিল, কিন্তু ইহার ভাল ফল হইল এই যে, বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন শাস্ত্রগুলি শিক্ষিতবর্গের মধ্যে আলোচিত হইতে লাগিল এবং রক্ষণশীল সমাজের মধ্যেও সংস্কারকের দল জাগ্রত হইল। এমন কি রামমোহন-প্রতিদ্বন্দ্বী স্যার রাধাকান্তই তৎকালে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য প্রণালীতে এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানকল্পে বিদ্যালয়াদি স্থাপনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়া রাজা তৎকালীন রাজপুরুষদিগের আনুকূল্য এবং সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন; স্বদেশীয় কতিপয় মহানুভব ব্যক্তিও রামমোহনকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ, ১৮১৭ সালে যখন তাঁহারই চেষ্টায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল তখন প্রাচীন-পন্থিগণ রামমোহনকে উহার মেম্বর করিতে অস্বীকৃত হইলেন। মহানুভব রাজা অম্লানবদনে দেশের মুখ চাহিয়া সে অপমান সহ্য করিলেন। তিনি কেবল বলিলেন, "সে কি কথা? আমার নাম থাকা কি এতবড় কথা যে, সেজন্য একটা ভাল কাজ নষ্ট করিতে হইবে?" ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হওয়ার বিরুদ্ধেও অনেকে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন বটে, কিন্তু তাহা টিকিল না।

কালক্রমে হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন, স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা আরম্ভ হইল। অখাদ্যভক্ষণ, সুরাপান, প্রকাশ্য স্থানে মুসলমানের দোকান হইতে গোমাংসাদি ক্রয় করিয়া আহার করা ইত্যাদি সৎসাহসের কার্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। কলিকাতা সহরের এই ক্ষুদ্র সমাজবিপ্লবটির সহায়ক হইলেন কলেজের খৃষ্টান অধ্যাপকবৃন্দ। এই সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীবিপ্লব-সাগরমথিত অমৃত ও গরল লইয়া আসিলেন প্রতিভাশালী শিক্ষক ডিরোজিও (Derozio) । ইনি ইউরেশিয়ন। ধর্মে যে কি ছিলেন তাহা বলা বা নির্বাচন করা সুকঠিন। অপ্রতিহত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সর্বতোভাবে উপভোগ করিতে হইবে—ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল।

দৃঢ়হৃদয় শক্তিশালী শিক্ষক ডিরোজিওকে নেতারূপে পাইয়া হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ উৎসাহে অধীর হইলেন। ইঁহাদের আচার-ব্যবহার ক্রমে সমাজের সকল শ্রেণীরই অসহনীয় হইয়া উঠিল। যাহা কিছু হিন্দুর বা হিন্দুত্ব তাহাই কুসংস্কার, এই অদ্ভুত ধারণা লইয়া তাঁহারা "কুসংস্কার ভঞ্জন ও চরিত্রের উন্নতি সাধনের এক প্রধান উপায় মনে করিয়া" অবাধ সুরাপানের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। হিন্দু কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ ক্রমে বঙ্গের বিভিন্ন নগরীতে গিয়া

তাঁহাদের আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগের হঠকারিতা ও উচ্ছৃঙখলতা ক্রমে ধীরতার সীমা অতিক্রম করিল। ইতিমধ্যে ১৮৩০ সালে পাদ্রী আলেক্- জান্ডার ডফ্ কলিকাতায় আসিলেন। রামমোহন ইঁহাকে একটি স্কুল করিয়া দিলেন। ইতিপূর্বে রামমোহনের বন্ধু আডাম সাহেবও একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইত না, ছাত্রগণের নৈতিব চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, এই দুরবস্থা দেখিয়াই যাহাতে শিক্ষ ধর্মানুগ হয়, সেজন্য রামমোহন চেষ্টিত হইলেন। এই সময় রামমোহনকে বিবিধ কার্যের জন্য বিলাত যাইতে হইল। ভারতবর্ষ হইতে সর্বপ্রথম হিন্দুসন্তান রামমোহন বিলাত গমন করিলেন—ইহা একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা এব ইহাতেও রামমোহনের দুঃসাহসের অন্ত ছিল না।

হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের উচ্ছৃঙখলতা—তাঁহার বড় আদরের পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষময় বিকৃত ফল দেখিয়া রামমোহন ব্যথিত হইলেন। তাঁহার জীবনচরিতকার লিখিয়াছেন*—

অর্থাৎ—তিনি (রামমোহন) প্রথম জীবনে স্বদেশবাসিগণের অত্যধিক বিশ্বাস- প্রবণতা দেখিয়া হৃদয়ে গভীর বেদনানুভব করিতেন। এবং ইহার বিরুদ্ধে স্বীয় সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি বুঝিতে লাগিলেন যে, তত সাংঘাতিক না হইলেও অত্যল্প বিশ্বাসও বিপজ্জনক। কলিকাতায় বিশেষভাবে যুবকগণের দ্বারা গঠিত একটি দলের কথা তিনি প্রায়ই ক্ষোভের সহিত উল্লেখ করিতেন। এই যুবকগণের মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধিমান ছিলেন এবং সর্বতোভাবে সন্দেহবাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, এই দল হিন্দু ও ফিরিঙ্গী যুবকগণের সমবায়ে গঠিত হইয়াছিল; ইঁহারা অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাবে স্বীয় ধর্মমত পরিবর্জন করিতেন, কিন্তু অন্য কোন ধর্ম- মতাবলম্বী হইতেন না। এইরূপ কোন ধর্মে আস্থাহীন অবস্থা, একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর অবস্থা হইতেও শোচনীয়তর এবং তাঁহাদের মতবাদ সর্ব- প্রকার নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী। (রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত লন্ডন—১৮৩৩-৩৪)

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার তরঙ্গাভিঘাতে এক সুপ্রাচীন সভ্যতার বংশধরগণ একেবারে অসহায়ভাবে ভাসিয়া না যায়, যাহাতে তাহারা যুগোপযোগী উপায় অবলম্বনে জাতীয় জীবনাদর্শ রক্ষা করিয়া জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে, এই মহদ্ভাবের প্রেরণায় রাজা রামমোহন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্যকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিবার অবসর পান নাই; তাঁহার আদর্শ সেই কারণে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় নাই। দেশের দুর্ভাগ্য তিনি ইংলন্ড হইতে আর ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। ১৮৩৩-এর

---

* "In his younger years, his mind had been deeply struck with the evils of believing too much, and against that he directed all his energies: but, in his latter days, he began to feel, that there was as much, if not greater, danger in the tendency to believe too little. He often deplored the existence of a party which had sprung up in Calcutta, composed principally of imprudent younger men, some of them possessing talent, who had avowed themselves sceptics in the widest sense of the term. He described it as partly composed of East Indians, partly of the Hindu youths who, from education had learnt to reject their own faith without substituting any other, these he thought more debased than the most bigoted Hindu. and their principles the bane of all morality."—*Biography of Raja Ram Mohon Roy*, London, 1833-34.

২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার দেহান্ত হইল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "ব্রহ্মসভা" আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের চেষ্টায় কোন প্রকারে জীবনধারণ করিয়া রহিল মাত্র। যাঁহারা তৎকালে রাজার সহকর্মী ছিলেন তাঁহারা কেহই এই প্রচণ্ড ভাবধারাকে বহন করিবার জন্য তেমন ভাবে অগ্রসর হন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ রামমোহনের শিক্ষার তিনটি মূলসূত্র বলিয়া নির্দেশ করিতেন—তাঁহার বেদান্ত-গ্রহণ, স্বদেশপ্রেম প্রচার এবং হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে ভালবাসা। এই সকল বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা ও ভবিষ্যদর্শিতা যে কার্যপ্রণালীর সূচনা করিয়াছিল, তিনি নিজে মাত্র তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেন।

হিন্দুধর্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন শাঙ্কর-অদ্বৈতবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। উপনিষদ্ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্যকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়া বেদকে যে ভাবে মর্যাদা দিয়া রামমোহন হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নানারূপ মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও একথা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হয়, তাঁহার সিদ্ধান্ত তাঁহার অনুবর্তিগণ ঠিক ঠিক গ্রহণ করেন নাই, অথবা করিতে পারেন নাই। অথচ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে রামমোহন যে সকল দিক দিয়া অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এমন কথাও সাহস করিয়া বলা যায় না। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যেগুলি অদ্যাপি আছে, তাহা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে অর্থাৎ পরবর্তী ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণের চক্ষু দিয়া না দেখিলে, মোটামুটি বোঝা যায় :—

(১) বাঙ্গলার শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই প্রধান সম্প্রদায় কালবশে নানাভাগে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল, দেশের জনসাধারণ ধর্ম বলিতে কতকগুলি প্রথা ও নিয়মের বিচারহীন অনুসরণই বুঝিত। ইহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিরোধ ও বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। বেদান্ত অবলম্বনে তিনি এই বিভক্ত বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে এক ঐক্যমূলক দার্শনিক ভিত্তির উপর আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টায় রামমোহন শাক্ত ও বৈষ্ণবের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, গুরু ও অবতারবাদ, মন্ত্র, সাধনা ও সিদ্ধির প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব আদর্শকে তিনি অশ্লীল বলিয়া এক প্রকার উপেক্ষাই করিয়াছেন। স্বয়ং তন্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াও, তান্ত্রিক সাধকের শিষ্য হইয়াও এবং তন্ত্রোক্ত চক্রের সাধনায় শক্তি গ্রহণ ও শৈব বিবাহ সমর্থন করিয়াও তিনি তন্ত্রের মাতৃভাব পরিহার করিয়াছেন।

(২) হিন্দুশাস্ত্ররাশি আলোচনা করিয়া রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, হিন্দুরা ধর্মতত্ত্ব নিরূপণে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিলেও নীতির দিক দিয়া অত্যন্ত অবনত। হিন্দুর ধর্মনীতি অপেক্ষা খৃষ্টানী ধর্মনীতি তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল এবং হিন্দুজাতির পুনরুত্থানকল্পে খৃষ্টানী নীতি-মার্গের পথিক হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, ইহা রাজা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেন।

(৩) বেদান্তোক্ত নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়া রামমোহন হিন্দুর সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিরসন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৪) জাতিভেদ, মাংসাহারে অনিচ্ছা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, বিদেশগমনে অনিচ্ছা, সমুদ্রযাত্রায় পাপবোধ ইত্যাদি রাজার মতে আমাদের জাতীয়

অবনতির কারণ এবং এই সমস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে লেখনী চালনা করিতে কোন প্রতিকূল সমালোচনাতেই ভীত হন নাই।

(৫) রাজা দেশে স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির উন্মেষকল্পে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিক্ষার মধ্য দিয়া তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শারীর-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে যাহাতে এদেশের নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা গদ্য রচনায় উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বনে মাতৃভাষার উন্নতিসাধনে রামমোহনের উদ্যমও সামান্য নহে।

রামমোহনের সর্বতোমুখী প্রতিভার প্রখর দৃষ্টি জাতীয়-জীবনের সকল বিভাগেই পতিত হইয়াছিল। স্বধর্মানুরাগী, জাতীয়তাবোধের প্রথম পুরোহিত রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম নব জাগরণের ভেরী-নিনাদে দেশকে জাগ্রত হইবার জন্য আবাহন করিয়াছিলেন। অথচ এই মহাপুরুষের চিন্তা ও চরিত্র নিরপেক্ষ ভাবে এ পর্যন্ত আলোচনা হয় নাই। আমি সাহস করিয়া বলিব, ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাবশতঃ রামমোহনের উদার সার্বভৌমিক আদর্শ সম্বন্ধে এত ভ্রান্ত ধারণা করিবার সুযোগ দিয়াছেন যে, আজ বাঙ্গালী জাতির এই মহাপুরুষকে না জানার দুর্ভাগ্য অপেক্ষা ভুল করিয়া জানার দুর্ভাগ্যই অধিক।

'আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ চিন্তনরূপ মুখ্য উপাসনা'কে ভিত্তি করিয়া রামমোহন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির ম দিয়াও রামমোহন ভারতের সনাতন সাধনা ও সভ্যতার মর্ম উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই কতকগুলি প্রচলিত লোকাচার এবং ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াও কোন নূতন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। 'ব্রাহ্মধর্ম' রামমোহনের নামের ছাপ লইয়া এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রণেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫), রাজা রামমোহন নহেন। দেশে এখনো অনেকের রামমোহনই ব্রাহ্মধর্ম-প্রবর্তক ইত্যাকার ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেই জ এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

১৮৪৩-এর ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিশজন বন্ধুসহ 'ব্রাহ্মধর্মে' দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'ব্রহ্মধর্ম' রামমোহনের ঈপ্সিত পথে বিকশিত হয় নাই। ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রচারক মনীষী স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় রাজার আদর্শ ও মহর্ষির আদর্শ আলোচনা করিয়া নিম্ন-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

> "* * রাজা একান্তভাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জন করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদকে প্রামাণ্য-মর্যাদাভ্রষ্ট করিয়া শুধু ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরেই ঐকান্তিকভাবে সত্যাসত্য ও ধর্মাধর্ম মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। রাজা ধর্মসাধনে যে গুরুরও একটা বিশেষ স্থান আছে, ইহা কখনো অস্বীকার করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেমন শাস্ত্র সেইরূপ গুরুকেও বর্জন করিয়া, প্রত্যক্ষ আত্মশক্তি ও অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-কৃপার উপরেই সাধনে যথাযোগ্য সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা কি তত্ত্বাঙ্গে, কি সাধনাঙ্গে, ধর্মের কোন অঙ্গেই, স্বদেশের সনাতন সাধনার সঙ্গে আপনার ধর্মসংস্কারের প্রাণগত যোগ নষ্ট করেন নাই। মহর্ষি এক প্রকারের স্বাদেশিকতার একান্ত অনুরাগী হইয়াও প্রকৃতপক্ষে এই যোগ রক্ষা করেন নাই, করিতে চেষ্টাও করেন নাই। রাজা বেদান্তের উপরেই আপনার তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্মকে গড়িয়া তুলেন। রাজা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মকেই ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া প্রচার করেন। মহর্ষি তাঁহার আপনার

আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিপ্রতিপাদ্য ধর্মকেই ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

"* * মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে কেবল উপনিষদের উপদেশই উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ সকল উদ্ধৃত উপদেশের প্রামাণ্য-মর্যাদা শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত নহে, মহর্ষির আপনার স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠিত মাত্র; উপনিষদের যে সকল শ্রুতি মহর্ষির নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, তিনি সেগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া আপনার ব্রাহ্ম-ধর্মগ্রন্থে নিবন্ধ করেন—ঋষিরা কি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন বা জানিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান তিনি করেন নাই। কোন শ্রুতির বা উত্তরার্ধ, কোনওটির বা অপরার্ধ, যার যতটুকু তাঁর নিজের মনোমত পাইয়াছেন, তাহাই কাটিয়া ছাঁটিয়া আপনার ব্রহ্মধর্মগ্রন্থে গাঁথিয়া দিয়াছেন। অতএব মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে বিস্তর শ্রুতি উদ্ধৃত হইলেও, এ গ্রন্থ তাঁহার নিজের, ইহার মতামত তাঁহার, প্রাচীন ঋষিদিগের নহে। সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার না করিয়া কেবল বাঙ্গলাভাষায় এ সকল মতামত লিপিবন্ধ করিলেও তার যতটুকু মর্যাদা থাকিত, উপনিষদের বুক্‌নী দেওয়াতে ইহা তদপেক্ষা বেশী মর্যাদা লাভ করে নাই।" ('পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ব্রাহ্ম-সমাজ' হইতে উদ্ধৃত)

যাহা হউক, রাজার আদর্শের সহিত প্রভূত অনৈক্য সত্ত্বেও 'ব্যক্তিত্বাভিমানী য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-ধর্মকে' প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিবার জন্য মহর্ষি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। এই কার্যে তাঁহার সহায় হইলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্গভাষার অন্যতম স্রষ্টা অক্ষয়কুমার দত্ত এবং মনীষী রাজনারায়ণ বসু।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের কলিকাতার ধনী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত আভিজাত্য-মর্যাদা ছিল। ঋণমুক্ত হইলে তিনি পুনরায় কলিকাতার ধনী-সমাজের অগ্রণী হইয়া উঠেন এবং তাঁহার অর্থানুকূল্যে ও সবিশেষ চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকার্য চলিতে থাকে। মহর্ষির ধনবল ও জনবলের সহায়েই ব্রাহ্মসমাজ অল্পকালেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

প্রতিমা-পূজাদি ক্রিয়াকাণ্ড বর্জন করিলেও মহর্ষি প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হন নাই, বরং হিন্দু-সমাজের সহিত আপোষের ভাব রক্ষা করিয়াই রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিনব ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

পাদ্রী আলেক্‌জাণ্ডার ডফের অক্লান্ত চেষ্টায় হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে নাস্তিকতার ভাব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, এইবার শিক্ষিত বাঙ্গালীগণকে তাঁহারা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইবেন; এমন সময় তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির পথে প্রবল অন্তরায়স্বরূপ দাঁড়াইল—মহর্ষি-প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম। পাদ্রী ডফের চেষ্টায় ইতিপূর্বেই ডিরোজিওর শিষ্য-গণের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি খৃষ্টান হইয়াছিলেন—তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেকে খৃষ্টান হইলেন; কেহ কেহ হইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন—এমন সময় "যীশুর স্বর্গরাজ্য আনয়নের" দ্বাররোধ করিতে উদ্যত হইলেন—ব্রাহ্মসমাজ। আবার বেদান্তযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। বেদান্তপক্ষ সমর্থন করিয়া মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল; ডফ্ সাহেবও প্রাণপণে সদলবলে বেদান্তকে আক্রমণ করিলেন। এ আন্দোলনে কলিকাতানগরীর 'হিন্দুবর্গ" উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ডফ্ সাহেবকে হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে দেখিয়া হিন্দু কলেজের নেতৃবৃন্দ, ছাত্রগণকে ডফ্ ও ডিয়েলট্রির বক্তৃতা

শুনিতে নিষেধ করিলেন। কারণ-পরম্পরায় কালের গতিরোধ করিতে অক্ষম হইয় পাদ্রী ডফ্ ভগ্নহৃদয়ে ১৮৬৩ সালে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

১৮৫০ সালে অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণের পরামর্শে মহর্ষি বাধ্য হইয় বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পরিত্যাগ করিলেন। ফলে চিরদিনের মত ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক হইয়া গেল। যাহা হউক, ইঁহাদে অক্লান্ত চেষ্টায় বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানেও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, সমাজে কার্য বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল।

এই সময় আর এক শক্তিশালী পুরুষ বাঙ্গালী সমাজে আবির্ভূত হইলেন, ইনি বীরসিংহ গ্রামের সিংহশিশু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে পরানুকরণমোহ, আর অন্য দিকে আত্মবিস্মরণ—দক্ষিণে ও বামে রাখিয় বাঙ্গালী-দুর্লভ বিবিধ সদ্‌গুণমণ্ডিত এই চিরস্মরণীয় চরিত্রে মনুষ্যত্বের এব অত্যুজ্জ্বল মূর্তি অতি আশ্চর্য রকমে আত্মপ্রকাশ করিল। বঙ্গভাষার স্রষ্টা ও পালয়িতা বিদ্যাসাগর, শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী বিদ্যাসাগর, দীন-দরিদ্র দুঃখী-আর্তের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী বিদ্যাসাগর; সর্বোপরি স্বদেশী সমাজের দুর্গতি ও দুর্নীতি পরিহার করাইতে ব্রতী বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় কীর্তি-কাহিনী নব বাঙ্গলার ইতিহাসের অক্ষয় সম্পদ।

বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন, “বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে ইহাপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকার্য করিতে পারিব তাহার সম্ভাবন নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।”

বাল-বিধবার ব্রহ্মচর্য এবং নারীর সতী-ধর্মের মহিমা কীর্তনে মুখরিত ভারতভূমিতে হতভাগ্য অবলাজাতির উপর যুগান্ত-সঞ্চিত অতি পৈশাচিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেদিন বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইলেন, “সেদিন দেশের পুরুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণসংহারের জন্য গোপন আয়োজন করিতেছিল এব দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটূক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিল।” কিন্তু মাতৃপদধূলি ও আশীর্বা শিরে লইয়া পৌরুষের প্রচণ্ড অবতার বিদ্যাসাগর বাল-বিধবার দুঃখমোচনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিচলিত হইলেন না, ক্ষুব্ধ হইলেন না—‘সংস্কৃত শ্লোক এবং বাঙ্গলা গালি মিশ্রিত তুমুল কলকোলাহল’ খণ্ডন করিয়া ব্রাহ্মণবা বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে বিধবাবিবাহ আইন রাজদ্বারে বিধিবদ্ধ হইল।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচণ্ড মার্তণ্ডের ন্যায় এই একক নিঃসঙ্গ মহাপুরুষ আলোক ও উত্তাপ বিকীর্ণ করিয়া, সমগ্র সমাজের অজ্ঞতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া, ক্ষুধিত দুঃস্থ রোগীর অশ্রু মুছাইয়া, অকৃতজ্ঞগণের সকল ঔদ্ধত্য মার্জনা করিয়া ‘আপন পুষ্পকোমল ও বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্ আদর্শ বাঙ্গালী জাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।’

“হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি-সকল এরূপ্ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয় কঠিন এবং ব্যভিচারদোষে ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ

উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। * * * তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না। * * * হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশে পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক প্রথা রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।”

বিধবার দুঃখে এতবড় মহত্ত্ব ও পৌরুষের বাণী বাঙ্গলাদেশে আর গর্জে নাই। একদিন অকস্মাৎ যেন হরজটাজাল-নির্মুক্ত ভুবনপাবন ভাগীরথী মর্ত্যে ঝরিয়া পড়িয়া অজস্র ধারায় মুক্তি বহন করিয়া আনিয়াছিল তেমনি একদিন ভারতের অভিশপ্ত নারীজাতি ও বিধবার অপমান ও দুঃখের উপর বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ দয়ার অভয় আশীর্বাদ করুণাবিগলিত ভাবধারায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল। “ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় লইয়া আমরা সকলেই কিছু ধরাতলে অবতীর্ণ হই নাই। বালবিধবার অশ্রুজলে আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না; তাই আমরা ভণ্ড ব্রহ্মচর্যের মলিন পাংশু বিক্ষেপে সেই অশ্রুজল মুছিতে চাই। ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখ মোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের জয়লাভ ঘটিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু ইহাই প্রকৃতির নির্বন্ধ। স্বাভাবিক, সরল, ছদ্মবেশহীন মনুষ্যত্ব ইহাতে ম্রিয়মাণ হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ নিষ্ফল; কেন না ইহা বিধিলিপি।”—১৩০৩ সালের ভাদ্র মাসে, বাঙ্গলার অন্যতম মনীষী-সন্তান আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের এই মর্মভেদী বিলাপও এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসিতেছে।

বাঙ্গলার নবযুগের সাধনা ও সিদ্ধির মূর্তবিগ্রহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বিদ্যাসাগরের সমীপে আসিয়া বলিয়াছিলেন,—“এতদিন খাল ডোবা পুকুর দেখিয়াছি, আজ সমুদ্র দেখিলাম।” সত্যই বিদ্যাসাগর মনুষ্যত্বের মহাপারাবার ছিলেন! কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “তাঁহার মত লোক পারমার্থিকতাভ্রষ্ট বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, চতুর্দিকের নিঃসাড়তার পাষাণখণ্ডে বারংবার আহত প্রতিহত হইয়াছিলেন বলিয়া, বিদ্যাসাগর তাঁহার কর্মসঙ্কুল জীবন যেন চিরদিন ব্যথিত ক্ষুব্ধভাবে যাপন করিয়াছেন। তিনি যেন সৈন্যহীন বিদ্রোহীর মত তাঁহার চতুর্দিককে অবজ্ঞা করিয়া জীবন-রঙ্গভূমির প্রান্ত পর্যন্ত জয়ধ্বজা নিজের স্কন্ধে একাকী বহন করিয়া লইয়া গেছেন। তিনি কাহাকেও ডাকেন নাই, তিনি কাহারও সাড়া পান নাই, অথচ বাধা ছিল পদে পদে। * * * তিনি যে শব-সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার উত্তর-সাধকও ছিলেন তিনি নিজে।”

১৮৫৯ সালে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন। সংস্কারযুগের এক অভিনব অধ্যায় আরম্ভ হইল। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কেশবের সহপাঠী, তিনিই কেশবকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া আসেন। প্রখর প্রতিভা ও বাগ্মিতায়, এই একবিংশতিবর্ষীয় যুবক, অতি সহজেই নবীন ব্রাহ্মদের নেতৃত্ব লাভ করিলেন। এই সময় হিমালয় হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলে গুরু-শিষ্যে মিলন (১৮৬৩) হইল। ‘ব্রহ্মানন্দ’ উপাধি দিয়া মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে স্বীয় সহকর্মী, পুত্র এবং প্রিয়তম শিষ্যরূপে বরণ করিলেন।

আভিজাত্য ও কাঞ্চন-কৌলিন্যে কেশবচন্দ্র, রামমোহন অথবা দেবেন্দ্রনাথ হইতে পৃথক। ইংরাজ আমলে, ইংরাজী-শিক্ষাকৃষ্ট অভিনব শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সন্তান কেশবচন্দ্রের চিন্তা চরিত্র রুচি ঐ দুই পূর্বগামীর সহিত তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক। ষোড়শ বৎসর বয়সে রামমোহন ইসলাম ধর্মানুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুর

মূর্তিপূজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, আর তরুণ কেশবচন্দ্র খৃষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার আদর্শ ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজকে সেই আদর্শাভিমুখী করিতে প্রস্তুত হইলেন। রামমোহন তো দূরের কথা, এমন কি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়ও সংস্কৃত ভাষা তিনি জানিতেন না, বেদ-বেদান্ত অথবা শাস্ত্রাদির সহিত তৎকালে তিনি একান্ত অপরিচিত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাঁহাকে বরণ করিয়া আনিলেন তাঁহাকে স্বীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারিলেন না। মনীষী বিপিনচন্দ্র বলেন, "শাস্ত্রের প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা, গুরুর প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে অসংস্কৃত ও অসিদ্ধ স্বাভিমতের স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা, সমাজের বিধি-নিষেধাদির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তির স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা—ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনে কর্মচেষ্টার মূলসূত্র ছিল।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয় ও সহজজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের সাধনা এবং সমাজ-সংস্কারে ডেভিড্ হেয়ার ও ডিরোজিওর অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য অন্যনিরপেক্ষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—এই উভয় ধারাকে আত্মসাৎ করিয়া কেশব ও তৎসঙ্গিগণ ব্রাহ্মসমাজকে খৃষ্টানসমাজের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতা রক্ষণশীল ও মধ্যপন্থী দেবেন্দ্রনাথ, কেশব এবং কেশবগণকে সংযত করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই কালে কেশবচন্দ্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কেবল ব্রাহ্মসমাজেই আবদ্ধ রহিল না। তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত 'উদার' হিন্দু এবং বিশেষভাবে কলেজের ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িলেন। কেশবের ছিল অনুপম বাগ্‌বিভূতি। ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতে তৎকালে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ পর্যন্ত তাঁহার প্রশংসা করিতেন। সেকালে ইংরাজগণ যাঁহার প্রশংসা করিতেন, সমাদর করিতেন, লোক-সমাজে তাঁহার খ্যাতি ও সম্মানের অন্ত ছিল না। কলিকাতার ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের উপর বাগ্মী কেশবচন্দ্রের অসামান্য প্রভাব বিস্তারের ইহাই কারণ। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ কেশবের বক্তৃতার বাত্যাতরঙ্গে কলিকাতানগরী বিক্ষুব্ধ হইল। কৃষ্ণনগরে তাহার প্রতিধ্বনি ছুটিল। তাঁহার প্রতিভায় প্রভাবান্বিত হন নাই, এমন শিক্ষিত যুবক কলিকাতায় অতি অল্পই ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন; অনেকে অল্পবিস্তর ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইলেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ, পানভোজনের প্রাচীন বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন, উপবীতহীন এবং অব্রাহ্মণ আচার্যগণ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রভৃতি সংস্কার প্রস্তাবগুলির সহিত অতিমাত্রায় খৃষ্টপ্রীতি ও খৃষ্টীয় নীতিবাদের প্রতি আকর্ষণ মিলিত হইয়া কেশবচালিত ব্রাহ্মদল যে পথে চলিতে চাহিলেন, সামাজিক ব্যাপারে রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে তাহাদের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিদ্রোহী পুত্রপ্রতিম কেশবচন্দ্রের যুক্তির শরবর্ষণ সংযতধৈর্যে সহ্য করিয়া মহর্ষি অটল রহিলেন। এই বিচ্ছেদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> "প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি অনুসারে উৎকর্ষ লাভ করে, তখন মনুষ্যত্ব লাভ করে—সাধারণ মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে, খৃষ্টানের মধ্যে বস্তুতঃ একই, তথাপি হিন্দু-বিশেষত্ব মনুষ্যত্বের এক বিশেষ সম্পদ এবং খৃষ্টান-বিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ লাভ, তাহার

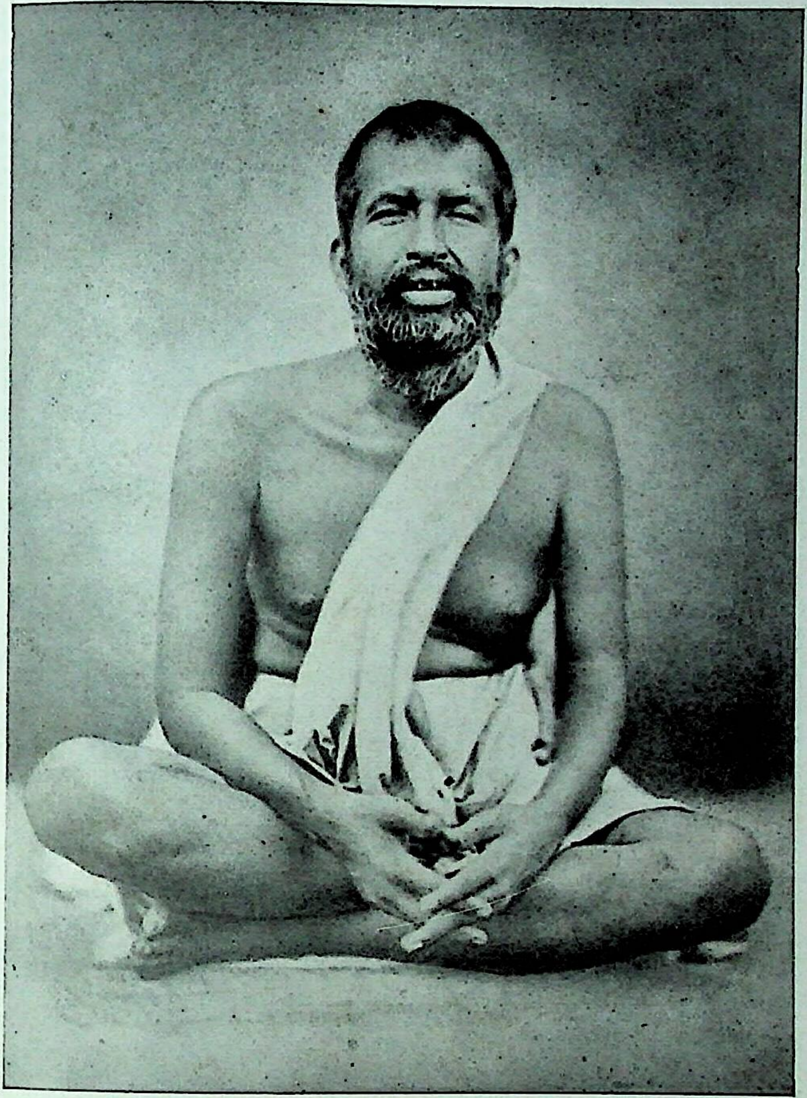

কোনটা সম্পূর্ণ বর্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠ ধন তাহাও সার্বভৌমিক, য়ুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠ ধন তাহাও সার্বভৌমিক, তথাপি ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া যায় না। * * * তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুলিয়াছিল, যখন ধর্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত, যখন সে মনে করিয়াছিল, বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থ ঔদার্য রক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব (মহর্ষি) সার্বভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জন দিতে অস্বীকার করিলেন—ইহাতে তাঁহার অনুবর্তী অসামান্য প্রতিভাশালী ধর্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল।”

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মহর্ষির সহিত কেশবচন্দ্রের শিক্ষা ও প্রকৃতির প্রচুর পার্থক্য ছিল—ঘাতসংঘাতে এই পার্থক্যই পরিণতির মুখে বিচ্ছেদরূপে দেখা দিল এবং একটা সামান্য ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া, অর্থাৎ মহর্ষি পৈতাধারী আচার্যদিগকে বেদীর কার্য হইতে তাড়াইয়া দিতে অস্বীকার করায় গুরু দেবেন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করিয়াই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র দল গড়িলেন; ১৮৬৬ সালে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইল। মহর্ষির সমাজ হইল, “আদিসমাজ”, আর কেশব বিজয়কৃষ্ণ শিবনাথ প্রভৃতি যে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার নাম হইল “ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ”। এই নূতন সমাজ য়ুরোপীয় খৃষ্টানী ঢোলে সমাজজীবন গঠন করিতে গিয়া জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিলেন, অসবর্ণ বিবাহপ্রথা প্রবর্তন করিলেন, এই শ্রেণীর বিবাহ আইনমত যাহাতে সিদ্ধ হয় তজ্জন্য তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। ১৮৭২ সালে তিন আইন মতে এক প্রকার অসবর্ণ বিবাহ রাজদ্বারে বিধিবদ্ধ হইল। কেশবচালিত এই নূতন সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ব্রাহ্মপ্রচারকগণ, রক্ষণশীল প্রাচীন সমাজকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতাদি দিতে লাগিলেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসাধনাও রূপান্তরিত হইল। কেশবের খৃষ্টধর্মপ্রীতি হইতে পাপবোধ, পাপ-ভীতি, অনুতাপ, ভাবাবেশে ক্রন্দন ইত্যাদি ব্রাহ্মসাধকগণ আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই নিরাকার ও একাকারের বিলাতী ঢংএর নকল করিয়া প্রাচীনপন্থীরা ‘হরিসভা’ ‘ধর্মসভা’ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ‘হিন্দুয়ানী’ রক্ষার জন্য চেষ্টিত হইলেন। এই হিন্দু-আন্দোলনের পশ্চাতে কোন আন্তরিক আবেগ ছিল না। ভূরিভোজন, সঙ্কীর্তন, দান, পয়সা দিয়া বক্তা আনিয়া কতকগুলি বক্তৃতা—আর কি, ধর্মের চূড়ান্ত হইয়া গেল! বার বৎসরের শিশুও হরিসভার বেদী হইতে হরিভক্তির মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিত এবং দর্শকগণ করতালি দিয়া তাহাকে মাতাইয়া তুলিত। একদিকে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য ও উপাচার্যগণ হিন্দুধর্ম ও সমাজের মস্তকে অগ্নিময় অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে গোঁড়ার দল, অতি অশ্লীল ছড়া কাটিয়া, নক্সা, গল্প লিখিয়া ব্রাহ্মসমাজের ভণ্ডামিগুলির অতি কদর্য ভাষায় প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই বাদপ্রতিবাদের ফলে একশ্রেণীর জঘন্য কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি-হইল, যাহা বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গে এক দুরপনেয় কলঙ্ক।

নবনাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি কলিকাতা সহর যখন এই সমস্ত সংস্কার আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ এবং সমস্ত বাঙ্গলাদেশ বিহ্বল, তখন এই সহরের উপকণ্ঠে, দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে, এক অখ্যাত অজ্ঞাত

পূজারী ব্রাহ্মণ ভারতের সর্বলোককল্যাণকর পারমার্থিক আদর্শকে বিকৃতি ও বিস্মৃতি হইতে উদ্ধার করিবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬)। হুগলী জিলার সুদূর পল্লীগ্রাম কামারপুকুরে, দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে ১৮৩৬-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃবিয়োগের পর তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত কলিকাতায় চলিয়া আসেন, উদ্দেশ্য—কিছু লেখাপড়া শিখিয়া জীবিকার্জনের চেষ্টা করা। জ্যেষ্ঠভ্রাতার একটি টোল ছিল—তিনি সুপণ্ডিত ও উন্নতমনা ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া সহসা বালক রামকৃষ্ণের মনে হইল, এই লৌকিক বিদ্যার প্রয়োজন কি? সাংসারিক উন্নতি? প্রাচীনযুগের ঋষিদের ন্যায় তিনি ভাবিলেন, যাহা অমৃত নহে, তাহা লইয়া আমি কি করিব? তিনি লেখাপড়া ছাড়িলেন এবং পরাজ্ঞানলাভের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই কালে কলিকাতার ধনী ও ধর্মপ্রাণা মহিলা রাণী রাসমণি বহু অর্থব্যয়ে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উদরান্নের জন্য ভ্রাতার নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতা আনন্দময়ীর পূজারীর পদ গ্রহণ করেন। সরলহৃদয় তরুণ পুরোহিত দৈনন্দিন পূজা যথানিয়মে নির্বাহ করিতেন আর ভাবিতেন, সত্যই কি জগন্মাতা আছেন? সত্যই কি তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন? জগন্মাতার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশায় তন্ময় সাধক বাহ্যজগৎ ভুলিলেন,—দিন গেল, মাস গেল, বৎসরও কতবার ঘুরিয়া গেল, অর্ধোন্মাদ ঠাকুর দিব্যভাবে বিভোর। গঙ্গার পশ্চিমপারে অস্তগামী লোহিত সূর্যের পানে চাহিয়া তিনি কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন, মা, আর একটা দিনও তো বৃথা হইল,—তোমার দেখা মিলিল না। ধীরে ধীরে মৃন্ময়ী দেবী চিন্ময়ী হইয়া দেখা দিলেন। আবার মায়ের নির্দেশে সন্তানের সাধনা চলিল। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত সকল মতের, সকল পথের সাধকগণ, সিদ্ধ মহাপুরুষগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী আসিয়া তন্ত্রোক্ত সাধনা করাইলেন; তোতাপুরী আসিয়া বেদান্তের অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন; লোকদুর্লভ নির্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্যলাভ করিয়া সত্যপ্রচারের জন্য সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন,—“ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।”

অবশেষে একদিন সংস্কারযুগের নেতা কেশবচন্দ্রের সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইল। এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল, মূর্তিপূজা-বিরোধী কেশব মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের উপদেশবাণী প্রচার করিয়া তাঁহার কাগজে লিখিতে লাগিলেন, যদি শান্তি চাও, দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের পদতলে উপবেশন করিয়া ধন্য হও। ইহা আশ্চর্য, কিন্তু সত্য। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মরথিবৃন্দ এই মহাপুরুষের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং ইঁহাদের প্রচারের ফলেই কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বিষয় জানিতে পারিল।

১৮৭৯ সালে Theistic Quarterly Review-এর অক্টোবর সংখ্যায় নববিধান সমাজের প্রচারক রেঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সুদীর্ঘ প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

“আমার মন এখনও এক উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, যাহা সেই রহস্যময় পুরুষ যেখানে যান, সেইখানেই তাঁহার চতুর্দিকে বিকীর্ণ করেন। যখনই তাঁহার সহিত দেখা হয়, তখনই তিনি যে অনির্বচনীয়, রহস্যপূর্ণ ভাবনিচয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেন, তাহার প্রভাব হইতে আমার মন এ পর্যন্ত মুক্ত হইতে পারে নাই।

"তাঁহার এবং আমার মধ্যে সাদৃশ্য কি? আমি—ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, সভ্য, আত্মাভিমানী, অর্ধসন্দেহবাদী, তথাকথিত শিক্ষিত যুক্তিবাদী এবং তিনি—দরিদ্র, বর্ণজ্ঞানহীন, অমার্জিত-রুচি, অর্ধ-পৌত্তলিক, বন্ধুহীন হিন্দু ভক্ত। কেন আমি তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য বহুক্ষণ বসিয়া থাকি? আমি—যে, ডেস্‌রাইলি, ফসেট, স্টেন্‌লী, ম্যাক্সমুলর এবং পাশ্চাত্য-জগতের সমুদয় মনীষী ও ধর্মপ্রচারকগণের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি; আমি—যে, যীশুখৃষ্টের একজন একান্ত ভক্ত ও অনুচর উদারহৃদয় খৃষ্টান মিশনরিগণের বন্ধু ও সমর্থক, যুক্তিপন্থী ব্রাহ্মসমাজের অনুগত ভক্ত ও কর্মী, কেন আমি তাঁহার বাক্য শ্রবণকালে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যাই? এবং একা আমিই নই, আমার মত বহুব্যক্তিই এইরূপ হইয়া থাকেন। * * *

"কিন্তু যতদিন তিনি আমাদের নিকট জীবিত আছেন, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পবিত্রতা, বৈরাগ্য, সংসার-অনাসক্তি, আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততা সম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ উপদেশ শিক্ষা করিব।"

মজুমদার মহাশয় উপরোদ্ধৃত মন্তব্যের আত্মপরিচয় দিতে গিয়া সরলভাবে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মসমাজ যে কতদূর পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না এবং সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র ও সাধনার প্রভাব প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের উপর পতিত হইয়া, পরানুকরণমোহ অনেকাংশে দূর করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল।

একটা জীবন্ত, জাগ্রত জাতির যুগযুগান্তরের চিরপোষিত আশা, আদর্শ-সমূহের জীবন্ত-ঘন-বিগ্রহরূপে—তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল,—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে, ভাগীরথী তীরে পঞ্চবটীমূলে উপবিষ্ট শক্তিসাধক, নির্বিকল্প-সমাধিস্থ মহাযোগী, ভক্ত-চূড়ামণি, বৈষ্ণব, শাক্ত, খৃষ্টান, মুসলমান বিভিন্ন প্রকার ধর্মসাধনে সিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। যাঁহার সম্বন্ধে উত্তরকালে বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান, * * * স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাব-সমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া, যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতপ্রতীয়মান বহুবিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ড-সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়, তাহা দেখাইতে—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

১৮৭৫ সালের প্রথম ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কেশবের সাক্ষাৎ হয়। ভক্ত কেশবচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার ধর্মজীবনে এক বিচিত্র পরিবর্তন উপস্থিত হইল। খৃষ্ট-মহিমা কীর্তনকারী কেশবচন্দ্র

ভারতীয় বৈরাগ্যমূলক সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন; দৈহিক কঠোরতা, স্বপাক ভোজন প্রভৃতি আরম্ভ করিলেন; এমন কি হিন্দু দেবদেবীর আধ্যাত্মিক ও রূপক ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতাও দিতে লাগিলেন। যুক্তিপন্থী ব্রাহ্মগণ, কেশবচন্দ্রের ভক্তির আতিশয্য, অত্যধিক খৃষ্টপ্রীতি, বিশেষ সাধনভজন, যোগধ্যান ইত্যাদি পছন্দ করিতেন না। তাহার উপর ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অনুসারে তিনি যখন নববিধান প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন চরমপন্থী ব্রাহ্মরা কেশবের আনুগত্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে" গৃহবিবাদের সূত্রপাত হইল। ১৮৭৮ সালে কেশবের নাবালিকা কন্যার সহিত কোচবেহারের মহারাজার বিবাহ হয়। উক্ত বিবাহোপলক্ষে কেশব ব্রাহ্মসমাজের স্বরচিত নিয়মাবলীর মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ কেশবকে বাধ্য হইয়া হিন্দুমতে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইয়াছিল। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল; একদল ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রকে আচার্যের ও সম্পাদকের পদ হইতে অপসৃত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। এই বিবাদে লজ্জাকর আত্মদৌর্বল্য প্রকট করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হইল; প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মগণ বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠা করিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দলপতিরা কেশবের দ্রুত পরিবর্তিত ধর্মমতের তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। গৃহদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও কেশব তাঁহার "নববিধান" প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'সকল ধর্মই সত্য' এবং 'যত মত তত পথ' ইত্যাদি আংশিকভাবে উপলব্ধি করিয়া হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে স্বীয় শিষ্য ও অনুগতবর্গকে নূতন নূতন সাধন-পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

"নববিধান" সমাজে কেশব পরমহংসদেবের আদর্শে "মা" নাম চালাইয়া দিলেন; নিজেও মাতৃভাবে ভগবানের সাধনায় অগ্রসর হইলেন। মাতৃভাবে ভগবানের উপাসনা কেশববাবু যে পরমহংসদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বহুদিবস পরে উক্ত সমাজের প্রচারকগণ অস্বীকার করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর প্রণীত রামকৃষ্ণজীবনীতে কেশবের ধর্মজীবনের পরিবর্তন, উন্নতি, সাধনাকাঙ্ক্ষার প্রধান কারণ উক্ত মহাপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় তাঁহাদের "আচার্য" ছোট হইয়া গেলেন, এই এক ধারণা লইয়া তাঁহারা বিদ্বেষবিষতিক্ত প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসই কেশবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধর্মজীবনে উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্তী কেশব-শিষ্যগণ বোধ হয় অবগত নহেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন, নববিধান চার্চের অন্যতম মিশনরী বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় বহু পূর্বে লিখিয়াছেন—

> "ভগবানের মাতৃভাব সম্বন্ধীয় ভাব ব্রাহ্মসমাজ পরমহংসের জীবন হইতে প্রাপ্ত হন। বিশেষভাবে আমাদিগের আচার্য (কেশবচন্দ্র সেন) তাঁহার নিকট হইতে ঈশ্বরকে "মা" বলিয়া ডাকিতে এবং শিশুর সরলতা ও অভিমান লইয়া আব্দার করিয়া প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করেন। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মধর্ম জ্ঞানপ্রধান এবং শুষ্ক তর্কযুক্তিতে পূর্ণ ছিল। পরমহংসের জীবনাদর্শ ব্রাহ্মধর্ম হইতে শুষ্কতা দূর করিয়া উহাকে অধিক প্রিয়তর এবং ভক্তিময় করিয়া তুলিল।" (ধর্মতত্ত্ব—১লা আশ্বিন, ১৮০৯ শক)

উদারভাব, সর্বজনীন ধর্ম ইত্যাদির দোহাই দিয়া ব্রাহ্মসমাজে যে লজ্জাকর

দলাদলি আরম্ভ হইল—তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব অতিমাত্রায় খর্ব হইয়া পড়িল।

অপরদিকে ১৮৭০ সাল হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সনাতনপন্থিগণের আন্দোলন ফলপ্রসূ হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে প্রচারক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহোদয়ের চেষ্টা, বক্তৃতাশক্তি এবং কর্মোৎসাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সনাতনধর্ম প্রচার করিয়া ব্রাহ্মভাবাপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে পুনরায় স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মপ্রচারকগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুশাস্ত্র ব্যাখ্যাও কলিকাতা সহরে কম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে নাই। ইতিপূর্বে শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত “সনাতনধর্ম-রক্ষিণী” সভাও নূতন শক্তি লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন শাস্ত্রব্যাখ্যা, সাত্ত্বিকাচার প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রবন্ধাদি পাঠ চলিতে লাগিল। এই সময় হইতেই দেশের শিক্ষিত-সমাজের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর চেষ্টায় রাজনৈতিক আন্দোলন বেশ জাঁকিয়ে উঠায় কেশবের ১৮৬০-৬৬ সালের “ইয়ং বেঙ্গল” সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তথাকথিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবন-সমস্যার মীমাংসা খুঁজিয়া না পাইয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ রাজনীতি-সহায়ে উহা মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময়ে—“ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে—যখন আমরা সংস্কারের আবর্তে পড়িয়া কোন্ পথে যাইব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, পাশ্চাত্যের প্রখর বিদ্যুতের আলোকে যখন আমাদের চক্ষু প্রতিহত হইতেছিল, সমগ্র জাতির যখন প্রায় দিগ্‌ভ্রম হইবার উপক্রম, জাতির সম্মুখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সন্দেহের পরে সন্দেহ যখন ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, বিজাতীয় পথে স্বজাতির সংস্কাররথ যখন আর চলিতে না পারিয়া প্রায় থামিয়া যাইতেছিল, দীর্ঘ এক শতাব্দীর সংস্কারফল চিন্তা করিয়া যখন আমরা একরূপ হতাশভাবে বসিয়া পড়িতেছিলাম, কিন্তু কি করিব ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই, তখন সেই সংস্কারের ঝড়ে আলোড়িত ও মথিত বাঙালী-সমাজের জঠর হইতে আবির্ভূত হইলেন—**স্বামী বিবেকানন্দ**।”

সংস্কার-যুগপ্রবর্তক রামমোহনের কথা ছাড়িয়া দিলে, একাল পর্যন্ত তাঁহার পরবর্তী সংস্কারকগণ ধ্বংসনীতির অনুসরণ করিয়া এত অধিক শক্তিক্ষয় করিলেন যে, গড়িয়া তোলা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া উঠিল; এমন কি, অবশেষে তাঁহারা ভাঙ্গিবার প্রবলতম আগ্রহে আত্মশরীর পর্যন্ত ত্রিধা বিভক্ত করিয়া শক্তিহীন ও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। অনুদার ধর্মমত প্রচার, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, আর প্রাচীন সমাজের ও ধর্মের মস্তকে অকারণ অভিশাপ বর্ষণ—পরবর্তীকালের শক্তিহীন দুর্বল সংস্কারকগণের একমাত্র পেশা হইয়া পড়িল। অন্য গুরুতর কারণের সহিত, বিশেষতঃ এই সমস্ত কারণের সঙ্গেও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী “গণ্ডী” ছাড়িয়া বিশ্ব-বৈকুণ্ঠের পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার নাম কাটিয়া দিল।

বিগত শতাব্দীর সংস্কারকগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিলেও মোটের উপর সংস্কারযুগকে বিবেকানন্দ বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। বিবেকানন্দ ধ্বংসের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল—সংগঠন। অথচ সংস্কারকদিগের আদর্শে যে গঠনের প্রস্তাব একেবারেই ছিল না, একথা বলিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং বিবেকানন্দের আদর্শ ও কার্যপ্রণালীতে যে আবর্জনাকে পরিহারের চেষ্টা ছিল না—একথা বলিলেও

মিথ্যা বলা হইবে। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম সংস্কারযুগের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কে বলিবে যে, এই প্রতিবাদের আবশ্যক ছিল না? যাহাকে প্রতিবাদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে মানুষ বিশেষরূপেই সজাগ থাকে। সেই হিসাবে ব্রাহ্মযুগ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বিশেষরূপেই সচেতন ছিলেন এবং তাহা ছিলেন বলিয়াই একদিকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্রের সংস্কারের প্রভাব ও প্রতিবাদ যেমন তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে রাজনারায়ণ, বঙ্কিম ও ভূদেবের চিন্তাও সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহার মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। অথচ সমস্ত দিক হইতেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত প্রখরভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে,—এক অতি অনুপম ভাস্বর দীপ্তিতে ইতিহাস আলোকিত করিয়া গিয়াছে। তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার পূর্বগামী সংস্কারযুগকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। প্রত্যেক পরবর্তী যুগপ্রবর্তককেই তাহা করিতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সাধক বিবেকানন্দ

(১৮৮০-৮৬)

> “‘আজকাল ইহা একটী চলিত কথায় দাঁড়াইয়াছে, আর সকলেই বিনা আপত্তিতে এটী স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা দোষ। আমিও এক সময়ে এইরূপ ভাবিতাম, আর ইহার শাস্তিস্বরূপ আমাকে এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, যিনি পুতুলপূজা হইতেই সব পাইয়াছিলেন।”
>
> —বিবেকানন্দ

১৮৭৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন তিনি অষ্টাদশবর্ষীয় বালকমাত্র! পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার কালে তিন বৎসরের পাঠ্য বিষয় এক বৎসরে শেষ করিতে গিয়া নরেন্দ্রনাথকে গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সে বৎসরের মত তাঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হইল। পর বৎসর তিনি জেনারেল এসেম্বলী ইন্স্টিটিউসানে যোগ দিয়া এফ. এ. পড়িতে লাগিলেন।

প্রখর ব্যক্তিত্বশালী নরেন্দ্রনাথ অতি সহজেই সহপাঠিগণের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নিজের শক্তির উপর গভীর বিশ্বাসপ্রসূত শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান তাঁহার চরিত্রের এক দেদীপ্যমান বৈশিষ্ট্যরূপে সমভাবে সহপাঠী ও অধ্যাপকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কলেজে নরেন্দ্রের বন্ধু ও অনুরক্ত ভক্ত জুটিয়াছিল প্রচুর। তাঁহারা যে কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভা ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখিয়া আকৃষ্ট হইতেন, এমন কথা বলা যায় না। প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, তর্কশক্তি ইত্যাদি মানসিক গুণাবলী অপেক্ষা নরেন্দ্রের মধুর সঙ্গীতের মোহিনী-শক্তি এবং দৃঢ়-সবল নাতিদীর্ঘ সুঠাম দেহখানি সহজেই ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী-যুবক-হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইত। লোকমুখে শুনিয়াছি, তাঁহার পৌরুষ-দৃপ্ত মুখমণ্ডলের স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য এবং সর্বোপরি উজ্জ্বল মর্মভেদী দৃষ্টিপূর্ণ বিশাল নেত্রদ্বয় দেখিয়া মুগ্ধ হইত না, এমন ছাত্র কলেজে অতি অল্পই ছিল।

নরেন্দ্র কোনদিনই শান্ত-শিষ্ট ছিলেন না। লোক-ব্যবহারে, তৎকালপ্রচলিত খৃষ্টানী-কাম-ব্রাহ্ম-নীতিমার্গের পথিকও ছিলেন না। জীবন তাঁহার নিকট ছিল —এক স্বচ্ছন্দ অবিরাম প্রবাহ; তথাকথিত নীতিশাস্ত্রের বিধিনিষেধের বাঁধন জড়াইয়া পঙ্গু হইয়া ‘ভালমানুষ’ সাজিবার গতানুগতিকতা তাঁহার জীবনের সহজ-প্রবল গতিমুখে কোন বাধা দান করিতে পারে নাই। তিনি পরচর্চা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না, কিন্তু কখনো কাহারও অসাক্ষাতে কোনো কথা বলিতেন না। যাহাকে যাহা বলিবার আবশ্যক হইত, নির্বিচারে মুখের উপর বলিয়া দিতেন। বাল-সুলভ সরলতার সহিত তিনি যখন ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র-সমালোচনায় অগ্রসর হইয়া তীব্র শ্লেষবাক্যে তাহার অন্তর জর্জরিত করিয়া তুলিতেন, তখন বন্ধুবর্গের সম্মুখে অপ্রতিভ হইয়া উক্ত ব্যক্তি সাময়িক তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেও

পরক্ষণেই তাহা ভুলিয়া যাইতেন। কারণ ঐ প্রকার সমালোচনা কঠোর ও নির্ভীক হইলেও তাহার মধ্যে ঈর্ষা বা অন্য কোন নীচ অভিসন্ধি থাকিত না। যুবক বা বালকবৃন্দের একটি অপরাধ নরেন্দ্রের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় ছিল—অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে চাওয়া, মৃদুহাস্য সহকারে ললিতভঙ্গিতে কথোপকথন, দৃষ্টি মিলিত হইবামাত্র লজ্জায় নতনেত্র হওয়া, কোমল অঙ্গভঙ্গী, মন্থর গমন ইত্যাদি অভ্যাস করিয়া পুরুষ চেষ্টা করিয়া স্ত্রীলোক হইবে, ইহা তাঁহার অসহ্য ছিল। তাহার উপর যদি কোন ছাত্র, অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নরেন্দ্রের কঠোর সমালোচনার তীক্ষ্ণবাক্যে মস্তক অবনত করিয়া স্বীয় ত্রুটী স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকিত না।

ডন, কুস্তি, ক্রিকেট খেলা ইত্যাদিতে তাঁহার সমধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। দৈহিক শক্তিতে নরেন্দ্রনাথ সমবয়স্কদিগের মধ্যে অন্য বালক অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। নরেন্দ্রনাথ পাঠশ্রান্ত মস্তিষ্ককে বিশ্রাম প্রদান করিবার জন্য সময় সময় বন্ধুবর্গের সহিত রঙ্গপরিহাসে যোগদান করিতেন। আমোদ-প্রমোদ করিবার নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার এই সমস্ত ব্যবহার ও সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলবৎ আচরণের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অনেকে নানাপ্রকার ধারণা করিয়া বসিতেন, কেহ বা তিক্ত মন্তব্যও প্রকাশ করিতেন। তেজস্বী, স্বাধীনচেতা নরেন্দ্র নিন্দা শ্রবণ করিয়া কখনও বিচলিত হইতেন না; এমন কি, অবজ্ঞাহাস্যে উড়াইয়া দেওয়া ব্যতীত কখনও কোনপ্রকার প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইতেন না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ স্বল্পকাল মধ্যেই নির্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত করিতে পারিতেন বলিয়া সঙ্গীত, হাস্য, পরিহাস ইত্যাদি করিবার জন্য প্রচুর অবসর পাইতেন; অনেক হীনবুদ্ধি বালক তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া স্বীয় সর্বনাশ ডাকিয়া আনিত। চপল-চটুলবাক্য-বিন্যাস-পটু সুরসিক নরেন্দ্রনাথকে বাহ্য আচরণ দিয়া বিচার করিয়া এইকালে যাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বলা বাহুল্য তাঁহারা এই অদ্ভুত যুবকের প্রকৃত পরিচয়, অতি সন্নিকটে থাকিয়াও অতি অল্পই পাইয়াছেন।

কবির উদ্দাম কল্পনা-প্রবণ অধীর প্রতিভা লইয়া নরেন্দ্রনাথ যখন নিবিষ্ট মনে দর্শনশাস্ত্র বা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন তিনি এক স্বতন্ত্র মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হইতেন। এফ. এ. পরীক্ষার পূর্বেই তিনি মিল প্রমুখ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকগণের মতবাদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং হিউম ও হারবার্ট স্পেন্সরের দার্শনিক গ্রন্থসমূহ পড়িতে আরম্ভ করেন।

জেনারেল এসেম্বলী কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেষ্টি সাহেব একাধারে সুপণ্ডিত, কবি ও দার্শনিক ছিলেন। নরেন্দ্র, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাশালী ছাত্র তাঁহার সমধিক প্রিয়তর ছিলেন। ইঁহারা তাঁহার নিকট নিয়মিতভাবে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। হেষ্টি সাহেব নরেন্দ্রকে এত অধিক স্নেহ করিতেন যে, একদিন উক্ত কলেজের "আলোচনা সভায়" নরেন্দ্রের দার্শনিক মতবিশেষের বিশ্লেষণে সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,— "He is an excellent philosophical student. In all the German and English Universities there is not one student so brilliant as he is."

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রসমূহের আলোচনা তাঁহার হৃদয়ে এক তুমুল ঝড় তুলিয়া দিল। তাঁহার জন্মগত সংস্কার ও মর্মগত বিশ্বাস চারিদিকের পারি-

পার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংঘর্ষে আসিয়া বিচলিতপ্রায় হইয়া উঠিল। ভিতরের মানুষটির অন্তর্নিহিত ভাবনিচয়ের সহিত এই প্রবল সচেষ্ট যুদ্ধ স্থূলদৃষ্টি ছাত্রবৃন্দের ধারণারও অতীত ছিল। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুই উহা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

ডেকার্টের অহংবাদ, হিউম এবং বেনের নাস্তিকতা, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ —সর্বোপরি স্পেন্সরের অজ্ঞেয়বাদ ইত্যাদি বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তারণ্যে পথহারা হইয়া নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত সত্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুর এই কালের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া ১৯০৭ সালে "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহা পাঠ করিলে নরেন্দ্রনাথের মানসিক অশান্তি ও বিপ্লবের বেশ একটা যুক্তিপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহাকে শেলীর কবিতা, হেগেলের দর্শন এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করিতে পরামর্শ দিলেন। ক্রমবর্ধমান জ্ঞানপিপাসা লইয়া নরেন্দ্র যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি দেখিলেন যে, চরম সত্যলাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বুদ্ধি-বিচার সহায়ে দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্ব মীমাংসায় ব্যাপৃত থাকিলে চলিবে না। কিন্তু উপায় কি?

এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়-জগতের অন্তরালে এমন কোন শক্তিমান পুরুষ আছেন কি না, যাঁহার ইঙ্গিতে এই জড়সমষ্টি পরিচালিত হইতেছে? এই মানবজীবনের উদ্দেশ কি? এবম্বিধ অতীন্দ্রিয়রাজ্যের রহস্যপূর্ণ প্রশ্নসকল পর্যায়ক্রমে তাঁহার মানস-পটে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রসমূহ, যুক্তি ও বিচার সাহায্যে তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে গিয়া অথবা সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া, উহাকে অধিকতর জটিল করিয়াছে মাত্র। কাজেই স্বীয় সত্যানুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তিকে কেবলমাত্র দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনায় নিযুক্ত না রাখিয়া বহির্জগতে জীবন্ত আদর্শের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখনই কোন ধর্মপ্রচারক ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অশান্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা ঢালিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, "মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?"

আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা প্রচারক এই অদ্ভুত প্রশ্নকর্তার উদ্‌গ্রীব মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া "হাঁ" বা "না" এতদুভয়ের কোনটিই উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে প্রয়াসী হইতেন। ফলে, বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি একজনও প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাইলেন না; কেবল পুঁথিগত বিদ্যার আবৃত্তিকারী অথবা পরধর্মছিদ্রান্বেষী জনকতক ব্যক্তির দর্শনলাভ করিলেন মাত্র। ধর্মপ্রচারকগণের সম্প্রদায়গত বাঁধা বুলি শুনিয়া শুনিয়া তিনি প্রবল সন্দেহবাদী হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ধর্মপ্রচারকগণের অন্তঃসারশূন্যতা ও পাশ্চাত্ত্য জড়বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রবল যুক্তিসমূহ কিছুতেই তাঁহার সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষাকে উন্মূলিত করিতে পারিল না। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"
মূঢ় বিদ্যা অভিমানী, অবিদ্যার মাঝে জ্ঞানী, ভাবে আপনায়।
অসার জ্ঞানের গর্বে অন্ধনীত অন্ধসম ভ্রাম্যমাণ হায়!

সত্যলাভের প্রেরণাই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া গিয়াছিল। এই যুক্তিপন্থী, সন্দেহবাদী অথচ সত্যকাম যুবক, আগ্রহসহকারে ব্রাহ্ম-আচার্যগণের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। অবশেষে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন।

কিন্তু কতকগুলি ধরাবাঁধা মতবাদ এবং প্রণালীবদ্ধ উপাসনা ইত্যাদিতে তাঁহা অদ্ভুত আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত হইল না।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিবার পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রাজে লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধসমূহের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াও তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশববাবুর নিক তত্ত্বালোচনার জন্য গমনাগমন করিতেন। অদ্বিতীয় বক্তা ও শক্তিশালী গুরু কেশবচন্দ্রের অনুরাগী হইয়াও, নব-প্রতিষ্ঠিত নববিধান সমাজে যোগদান করিয়া, তিনি কেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন, আমরা তৎসম্ব চারিটি প্রধান কারণ দেখিতে পাই।

১। বাল্যকাল হইতেই তিনি জাতিগত অধিকার-বৈষম্যকে ঘৃণা করিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকবৃন্দ এই কালে জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদসাধনকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন; ইহাতে তাঁহার পূর্ণ সম্মতি ছিল।

২। নারীগণকে ধর্মকার্যে ও সমাজ-জীবনে পুরুষের সমান অধিকার প্রদা পূর্বক সুশিক্ষিত করিয়া তোলার সংকল্পও তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

৩। নববিধান সমাজের ব্রাহ্মগণের ভাবাবেশ, ক্রন্দন ও ভক্তির আতিশ কেশবকে প্রেরিত পুরুষ ইত্যাদি বলা তাঁহার ভাল বোধ হয় নাই।

৪। রাজা রামমোহনের আদর্শের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কথঞ্চিৎ যো থাকিলেও, উহা যে রাজার ঈপ্সিত পথে বিকশিত হয় নাই, ইহা তিনি স্পষ্ট বুঝি কোন বিশেষ সমাজের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেন নাই।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াও তিনি উপাসনা বিষয়ে সমাজস্থ অন্যান্য স গণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। মেধাবী, দৃঢ়চেতা নরেন্দ্রনাথ অপরে মতামত নির্বিচারে গিলিয়া ফেলিবার মত ছেলে ছিলেন না; কাজেই কেহ তাঁহা স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তর্ক উপস্থিত করিলে তিনি পাশ্চাত্য সংশয়বা দার্শনিকগণের যুক্তিসমূহকে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে এমনভাবে প্রক করিতেন যে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত হইতে হইত। নির্ভীক ও কঠোর সমালোচ হইলেও ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সমধিক স্নেহ করিতেন। নরেন্দ্র রবিবাসরীয় উপাসনাকালে মধুরকণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া সভ্যগণের চিত্তবিনো করিতেন এবং উপাসনায় যোগ দিতেন; কিন্তু তাঁহার "স্বাভাবিক বৈরাগ্যপ্র মন ত্যাগের ও জ্বলন্ত ধর্মবুদ্ধির অভাববোধে ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীবদ্ধ উপাস তৃপ্তিলাভ করিত না।"

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ ধ্যানানন্দে তন্ময় হইয়া যাইতেন। মনঃসং তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া করিতে হইত না। একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নরেন্দ্রে ধ্যান করিবার উপদেশ দিলেন। বলিলেন, তোমার অবয়বে যোগিজনোচিত চি বিদ্যমান। তুমি ধ্যান করিলেই শান্তি ও সত্যলাভ করিবে। পূতচরিত মহর্ষি প্রতি নরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিমান ছিলেন। কাজেই তাঁহার কথায় নরেন্দ্রে অনুরাগ দ্বিগুণিত হইল। কেবল তাহাই নহে, তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য-পালনে অগ্রসর হইলেন। নিরামিষ ও পরিমিত আহার, ভূমিশয্যায় শয়ন, সাদা ধুতি চাদর পরিধান ইত্যাদি বাহ্য কঠোরতাও অবলম্বন করিলেন। নরেন্দ্রনাথ স্ব বাটীর সন্নিকটে মাতামহীর ভাড়াটিয়া বাটীর একটি কক্ষে থাকিতেন। এইখা কোলাহলহীন নির্জনতার মধ্যে তাঁহার সাধন-ভজনের সুবিধা হইত। বাড়ি লোকেরা মনে করিতেন, হট্টগোলে পড়ার ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই নরেন্দ্রনাথ বাড়ি থাকিতে চাহেন না। পুত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক বিশ্বনা

বাবুও এজন্য কোনদিন কিছু বলেন নাই; কাজেই নরেন্দ্রনাথ একান্তে পড়াশুনা, সঙ্গীত-চর্চা ইত্যাদি করিয়া অবশিষ্ট সময় সাধন-ভজনে ব্যয় করিতেন।

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার সত্য জানিবার ইচ্ছা তো তৃপ্ত হইলই না, বরং উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি বুঝিলেন যে, অতীন্দ্রিয় সত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এমন এক ব্যক্তির চরণতলে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিবার প্রয়োজন, যিনি ঐ সত্য সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। তিনি ইহাও প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন যে, এ জীবনে সত্যলাভ করিতে হইবে, নয় সেই চেষ্টায় প্রাণ দিতে হইবে, নতুবা এ অশান্তি-সঙ্কুল জীবন ধারণ করিয়া লাভ কি? পারিপার্শ্বিক প্রভাবের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াও, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের চিন্তারাশির দ্বারা আলোড়িত হইয়াও এবং যুক্তিপন্থী ব্রাহ্ম হইয়াও তিনি সৎগুরুলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। এক মহৎ আধ্যাত্মিক ক্ষুধার আবেশে দিবারাত্র ভাবিতে লাগিলেন, কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে, কোথায় শান্তি!—

"কস্মিন্নু ভগবন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি?"

কিন্তু কোথায় তিনি এমন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইবেন, যিনি স্বীয় জীবনের ও জগতের সমস্যা মীমাংসা করিয়াছেন, যিনি জগৎকারণ সেই ভূমাকে জানিয়াছেন, যাঁহার জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত হইয়াছে এবং যিনি অপরকেও তৃপ্ত করিতে সক্ষম?

কলিকাতাস্থ শিমলাপল্লীর ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একদিন স্বালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লইয়া আসেন এবং একটি আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন। সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় স্বীয় প্রতিবেশী নরেন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন। ১৮৮০ সালের নভেম্বর মাসে ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-শ্রবণে সমধিক প্রীত হইয়াছিলেন ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আগ্রহের সহিত তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিদায়কালে নরেন্দ্রনাথকে একদিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান।

ইতিমধ্যে এফ. এ. পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকায় নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পরীক্ষা হইয়া গেলে তাঁহার পিতা বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, কারণ তাঁহার সঙ্গতিপন্ন ভাবী বৈবাহিক যৌতুকস্বরূপ নগদ দশসহস্র টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আজন্ম বিবাহ-বিতৃষ্ণ নরেন্দ্র বিষম আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা বিশ্বনাথবাবুর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল; কিন্তু তিনি স্বয়ং পুত্রকে অনুরোধ না করিলেও অন্যান্য আত্মীয়গণকে নরেন্দ্রকে সম্মত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ভক্তগণের অন্যতম প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺রামচন্দ্র দত্ত বিশ্বনাথবাবুর গৃহেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। একদিন বিবাহের প্রসঙ্গের আলোচনায় নরেন্দ্র তাঁহাকে স্বীয় অন্তরের অশান্তিগুলি খুলিয়া বলিয়া বিবাহের অন্তরায়গুলি বুঝাইয়া দিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের যুক্তিগুলি শুনিয়া অবশেষে বলিলেন, "যদি প্রকৃত সত্যলাভ করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-সমাজ ইত্যাদি স্থানে না ঘুরিয়া দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকটে চল।" নরেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া সম্মত হইলেন এবং কয়দিন পর দুই চারিজন বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র ঠাকুর তাঁহার সহিত চিরপরিচিতের মত সরলভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত, কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, সহসা ঠাকুর

তাঁহাকে আহ্বান করিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ভাবে বিভোর হইয়া তিনি নরেন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া স্নেহগদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন, “তুই এতদিন কেমন করে আমায় ভুলে ছিলি! তুই আস্‌বি বলে আমি কতদিন ধরে পথপানে চেয়ে আছি! বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ থেকে তোর মত যথার্থ ত্যাগীর সঙ্গে কথা কয়ে শান্তি পাব।” বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল। বিস্ময়-বিমিশ্র বিহ্বল-দৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথ এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন; কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

দেখিতে দেখিতে পরমহংস কৃতাঞ্জলি হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি জানি, তুমি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি, নররূপী নারায়ণ; জীবের কল্যাণ-কামনায় দেহধারণ করিয়াছ।” ইত্যাদি ইত্যাদি।

একি অদ্ভুত উন্মত্ততা! আমি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্র, এসব কি কথা!

তারপর যখন ঠাকুর পুনরায় ভক্তবৃন্দের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সহজভাবে আলাপাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন নরেন্দ্র বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার হাব-ভাব, চাল-চলনের মধ্যে কোনপ্রকার উন্মত্ততার লেশমাত্র নাই। ঠাকুরের কথাগুলি অসম্বদ্ধ-প্রলাপোক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ নহে; কিন্তু উহার মধ্যে কি গভীর রহস্য নিহিত আছে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তিনি বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

স্বামী সারদানন্দ “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে” নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের বহুপূর্বে ঠাকুরের এক দিব্যদর্শনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

“একদিন দেখিতেছি, মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্র সূর্য তারকামণ্ডিত স্থূলজগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম, এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম—সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারী দেবদেবী সকল পর্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, দিব্যজ্যোতিঃ ঘনতনু সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব তো দূরের কথা, দেবদেবীদিগকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদিগের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র বিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেবশিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল। পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময় বাণীদ্বারা সাদরে আহ্বানপূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন

তাঁহার বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবশিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশ পূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—'আমি যাইতেছি, তোমাকে যাইতে হইবে।' ঋষি তাহার ঐরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীর মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতিঃর আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এই সেই ব্যক্তি।"

নরেন্দ্রের বিচারসক্ষম সূক্ষ্মবুদ্ধি, এই অলৌকিক দেব-মানবের চরিত্র-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া পরাজিত হইল। যাঁহার পবিত্র সঙ্গে কেশববাবু, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি শক্তিমান্ আচার্যগণের ধর্ম-জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাকে একজন উন্মাদ বলিয়া স্থির করাটাও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বিষম সমস্যায় পতিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে পারিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, ইঁহাকে ভালরূপে পরীক্ষা না করিয়া কখনও ঈশ্বরদর্শী মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়া লইব না। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই তিনি এমন প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেন, যাহাতে মধ্যে মধ্যে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতে হইত। ঠাকুরের অপূর্ব ত্যাগ, শিশুর মত অভিমানশূন্য সরল ব্যবহার, বিনয়-নম্র মধুর বাক্য, সর্বোপরি রহস্যময় নিষ্কাম ভালবাসা, নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিল। নরেন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, এই দেব-মানবের কৃপায় বহু ব্যক্তির জীবন কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছে; কিন্তু তথাপি সহসা তিনি এই "পাগলকে" জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এমন কি, ক্রমাগত তিন বৎসরকাল তাঁহাকে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, ঠাকুরের নিকট যাতায়াত কালেও নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সমাজের নিয়মিত উপাসনা ইত্যাদিতে যোগদান করিতেন। রাখালচন্দ্র ঘোষ (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) নরেন্দ্রের সহিত একযোগে ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য হইয়াছিলেন। ইনি নরেন্দ্রনাথের কিয়দ্দিবস পূর্ব হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর ইঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং সর্বদা কাছে কাছে রাখিতেন। একদিন নরেন্দ্র, রাখালকে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবমন্দিরে গিয়া প্রতিমা প্রণাম করিতে দেখিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঠাকুরের সমক্ষেই তাঁহাকে "মিথ্যাচারী" ইত্যাদি বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কারণ রাখালও "একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিব"—এই মর্মে সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অপ্রতিভ রাখালকে লজ্জায় অধোবদন হইতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়া বলিলেন, "ওর যদি সাকারে ভক্তি হয়, তা' হ'লে ও কি কর্‌বে? তোমার ভাল না লাগে তুমি করো না। ত'বলে অপরের ভাব নষ্ট করবার তোমার কি অধিকার আছে?" নরেন্দ্র চিন্তিতভাবে নিরস্ত হইলেন; কিন্তু এই ঘটনায় বুঝা যায়, তখনও নরেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা-প্রণালীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

নিরাকার-ধ্যানই নরেন্দ্রের ভাল লাগিত। ঠাকুর তাঁহাকে সেই ভাবেই উপদেশ দিতেন। কখনও জোর করিয়া তাঁহাকে সাকারে বিশ্বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন না; এমন কি, তিনি কোনদিন নরেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতে নিষেধও

করেন নাই। তিনি কখনও কাহারও স্বাধীন ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করিতেন না। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ, দর্শনমাত্রেই কাহার ভিতরে কি আছে বুঝিয়া লইতেন এবং স্ব স্ব ভাবানুযায়ী বিশেষ বিশেষ সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন। জোর করিয়া কাহারও ভাব নষ্ট করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

ঠাকুর প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই যুবককে কালে জগতের শত শত ধর্মপিপাসু নরনারীর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইতে হইবে, লুপ্তপ্রায় সনাতন পথে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণগর্বে অন্ধ স্বদেশবাসীকে ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিতে হইবে, সর্বোপরি নিজ জীবনে প্রকটিত "যত মত তত পথ" রূপ সার্বভৌমিক আদর্শ প্রচারকার্যে নরেন্দ্রনাথই সমধিক উপযুক্ত অধিকারী। ভবিষ্যৎ বুঝিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সর্বমতগ্রাসী বেদান্তোক্ত সাধানমার্গে পরিচালিত করিতে প্রয়াসী হইলেন বটে, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সগুণ নিরাকার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন বলিয়া অদ্বৈতবাদ অনেক বিলম্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্মমতানুসারে তিনি ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, "আমিই ব্রহ্ম একথা বলার মত পাপ আর কিছু নেই।"

পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও নরেন্দ্রনাথ যে আধিকারিক পুরুষ এবং জগদম্বার বিশেষ কার্যসাধনোদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা তিনি নিজে বিশ্বাস করিতেন না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে কেশব, বিজয় প্রভৃতি ব্রাহ্ম-নেতৃবৃন্দ উপবিষ্ট আছেন, নরেন্দ্রও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর ভাবস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন; অবশেষে কেশব ও বিজয় বিদায় গ্রহণ করিলে পর ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাবে দেখ্‌লাম, কেশব যে শক্তিবলে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, নরেন্দ্রের মধ্যে অমন আঠারোটা শক্তি রয়েছে। কেশব ও বিজয়ের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বল্‌ছে, ওর মধ্যে জ্ঞানসূর্য রয়েছে।"

এইরূপ অযাচিত প্রশংসায় সাধারণ মানব অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "বলেন কি মশাই! কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব সেন, আর কোথায় একটা নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া নরেন্দ্র, লোকে শুন্‌লে আপনাকে পাগল বল্‌বে।" ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া সরলভাবে উত্তর করিলেন, "তা' কি করবো বল, মা দেখিয়ে দিলেন, তাই বল্‌ছি।"

জগন্মাতার দোহাই দিয়াও ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সমালোচনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না; কারণ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ সমস্ত অদ্ভুত দর্শন ইত্যাদির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইতে তখনও পারেন নাই, তিনি সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "মা দেখিয়ে দিলেন, না আপনার মাথার খেয়াল কেমন করে বুঝ্‌বো? আমার তো মশাই ওরকম হ'লে, খেয়াল দেখেছি বলেই বিশ্বাস হ'ত।"

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের স্বাধীন চিন্তার পরিপোষক মতসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়-থাকা নিবন্ধন তিনি প্রথম প্রথম ঠাকুরের জগন্মাতার সহিত বাক্যালাপ, ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন প্রভৃতিকে মস্তিষ্কের ভুল বলিয়া উল্লেখ করায় অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ তর্কে অনেকেই তাঁহার তীক্ষ্ম যুক্তির সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের কেশব, প্রতাপবাবু, চিরঞ্জীববাবু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ঠাকুরের সঙ্গগুণে ভাবান্তরের কথা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যান্য ভক্তবৃন্দও ঠাকুরের নিকট ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবার অভিলাষে যাতায়াত করিতেন; কিন্তু যখন বিজয় গোস্বামী স্বীয় ধর্মমতের পরিবর্তন হওয়ায় সাধারণ সমাজের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন, তখন শিবনাথ

প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম-নেতা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমনাগমন ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহাদের ভয় হইল, যদি তাঁহারাও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে ধর্মমতের পরিবর্তন করিয়া বসেন! শিবনাথ ব্রাহ্মগণকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমন করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথও যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমনাগমন করিতেন, তাহা শিবনাথবাবুর অবিদিত ছিল না। তিনি নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "ওসব সমাধি, ভাব যা' কিছু দেখ, স্নায়বিক দৌর্বল্যমাত্র; অত্যধিক শারীরিক কঠোরতা অভ্যাস করিবার ফলে পরমহংসের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে।"

নরেন্দ্র নিরুত্তরে শিবনাথবাবুর উপদেশ শ্রবণ করিলেন। তাঁহার অন্তরে তখন যে কি ঝড় বহিতেছিল! ঐ ত্যাগি-কুল-চূড়ামণি, সরল, উদার, প্রেমিক-পুরুষ বিকৃতমস্তিষ্ক? কিন্তু তিনি কি? তিনি কে? কেন তিনি আমার মত ক্ষুদ্র মানবের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকেন? ঠাকুরের অদ্ভুত নিষ্কাম ভালবাসার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইলেন না! একি রহস্যময় সমস্যা! নরেন্দ্র সংশয়-দ্বন্দ্বালোড়িত চিত্তে গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন।

তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের অধিকাংশ নেতার সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি সন্দর্শনে অকপটভাবে শ্রদ্ধাও করিতেন; কিন্তু এতদিন ব্রাহ্ম-সমাজে ইঁহাদের সহিত একত্রে উপাসনা প্রার্থনা ইত্যাদি করিয়াও তাঁহার হৃদয় প্রশান্ত হইল না কেন?

একদিন ঈশ্বরলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতায় নরেন্দ্র গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। মহর্ষি তখন গঙ্গাবক্ষে একখানি বোটে বাস করিতেন। নরেন্দ্র গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া দ্রুতপদে বোটে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ করাঘাতে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল। মহর্ষি তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন, সহসা শব্দে চমকিয়া চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে উন্মাদবৎ তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নরেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান! মহর্ষিকে ক্ষণকাল চিন্তা বা প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই তিনি আবেগাকুলিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" বিস্ময়-স্তম্ভিত মহর্ষি কি যেন একটা উত্তর দিবার জন্য দুইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বাক্যনিঃসরণ হইল না। অবশেষে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "নরেন্দ্র, তোমার চক্ষু দেখিয়া বুঝিতেছি, তুমি যোগী।" তিনি নরেন্দ্রকে বিবিধ-প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন যে, তিনি যদি নিয়মিতরূপে ধ্যানাভ্যাস করিতে থাকেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী হইবেন, ইত্যাদি।

নরেন্দ্র প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া ভগ্নহৃদয়ে বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। যদি মহর্ষির মত ভক্তিমান্ ঈশ্বরপ্রেমিক এ পর্যন্ত ভগবদ্দর্শন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কাহার নিকট যাইবেন? তবে কি এ মিথ্যা? ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি মানবের কল্পনাসৃষ্ট আকাশকুসুমবৎ অলীক?

গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী দূরে নিক্ষেপ করিলেন। যদি উহা তাঁহার ঈশ্বর-লাভের সহায়তা না করিতে পারিল, তবে অনর্থক ঐগুলি পাঠ করিবার ফল কি? বিনিদ্রনয়নে নরেন্দ্রনাথ কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্ভুত প্রেমিকের কথা। সমগ্র রজনী অসহনীয় উৎকণ্ঠায় যাপন করিয়া নরেন্দ্র প্রভাতে দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীশ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সদানন্দময় পুরুষ ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া অমৃত-মধুর উপদেশ প্রদান করিতেছেন!

নরেন্দ্রের হৃদয়ে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইল। যদি ইনিও “না” বলিয়া বসেন তাহা হইলে কি উপায় হইবে? আর কাহার কাছে যাইবেন? অন্তঃপ্রকৃতির সহিত যথেষ্ট সংগ্রাম করিয়া অবশেষে তিনি যে প্রশ্ন বহু ধর্মাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই যে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই, সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, “মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?”

মৃদুহাস্য-রঞ্জিত মহাপুরুষের প্রশান্ত বদনমণ্ডল অপূর্ব শান্তি ও পুণ্য-বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর করিলেন, “বৎস! আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি। তোমাকে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতররূপে দেখিয়াছি।” নরেন্দ্রের বিস্ময় শতগুণ বর্ধিত করিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, “তুমি দেখিতে চাও? তোমাকেও দেখাইতে পারি, যদি তুমি আমি যাহা বলি তদ্রূপ আচরণ কর।”

শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী শুনিয়া তাঁহার উদ্বেলিত আনন্দ মুহূর্তকাল পরেই সন্দেহের অন্ধকারে বিলয়প্রাপ্ত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মধ্য দিয়া তিনি যে পন্থার ইঙ্গিত পাইলেন, তাহা কুসুমাবৃত নহে। এই অর্ধোন্মাদ ব্যক্তির চরণে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া কঠোর সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত নরেন্দ্রনাথ সহসা ঠাকুরকে গুরুপদে বরণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু কিছুদিন পরে এক বিশেষ ঘটনায় তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অনেকদিন নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। সেদিন রবিবার, ব্রাহ্ম-সমাজে গেলে নিশ্চয়ই নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন, এই আশায় ঠাকুর সন্ধ্যাকালে সাধারণ সমাজের উপাসনায় উপস্থিত হইলেন। আচার্য তখন বেদী হইতে বক্তৃতা করিতেছিলেন। ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণে ভাবোন্মত্ত ঠাকুর অজ্ঞাতসারেই বেদীর সমীপবর্তী হইলেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের আগমনের কারণ অনুমান করিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া পতনোন্মুখ ভাবময় দেহখানি ধারণ করিলেন; কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, পরমহংসকে সম্মুখে দেখিয়া বেদীতে উপবিষ্ট আচার্য গাত্রোত্থান করা তো দূরের কথা, তিনি এবং অন্যান্য ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে সম্ভাষণও করিলেন না এবং সাধারণ ভদ্রতাসূচক শিষ্টাচারও প্রদর্শন করিলেন না। অনেকের মুখে অবজ্ঞাবিমিশ্র বিরক্তির চিহ্নই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইতোমধ্যে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ফলে উপাসনালয়ে বিশৃঙ্খল কোলাহল দেখিয়া কর্তৃপক্ষ গ্যাসালোকগুলি নিবাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র বহুকষ্টে মন্দিরের পশ্চাৎ-দ্বার দিয়া ঠাকুরকে বাহিরে আনিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। ঠাকুরের প্রতি ব্রাহ্মগণের এইরূপ ব্যবহারে তিনি হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইলেন এবং তাঁহারই জন্য ঠাকুর এইভাবে লাঞ্ছিত হইলেন দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত নরেন্দ্র আর কখনও ব্রাহ্ম-সমাজে যান নাই।

সূক্ষ্ম যোগজদৃষ্টি-সহায়ে ঠাকুর নরেন্দ্রের মহিমাসমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়াই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; নরেন্দ্রও তাঁহার অসীম নিষ্ঠা, জগজ্জননীর উপর পূর্ণ নির্ভরতা, ত্যাগপূত পবিত্র জীবন ইত্যাদি দর্শন করিয়া একরকম অজ্ঞাতসারেই তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্যান্য রামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দ প্রথম প্রথম নরেন্দ্রকে ততটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। তাঁহার জন্য ঠাকুরের তীব্র ব্যাকুলতা অনেকের নিকটেই রহস্যময় বোধ

হইত। প্রবল আত্মবিশ্বাসের দিক হইতে নরেন্দ্রনাথের অকপট নির্ভীক আচরণগুলি সাধারণের স্থূলদৃষ্টিতে দম্ভ ও ঔদ্ধত্য বলিয়া প্রতিভাত হইত। বিশেষতঃ, ভক্তবৃন্দের ভাবাবেশে ক্রন্দন, কথায় কথায় দয়াময় ভগবানের কৃপা প্রার্থনা, নিজেকে কীটাণুকীটতুল্য হেয়জ্ঞান করিয়া আত্মনিন্দা ইত্যাদির তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করিতেন। পুরুষ পুরুষের মতই শির উন্নত করিয়া, দৃঢ় উদ্যম ও অটুট সঙ্কল্প লইয়া ভগবানের আরাধনা করিবে, ইহাই তিনি সমীচীন মনে করিতেন; কাজেই অনেক ভক্ত নরেন্দ্রের মুখর সমালোচনায় নিরুত্তর হইয়া মনক্ষুণ্ণ হইতেন। সর্ববিষয়ে নিঃসঙ্কোচ স্বাধীন ব্যবহার, স্পষ্টবাদিতা ইত্যাদির জন্য তিনি অনেকের অপ্রিয় হইলেও তাঁহার উদাসীন প্রকৃতি লোকের নিন্দা-প্রশংসার বিষয় ভাবিবার অবসর পাইত না। সাধারণ মানব তাঁহাকে যাহাই ভাবুক না কেন, ঠাকুর জানিতেন, নরেন্দ্র নির্ভীক সত্যবাদী, তাঁহার বাক্যে ও কার্যে কোথাও বিন্দুমাত্র "ভাবের ঘরে চুরি" নাই।

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইলেই তাহা মীমাংসা না করা পর্যন্ত শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। অহোরাত্র চিন্তা করিয়াও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং এই অস্থিরতা হইতেই তিনি দৃঢ়তা ও সতর্কতার সহিত ঠাকুরের নিকট গমনাগমন, এমন কি, তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস পর্যন্ত করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরকে পরীক্ষা করা, তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ইত্যাদি বাহ্য আচরণের মধ্য দিয়া নরেন্দ্রের যে অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিত, তাহাকে দম্ভ মনে করিয়া ঠাকুরের অনেক ভক্ত বিরক্ত হইতেন; কিন্তু যাঁহারা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে নরেন্দ্রের গভীর 'অন্তস্তলের খবর' রাখিতেন, তাঁহারাই জানিতেন, ঠাকুরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, ভক্তি কি অপরিসীম! যে ঠাকুরের কণামাত্র করুণালাভ করিলে অনেক ভক্ত উচ্ছ্বসিত আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, সেই করুণা-মন্দাকিনীধারা নরেন্দ্র অটলভাবে দাঁড়াইয়া মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন। স্বার্থলেশশূন্য ও এ অপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রেমসম্বন্ধ বর্ণনা করি, এমন সাধ্য আমার নাই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তুই যদি আমার কথা না শুন্‌বি, তাহ'লে এখানে আসিস্‌ কেন?" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "আপনাকে ভালবাসি, তাই দেখ্‌তে আসি, কথা শুন্‌তে নয়!" উত্তর শুনিয়া ঠাকুর ভাবানন্দে গদ্‌গদ হইলেন; মনের গোপন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় অপ্রতিভ নরেন্দ্র মরমে মরিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন, তাহা দেখিয়া একদিন তিনি রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "পুরাণে আছে, ভরতরাজা 'হরিণ' ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুর পর হরিণ হইয়াছিলেন; আপনি আমার জন্য যে রকম করেন, তাহাতে আপনারও ঐ দশা হইবে।" এই কথা শুনিয়া বালকের ন্যায় সরল ঠাকুর চিন্তিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তাইতো-রে, তাহ'লে কি হবে, আমি যে তোকে না দেখে থাক্‌তে পারিনে।" সন্দেহের উদয় হইবামাত্র ঠাকুর কালীঘরে মা'র কাছে ছুটিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "যা শালা, আমি তোর কথা শুন্‌বো না; মা বল্‌লেন, তুই ওকে (নরেন্দ্রকে) সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস্‌, তাই ভালবাসিস্‌, যেদিন ওর ভিতর নারায়ণকে না দেখ্‌তে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখ্‌তে পারবি না।"

ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্রই তাঁহাকে উচ্চ-অধিকারী ও দৈবশক্তিসম্পন্ন

বিশুদ্ধচিত্ত সাধক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই স্বীয় অহেতুক প্রেম অজস্র ধারায় ঢালিয়া দিয়া উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

একদিন নরেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের সম্মুখে ভক্তবৃন্দের মধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, “এর (স্বদেহের) ভিতরে যেটা রয়েছে সেটা শক্তি; ওর (নরেন্দ্রের) ভিতরে যেটা আছে, সেটা পুরুষ; ও আমার শ্বশুরঘর।” এ সমস্ত কথা শুনিয়া নরেন্দ্র মৃদুহাস্য করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, আবার পাগলামী আরম্ভ হইল।

ভক্তবৃন্দ ঈশ্বরবিষয়ক সঙ্গীত ও পরমার্থচর্চায় প্রবৃত্ত ছিলেন; ক্রমে দিবাবসানপ্রায় দেখিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন। সম্মুখে সুবিস্তৃত গঙ্গাবক্ষে লহরীমালার শীর্ষে দিগন্তের পীতাভ লোহিত রশ্মিমালা নৃত্য করিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইল; সন্ধ্যার ধূসর ছায়া, পরপারস্থ সৌধশিখর ও বৃক্ষশীর্ষগুলিকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল, তখনও দেবালয়ে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে নাই; ঠাকুর একদৃষ্টে নরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা আসন হইতে উঠিয়া দক্ষিণ চরণ তাঁহার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার আশেপাশে দৃশ্যমান পদার্থনিচয় এক অনন্তসত্তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে; কেবল তিনি একা, অবশেষে তাঁহার “আমিত্ব”ও বিলীন হইবার উপক্রম হইল, তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওগো, তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন।”

ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হস্তার্পণ করিবামাত্র তিনি পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দেখেন, অদ্ভুত দেব-মানব তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাস্য করিতেছেন। চিরকাল দৃঢ়হৃদয় বলিয়া নরেন্দ্রনাথের যে গর্ব ছিল, আজ তাহা সমূলে চূর্ণ হইয়া গেল! পিতৃমাতৃ-মমতায় অন্ধ হইয়া, নাম-রূপের গণ্ডী ভেদ করিয়া তিনি তো যোগিজন-বাঞ্ছিত চিদানন্দসাগরে ঝাঁপ দিতে পারিলেন না!

যে মহাপুরুষ কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়া একজন সাধারণ ব্যক্তিকে বহুজন্মার্জিত সাধনার ফলস্বরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ্ সমাধি-ধনের অধিকারী করিয়া দিতে পারেন, তিনি কখনও উন্মত্ত নহেন। আবার ভাবিলেন, ইহা সম্মোহন (Hypnotism) নহে তো? নরেন্দ্রনাথ, যাহাতে ঠাকুর ভবিষ্যতে তাঁহার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া ঐ প্রকার ভাবান্তর ঘটাইতে না পারেন, তদ্বিষয়ে সাবধান হইলেন।

এদিকে বি. এ. পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র, পিতার আদেশানুসারে সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী নিমাইচরণ বসুর নিকট এটর্ণীর ব্যবসায় শিখিতে লাগিলেন। পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য বিশ্বনাথবাবু বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র যে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের নিকট যাতায়াত করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু উহা তিনি ততটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না। বিশেষতঃ, বি. এ. পড়িবার সময় নরেন্দ্র রামতনু বসু লেনে স্বীয় মাতামহীর ভবনে তাঁহার পাঠগৃহ নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। আত্মীয়, পরিজন ও অন্যান্য লোকের সমাগমে পিতৃভবন সর্বদা কলরবে মুখরিত থাকিত বলিয়া তাঁহার পড়াশুনার বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইত। এই কক্ষে ধনীর সন্তান হইয়াও নরেন্দ্রনাথের সামান্য শয্যা, কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক, একটি তানপুরা ও তামাক খাইবার সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য কোন তৈজসপত্র ছিল না। নির্জনবাস, ধ্যান, দৈহিক

কঠোরতা, সংযম অভ্যাস ইত্যাদি সহকারে তিনি প্রকৃত ব্রহ্মচারীর মত জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন। কখন কখন দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুর তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের এত ঘনিষ্ঠতা তাঁহার পরিজনবর্গের ততটা প্রীতিকর ছিল না; কিন্তু কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। স্বাধীনচেতা নরেন্দ্রকে নিষেধ করিয়া নিবৃত্ত করা অসম্ভব, তাহা সকলেই জানিতেন। তাঁহার বিবাহিত জীবনের উপর প্রবল বিতৃষ্ণা, সংসারের প্রতি অনাসক্ত ভাব প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরিজন ও বন্ধুবর্গ সকলেই শঙ্কিত হইলেন।

বি. এ. পরীক্ষার বেশী বিলম্ব নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায় দেখিয়া নরেন্দ্র পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার জনৈক সহাধ্যায়ী বন্ধু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং গম্ভীরভাবে নরেন্দ্রকে নানাপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। দর্শনশাস্ত্র আলোচনা, সাধুসঙ্গ, ধর্মালোচনা ইত্যাদি পাগলামিগুলি পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সাংসারিক "সুখ-সুবিধা" হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করাই কর্তব্য—ইহাই তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল। কিছুদিন হইতে তথাকথিত সাংসারিক বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট নরেন্দ্র এই প্রকার উপদেশ শুনিতেন, সহৃদয় বন্ধুর মুখেও ঐ প্রকার উপদেশ শুনিয়া তিনি ব্যথিতহৃদয়ে স্বীয় মানসিক অশান্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "আমার মনে হয়, সন্ন্যাসই মানবজীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। নিয়ত পরিবর্তনশীল অনিত্য সংসারের পশ্চাতে সুখ-লালসায় ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়ার চেয়ে, সেই অপরিবর্তনীয় 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'কে পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা শতগুণে শ্রেষ্ঠতর।"

বৈরাগ্যপ্রবণ নরেন্দ্রনাথ উৎসাহের সহিত ত্যাগের মহিমা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার বন্ধুর সহিত তর্ক উপস্থিত হইল। ক্রমে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার বন্ধু বলিলেন, "দেখ নরেন, তোমার যে প্রকার বুদ্ধি ও প্রতিভা ছিল, তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করিতে পারিতে, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস তোমার মাথা খাইয়াছেন। যদি ভাল চাও, তাহা হইলে ঐ পাগলের সঙ্গ পরিত্যাগ কর নতুবা তোমার সর্বনাশ হইবে।"

নরেন্দ্র নীরব হইলেন। বন্ধুটি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে নরেন্দ্র গাত্রোত্থান করিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন; তাঁহার ব্যথিত মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পর তিনি মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝিতে পারিতেছ না, আর বলিব কি, আমি নিজেও তাঁহাকে সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবু ঐ সরল, সৌম্যকান্তি মহাপুরুষকে আমি ভালবাসি কেন, তাহা বলিতে পারি না।"

পরমহংসের "সঙ্গদোষে" নরেন্দ্রের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া উক্ত বন্ধু দুঃখিতান্তঃকরণে প্রস্থান করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার প্রতিকূল সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া স্বনির্দিষ্ট পথেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বি. এ. পরীক্ষা হইয়া গেল। বি. এ. পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য তাঁহাকে কঠোর মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। শ্রমক্লান্তি অপনোদনের জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে সমপাঠী বন্ধুবর্গের সহিত সঙ্গীত, হাস্য-পরিহাস ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতেন। নরেন্দ্রকে বাধ্য হইয়াই বন্ধুবর্গের আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে হইত; কারণ তাঁহারা একরকম জোর

করিয়াই তাঁহাকে লইয়া যাইতেন।

ইতোমধ্যে একদিন তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া বরাহনগরে জনৈক বন্ধুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে বয়স্যগণসহ তিনি সঙ্গীত-আলোচনা ইত্যাদিতে রত আছেন, এমন সময় হাস্য-কলরব-মুখরিত কক্ষে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিলেন, নরেন্দ্রনাথের পিতা সহসা হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উজ্জ্বল-আলোকিত কক্ষে নরেন্দ্রনাথ চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, দ্রুতপদে উন্মত্তের ন্যায় বাটীতে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাঁহার গৌরব-গর্বের হিমাচলসদৃশ পিতার মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া জননী ও ভ্রাতা-ভগিনীগণ বিলাপ করিতেছেন। নরেন্দ্রের দৃঢ় হৃদয় বিচলিত হইল, পিতৃশোকে অধীর হইয়া তিনি অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বিশ্বনাথ দত্ত যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন বটে, কিন্তু উদার ও মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। যে সংসারের মাসিক ব্যয় সহস্রাধিক মুদ্রা সে সংসার চলিবে কিরূপে? সদ্যঃবিধবা জননীও সন্তান-সন্ততি-পরিজনবর্গকে লইয়া দশদিক্ অন্ধকার দেখিলেন। সংসার সম্পর্কে উদাসীন নরেন্দ্রনাথ সহসা দারিদ্র্যের কঠোর স্পর্শে চমকিয়া উঠিলেন। চিরদিন আদরে-যত্নে, প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত ভাইবোনদের এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। সম্পদকালে যাঁহারা পরমবন্ধু ছিলেন, সংসারের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহারা বিপদ্‌কালে সরিয়া পড়িলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু আত্মহারা হইলেন না। তিনি সহিষ্ণুধৈর্যে নীরবে দৈন্যের পীড়া সহ্য করিতে লাগিলেন; বন্ধুবর্গকে সাংসারিক শোচনীয় অবস্থার কথা জানিতে দিলেন না। একদিকে আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, অপরদিকে কাজকর্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিন চারিমাস অতীত হইলেও তিনি কোন সুবিধাই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অন্নাভাবনিবন্ধন কোন কোন দিন পরিবারবর্গের আহার জুটিয়া উঠিত না। আহার্যদ্রব্যের অপ্রাচুর্যের বিষয় গোপন-অনুসন্ধানে অবগত হইয়া নরেন্দ্রনাথ মাতাকে, বাহিরে নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া বাটীতে আহার করিতেন না; একরকম উপবাস বা সামান্য কিছু খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমাগত উপবাসে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িল; এমনকি, কোন কোন দিন প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় মূর্ছিতবৎ পড়িয়া থাকিতেন। কতিপয় সহৃদয় বন্ধু অবশ্য এ বিপদে তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু আজন্ম আত্মনির্ভরশীল নরেন্দ্রনাথ বিনীতভাবে ঐ সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতেন। উদরের তাড়নায় তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন, এ চিন্তা তাঁহার অসহনীয় ছিল। কথিত বন্ধুবর্গ নরেন্দ্রনাথের সুগভীর আত্মমর্যাদাজ্ঞানের বিষয় অবগত ছিলেন; কাজেই প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে মাঝে মাঝে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। তিনি কোনদিন বিশেষ কার্যের ভান করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অসমর্থতা জানাইতেন, কোনদিন বা প্রফুল্লতার ভান করিয়া পূর্বের ন্যায় উৎসাহ ও আনন্দের সহিত আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতেন; কিন্তু তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিবামাত্র তাঁহার হাস্যপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিত; তাঁহার ব্যথিত মানসপটে সংসারের দারিদ্র্যদুঃখগুলি একে একে ফুটিয়া উঠিত। মনে পড়িত, প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতাভগিনীগণের অনশনক্লিষ্ট মলিন মুখচ্ছবিগুলি, তাহাদিগকে ফেলিয়া তিনি কেমন করিয়া সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিবেন!

ভাগ্যচক্রের সহসা-বিবর্তনে যাঁহারা কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থানে পিতৃহীন হইয়া কপর্দকশূন্য অবস্থায় পরিজনবর্গের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা নরেন্দ্রনাথের বর্তমান অবস্থা সম্যক্-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ভাগ্য-বিপর্যয়ে বিমুখ পিতৃবন্ধুগণের আচরণ দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। সংসারের শোচনীয় কৃতঘ্নতার কদর্যমূর্তি দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আহত আত্মাভিমানকে অবিচলিত ধৈর্যে সংযত করিয়া বুভুক্ষু যুবক নগ্নপদে নগ্নমস্তকে প্রতপ্ত মধ্যাহ্নে কলিকাতার রাজপথে চাচুরীর সন্ধানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেন, সন্ধ্যার পর অবসন্নদেহে ব্যর্থ-চেষ্টার শ্রম-ক্লান্তি লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন; এইরূপে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে তাঁহার দুঃখকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। তাঁহার জনৈক জ্ঞাতি, তাঁহাদিগকে গৃহচ্যুত করিবার সঙ্কল্প করিয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন।

একদিন প্রভাতে নরেন্দ্রনাথ শ্রীভগবন্নাম উচ্চারণ পূর্বক শয্যাত্যাগ করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, তাঁহার মাতা বলিতেছেন, "চুপ্ কর্ ছোঁড়া, ছেলে-বেলা থেকে কেবল ভগবান্ ভগবান্! ভগবান্ তো সব কল্লেন।"

কথা কয়টি নির্মমভাবে তাঁহার ব্যথিতহৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া প্রচণ্ড অভিমান জাগ্রত করিয়া তুলিল। বাস্তবিকই কি ভগবান্ দরিদ্রের কাতর-ক্রন্দন শুনিতে পান না, অথবা শুনিতে চাহেন না? তিনি কি কেবল নিশ্চল নির্বিকারভাবে হাত গুটাইয়া এই নিষ্ঠুর সৃষ্টির দানবী-লীলা দেখিতেছেন? যে ভগবান্ ইহলোকে বুভুক্ষুকে এক টুক্‌রা রুটি দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন না, তিনি পরকালে অক্ষয় স্বর্গে অনন্ত সুখের অধিকারী করিবেন, ইহা কি সম্ভব? তবে কি ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই? হ্যাঁ, আছেন। তবে তিনি মঙ্গলময় বা দয়াময় নহেন, তিনি নির্বিকার। দুঃখীর ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয় না—তিনি হৃদয়হীন!

বন্ধুবর্গের নিকটে নরেন্দ্র সময় সময় তাঁহার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অভিনব ধারণার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। কি মর্মন্তুদ দুঃখের সহিত তিনি ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের চিরপ্রতিষ্ঠিত প্রভুত্বকে দুঃসহ অভিমানে প্রত্যাখ্যান করিতেন, তাহা সাধারণ মানব কেমন করিয়া বুঝিবে? অনেকেই স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন। পুরুষকার-সহায়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার পশ্চাতে যে গর্বদৃপ্ত আত্মশক্তির প্রেরণা, যে মহিমাসমুজ্জ্বল ত্যাগের বিকাশ, দৃঢ়বিশ্বাসী ভক্তের অসীম অনুরাগ, তাহা সাধারণ মানবের দৃষ্টিতে পড়িতে পারে না।

সে কেবল বুঝিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। বিষয়কর্মে জড়িত থাকিয়া নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারেন নাই; ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে আনিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। কলিকাতার ভক্তবৃন্দ শুনিয়াছিলেন যে, অসৎসঙ্গে মিশিয়া নরেন্দ্রনাথের চরিত্র খারাপ হইয়া গিয়াছে, পূর্বের ন্যায় আর ধর্মভাব নাই! এই সমস্ত মিথ্যা নিন্দাবাদ শ্রবণে সন্দিহান হইয়া ভক্তগণ অনেকে নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের বাক্যালাপের মধ্যে সন্দেহের পরিচয় পাইয়া নরেন্দ্রনাথের রুদ্ধ অভিমান জাগিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য! বাহিরের লোকে যাহা রটায়, ইঁহারা পর্যন্ত তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন। হয়তো ঠাকুরও ঐরূপ মিথ্যা দুর্নাম বিশ্বাস করিয়াই পরীক্ষার্থ ইঁহাদিগকে পাঠাইয়া থাকিবেন, মনে মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইবামাত্র ভক্তের হৃদয়ে সুতীব্র অভিমান জাগিয়া উঠিল। তাঁহার তিক্ত উত্তর-

সমূহ শুনিয়া কোন কোন ভক্ত ঠাকুরের নিকট গিয়া জানাইলেন, নরেন্দ্রের যে অধঃপতন হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঠাকুর প্রাণাধিক নরেন্দ্রের সাংসারিক বিপদ ইত্যাদির কথা ইতোপূর্বেই জানিতে পারিয়া যথেষ্ট মনোকষ্ট পাইতেছিলেন, তাহার উপর নরেন্দ্রনাথের স্বভাব-পবিত্র চরিত্রে নানারূপ কলঙ্ক আরোপিত হইতে চলিয়াছে শুনিয়া ভক্তবৃন্দকে বলিলেন, "চুপ্ কর্ শালারা, মা বলিয়াছেন, সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না, আর কখনও ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখদর্শন কর্‌ব না।"

নরেন্দ্রের উপরে ঠাকুরের কতখানি শ্রদ্ধামিশ্রিত বিশ্বাস ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। একদিন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় নরেন্দ্রের প্রশংসা করিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "এরকম বুদ্ধিমান্ ছেলে আমি খুব কম দেখেছি, এই বয়সে এত পাণ্ডিত্য অথচ কি নম্রতা। এ সমস্ত ছেলে যদি ধর্মের জন্য অগ্রসর হয় তো দেশের অনেক কল্যাণ হবে।" নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা শুনিয়া ঠাকুর বিহ্বল-হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "তা' হবে না কেন গো? ওর জন্যই তো এবার এখানকার (নিজের দেহ দেখাইয়া) আসা!"

দুর্দমনীয় অভিমানে যদিও নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না; কিন্তু চিরকাল দৃঢ়হৃদয় বলিয়া তাঁহার যে অহঙ্কার ছিল, তাহাও নিঃশেষে চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও হৃদয় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। ঐ মহাপুরুষের কৃপায় তিনি যে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন, সেগুলি পুনঃ পুনঃ মানসপটে উদিত হইয়া তাঁহার মনঃকল্পিত নাস্তিকতা দূর করিয়া দিল। তিনি বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, আমি করিতেছি কি?

অর্থোপার্জন ও পরিবার-প্রতিপালন করিয়া কায়ক্লেশে কোনমতে গতানুগতিকভাবে জীবনযাপন করিবার জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য মহান্, তাঁহার লক্ষ্য যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দলাভ! দিন স্থির করিয়া নরেন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করিবার জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সেদিন ঠাকুর কলিকাতাস্থ কোন ভক্তের আলয়ে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন: নরেন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়া তথায় উপনীত হইলেন, ইচ্ছা, গৃহত্যাগ করিবার প্রাক্কালে শ্রীগুরুচরণ বন্দনা করিয়া সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন; কিন্তু তাহা হইল না। ঠাকুরের ব্যাকুল অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইল।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট, নির্নিমেষে নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন, বিশাল নয়নদ্বয়ে দরবিগলিত অশ্রুধারা। বিহ্বল নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের নিহিত ব্যথা গলিয়া নয়নপথে নির্গত হইল। তাঁহার বিদ্রোহী মনের উপর এ কি রহস্যময় প্রাণময় প্রেরণা! উভয়ে নির্বাক! উপস্থিত অন্যান্য ভক্তবৃন্দ বিস্ময়-স্তম্ভিত। বহুক্ষণ পর ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সকরুণ নেত্রে নরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া স্নেহস্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "বাবা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে কিছু হবে না।" ঠাকুরের ভয়, পাছে নরেন্দ্রনাথ সংসারে জড়াইয়া পড়েন। উভয়ে নির্বাক্, অথচ নয়নে অশ্রু—এ অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য জানিবার জন্য জনৈক ভক্ত কৌতূহলবশে প্রশ্ন করায়, ঠাকুর মৃদু হাস্যে উত্তর করিলেন, "আমাদের একটা হয়ে গেল।" রাত্রিতে নরেন্দ্রকে নির্জনে লইয়া ঠাকুর নানাপ্রকার সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, যতদিন তাঁহার দেহ আছে ততদিন সংসারে থাকিতে হইবে এবং তিনি যে বিশেষ কার্যসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে

যখন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বর হইতে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন, একটা অভূতপূর্ব আনন্দের ও আশার বাণী যেন তাঁহার হৃদয়ের পর্বতোপম ভার সরাইয়া দিয়াছে। এখন আর ঠাকুর তাঁহার নিকট রহস্যময় উন্মাদ নহেন, তাঁহার জীবনের চরমাদর্শ, গুরু, পিতা—সর্বস্ব।

নাবালক ও বিধবার সম্পত্তি-গ্রাসের চেষ্টা আমাদের দেশে প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে। জ্ঞাতিদের ষড়যন্ত্রমূলক মোকদ্দমার জন্য নরেন্দ্রনাথ প্রস্তুত হইলেন। তাহারা বাড়ি ভাগ করিয়া লইবার জন্য আদালতের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিল। বাড়ির ভাল অংশটা যাহাতে তাহারা পায়, এই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। জননী ভুবনেশ্বরী দিশাহারা হইলেন। বিপদের পর বিপদের আঘাতে মর্মাহত সিংহের ন্যায় নরেন্দ্রনাথ অন্তিমবলে বিপক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অন্যায় অসত্যের নিকট কিছুতেই মাথা নত করিবেন না, ইহাই ছিল তাঁহার পণ। আদালতে মামলা চলিতে লাগিল। নরেন্দ্রের পিতৃবন্ধু বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মামলা চালাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। এই মামলা উপলক্ষে কতকগুলি ঘটনায় নরেন্দ্রের উপস্থিতবুদ্ধি, চরিত্রের দৃঢ়তা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বিপক্ষপক্ষের উকীল নরেন্দ্রনাথকে জেরা করিবার কালে নরেন্দ্রনাথের নির্ভীক স্পষ্ট ধীর-গম্ভীর উত্তর শুনিয়া এবং তিনি আইন পড়িতেছেন জানিয়া জজ সাহেব সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, 'যুবক, কালে তুমি একজন ভাল উকীল হইবে।' জজ সাহেব সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া নরেন্দ্রের পক্ষেই মামলার রায় দিলেন। জয়ের সংবাদ পাইবামাত্র নরেন্দ্রনাথ আনন্দে আদালত হইতে জননীর নিকট ছুটিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় বিপক্ষের এটর্ণী তাঁহার হাত ধরিয়া নিবারণ করিলেন এবং সানন্দে বলিলেন, "জজ সাহেবের সহিত আমিও একমত। আইনই আপনার যোগ্য ক্ষেত্র, আমি আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিতেছি।"

নরেন্দ্র ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া জননীকে বলিলেন, 'মা, বাড়ি বাঁচিয়াছে।' ভুবনেশ্বরী আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিজয়ী সন্তানকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। দুঃখের মধ্যেও ভগবান এমনি করিয়া অতি কঠিন আনন্দের দৃশ্য ফুটাইয়া তোলেন —ইহাই সংসার।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, সাংসারিক দিক দিয়া বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। একদিন নরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, হয়তো ঠাকুরের কৃপায় ইহার একটা সুবিধা হইতেও পারে। মনে ইহা উদয় হইবামাত্র তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন। নয়নের মণি নরেন্দ্রকে পাইয়া ঠাকুর আনন্দে বিহ্বল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। অগাধ বিশ্বাস লইয়া তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয়! যাহাতে আমার মাতা ও ভাই-ভগিনীদের দুটি খাওয়ার একটু উপায় হয়, সে সম্বন্ধে আপনার মাকে অনুরোধ করিতে হইবে।" ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, আমি কোনদিন মার কাছে কিছু চাই নাই, তবে তোদের যাতে একটু সুবিধা হয়, সেজন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুই তো মাকে মানিস্ না, তাই মা তোর কথায় কান দেয় না।"

কঠোর নিরাকারবাদী নরেন্দ্রের সাকারে বিন্দুমাত্র নিষ্ঠা ছিল না। মূর্তি-পূজাবিরোধী নরেন্দ্রনাথ কি করিবেন। অবিশ্বাস? সেদিন চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বাস! বিনা প্রমাণে? কেমন করিয়া সম্ভব? নরেন্দ্রনাথ নতমস্তকে রহিলেন।

কিন্তু ঠাকুর তাঁহার জন্য কি না করিতে পারেন। যিনি তাঁহার দুঃখকষ্টের বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং ভিক্ষার্থে বহির্গত হইবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনি

কি সেই নরেন্দ্রের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন? কিন্তু লীলাময় ঠাকুরও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন, মায়ের কৃপা ছাড়া কিছু হবে না। নরেন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা' চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন।"

বিশ্বাস থাক আর নাই থাক, ঠাকুরের প্রস্তরময়ী জগন্মাতাটি কি পদার্থ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

দিনান্তের রক্তরশ্মিমালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লঘুমেঘখণ্ডগুলির নিকষে কনকরেখা অঙ্কিত করিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। দেবালয়ে সন্ধ্যার আরতিবাদ্য মৃদুগম্ভীররোলে উত্থিত হইয়া কর্মশ্রান্ত চিত্তের উপর অপূর্ব প্রশান্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। ঠাকুর তখন বারান্দায় পদচারণা করিয়া মধুর কণ্ঠে ভগবন্নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। দীর্ঘসমুন্নতদেহ, আজানুলম্বিতবাহুযুগল, প্রশস্ত ললাটে মহিমার বিচ্ছুরিত দ্যুতি, নেত্রে শান্তোজ্জ্বল করুণা, নরেন্দ্রনাথের মুগ্ধ-দৃষ্টি নিষ্পলক হইল। তিনি কি ভাবিতেছিলেন, ঈশ্বরের চিরজাগ্রত মহিমার ঘনীভূত মূর্তিস্বরূপ এই অদ্ভুত দেব-মানব কি তাঁহার দুর্বল কল্পনা হইতে ঊর্ধ্বে, অতি ঊর্ধ্বে, যেখানে তাঁহার বিচার-বুদ্ধির হাস্যকর মূঢ়তা অগ্রসর হইতে পারে না?

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। নরেন্দ্রনাথ সংশয়দ্বন্দ্বালোড়িত চিত্তে "কালীঘর" অভিমুখে চলিলেন। আজ ঠাকুরের কৃপায় সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হইবে, উৎকণ্ঠিত উল্লাসে তাঁহার বক্ষ ভরিয়া উঠিল।

তিনি দেখিলেন, জগদম্বার ভুবনমোহনরূপে শ্রীমন্দির আলোকিত। প্রস্তরমূর্তি নয়, "মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী প্রতিমা" বরাভয় কর বিস্তার করিয়া অসীম অনুকম্পাভরে স্নেহকরুণ হাস্য করিতেছেন। তারপর কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন, আর জানেন তাঁহার অদ্ভুত গুরু পরমহংসদেব। ফলকথা, নরেন্দ্র সব ভুলিয়া গেলেন। ভক্তি-বিহ্বল-চিত্তে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "মা, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি দাও! যেন তোমার কৃপায় সর্বদাই তোমাকে দেখিতে পাই মা!"

নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন; ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাইলি? তাঁহার পূর্বসঙ্কল্প স্মৃতিপথে উদিত হইল। তাইতো, তিনি করিয়াছেন কি? ঠাকুরের আদেশে তিনি পুনরায় মন্দিরে গেলেন; দ্বিতীয়, তৃতীয় বারেও তিনি মুখ ফুটিয়া মায়ের চরণে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করিতে পারিলেন না। তাঁহার আজন্ম বৈরাগ্যপ্রবণ মন, সময়ে সময়ে জাগতিক দুঃখকষ্টে বিচলিত হইলেও পার্থিব ভোগসুখের কামনায় ক্ষুব্ধ হয় নাই; তিনি কেমন করিয়া অন্ন-বস্ত্রের জন্য প্রার্থনা করিবেন! কল্পতরুতলে গমন করিয়া, একান্ত মূর্খ ব্যতীত আর কে অমৃতফল ছাড়িয়া লাউ-কুমড়া কামনা করে?

অবশেষে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের নির্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তুই যখন চাইতে পারলি না, তখন তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নেই, তবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।" নরেন্দ্র আশ্বস্ত হইলেন, তাঁহার নিজের সংসারসুখের প্রয়োজন নাই।

সেইদিন হইতে নরেন্দ্রের জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এ অধ্যায় রহস্য-জটিল, সাধারণ মানববুদ্ধির ধারণাতীত। লোক-লোচনের অন্তরালে কি অদৃশ্য কৌশলে যে ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দকে গড়িতেছিলেন তাহা বর্ণনা

করিবার শক্তি লেখকের নাই। আশ্চর্য ত্যাগি-কুল-চূড়ামণি সাধক, ততোধিক আশ্চর্য তাঁহার আচার্যদেব!

শ্রীগুরু-কৃপায় নরেন্দ্রনাথের সাংসারিক অভাব অনেকাংশে দূরীভূত হইল। নরেন্দ্র এটর্ণী আফিসে কাজ করিয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদের দ্বারা কিছু কিছু অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন; অবশেষে স্থায়িরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে শিক্ষকতা কার্য গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৩ হইতে ১৮৮৪ সাল। শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। দলে দলে নরনারী তাঁহার দর্শনার্থ, শ্রীমুখের বালবোধ্য সরলমধুর উপদেশবাণী শুনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম কয়েকটি অর্ধস্ফুট কুসুম চয়ন করিয়া ঠাকুর এক গগনোপম উদার আদর্শ ধর্ম-সঙ্ঘ গড়িতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসরব্যাপী কি গভীর সুদুস্তর তপস্যা ও সাধনার মধ্য দিয়া জগদম্বা এই অভিনব আদর্শ-পুরুষকে গঠন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা অল্পবুদ্ধি মানব কেমন করিয়া করিবে? যাঁহার ইচ্ছামাত্র নর-পশু পলকের মধ্যে দেবত্ব প্রাপ্ত হইত, যাঁহার স্পর্শমাত্রে একজন সাধনহীন মানব অনায়াসে সমাধিগত হইয়া সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি করিত, যাঁহার কৃপা-কটাক্ষে এক মুহূর্তে ইষ্টদর্শন হইত; অথচ যিনি অপূর্ব বিনীত-সারল্যের সহিত নিজের দীনাতিদীন বলিয়া কীর্তন করিতেন, যিনি পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মত মাতৃ-নির্ভরতা লইয়া প্রতিটি বাক্য ও কর্মে জগদম্মার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতেন, যিনি নিখিল আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহের সমষ্টি স্বরূপ, সকল ধর্মের সকল মতের ধর্মপিপাসুর চিত্তে শান্তি প্রদান করিতেন, তাঁহার ইয়ত্তা অল্পবুদ্ধি মানব কেমন করিয়া করিবে!

এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-গর্বিত, সন্দিগ্ধ চিত্ত, আর্যধর্মভ্রষ্ট, ভোগৈক-মানস, মোহান্ধগণের পরিত্রাণের জন্য এক মহান্ আদর্শের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহারই পরিপূর্ণ প্রকাশ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব! তাই বিবেকানন্দ একদিন গৈরিক-উষ্ণীষ-মণ্ডিত শির ঊর্ধ্বে তুলিয়া সমগ্র জাতিকে মেঘমন্দ্রে শুনাইয়াছেন, “যদি তোমাদের চক্ষু থাকে, তবেই তোমরা উহা দেখিবে; যদি তোমাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তবেই তোমরা উহার সন্ধান পাইবে। অন্ধ—সে অতি অন্ধ, যে সময়ের চিহ্ন না দেখিতেছে, না বুঝিতেছে। দেখিতেছ না, দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার সুদূর গ্রাম-জাত এই সন্তান এক্ষণে সেই সকল দেশে সত্য সত্যই পূজিত হইতেছে, যাহারা বহু শতাব্দী ধরিয়া পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছে।”

১৮৮৫ সালের মধ্যভাগে ঠাকুরের গলরোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন। অবশেষে চিকিৎসার্থ ঠাকুর কলিকাতায় আনীত হইলেন। সহরে থাকা অসুবিধাজনক দেখিয়া, ভক্তগণ কলিকাতার উত্তরাংশে অবস্থিত কাশীপুরে একটি বাগান-বাটী ভাড়া লইয়া ঠাকুরকে তথায় লইয়া গেলেন। রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী, তারক, লাটু প্রভৃতি বালকভক্তগণ সেবায় রত হইলেন। বলরাম, রামচন্দ্র, গিরিশ, ঈশান প্রভৃতি গৃহী ভক্তবৃন্দ তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। সদাসর্বদা ঠাকুরের খোঁজ লওয়া এবং সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি করার জন্য নরেন্দ্রনাথ আগস্ট মাসেই শিক্ষকতাকার্য পরিত্যাগ করিলেন। ঠাকুর কাশীপুরের বাড়িতে থাকাকালীন তিনিও বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া তথায় আগমন করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বালক-ভক্তগণ প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়া একে একে কাশীপুরের

বাগানে আসিয়া গুরুসেবায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহারা কলেজ ছাড়িলে এমন কি, বাটীতে যে দুইবেলা আহার করিতে যাইতেন, তাহা পর্যন্ত বন্ধ করি দিলেন। অনেকের অভিভাবকগণ ইহাতে শঙ্কিত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগ গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। বালকগণকে অভয় দি নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিবার ভার লইলেন। তাঁহার মুখের সাম কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না, ফলে তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইতে পারিল ন

ঔষধ-পত্র, চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটী নাই, অথচ রোগ ক্রমে ক্রমে প্রবলাক ধারণ করিতে লাগিল। নিজ শক্তি শিষ্যগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া ঠাকু যে লীলা সাঙ্গ করিবার আয়োজন করিতেছেন, অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিলে তবুও আশা-মুগ্ধ-হৃদয়ে সমস্ত অমঙ্গল-চিন্তা সরাইয়া রাখিয়া ভক্তগণ প্রাণপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কি অপরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা ঠাকুরই জানেন। তি নরেন্দ্রের কোনপ্রকার সেবা গ্রহণ করিতেন না, করিতে পারিতেন না। প্রত্যক্ষভা গুরুসেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত নরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়াই কেবল পর্যবেক্ষ কার্যেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

কাশীপুরের বাগান-বাটী কেবল রোগীনিবাস ও শুশ্রূষাগার নহে, একাধা মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিল। ভক্তগণ সাধন-ভজন করিতেছেন; কখ বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রপাঠ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা চলিতেছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম-মদিরাপানে উন্মত্ত প্রেমিকপুরুষগণের জীবনের সর্বশ্রে আনন্দময় দিনগুলি এই পুণ্যতীর্থেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রীগুরু-প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে সাধনপথে দ্রু উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। সে প্রবল উৎসাহ, কঠোর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, পরিপূ বিশ্বাসের সহিত সত্যলাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা বর্ণনাতীত। কোন কো দিন তিনি রজনীযোগে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পঞ্চবটীমূলে ধ্যান করিতেন। নরে নাথের তীব্র অনুরাগ দর্শন করিয়া ঠাকুর আনন্দিত হইতেন; একদিন নরেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ্, সাধনকালে আমার অষ্টৈশ্বর্য লাভ হয়েছিল, তা' কো কাজে লাগেনি; তুই নে, কালে তোর অনেক কাজে লাগবে।”

নরেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, “মশায়, ওতে ভগবান্ লাভ কর্‌বার কোন সুবি হবে কি?”

ঠাকুর উত্তর করিলেন, “না, তা' হবে না বটে, কিন্তু ঐহিকের কোন বাস অপূর্ণ থাক্‌বে না।”

কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ত্যাগিশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, “তবে মশা ওতে আমার প্রয়োজন নেই।” বাস্তবিকই এই কালে নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকু পবিত্র সঙ্গে যেন স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া গিয়াছিলেন। দিবা-রাত্র কেবল ভগবৎসি সত্যলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা! তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত, পিঞ্জরাবদ্ধ সি যেন কারাগার ভাঙ্গিয়া বহির্গত হইবার অসীম আগ্রহে ছট্‌ফট্ করিতেছে।

ত্যাগে পবিত্র, চরিত্রে উন্নত, সঙ্কল্পে অটল, তরুণ যুবকগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ করিয়া কাশীপুরের বাগান-বাটীতে সুদুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেবা-উপলক্ষে গৃহ-পরিজন-ত্যাগী বালকগণ একত্র বসবাসের ফ এক অপরূপ আধ্যাত্মিক প্রেমসম্বন্ধে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইয়া পড়িলে এইখানেই ভাবী রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পত্তন হইল। এই সময় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁ কুমার শিষ্যদিগকে সন্ন্যাস দিবার সঙ্কল্প করিলেন। শুভদিনে শিষ্যগণকে স্বহ

গৈরিক দান করিয়া ঠাকুর নেতা নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সম্পূর্ণ নিরভিমান হইয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে রাজপথে ভিক্ষা করিতে পারিবে কি?" তাঁহারা শ্রীগুরুর আদেশে তৎক্ষণাৎ ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে আনয়ন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেদিন ঠাকুরের কি আনন্দ! উচ্চশিক্ষা ও আভিজাত্যের গৌরব-বুদ্ধি-বর্জিত বালসন্ন্যাসিগণের তীব্র বৈরাগ্যদর্শনে ঠাকুর আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর অতীতযুগের যুগপ্রবর্তক সন্ন্যাসীদের জীবন ও উপদেশ আলোচনাই নরেন্দ্রের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। ধ্যানাভ্যাসের ফলে একাগ্রমানস নরেন্দ্র যখন যে বিষয় আরম্ভ করিতেন, তাহা লইয়াই মাতিয়া উঠিতেন। ভগবান্ বুদ্ধদেবের অপূর্ব ত্যাগ, অলৌকিক সাধনা ও অসীম করুণা, নিশিদিন নরেন্দ্রের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। জন্ম, জরা, দুঃখ, ব্যাধির নির্মম পেষণে প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবকুলের কাতর হাহাকারে, করুণা-বিগলিত রাজপুত্রের বিশাল হৃদয়ের বেদনা বর্ণনা করিতে করিতে নরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিত। বুদ্ধদেবের ধ্যানে বিভোর নরেন্দ্রনাথ গোপনে দুইজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধগয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রজনীযোগে গাত্রোত্থান করিয়া নিঃশব্দে নরেন্দ্র, তারক (স্বামী শিবানন্দ) ও কালী (স্বামী অভেদানন্দ) গঙ্গা পার হইয়া বালী স্টেশনে আসিয়া ট্রেণে উঠিলেন।

১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাস, তরুণ সন্ন্যাসীরা গয়ায় পবিত্র ফল্গুনদীতে স্নান করিয়া ভক্তিভরে ৮ মাইল দূরবর্তী বোধিসত্ত্বের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে প্রভাতে নরেন্দ্রনাথকে না দেখিয়া ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন। চারিদিকে অনুসন্ধান করা হইল, নরেন্দ্রের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ঠাকুরের নিকট ভক্তবৃন্দ ঐ বিষয় নিবেদন করিতে তিনি মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না, সে ফিরে এলো বলে; তার কি এ জায়গা ছেড়ে থাক্‌বার জো আছে!"

বুদ্ধগয়ায় উপনীত হইয়া নরেন্দ্র বোধিসত্ত্বের মন্দির দর্শন করিলেন। এই সেই স্থান যেখানে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণক্লিষ্ট জীবগণের দুঃখ-নিবারণকল্পে সমাধিস্থ হইয়া বোধি লাভ করিয়াছিলেন! বোধিদ্রুমমূলে পবিত্র প্রস্তরাসনে নরেন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতাদ্বয় ধ্যানভঙ্গে চাহিয়া দেখেন, নরেন্দ্র পাষাণবৎ নিশ্চল, দেহ স্পন্দনহীন। বহুক্ষণ অতীত হইলে তিনি একবার অর্ধবাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; পরক্ষণেই আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে সত্যের বিমল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল; তিনি কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তাহা গুরুভ্রাতাদ্বয়ের নিকট প্রকাশ করিলেন না। ক্রমাগত তিন দিবস কঠোর তপস্যায় যাপন করিয়া তাঁহারা বুদ্ধগয়া হইতে কাশীপুরের বাগান-বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাদিগের প্রাণস্বরূপ নরেন্দ্রনাথকে পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন।

বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, যে অতৃপ্ত পিপাসায় কাতর হইয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছেন, সে পিপাসা একমাত্র ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত তৃপ্ত হইতে পারে না। নরেন্দ্র সংকল্প স্থির করিয়া লইলেন; কিন্তু অপরাপর ভক্তগণের ন্যায় বিশ্বাস-সহকারে শ্রীগুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেন না। তিনি চাহেন, সত্য উপলব্ধি করিতে। নরেন্দ্র তীব্র তপশ্চর্যায় রত হইলেন। সে প্রবল উৎসাহ, কঠোর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দৈহিক ভোগ-বিলাস বর্জন করিয়া অনন্যমানসে আত্মদর্শন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা বর্ণনাতীত!

পূর্বগ মহাপুরুষচরিতসমূহ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই তাঁহারা দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া মুক্তির নব নব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে কামকাঞ্চনের প্রবল আকর্ষণে অবিচলিত থাকিয়া স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিয়াছে তাঁহাদের জপ, তপ, সাধন, ভজন, যা'-কিছু সবই পরহিতায়, নিজের মুক্তি কি অপর কিছু কামনায় নহে। ঠাকুর নরেন্দ্রকে তাই বিভিন্ন প্রকার সাধনা আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্য দিয়া ধর্মজীবনের চরমাদর্শের অভিমুখী করিয়া দি লাগিলেন। ঠাকুরের নিজ জীবনের অনুভূত আধ্যাত্মিক সত্যগুলির সহিত প্রত্য ভাবে পরিচিত হইবার পূর্বে, নরেন্দ্র কিছুতেই ঐ সমস্তের প্রতি আস্থাবান্ নাই।

একদিন কাশীপুরের বাগান-বাটীতে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে নরেন্দ্র ধ্যানমগ্ন। এমন সময়ে তিনি অনুভব করিলেন যে, স্পর্শমাত্রে অপরের মনোরা আমূল পরিবর্তন আনিয়া ধর্মভাববিশেষ সঞ্চার করিবার শক্তি তাঁহাতে উদ্ভূ হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্পর্শ দ্বারা ঐরূপ করিতে তিনি বহুবার প্র করিয়াছেন। একি সেই শক্তি? বাল-সুলভ কৌতূহলবশতঃ অগ্রপশ্চাৎ না ভা তিনি পার্শ্বে ধ্যানমগ্ন জনৈক গুরুভাইয়ের উপর উহা পরীক্ষা করিতে গি তাঁহার ধর্মজীবনে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিলেন। দ্বৈতবাদী, সগুণ সা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ভক্ত মুহূর্ত মধ্যেই অদ্বৈতবাদী ও জ্ঞানযোগী হইলেন। ঠা ঐ বিষয় অবগত হইয়া নরেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "না জমতেই খরচ? ওর কি অনিষ্টটা কর্‌লি বল দিকি?" পরে ঐ শক্তি কিরূপে প্রয়োগ করিতে তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

সেদিন চলিয়া গিয়াছে। সেই দার্শনিক, তার্কিক, উদ্ধত নরেন্দ্রনাথ গুরুভক্ত সাধক। পাশ্চাত্যদর্শনের যুক্তিজাল, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব তাঁহার চি যে আবরণ দিয়াছিল, তাহা খসিয়া গিয়াছে। ঠাকুরের আদেশে এখন তাঁ পাঠ্যপুস্তক কেবল পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান নহে, তিনি গভীর শ্রদ্ধার স উপনিষদ্, সংহিতা, পঞ্চদশী, বিবেক-চূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতেছে স্বীয় সমস্ত বিদ্যার অভিমান হেয়জ্ঞান করিয়া পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সহিত ঠাকু অপূর্ব বাণীসমূহের মধ্য দিয়া অভিনব, শ্রেষ্ঠতর শিক্ষালাভ করিতেছেন। আ নিদ্রাদি জৈবিক-ধর্ম-বিবর্জিত নরেন্দ্রনাথের কঠোর তপস্যা উপস্থিত অ বালকভক্তমণ্ডলীর আদর্শস্বরূপ হইল। যাঁহাকে দেখিবার জন্য ঠাকুর উন্ম হইয়া উঠেন, যাঁহার কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তি নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মহারা হন, যাঁহার প্রশংসা করিতে গিয়া ভাষা খুঁ না পাইয়া ঠাকুর বলেন, "ও সাক্ষাৎ নারায়ণ—জীবোদ্ধারের জন্য দেহধারণ করেছে তাঁহাকেও যদি এত কঠোর সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যের আর ক কি! সাধনপথে বহুদূর-অগ্রসর নরেন্দ্রনাথ অবশেষে বুঝিতে পারিলেন, নির্বিক সমাধিলাভ ব্যতীত তাঁহার এ বিশ্বশোষী আধ্যাত্মিক পিপাসা পরিতৃপ্ত হই না; কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, পরিপূর্ণ উদ্যমের সহিত চে করিয়াও ঐ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারিলেন না।

নীরব গভীর রাত্রি। কাশীপুরের উদ্যান-বাটিকার দ্বিতলের কক্ষে ঠা রোগশয্যায় শায়িত। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ। কক্ষে অপর কেহ নাই। নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন, যে-কোন উপায়ে হউক নির্বিকল্প সমা লাভ করিবেন। চিরদিন পুরুষকারের উপাসক আজ কৃপাভিক্ষা করিতে আসিয়াছে ভয়ে, বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে তাঁহার বাক্যনিঃসরণ হইল না। অন্তর্যামী পুরুষ, শি

মনোভাব বুঝিলেন। কয় বৎসর পূর্বে যে নরেন্দ্রনাথ বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "যে বইএ মানুষকে ভগবান্ বলতে শিক্ষা দেয়, সে বই পড়বার কোন প্রয়োজন নেই। নিজেকে ভগবান্ বলার (সোঽহং) চেয়ে আর পাপ নেই।" আজ তিনিই বেদান্তোক্ত সর্বোচ্চ অনুভূতি লাভের জন্য লালায়িত! সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিনি গুরুর সহিত, নিজের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত কি বিরামহীন সংগ্রামই না করিয়াছেন!

ঠাকুর সস্নেহে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "নরেন, তুই কি চাস?" সুযোগ বুঝিয়া নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—"শুকদেবের মত সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিযোগে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকিতে চাই।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নেত্রপ্রান্তে ঈষৎ অধীরতা প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, "বার বার ঐ কথা বলিতে তোর লজ্জা করে না! কোথায় কালে বটগাছের মত বর্ধিত হ'য়ে শত শত লোককে শান্তিছায়া দিবি, তা' না, তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্; এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর!"

নরেন্দ্রের বিশাল নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল। তিনি অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, "নির্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে না; আর যদি তা' না হয়, তবে আমি ওসব কিছুই করতে পারবো না।"

"তুই কি ইচ্ছায় কর্‌বি, জগদম্বা তোর ঘাড় ধরে করিয়ে নেবেন! তুই না করিস্, তোর হাড় কর্‌বে।"

নরেন্দ্রের ব্যাকুল অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ঠাকুর অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা যা, নির্বিকল্প সমাধি হ'বে।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক জড়পুঞ্জ যেন মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল; দেশকাল নিমিত্তের পরপারে অবস্থিত নিজবোধস্বরূপ আত্মা স্বমহিমায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। এ যে কি অবস্থা, তাহা মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই, হইতে পারে না।

বহুক্ষণ পর তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব করিলেন, তাঁহার মন ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে কামনাশূন্য হইলেও একটা অলৌকিক শক্তি তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যজগতে নামাইয়া লইয়া আসিতেছে। অনুভব করিলেন, "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় কর্ম করিব, অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করিব"—এই মহতী কামনার সূত্র ধরিয়া তাঁহার মন নির্বিকল্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনুভব করিলেন, জগতের দুঃখ-দৈন্যপ্রপীড়িত মোহভ্রান্ত জীবকুলকে, স্বয়ং জ্ঞানামৃতে পরিতৃপ্ত হইয়া উক্ত অমৃত পান করাইবার জন্য ভারতের অতীত যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুলের ন্যায় তাঁহাকেও জলদমন্দ্রে ডাকিতে হইবে—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

* * *

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্,
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ;
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

আজ নরেন্দ্রের হৃদয়ের সমস্ত অশান্তি ও আকাঙ্ক্ষার অবসান হইয়াছে;

ব্রহ্মবিদের ন্যায় দিব্যজ্যোতিঃ-উদ্ভাসিত বদন লইয়া, আত্মকাম সন্ন্যাসী আসিয় শ্রীগুরু-চরণে প্রণত হইলেন। ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "এখনকার মত তবে চা দেওয়া রইল, চাবি আমার হাতে; কাজ শেষ হ'লে তবে খুলে দেওয়া হবে।"

সেদিন নরেন্দ্রগত-প্রাণ বালক-ভক্তগণের আনন্দ দেখে কে! অহর্নিশ ভজ গান চলিতে লাগিল। নরেন্দ্র ভাবোন্মত্ত হইয়া রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম ও চৈতন্যলী বিষয়ক সঙ্গীত গাহিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে পুলকবহুল উদ্দীপনা আনিয়া দি লাগিলেন। এদিকে ঠাকুর জগজ্জননীর নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলে "মা, ওর (নরেন্দ্রের) অদ্বৈত-অনুভূতি তোর মায়াশক্তি দিয়ে আবরণ ক'রে র মা, আমার ওকে দিয়ে যে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।"

যে সমস্ত ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ মানবজাতির কল্যাণ-কাম নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে মধ্যে কিছু না কিছু আমিত্বের অহঙ্কার ছিল। তাই ঠাকুর বলিতেন, "খাদ দিলে গড়ন হয় না।" অবশ্য এ "আমিত্ব" "কাঁচা আমি" নয়, এ "পাকা আমি আমি প্রভুর দাস, তাঁহার লীলার সহায়ক।

নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুর যে সকল রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলে তাহা আমরা ইতোপূর্বে স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। একদিন, নরেন্দ্র দেখাইয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই যে ছেলেটি দেখ্ছো, এ জন্ম থেকেই ব্রহ্মজ্ঞানী, এর মত ছেলেরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এ কখনও কামিনী-কাঞ্চনের মায়ায় বদ্ধ হয় না।" আবার কখনও বা "শুকদে কখনও বা "শঙ্কর," "নারায়ণ ঋষি" ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিতে ঠাকুরের এই আপাতবিরুদ্ধ উক্তিগুলি কি সাময়িক স্নেহের উচ্ছ্বাস! স্থূল দেখিতে গেলে তাহাই অনুমান হয় বটে এবং সাধারণ মানবের পক্ষে ঐগুলি সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াও বিচিত্র নহে। আজন্ম সত্যবাদী ঠাকুর, যি পরিহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই, যিনি জগন্মাতার পদতলে সর্ব উৎসর্গ করিতে গিয়া "এই নে মা তোর মিথ্যা"—পর্যন্ত বলিয়াই স্তব্ধ হইয়াছে "এই নে মা তোর সত্য" বলিতে পারেন নাই, তিনি কি ইতর সাধারণের ম স্নেহে মুগ্ধ হইয়া প্রিয়তম শিষ্যকে লোকচক্ষে বড় করিবার জন্য ঐ সব ক বলিয়াছেন? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? "অভিমানং সুরাপানং, গৌরবং ঘো রৌরবং, প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা"—ইহাই যে তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। এ সম্ব পূজনীয় শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামিজী একদা বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর ম ঋষির সমাধিতৃষ্ণা, শুকের মায়ারাহিত্য, শঙ্করের জ্ঞান ও নারদের ভক্তি এ মিলিত হইয়াছিল; তাই ঠাকুর তাঁহার বিভিন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া এক এক এক এক নামে অভিহিত করিতেন।" এই মীমাংসাই আমাদের সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূ ও সমীচীন মনে হয়।

১৮৮৬ সাল, জুলাই মাসের শেষ ভাগ। ঠাকুরের গলরোগ ক্রমশঃ ভী ভাব ধারণ করিল। মৃদুস্বরে ফিস্ ফিস্ করিয়া কোনমতে দুই চারিটি ক কহিতে পারেন মাত্র; আহার জল-বার্লি; তাহাও গিলিতে পারেন না। তথ মহাপুরুষের কৃপার অবধি নাই, সদাসর্বদা বালক-ভক্তগণকে উপদেশ দিতেছে কখনও বা নরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "নরেন, আমার এই সব ছেলেরা রই তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান্, শক্তিমান্, ওদের রক্ষা করিস্, সৎপথে চাল আমি শীগ্‌গীরই দেহত্যাগ করবো।"

আর একদিন রাত্রে নরেন্দ্রের দিকে সজল-নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "এ

আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকীর হলুম।" নরেন্দ্র বুঝিলেন, ঠাকুরের লীলাবসানকাল আসন্নপ্রায়; তিনি বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিরহে কেমন করিয়া জীবনধারণ করিবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন; ভাবাবেগ দমন করিতে অসমর্থ হইয়া নরেন্দ্রনাথ কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

অবশেষে সত্য সত্যই সে ভীষণ দিন উপস্থিত হইল। ১৫ই আগস্ট, রবিবার। মহাপুরুষের শয্যা ঘিরিয়া ভক্ত শিষ্যবৃন্দ শোকভারাক্রান্ত স্তম্ভিত-হৃদয়ে মহাসমাধির প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের ব্যথিত অন্তরে কি ভাবের প্রবাহ খেলিতেছিল তাঁহারাই জানেন।

নরেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিলেন, রামচন্দ্র, গিরিশ প্রমুখ ভক্তগণ যে ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে কথা কি সত্য! এই একটি সমস্যা এখনও তো অমীমাংসিত রহিয়াছে। এখন যদি ঠাকুর স্বয়ং এ সমস্যা ভঞ্জন করিয়া দেন, তবেই বিশ্বাস করিব, নচেৎ নহে। যে শক্তি যুগে যুগে ধর্ম-স্থাপনের জন্য করুণায় অবতীর্ণ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাঁহার সমষ্টিস্বরূপ? সত্যই কি শ্রীরামকৃষ্ণ যুগধর্মপ্রবর্তক অবতার-পুরুষ? অন্তর্যামী ভগবান্ চক্ষু মেলিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস হয় নাই? যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ—কিন্তু তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।"

সহসা যদি কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত তাহা হইলেও নরেন্দ্র বোধ হয় অতখানি চমকিয়া উঠিতেন না।

ক্রমে রজনী গভীর হইতে গভীরতর হইল। উপাধান আশ্রয়ে ঠাকুরের কৃশতনুখানি মৃদু কাঁপিতেছে, জীর্ণ-পঞ্জর-পিঞ্জর ছাড়িয়া মহান্ আত্মা মহাকাশে বিলীন হইবার জন্য যেন পাখা মেলিয়াছে। নাসাগ্র-নিবদ্ধ দৃষ্টি স্থির, বদন মৃদুহাস্যে অনুরঞ্জিত; এমন সময় তিনবার কালীনাম উচ্চারণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিযোগে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার সেই অন্তিম বাণী নরেন্দ্রের হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া রহিল। তাই আমরা অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকেও জলদনির্ঘোষে বলিতে শুনিয়াছি—

"প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তঃ যস্য প্রকরণে হরিহরব্রহ্মাদি-দেবৈর্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাম্,
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণ-পাত্রমিদং ভোঃ॥"

চতুর্থ অধ্যায়

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

(১৮৮৬—১৮৯২)

*   *   *

ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।
ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদ্রবমতঃ ক্বাপ্যাবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ॥

—বিবেকচূড়াম

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপ্রকট হইবার কয়েকদিন পরই কাশীপুরের বাগানবা ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু নরেন্দ্র দেখিলেন, বালসন্ন্যাসীরা যদি চারিদি বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই মহাপুরুষের আদর্শ প্রচারের প বিঘ্ন ঘটিবে। তাঁহারা শ্রীগুরুর নিকট প্রত্যেকে পৃথকভাবে যে সাধনা, যে আদ লাভ করিয়াছেন, তাহা কেন্দ্রসংহত করিতে হইবে। কতিপয় গৃহী ভক্ত নরেন্দ্রে এই মত সমর্থন করিলেন। এই সকল বৈরাগ্য-প্রবণ তরুণ-সন্ন্যাসী আশ্রয়হী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, ইহা তাঁহাদের মনঃপূত হইল না। গুরুগত উদারহৃদয় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বরাহনগরে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া দিলে ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েকদিন পরই, তাঁহার দেহাবশিষ্ট ভস্মাস্থিপূর্ণ তাম্রকল মস্তকে লইয়া, বালসন্ন্যাসিগণ শোকাশ্রু মোচন করিতে করিতে পুণ্যলীলার ব পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত কাশীপুরের বাগানবাটী ত্যাগ করিলেন।

ঠাকুরের সেবা উপলক্ষ করিয়া দীর্ঘকাল একত্র বাস, সাধন-ভজন ইত্যা দ্বারা পরস্পর যে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ছিন্ন হইবার নহে বিশেষ শ্রীগুরুর আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য নরেন্দ্র সঙ্ঘবন্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়ো বোধ করিয়া বালকগণকে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। কোন কে গৃহী ভক্ত, তাঁহাদিগকে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দি লাগিলেন। কয়েকজন বালক পরীক্ষা ইত্যাদির জন্য অভিভাবকগণের অনুরো পুনরায় বাটীতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। নরেন্দ্রনাথ তখনও সাংসারি বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কাজেই সর্বদা মঠে থাকি সুযোগ পাইতেন না। তাঁহাদের বাড়িখানি লইয়া যে মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছি তাহার জের তখনও শেষ হয় নাই; কাজেই নরেন্দ্রকে বাধ্য হইয়া বাটীতে থাকি হইত। নরেন্দ্রের অনুপস্থিতিকালে অভিভাবকগণ বালকগণকে তাঁহার দৃষ্টা দেখাইয়া সংসারে ফিরাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র নি সংসারের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, কাজেই ততটা জোরের সহিত প্রতিবাদ করি পারিলেন না।

ইতোমধ্যে এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল! মহাত্মা রামচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত প্রস্তাব করিলেন যে, "তোমরা সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, ক

কোথায় থাকিবে, তাহার স্থিরতা নাই। শ্রীগুরুর দেহাবশেষ আমাদিগকে প্রদান কর, আমরা উহা যথাস্থানে সমাহিত করিয়া তদুপরি মন্দির নির্মাণ করিব।” রামবাবু স্বীয় কাঁকুড়গাছি বাগানবাটীখানি শ্রীগুরুর চরণে উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীভক্তগণ কিছুতেই শ্রীগুরুর দেহাবশেষ গৃহী ভক্তগণের হস্তে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। ফলে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। শশী ও নিরঞ্জন উক্ত তাম্রাধারের রক্ষক ছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই উহা হস্তান্তর করিতে সম্মত হইলেন না। রামবাবুও উহা পাইবার জন্য সদলবলে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আসন্ন ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিয়া বুদ্ধিমান নরেন্দ্র, স্বীয় গুরুভ্রাতাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, “মহাপুরুষগণের দেহাবশেষ লইয়া শিষ্যগণের বিবাদ ধর্মজগতে বহুবার ঘটিয়াছে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদেরও সেই পন্থার অনুসরণ করা কর্তব্য নহে। আমরা সন্ন্যাসী, ঠাকুরের পবিত্রতম জীবন হইতে যে মহানাদর্শ পাইয়াছি, সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবন গঠন করাই আপাততঃ আমাদের প্রধান কর্তব্য এবং উহাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ দেহাবশেষ লইয়া কলহ করিয়াছেন, এরূপ একটা লজ্জাকর ব্যাপারের স্মৃতি ভবিষ্যৎবংশধরগণের জন্য রাখিয়া যাওয়া অতীব অসঙ্গত, অতএব উঁহাদের ইচ্ছামত কার্যই হউক। আমরা যদি তাঁহার আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিবে সমগ্র জগৎ আমাদের পদতলে আসিবে।”

শশী মহারাজ নরেন্দ্রের কথার প্রতিবাদ করিলেন না। দেহাবশিষ্ট ভস্মাস্থির কিয়দংশ রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগ তাম্রকলসীসহ প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে শুভদিন দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী সন্ন্যাসী ভক্তগণ একত্র মিলিত হইয়া কাঁকুড়গাছি “যোগোদ্যানে” পবিত্র তাম্রাধার সমাহিত করিলেন। গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইতেছিল, নরেন্দ্রনাথ তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিলেন।

একটি গুরুতর বিরোধ দূর করিয়া নরেন্দ্রনাথ কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ সাংসারিক অভাব-অভিযোগের জন্য বাধ্য হইয়া বাটীতে থাকিতেন বটে, কিন্তু রাত্রিতে, এমন কি, অধিকাংশ দিবসই বরাহনগর মঠে যাপন করিতে লাগিলেন। কলিকাতাতেও নরেন্দ্রনাথ কেবল সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন না; যে সমস্ত সন্ন্যাসী বালক, অভিভাবকগণের তাড়নায় বাড়িতে গিয়া আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত বাস করিতেছিলেন এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, অবসর পাইলেই তাঁহাদিগের সহিত তিনি দেখা করিতেন এবং সংসারের সহিত সমস্ত প্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার পরামর্শ দিতেন। নরেন্দ্রনাথের “দৌরাত্ম্যে” অভিভাবকগণ চিন্তিত ও অস্থির হইয়া উঠিলেন। ভয়প্রদর্শন, তাড়না ইত্যাদির দ্বারা তাঁহারা নরেন্দ্রনাথকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার উৎসাহে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যুবকগণ পুনরায় একে একে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। নরেন্দ্রও যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত সংসারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বাটীর অধিকার লইয়া তাঁহার জ্ঞাতিগণ যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; উক্ত মোকদ্দমার আপীলেও নরেন্দ্রনাথ জয়ী হইলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে সংসারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া তিনি স্থায়ীভাবে মঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সর্বোপরি সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রাণপণে তরুণ সন্ন্যাসি-বৃন্দকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন।

আহার নাই, নিদ্রা নাই, দৈহিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন দিব্যভাবে বিভোর কুমারসন্ন্যাসিগণ, শ্রীগুরুর পবিত্রচরিত্র ও উপদেশের আলোচনা, দর্শনশাস্ত্র, বেদান্ত, পুরাণ, ভাগবত পাঠ, ধ্যান, জপ, কঠোর তপস্যা ইত্যাদিতে রত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর অদর্শনে ব্যথিত ভক্তগণের একমাত্র আশা-ভরসাস্থল!

ধন্য গুরুভক্তির জীবন্ত আদর্শ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী)! যিনি কেবলমাত্র ঠাকুরের পূজা, আরতি এবং গুরুভ্রাতৃগণের সেবাকার্যেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত মঠের মাতা, পিতা, রক্ষক, ভৃত্য, পাচক সবই একাধারে শশী মহারাজ! কখনও ধর্মালোচনায় মগ্ন ভ্রাতৃগণকে ভয় দেখাইয়া আহার করিতে বাধ্য করিতেছেন, কাহাকেও বা জোর করিয়া স্নান করাইতেছেন, আবার ক্রমাগত রাত্রিজাগরণরত ধ্যানস্থ কোন সন্ন্যাসীকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিতেছেন। যদি তিনি ঐরূপভাবে প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য না রাখিতেন, তাহা হইলে যে সমস্ত মহাপুরুষের নিষ্কাম কর্ম, অক্লান্ত জনহিতৈষণা ও অপূর্ব ত্যাগশক্তিতে আজ জগৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেরই কঠোর তপস্যায় শরীরপাত হইয়া যাইত।

প্রমত্ত সিংহের ন্যায় অশান্ত নরেন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র অবসর নাই। ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি জলদমন্দ্রে গুরুভ্রাতাগণকে আহ্বান করিতেন, "হে অমৃতের পুত্রগণ! অমৃত পান করিবার জন্য জাগরিত হও—জাগরিত হও।" ধ্যান, জপাদি সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা সকলে 'দানাদের ঘরে' সমবেত হইতেন। নরেন্দ্রনাথ কোনদিন গীতা, কোনদিন টমাস্, এ, কেম্পিসের ঈশানুসরণ (The Imitation of Christ) পাঠ করিতেন। নরেন্দ্র যখন ভাবোন্মত্ত হইয়া গর্জন করিয়া উঠিতেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

তখন তরুণ সন্ন্যাসিগণের তপোমার্জিত চিত্তদর্পণে সুদূর অতীতের এক মহিমময় দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; তাঁহারা যেন মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেন, সাক্ষাৎ গীতামূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শান্তোজ্জ্বলনেত্রে, প্রশান্ত দৃঢ়তার সহিত কর্তব্য-বিমুখ মোহভ্রান্ত সব্যসাচীকে মেঘগম্ভীরস্বরে, স্বীয় কর্তব্য পথ বাছিয়া লইবার জন্য মৃদু ভর্ৎসনা করিতেছেন। তখন তাঁহাদের মুগ্ধমন বাহ্যজগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইত, কেবল একটা অগাধ বিশ্বাস, মধুর ভক্তির কোমল স্পর্শ তাঁহাদের উন্মুখ আগ্রহপূর্ণ হৃদয়গুলিকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিত।

কখনও বা নরেন্দ্রনাথ "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" মন্ত্রে গুরুভ্রাতাগণকে অনুপ্রাণিত করিয়া আদর্শ কর্মযোগীর মত বিশ্বমানবের কল্যাণযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানকল্পে প্রস্তুত হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন।

কখনও বা গীতা বন্ধ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিতেন, "কি হবে আর গীতা পাঠ করে! ঠাকুর বল্তেন, গীতা দশবার বল্লে যা' হয় তাই! গীতা, গীতা, গীতা—ত্যাগী, ত্যাগী, ত্যাগী। চাই ত্যাগ—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ! ত্যাগই গীতার আদর্শ!"

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রবিদ্, সন্দেহবাদী নরেন্দ্রনাথ ক্রমাগত ছয় বৎসরকাল শ্রীগুরুর সহিত তর্ক করিয়াছেন; আজ তাঁহার কি বিচিত্র পরিবর্তন! আজ তিনি সন্ন্যাসী! রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নেতা! শ্রীগুরুর পবিত্র জীবনের ভাস্বর দ্যুতিতে আজ সনাতন ধর্ম তাঁহার চক্ষে মহিমময়, উদার, সার্বভৌমিক! আজ তাঁহার নিকট বেদ অপৌরুষেয় আপ্তবাক্য, নিত্যবর্তমান সত্য! উপনিষদের কল্যাণপ্রদ সত্য-

সমূহের গূঢ়ার্থ, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আলোকে আজ তাঁহার নিকট সহজবোধ্য। উপনিষদ্ বা বেদান্ত বুঝিবার জন্য তিনি কোন বিশেষ ভাষ্যকারকে অনুসরণ করেন নাই, করিবার প্রয়োজনও হয় নাই। তিনি স্বাধীনভাবে শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্বামীজী উত্তরকালে বলিয়াছিলেন, "বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সাহচর্যের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, তেমনি অপরদিকে ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন; যিনি একদিকে যেমন পরম ভক্ত, অপরদিকে তেমনি পরমজ্ঞানী ছিলেন। ইঁহার শিক্ষাফলেই আমি উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্র কেবল অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টতররূপে বুঝিতে শিখিয়াছি।"

একদিন বেলুড়মঠে, প্রসঙ্গক্রমে এই কালের কথা বলিতে গিয়া পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আজ যে এই এত বড় মঠ দেখছো, কোথায় এর আরম্ভ! ঠাকুর যখন অপ্রকট হ'লেন, লাটু আর কয়টি ছেলে কোথায় দাঁড়ায় তার স্থান নেই, শেষে সুরেশ মিত্তির* বরাহনগরে একটি বাড়ি ঠিক করে দিলেন। নীচের একতলাটা অব্যবহার্য, উপরের তলায় তিনটে ঘর। ঠাকুরকে কোন-দিন বা দু'টো নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হ'ত। কি আর জুটবে? একবেলা ভাত কোনদিন জুটতো, কোনদিন জুটতো না। থালাবাসন তো কিছু নেই, বাড়ির সংলগ্ন বাগানে লাউগাছ, কলাগাছ ঢের ছিল। দুটো লাউপাতা কি একখানা কলাপাতা কাট্‌তে গেলে উড়েমালী যা' তা' গাল দিত। শেষে মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হ'ত। তেলাকুচোর পাতা সিদ্ধ আর ভাত, তা' আবার মানপাতায় ঢালা। কিছু খেলেই গলা কুট্‌কুট্‌ করতো। এত যে কষ্ট, ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ভক্তের সংখ্যা দু'টি একটি করে বাড়তে লাগলো। উৎসাহ কত? পূজা, ধ্যান, জপ সর্বক্ষণ চলছে। হয়তো কীর্তন লেগে গেল। ঘরের দোর বন্ধ করে ভিতরে জমাট কীর্তন। এমন জমে গেছে যে, বাইরে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা কীর্তন ছেড়ে দিয়েছি, বাইরে লোক তখনও দাঁড়িয়ে, চীৎকার করে বলছে, ছাড়বেন না, ছাড়বেন না, চমৎকার শুনছি, ছাড়বেন না।"

গুরুভাইদের উপদেশ দান, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির ভার শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রের স্কন্ধেই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারও বিরাম নাই, আলস্য নাই, নানাপ্রকারে বালকগণকে উৎসাহিত করিতেছেন। "জয় রামকৃষ্ণ! মানুষ গড়ে তোলাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হোক্! মনে রেখো, এই আমাদের একমাত্র সাধনা। বৃথা বিদ্যার গর্ব পরিত্যাগ কর। উৎকৃষ্টতম মতবাদ অথবা সূক্ষ্মযুক্তিসমন্বিত তর্কের আবশ্যক কি? ঈশ্বরানুভূতিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে এ আদর্শ দেখিয়ে গেছেন; আমরা তাঁর আদর্শজীবনই অনুকরণ করবো। একমাত্র ভগবল্লাভই আমাদের চরম লক্ষ্য।" নরেন্দ্র-গতপ্রাণ নবীন সন্ন্যাসিগণও তাঁহার প্রত্যেকটি বাক্য শ্রীগুরুর আদেশ-বাণীর মতই শ্রদ্ধাসহকারে পালন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র সন্ন্যাসিগণের দৈহিক অভাব পূরণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বিষয়কর্মে ব্যস্ত থাকায় তিনি স্বয়ং গিয়া মঠের অভাবাদি স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না। সন্ন্যাসিগণ তণ্ডুলাভাবে অনাহারী থাকিলেও সুরেনবাবুকে খবর দিতেন না। ভগবানের ইচ্ছায় যেদিন যাহা অযাচিতভাবে উপস্থিত হইত, তাহাই তৃপ্তির সহিত ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। কিয়দ্দিন পরে সুরেনবাবু

---

* বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেশ বলিয়া সম্বোধন করিতেন; সেহেতু তিনি রামকৃষ্ণ ভক্ত-সঙ্ঘে ঐ নামেই সুপরিচিত।

ঐ বিষয় জানিতে পারিয়া চিন্তিত হইলেন। অবশেষে গোপাল নামক জনৈক রামকৃষ্ণভক্তের মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়া সুরেনবাবু তাঁহাকে মঠে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার উপদেশক্রমে গোপাল যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংবাদ দিতেন। সুরেন সর্বদাই বলিতেন, "ইঁহাদের সর্ববিধ অভাব দূর করা আমার অবশ্যকর্তব্য কর্ম, কারণ ইঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান, আমার ভাই।" গুরুভ্রাতৃপ্রীতির কি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত!

মধ্যে মধ্যে গৃহী ভক্তবৃন্দ মঠে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ ও ধর্মালোচনা করিতেন। অনেক অপরিচিত ব্যক্তিও কৌতূহলবশে, কেহ বা তর্ক করিতে, কেহ বা পরীক্ষা করিতে বরাহনগর মঠে আগমন করিতেন। নরেন্দ্রের যুক্তিপূর্ণ উত্তরের সম্মুখে বড় কেহ দাঁড়াইতে পারিতেন না। সাধারণের অশিষ্ট সমালোচনায় উত্তেজিত না হইয়া নরেন্দ্রনাথ হাস্যসহকারে গুরুভ্রাতৃগণকে বলিতেন, "ওরে, ঠাকুর বল্‌তেন, লোক্ না পোক্। তার মানে কি জানিস্? কাম-কাঞ্চনের ক্রীতদাসেরা কি বল্‌ছে না বল্‌ছে, তাই শুনে সন্ন্যাসীদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়।"

এই সমস্ত বালসন্ন্যাসিগণের অভিভাবকগণ প্রায়ই তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য মঠে উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদিগকে বাধা দিবার জন্য নরেন্দ্রনাথকেই সম্মুখীন হইতে হইত। কেহ কেহ গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য তর্কজাল বিস্তার করিতেন। নরেন্দ্র দৃপ্তসিংহের মত গ্রীবা উন্নত করিয়া উত্তর দিতেন, "কি, যদি আমরা ঈশ্বর লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে কি ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া জীবনযাপন করিব? সন্ন্যাসের মহিমময় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইব? অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, ত্যাগের মহান্ আদর্শ আমরা প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিব। দেহপাত হইয়া যাউক, সর্বস্ব যাউক, উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না। আমরা রামকৃষ্ণতনয় নহি?"

১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস। ঠাকুরের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম ঘোষ) জননীর আহ্বানে সন্ন্যাসীরা তাঁহার পল্লীভবন আঁটপুরে (হুগলী) সমবেত হইয়াছেন। রাত্রিতে বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে বিরাট ধুনী জ্বালাইয়া নরেন্দ্র গুরুভাইদের সহিত ধ্যানে বসিয়াছেন। নিস্তব্ধ পল্লী—ঊর্ধ্বে নির্মল আকাশে গ্রহতারা ঝলমল করিতেছে। চারিদিকের গাঢ় অন্ধকারে ধুনীর অগ্নিশিখায় কেবল সন্ন্যাসীদের তপোনির্মল ঋজুদেহ, প্রশান্ত বদন, নির্মল ললাট উদ্ভাসিত। এমন সময় নরেন্দ্র চক্ষু মেলিয়া যীশুখৃষ্টের জীবন আলোচনা করিতে লাগিলেন। জন্ম হইতে মৃত্যু, সেই অপূর্ব আত্মদান ও পুনরুত্থানের কাহিনী জীবন্ত ভাষায় বর্ণনা করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উঠিল। যীশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ! যীশুর দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্য সাধু পল কি জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া নবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। উৎসাহে ও উন্মাদনায় অধীর হইয়া নরেন্দ্র তাঁহাদের জীবনের পথ যেন সেই আলোকে দেখিতে পাইলেন। তিনি এবং তাঁহার বাক্যে অনুপ্রাণিত গুরুভ্রাতাগণ যেন আরেক বার অনুভব করিলেন, যখন ভারতবর্ষের জনমণ্ডলী আদর্শকে বিভক্ত, খণ্ডিত ও আংশিকরূপে দর্শন করিয়া পরস্পরের সহিত বিবাদরত, যখন বৈষম্য ও ভেদের মধ্যে আমরা কোন সামঞ্জস্য খুঁজিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিতেছিলাম না, যখন নষ্টবুদ্ধি দ্বারা বিকৃত, ভ্রষ্টচরিত্রের দ্বারা কলঙ্কিত হইয়া সমস্ত উচ্চাদর্শ কর্মহীন তামসিক জড়ত্বের মধ্যে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইতেছিল সেই সংকটের দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করিয়া সমস্ত বিচিত্র ও বিশিষ্ট সাধনাগুলিকে এক সমন্বয়ের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান দিয়া আদর্শের পরিপূর্ণ রূপ স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিলেন; এই প্রাচীনা পৃথিবী

ধর্মের নামে, জাতির নামে, দেশপ্রেমের নামে নরশোণিতে রুধিরাক্ত হইয়া যাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেই বহুপ্রার্থিত, বহুঈপ্সিত মহাসমন্বয়ের বার্তা প্রচার করিব আমরা, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকাবাহী সর্বত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী! মানব-কল্যাণব্রতে নিজেদের একান্তভাবে উৎসর্গ করিবার পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নিজেদের কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। প্রথমে যীশুখৃষ্টের প্রসঙ্গ এবং প্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের গভীর আত্মবিশ্বাসের কথা সেই রাত্রিতে যখন নরেন্দ্রাদি ভক্তমণ্ডলী আলোচনা করিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহারা জানিতেন না যে, উহা যীশুখৃষ্টের জন্মরাত্রি। পরে তাঁহারা উহা জানিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আঁটপুর হইতে সন্ন্যাসিগণ তারকেশ্বরে গিয়া শিব আরাধনান্তে বরাহনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুদিন বরাহনগর মঠে যাপন করিবার পর সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ে তীর্থ-ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল। দুই একজন বাধাপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্কায় নরেন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারেই মঠবাটী পরিত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। একদিন নরেন্দ্রনাথকে কোন বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল; তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুনিলেন যে, সাংসারিক অভিজ্ঞতাহীন বালক সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) গোপনে মঠবাটী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বালক না জানি কি বিপদে পড়িবে, এই আশঙ্কায় তিনি আকুল হইলেন এবং রাখালকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেন তুমি তাহাকে যাইতে দিলে? দেখ রাজা! আমি কি ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াছি। এক সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এখানে আর এক নূতন মায়ার সংসার পাতিয়াছি। এই ছেলেটির জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।" এমন সময় একজন তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন, সারদা যাইবার সময় উহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে; কে জানে কখন মনের গতি পরিবর্তন হইবে! আমি মাঝে মাঝে পিতামাতা, গৃহ, পরিজন বিষয়ক স্বপ্ন দেখি। আমি স্বপ্নে মূর্তিমতী মায়ার দ্বারা প্রলোভিত হইতেছি। আমি যথেষ্ট সহ্য করিয়াছি; এমন কি, প্রবল আকর্ষণে আমাকে দুইবার বাটীতে গিয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা করিতে হইয়াছিল। অতএব এখানে থাকা আর কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে; মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য দূরদেশে যাওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।"

পত্র পাঠ করিয়া স্বামিজীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। রাখাল বলিলেন, "এখন বুঝিতেছি, কেন সারদা মঠ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।" তিনি চিন্তিতভাবে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমিও উহা অনুভব করিতেছি।"

নরেন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবিলেন, এক্ষণে দেখিতেছি, সকলেই তীর্থভ্রমণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। ইহাতে এই মঠ ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে—যাউক। আমি কে যে, ইঁহাদিগকে আমার আদেশ অনুসারে চলিতে হইবে! না, এ মধুর মায়ার বন্ধন আমাকে ছিন্ন করিতে হইবে। সারদার পত্রখানি তাঁহাকে অতিমাত্রায় ভাবাইয়া তুলিল। সকলে একত্রে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে মায়ার বন্ধনে জড়াইয়া পড়িতেছেন, ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া তিনিও মঠবাটী পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবশেষে একদিন গুরুভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়া, শ্রীগুরুর মহতী ইচ্ছায় পরিচালিত নরেন্দ্রনাথ পরিব্রাজক বেশে মঠবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

এই স্থলে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। নরেন্দ্র ১৮৮৮'র প্রথম ভাগে তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা লইয়া বরাহনগর মঠ হইতে বহির্গত হন।

ইতোপূর্বে দুই বৎসর কাল তিনি আঁটপুর ব্যতীত কয়েকবার বৈদ্যনাথ ও শিমুলতলায় গিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-কাহিনীর অনেক কথাই জানিবার উপায় নাই। কেননা, তিনি কোন রোজ-নামচা লেখেন নাই। পরে তাঁহার প্রসঙ্গতঃ কোন মন্তব্য শুনিয়া অথবা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এমন ব্যক্তিদের বর্ণনা শুনিয়া যথাসম্ভব গুছাইয়া পরবর্তী বিবরণগুলি লিখিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভ্রমপ্রমাদ থাকা অনিবার্য। প্রত্যেক পরবর্তী সংস্করণে এই সকল ভ্রমসংশোধনের আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আর একটি কথা—অতঃপর আমরা আর নরেন্দ্রনাথ না বলিয়া আচার্যদেবকে স্বামিজী অথবা বিবেকানন্দ এই নামে উল্লেখ করিব।

সূর্য উদিত হইলে কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে, প্রভাত হইয়াছে। সূর্যরশ্মির ক্রমসঞ্চারণ কোন ঘোষণাকারীর অপেক্ষা রাখে না, তদ্রূপ স্বামিজীও যেখানে যাইতেন, তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণ দীর্ঘ তপোজ্জ্বল তনুখানি সকলেরই মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিত। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তিনি হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কাশীধামে উপনীত হইলেন।

কাশীধামে তিনি দ্বারকাদাসের আশ্রমে থাকিতেন। ভিক্ষান্নে উদর পূরণ, দেবস্থানসমূহ দর্শন, শাস্ত্রচর্চা, ধ্যান, জপ, সাধুসঙ্গ ইত্যাদি তাঁহার নিত্যকর্ম হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাকালে যখন তিনি ভাগীরথী-তীরে প্রস্তর-সোপানোপরি বসিয়া সায়ংকালীন উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতেন তখন অগণিত মন্দির হইতে সন্ধ্যারতির প্রাণমাতানো শঙ্খঘণ্টার মধুর নিনাদ উত্থিত হইয়া তাঁহাকে ভাবে বিভোর করিয়া তুলিত; সেই ভাগীরথী তীর, সেই দক্ষিণেশ্বর, সেই অদ্ভু প্রেমিক পুরুষ——একে একে তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত। সে আনন্দের মে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! আজ আর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের শিশু নরেন্দ্রনাথ নহে —আজ তিনি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ! ভবিষ্যৎ জগৎ নব-যুগাদ পাইবার আশায় তাঁহার প্রতীক্ষ করিতেছে—কি গুরুভার দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে ভাবুক ভক্তকবি বিবেকানন্দের হৃদয়দুর্গে অবরুদ্ধ ভুবন-পাবন যুগধর্ম, ঈশানে জটাজুট মধ্যস্থিত অলকানন্দার মতই নির্গমপথ না পাইয়া গভীর আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। বিচলিত হৃদয়ে বিবেকানন্দ এ কর্মভার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরুচরণে প্রার্থনা করিতেন।

একদিন জনৈক গুণমুগ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাকে পণ্ডিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। অদ্ভুত ধীশক্তিশালী তরুণ সন্ন্যাসীর সহিত ধর্ম, সমাজনীতি ও ভারতের উন্নতিবিষয়ক আলোচনা করিয়া ভূদেববাবু এতাদৃশ মুগ্ধ হন যে, উক্ত ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, “আমি আশ্চ হইতেছি যে এই তরুণ যুবক কি করিয়া এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিপু অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। ইনি ভবিষ্যতে একজন মহদ্ব্যক্তি হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।”

বারাণসীর বিখ্যাত সাধু শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের দ্বিতীয় বিগ্রহতুল্য শ্রীমৎ ত্রৈল স্বামীর দর্শনলাভ করিয়া স্বামিজী কৃতার্থ হইলেন। ইঁহার ত্যাগ ও তপস্যা বিষয় স্বামিজী বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহা দর্শনে ভক্তি-বিনম্রচিত্তে পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দজীর গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া স্বামিজী একদিন তাঁহা আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি তখন শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া উপবি ছিলেন; স্বামিজী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। বিবেকানন্দে

মনোহর অঙ্গকান্তি প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ক্রমে সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে স্বামিজীকে উপদেশ দিতে দিতে ভাস্করানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "কেহই সম্পূর্ণরূপে 'কামিনী-কাঞ্চন' ত্যাগ করিতে পারে না।" স্বামিজী বিনীতভাবে বলিলেন, "বলেন কি মহাশয়, এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কাম-কাঞ্চনের বন্ধন হইতে বিমুক্ত, কারণ উহাই সন্ন্যাসজীবনের প্রথম সাধনা এবং আমি অন্ততঃ এমন একজন ব্যক্তি দেখিয়াছি, যিনি কাম-কাঞ্চন-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিলেন। ভাস্করানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বালক মাত্র, এ বয়সে ওসব বুঝিতে পারিবে না।" ক্রমে স্বীয় গুরুর পবিত্রতম চরিত্র সমালোচিত হইতে দেখিয়া স্বামিজী নির্ভীক দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার তেজোগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ও স্বয়ং ভাস্করানন্দ বিস্মিত হইলেন। যাঁহার চরণতলে রাজা, মহারাজা, ধনী, পণ্ডিত, শত শত ব্যক্তি মস্তক অবনমিত করিয়া কৃতার্থ, যাঁহার অলৌকিক পাণ্ডিত্য অপ্রতিহত গৌরবে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিত, সেই ভাস্করানন্দের প্রতিপক্ষ হইয়া তর্কে অগ্রসর হওয়া কম সাহসের বিষয় নহে! উদারহৃদয় সন্ন্যাসী, স্বামিজীর বাক্যে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার সম্মুখেই স্বীয় শিষ্য ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইহার কণ্ঠে সরস্বতী আরূঢ় হইয়াছেন। ইহার হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়াছে।" গুরুনিন্দায় ব্যথিতহৃদয় বিবেকানন্দ সত্বর উক্তস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

কিয়দ্দিবস কাশীধামে বাস করিয়া স্বামিজী বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। বারাণসীধাম, হিন্দু-ভারতের হৃৎপিণ্ড! এখানে মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দুস্থানী বিভিন্ন আচার ও বিভিন্ন ভাষা সত্ত্বেও, একই ভাবের ভাবুক হইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে মিলিত হইয়াছে। স্বামিজী পরমার্থিকতাভ্রষ্ট বিচারহীন বাহ্য আচারপরায়ণ এই মানবসমষ্টির মধ্যেও ভারতবর্ষের যুগ যুগ সঞ্চিত ঐক্যের মহিমাকে উপলব্ধি করিলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, বরাহনগর মঠে ফিরিয়া তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে প্রচারকার্যের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষকে দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, এই লক্ষ কোটি নরনারীর জীবনযাত্রার কত বিভিন্ন স্তরে কি বেদনা, কি অভাব অহোরাত্র অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা লইয়া রোদন করিতেছে তাহার ভাষা বুঝিতে হইবে, ইহাদের কল্যাণব্রতের সাধনা শুধু স্বার্থত্যাগের কথা নহে, সর্বত্যাগের কথা। এমন কি স্বীয় মুক্তির কামনা পর্যন্ত বিস্মৃত হইতে হইবে। তেজস্বী বিবেকানন্দের প্রশস্ত হৃদয়ের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি পুনরায় তাঁহাকে আকর্ষণ করিল, তিনি মঠবাটী ত্যাগ করিয়া পুনরায় কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। কাশীধামে, অখণ্ডানন্দজী স্বামিজীকে প্রমদাদাস মিত্রের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। এই ভদ্রলোক সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য এবং বেদান্তদর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রথম পরিচয়েই স্বামিজী প্রমদাদাসের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে শাস্ত্রার্থ মীমাংসায় কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট পত্রযোগে উপদেশ প্রার্থনা করিতেন। কাশী হইতে তাঁহার তীর্থযাত্রা সুরু হইল। ১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে দণ্ডকমণ্ডলুহস্ত সন্ন্যাসী উত্তর ভারতের নানাস্থানের মধ্য দিয়া সরযূ নদীতীরে অযোধ্যায় উপনীত হইলেন।

অযোধ্যা—যাহার প্রতি ধূলিকণার সহিত সূর্যবংশীয় পরাক্রান্ত নরপালগণের গৌরবস্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকির কল্পনানন্দনের

পারিজাত-কুসুম, শ্রীরামচন্দ্র, আদর্শ রাজা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ পতি, আদর্শ ভ্রাতারূপে এই পুণ্যভূমিতেই পরিপূর্ণ মহিমায় প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তেজস্বী ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের পৌরোহিত্য, ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ প্রাপ্তি, ব্রহ্মজ্ঞানী মিথিলাধিপতি জনক, সুদূর অতীতের কীর্তিসমুজ্জ্বল সহস্র কাহিনী স্বামিজীর স্মৃতিপথে উদিত হইল। সীতারামের পুণ্য লীলাভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার বাল্যস্মৃতি উছলিয়া উঠিল। সেই রামায়ণপ্রীতি— সীতারামের মূর্তির সম্মুখে তন্ময়চিত্তে ধ্যান, বীরভক্ত হনুমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, একে একে তাঁহার মানসপটে উদিত হইয়া তাঁহাকে ভাবানন্দে বিভোর করিয় তুলিল। কিয়দ্দিবস অযোধ্যায় রামাইত সন্ন্যাসিগণের সহিত শ্রীশ্রীরামনাম কীর্তনে অতিবাহিত করিয়া স্বামিজী লক্ষ্ণৌ ও আগ্রার পথে শ্রীবৃন্দাবনধাম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

আগ্রায় ভুবনমোহিনী তাজমহল. এবং বিশাল মোগলদুর্গ দর্শন করিয় স্বামিজী আগ্রা হইতে মাত্র ৩০ মাইল দূরবর্তী বৃন্দবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন স্বামিজী বৃন্দাবনের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন এমন সময় দেখিলে পথের পার্শ্বে এক ব্যক্তি নিশ্চিন্তমনে তামাক সেবন করিতেছে। কৈশোর উত্তী না হইতেই তিনি ধূমপানে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন; পথশ্রমে ক্লান্ত স্বামিজী দু এক টান তামাক খাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া কলিকাটি চাহিলেন। লোকটি সন্ত্র সঙ্কুচিত হইয়া বলিল. 'মহারাজ. ম'য় ভাঙ্গী হ্যায়।' মেথর—আজন্মের সংস্কারব স্বামিজীর হস্ত অজ্ঞাতসারেই সরিয়া আসিল, তিনি পুনরায় পথ চলি লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল। তাইতো, আ না জাতিকুলমান বিসর্জন দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি; তবে মেথর শুনিয়া আম প্রসুপ্ত জাতি-অভিমান কেন জাগিল, কেন মেথরস্পৃষ্ট কলিকাটি গ্রহণ করি বিমুখ হইলাম! অভ্যাসগত সংস্কারের কি প্রভাব! স্বামিজী ফিরিলেন এ দ্রুতপদে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মধুর বচনে তাহার দ্বারা এক কলি তামাক সাজাইয়া আনন্দে ধূমপান করিলেন। এই ঘটনাটি তিনি জীবনে কখ বিস্মৃত হন নাই। পরবর্তীকালে স্বীয় শিষ্যদিগকে আত্মাভিমানহীন সর্বমান সমবুদ্ধি রক্ষা করার কঠিন আদর্শ কত সতর্ক হইয়া রক্ষা করিতে হয়, তা বুঝাইতে এই গল্পটি বলিতেন।

বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি লালাবাবুর কুঞ্জে অতিথি হইলেন। বৃন্দাবনে তাঁহা মন টিকিল না। ১২ই আগস্ট এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন, "সহরে মন কুণ্ঠি হইয়া আছে, শুনিয়াছি রাধাকুণ্ডাদি স্থান মনোরম।" সত্যই শ্রীবৃন্দাবন অপেক্ষ নন্দীগ্রাম, বর্ষণা, গোকুল, রাধাকুণ্ডাদি স্থান মনোরম। পল্লীবাসিরা সরল, উদার পল্লীশ্রী মনোরম। শ্যামল প্রান্তরে পরিপুষ্ট মসৃণদেহ ধেনুগণের নির্ভয় বিচর শ্রীকৃষ্ণলীলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাধাকুণ্ডে আসিয়া স্বামিজীর এক অপূ অভিজ্ঞতা হইল।

একদিন পরিধানের একমাত্র সম্বল কৌপীনখানি ধৌত করিয়া তীরপ্রা রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া স্বামিজী স্নান করিতে পবিত্রসলিলা রাধাকুণ্ডে অবত করিলেন। স্নানের পর স্বামিজী চাহিয়া দেখেন কৌপীনখানি নাই। বিস্মি স্বামিজী দেখিতে পাইলেন, এক বানর কৌপীনখানি লইয়া তীরস্থিত এক বৃ শাখায় বসিয়া আছে। সলিলমধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি উক্ত বানরকে অনেক অনু করিলেন, কিন্তু বানর মুখভঙ্গী করিয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিল মাত্র, কৌপী ফিরাইয়া দিল না। সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় তিনি কিরূপ পরিভ্রমণ করি

ভাবিয়া বালকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহা কি শ্রীশ্রীরাধারাণীর ইচ্ছা? তাঁহার ব্যথিতহৃদয়ে অভিমান জাগিয়া উঠিল; সলিল হইতে উত্থিত হইয়া স্বামিজী নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন; মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যতক্ষণ না পরিধেয় বস্ত্র পাইবেন, ততক্ষণ অরণ্যমধ্যে প্রায়োপবেশন করিয়া রহিবেন। এমন সময় তিনি দূর হইতে আহূত হইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখেন, একব্যক্তি দ্রুতপদে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আগমন করিতেছেন। স্বামিজী তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনে চলিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই তিনি ছুটিয়া আসিয়া স্বামিজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বিস্ময়ে চাহিয়া দেখেন, নবাগতের হস্তে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও একখানি নূতন গৈরিকবসন। তাঁহার অনুরোধে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বামিজী উক্ত উপহার দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিবামাত্র তিনি ঘন বনান্তরালে অদৃশ্য হইলেন। সম্ভবতঃ ঐ ব্যক্তি স্বামিজীর দুর্দশা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি রাধাকুণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অপহৃত কৌপীনখানি পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। এই ঘটনায় সমস্ত যুক্তি-বিচার ছাপাইয়া একটা দিব্য প্রেমানন্দে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল; তন্ময়চিত্তে তিনি রাধাকুণ্ড-তীরে কৃষ্ণগুণগানে রত হইলেন।

তখনও প্রভাত হয় নাই। পূর্বাকাশে ঊষার রক্তিমচ্ছটা ঈষৎ বিকশিত—দীর্ঘপথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর স্বামিজী পথিপার্শ্বে এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। হাতরাস রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত কার্যসমাপনান্তে বাসায় ফিরিতেছেন। এমন সময় স্বামিজীর প্রভাতারুণরাগরঞ্জিত শ্রীঅঙ্গের দিব্যকান্তিচ্ছটা নেত্রপথে পড়িবামাত্র তাঁহার মুগ্ধদৃষ্টি অজ্ঞাতসারে নিষ্পলক হইল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পদধূলি গ্রহণান্তর শরৎচন্দ্র বিনয়-নম্রবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত দেখিতেছি। দয়া করিয়া আমার গৃহে চলুন, সেইখানেই বিশ্রাম করিবেন।" মৃদুহাস্যে করুণা-স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া স্বামিজী ভূম্যাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং নীরবে শরৎচন্দ্রের পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।

শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ বলেন যে, ভাগ্যবান সাধকের দীক্ষার কাল সমুপস্থিত হইলে তাঁহাকে আর গুরু অন্বেষণে বহির্গত হইতে হয় না; গুরুই শিষ্যকে কৃতার্থ করিবার জন্য তৎসকাশে উপস্থিত হন। আধ্যাত্মিক রাজ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্বামিজীর সর্বপ্রথম শিষ্য পুণ্যচরিত শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দের জীবনেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

প্রথম দর্শনেই শরৎচন্দ্র স্বামিজীর শ্রীপাদপদ্মে মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। স্বামিজী আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইলে তিনি দুই এক কথার পর বলিলেন, "বহুদিন হইতে আত্মজ্ঞান লাভের স্পৃহা বলবতী হইয়াছে; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজিয়া পাইতেছি না। যখন দয়া করিয়া আপনি দর্শন দিয়াছেন, তখন আমাকে কৃপা করিয়া আত্মজ্ঞান প্রদান করুন।"

স্বামিজী প্রত্যক্ষভাবে তাহার কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে একটি গান গাহিতে লাগিলেন। তাহার ভাবার্থ এই, "যদি তুমি আমার ভালবাসা লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার সুন্দর মুখখানিতে ছাই মাখিয়া আইস; পারিবে কি?"

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "স্বামিজী! আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য; যাহা আদেশ করিবেন, নির্বিচারে তাহাই পালন করিব।" তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে মুমুক্ষু যুবকের বৈরাগ্যোদ্দীপ্ত মুখখানির প্রতি চাহিলেন, কি বলিবেন

ভাবিয়া পাইলেন না।

একদিন স্বামিজীকে একান্তে গভীর চিন্তামগ্ন দেখিয়া শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাস করিলেন, “স্বামিজী! আপনাকে আজ বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?” দীর্ঘশ্বাস ত্যা করিয়া স্বামিজী উত্তর করলেন, “বৎস! মহৎ কার্য সম্পাদন করিবার ভার আমা স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে; কিন্তু আমি ক্ষুদ্রশক্তি, আমার দ্বারা উহা সম্ভব নহে ভাবিয়া হতাশ হইয়াছি। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন স্পষ্টতররূ বুঝিতেছি, সনাতন ধর্মের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করাই তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম হায়! ধর্মের কি শোচনীয় অধঃপতন! আর তাহার সঙ্গে অনশনক্লিষ্ট ভারতবাসী কি মর্মভেদী দুরবস্থা! ভারতকে পুনরায় ধর্মের বৈদ্যুতিক শক্তিতে সঞ্জীবি করিতে হইবে, তাহার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে; কিন্ উপায় কি, উপায় কি?”—বলিতে বলিতে তাঁহার জ্যোতির্ময় বিশাল নেত্রদ্ব ব্যথিত করুণায় সমধিক প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র গভীর শ্রদ্ধার সহি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, “আমি কি আপনার কোন কাজে লাগিতে পারি না?”

সন্ন্যাসী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “এই মহৎকা আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তুমি কি ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু সম্বল করিয়া প দাঁড়াইতে প্রস্তুত আছ? তুমি কি প্রকৃত ত্যাগীর জীবনের দুঃসহ কঠোরতা স করিতে পারিবে?”

দৃঢ়তার সহিত শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “অবশ্য আপনার কৃ হইলে আমি নিশ্চয়ই সহ্য করিতে পারিব।”

* * *

কিছুদিন গুপ্ত-পরিবারের মধ্যে যাপন করিয়া স্বামিজী হাতরাস ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। একদিন শরৎচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “ব সন্ন্যাসীর পক্ষে একস্থানে অধিক দিন থাকা অন্যায়, বিশেষ তোমাদের প্র আমি একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছি, অতএব আমার সত্বর এস্থান পরিত করাই শ্রেয়স্কর।”

স্বামিজীর পবিত্র সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় শরৎচন্দ্র শোক হৃদয়ে বলিলেন, “স্বামিজী! আমাকে আপনার শিষ্য করিয়া সঙ্গে লউ স্বামিজী উত্তর করিলেন, “তুমি কি মনে কর যে, আমার শিষ্য হইলেই তো আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত হইবে? কাহারও গুরু হইবার যোগ্যতা আমাতে আ কিনা সন্দেহ। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ম করিয়া যাও, তি কল্যাণ বিধান করিবেন। আমি আপাততঃ শ্রীশ্রীবদরী-কেদার দর্শনে যাত্রা ক সংকল্প করিয়াছি, তুমি দুঃখিত হইও না, প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দাও, অ পুনরায় হাতরাসে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিব।”

শরৎচন্দ্র স্তোকবাক্যে ভুলিবার পাত্র নহেন। তিনি উত্তর করিলেন, “আপ যাহাই কেন বলুন না, আপনি যেখানে যাইবেন, আমিও আপনার অনুগ করিব। আমাকে দীক্ষা প্রদান করিতেই হইবে।”

স্বামিজী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “সত্য সত্যই কি তুমি আ অনুগমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?” শরৎচন্দ্র সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলে স্বামিজী গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, “উত্তম; এই আমার ভিক্ষার ঝুলি ল তোমার স্টেশনের কুলিগণের কুটীর হইতে ভিক্ষা করিয়া আইস।”

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন চিত্তে ঝুলিটি স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষার্থে বহি হইলেন। ভিক্ষালব্ধ বস্তুসহ শরৎচন্দ্রকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া স্বামিজী আনন্দো

তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। অতঃপর শরৎচন্দ্র পিতা-মাতার সম্মতি গ্রহণপূর্বক স্বামিজীর সহিত হাতরাস পরিত্যাগ করিয়া হৃষীকেশে উপনীত হইলেন।

নবদীক্ষিত শিষ্য স্বামী সদানন্দ, গুরু-নির্দিষ্ট পন্থাবলম্বনে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইলেন; কিন্তু দৈহিক কঠোরতায় অনভ্যস্ত নবীন সন্ন্যাসী কিছুদিন পরেই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। স্বামিজী বাধ্য হইয়া শিষ্যসহ হাতরাসে ফিরিয়া আসিলেন। হাতরাসে আসিয়া স্বামিজীও পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় উৎসাহী যুবকবৃন্দ ও গুপ্ত-পরিবারের যত্ন ও চেষ্টায় স্বল্পকাল মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়া বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। সদানন্দজীও কিছুদিন পরেই অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া নবেম্বর মাসে মঠে আগমন করিলেন এবং অপরাপর সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক স্নেহে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে গৃহীত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ বহুদিন পর তাঁহাদের প্রিয়তম "নরেন্দ্র"কে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। স্বামিজী পুনরায় প্রবল উৎসাহের সহিত সন্ন্যাসিবৃন্দকে শিক্ষাদান ও আগতপ্রায় ভবিষ্যৎ কর্মের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন। যে অ-মানব প্রতিভা, অসীম অনুকম্পা ও উদার হৃদয় উত্তরকালে সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা-মুগ্ধ-বিস্মিত-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দ বহুপূর্বেই তাহা অনুভব করিয়াছিলেন।

একদিকে বেদান্তদর্শন, ধ্যান ধারণা যোগ সমাধি, ইহলোকবিমুখ সন্ন্যাসের আদর্শ, অন্যদিকে ভারতের বিশাল জনসমষ্টির দুর্গতি মোচনের সেবাব্রত; এই দুই আপাতঃ বিপরীত ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান যদি না করিতে পারিলাম, তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার কি অধিকার আমাদের আছে? সাধনভজন শাস্ত্রপাঠের মধ্যে এই প্রশ্ন স্বামিজী গুরু-ভ্রাতাদের সহিত আলোচনা করিতেন। বহু বিকৃতি, প্রাণহীন অনুষ্ঠান সত্ত্বেও ভারতে ধর্ম আছে; কিন্তু সামাজিক ও সাংসারিক দুর্গতিই ভারতবাসীর বর্তমান দুর্দশার কারণ।

বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পল্লীনগর পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া এবং তীর্থস্থানগুলিতে তিনি বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, ধর্মের প্রতি অনুরাগের অভাব নাই; কিন্তু সমাজ-জীবনে স্বাভাবিক গতিশীলতা নাই। ইহা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর সমস্যা নহে—ভারতের বিশাল জনসমষ্টির সমস্যা। পূর্বগামী সংস্কারকগণের মত তিনি জাতীয় সমস্যাকে, তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকে দেখিবার সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও জীবন বিশ্লেষণ করিয়া তিনি গুরুভ্রাতাদের বলিতেন, দোষ ধর্মের নহে, ধর্মের নামে ধর্ম-ব্যবসায়ী গুরু-পুরোহিত-পান্ডাদের সমাজের উপর আধিপত্যই সমাজ-জীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। বহু শতাব্দীর প্রথা-নিষেধের অন্ধ অনুবর্তনায়, সমাজের একদিকে বংশ ও রক্তের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান, অন্যদিকে হীনতাবোধ, বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বহুতর শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত কৃত্রিম জাতি-বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবাসীকে এক অখন্ড জাতিতে পরিণত করিতে হইলে আমাদিগকে ঐ সকল বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, ধর্মসাধনায় এবং সামাজিক সুখ-সুবিধালাভে সর্বমানবের সমান অধিকারবাদ প্রচার করিতে হইবে। এই ভাব লোকে সহজে গ্রহণ করিবে না। কাজ সহজ নহে, কিন্তু ঠাকুর এই কঠিন ব্রতেই আমাদের দীক্ষা দিয়াছেন।

এই সময়ে প্রায় একবৎসর কাল স্বামিজী বরাহনগর মঠ অথবা কলিকাতার বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে যাপন করেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি শাস্ত্রাধ্যয়নে যাপন করিতেন। স্বীয় সুপণ্ডিত গুরুভ্রাতাদের লইয়া বেদান্ত ও পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। কাশীর প্রমদাদাস বাবু এই দরিদ্র সন্ন্যাসী-দিগকে বেদান্ত ও অষ্টাধ্যায়ী দান করিয়াছিলেন, স্বামিজীর একখানি প কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার উল্লেখ আছে। ১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামিজী একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রাম এবং শ্রীশ্রীমার জন্মভূ জয়রামবাটীতে গিয়াছিলেন এবং পরে কিছুদিন শিমুলতলায় থাকিয়া জুলা মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই কালে আমরা দেখিতে পাই, স্বামিজ উৎসাহের সহিত উপনিষদ্ ও শাঙ্করভাষ্য অধ্যয়ন করিতেছেন এবং প্রত্যেক সমস্যা ও সংশয় ভঞ্জনের জন্য কাশীতে প্রমদাদাস বাবুর নিকট পত্র লিখিতেছেন এই সময়ে ৪ঠা জুলাই তারিখের একখানি পত্রে তাঁহার মানসিক অবস্থা বর্ণ করিয়া প্রমদাদাস বাবুকে লিখিতেছেন, "নানাপ্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধার জন্য যে সময়ে সময়ে ভুগিতে হয়, ইহা অতি যথার্থ এবং অনেক সময় দেখিয়াছি কিন্তু এবার অন্য প্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় না এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাস টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আম জীবনের গত ৬।৭ বৎসর ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্ন-বাধার সহিত সংগ্রামে পরি পূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।

"বিশেষ কলিকাতার নিকট থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আম মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফা আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট। ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছি কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ; এমন কি, কখনো কখ উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হই তাড়াইয়া দিয়াছিল—হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া যদিও সেই বাটীর অং পাইয়াছেন—কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মোকদ্দমার দস্তুর।

"কখন কখন কলিকাতার নিকট থাকিলে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগু প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়; সেই সম মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে; তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা ভয়ঙ্ক এবার তাহাদের মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া সম মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইতে পারি, আপনি সেই আশীর্বা করুন। আশীর্বাদ করুন, যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং স প্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া যায়।"

স্বামিজী ডিসেম্বর মাসের পূর্বে কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই কলিকাতা হইতে বৈদ্যনাথ গিয়া স্বামিজী কাশীদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ১৮৮৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর তিনি প্রয়াগ হইতে প্রমদাদাস বাবুকে লিখিতেছেন, "দুএকদিনের মধ্যে কাশী যাইতেছি বলি আপনাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডাইবে যোগানন্দজী নামক আমার একটি গুরুভ্রাতা চিত্রকূট ওঙ্কারনাথাদি দর্শন করি এস্থানে আসিয়া বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন সংবাদ পাই; তাহাতে তাঁহা সেবা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই। আমার গুরুভাই সম্প সুস্থ হইয়াছেন। * * আমার মন কিন্তু কাশী কাশী করিয়া অত্যন্ত ব্যা

হইয়াছে।" এখান হইতে স্বামিজী কাশী হইয়া ১৮৯০ সালের ২২শে জানুয়ারী গাজীপুরে উপস্থিত হইলেন। অভিপ্রায়—বিখ্যাত সাধু পওহারীবাবার দর্শন লাভ করিবেন। ২৪শে জানুয়ারী স্বামিজী লিখিতেছেন, "এস্থানে আমার বাল্য-সখা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে আছি, স্থানটি মনোরম। * * আমার বড় ইচ্ছা ছিল, পুনর্বার কাশী যাই। কিন্তু যে জন্য আসিয়াছি, অর্থাৎ বাবাজীকে দেখা, তাহা এখনো হয় নাই।" ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লিখিতেছেন, "বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ * * * বিচিত্র ব্যাপার এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না।"

পওহারীবাবা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় অবগত ছিলেন, স্বামিজীকে তাঁহারই শিষ্য জানিয়া আদর করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পরস্পর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহারা ধর্মরাজ্যের উচ্চতর অনুভূতি ও জটিল দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন, উহা এরূপ অবস্থায় উপনীত হইত যে, উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে কেহই উক্ত কথোপকথনের মর্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

স্বামিজীর গাজীপুরে আগমনের পর হইতেই প্রতি রবিবার গগনচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে একটি ক্ষুদ্র ধর্ম-সভা বসিত। স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের অধিকাংশই স্বামিজীর সঙ্গ-সুখ ও মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে তথায় একত্র হইতেন। স্বামিজী রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত গাহিতেন বলিয়া গাজীপুরের সকলেই তাঁহাকে 'বাবাজী' বলিয়া ডাকিতেন। একদিন এই সভায় সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামিজী বলিয়াছিলেন যে, সমাজের মস্তকে অগ্নিময় অভিশাপ বর্ষণ করিয়া এবং প্রত্যেক আচার-ব্যবহারের তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া কোনপ্রকার সংস্কার সম্ভব নহে। অসীম প্রেম ও অনন্ত ধৈর্যের সহিত শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ভিতরের দিক হইতে জাতিকে উন্নত করিতে হইবে। হিন্দুধর্মের মহান্ সার্বভৌমিক আদর্শসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-প্রচার করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম একটা ভ্রম-প্রমাদের সমষ্টি নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দৃষ্টি দিয়া বিচার না করিয়া, গভীর অধ্যবসায়ের সহিত সনাতন ধর্মের মহত্ত্ব অনুধাবন করিতে চেষ্টিত হইতে হইবে। এই সনাতন হিন্দু-জাতির উদ্দেশ্য কি এবং ইহার প্রকৃত জীবনীশক্তি কোথায়, তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমরা অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে অন্ধ হইয়া মনে মনে কল্পনা করি, ভারতবর্ষ তাহার জাতীয় জীবনাদর্শ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে, অথবা উহার এমন কোন সর্বজনীন আদর্শ নাই, যাহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একটা সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করা যায়। বর্তমান সমাজ-সংস্কারকগণের ইহাই প্রধান দৈন্য—আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসভ্যতার প্রকৃত রূপ দেখিবার মত দৃষ্টি তাঁহারা হারাইয়াছেন। যখন আমরা ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া বৈদেশিক-ভাববহুল সংস্কারের হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইব, তখনি আমাদের বর্তমান জাতীয়-সমস্যার সমাধান হইবে।

মহাতপস্বী ও জ্ঞানী পওহারীবাবার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে স্বামিজী মুগ্ধ হইলেন। ভাবিলেন, "ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক কৃপার অধিকারী হইয়াও

আজ পর্যন্ত শান্তি পাইলাম না কেন? হয়তো এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সাহায্যে আমি শান্তিলাভ করিতে পারিব।”

কে বলিবে, এই কালে প্রবলতম ব্যাকুলতায় তিনি শ্রীগুরুর আদেশবাণী বিস্মৃত হইয়াছিলেন কি না? অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “তোর নির্বিকল্প সমাধি চাবি দেওয়া রইল, কাজ শেষ হ'লে তবে পাবি।” ইহা কি তিনি ক্ষণিক দৌর্বল্যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন?

স্বামিজী শুনিয়াছিলেন, পওহারীবাবা যোগ-মার্গ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পওহারীবাবার সহিত আলাপ-পরিচয়ে তাঁহার হৃদয়ে যোগশিক্ষার বাসনা বলবতী হইল। তিনি বাবাজীকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে যোগশিক্ষা দিতে হইবে। আগ্রহাতিশয়ে পওহারীবাবাও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। স্বামিজী শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

গভীর নিশীথে স্বামিজী পওহারীবাবার গুহায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ‘শ্রীরামকৃষ্ণ না পওহারীবাবা?’ এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র তাঁহার হৃদয় দমিয়া গেল। বিহ্বল হৃদয়ে সংশয়-দ্বন্দ্বালোড়িত চিত্তে বিবেকানন্দ ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপা, গভীর ভালবাসা, সস্নেহ ব্যবহার, পর্যায়ক্রমে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহার ব্যথিতচিত্ত আত্মধিক্কারে ভরিয়া উঠিল! সহসা তাঁহার অন্ধকারময় কক্ষ দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বামিজী অশ্রু-সজল নেত্র তুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনের আদর্শ দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্ভুত দেব-মানব সম্মুখে দাঁড়াইয়া! তাঁহার উজ্জ্বল আয়তনেত্রদ্বয়ে স্নেহ-সকরুণ-ব্যথিত-ভর্ৎসনা, বিবেকানন্দের বাক্যস্ফূর্তি হইল না, প্রহরকাল প্রস্তরমূর্তির মত ভূমিতলে বসিয়া রহিলেন। প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত দর্শন তিনি মস্তিষ্কের দৌর্বল্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া আগামী রজনীতে পুনরায় পওহারীবাবার নিকট যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। সেদিনও সেই পূর্বদৃষ্ট জ্যোতির্ময় মূর্তি তেমনিভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া!! এইরূপে সপ্তবিংশতিদিবস অতিবাহিত হইলে পর, একদিন তিনি মর্মবেদনায় ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “না, আমি আর কাহারও নিকট গমন করিব না। হে রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্য, আমি তোমার ক্রীতদাস! আমার এ আত্মহারা দৌর্বল্যের অপরাধ ক্ষমা করো প্রভো!”

এতৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেই স্বামিজীর অব্যক্ত-বেদনা-ক্লিষ্ট-মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিত। বিশেষ কোন উত্তর করিতেন না, করিতে পারিতেন না। বহুদিন পরে রচিত “গাই গীত শুনাতে তোমায়” শীর্ষক কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত অংশে আমরা এই ঘটনার কিঞ্চিৎ আভাস পাই—

“কভু ছেলেখেলা করি তোমা সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা ’পরে যেতে চাই দূরে পলাইয়ে,
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে—নির্বাক আনন, ছলছল আঁখি
চাহ মম মুখপানে:
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি, কিন্তু ক্ষমাভিক্ষা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব—অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা?
প্রভু তুমি—প্রাণসখা তুমি মোর!
কভু দেখি, তুমি—আমি; আমি—তুমি!!”

কাশীধাম হইতে স্বামী [illegible] পীড়ার সংবাদ পাইয়া স্বামিজী

গাজীপুর পরিত্যাগ করিলেন। কাশীধামে উপস্থিত হইয়া অভেদানন্দজীর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে স্বামী প্রেমানন্দজীকে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া স্বামিজী বাবু প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের বাগানবাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহী ভক্ত বাবু বলরাম বসু মহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া স্বামিজী শোকে মুহ্যমান হইলেন। গুরু-ভ্রাতৃ-বিয়োগব্যথায় কাতর স্বামিজীকে বিলাপ করিতে দেখিয়া প্রমদাবাবু বলিলেন, "এ কী স্বামিজী! আপনি সন্ন্যাসী, আপনার শোকার্ত হওয়া শোভা পায় না।"

স্বামিজী গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "আপনি কি মনে করেন, সন্ন্যাসীর হৃদয় বলিয়া একটা জিনিসও থাকিতে নাই? প্রকৃত সন্ন্যাসী পরের জন্য সাধারণ অপেক্ষা অধিক অনুভব করেন। বিশেষ আমি মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহি। সর্বোপরি তিনি যে আমার গুরুভাই। আমরা যে একত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার বিয়োগে যে আমি কাতর হইব, ইহাতে আর বিচিত্র কি? প্রস্তরের ন্যায় অনুভূতিহীন সন্ন্যাস-জীবন আমার স্পৃহনীয় নয়!"

বলরামবাবুর মৃত্যুর পর শোকার্ত বসু-পরিবারকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এবং বরাহনগর মঠের সুব্যবস্থার জন্য স্বামিজী কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে ২৫শে মে মঠের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ঠাকুরের গৃহী শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের পরলোকগমনে মঠের ব্যয়-নির্বাহের জন্য স্বামিজী চিন্তিত হইলেন। দুইমাস কাল কলিকাতা ও বরাহনগরে অবস্থান করিয়া স্বামিজী মঠের খরচ চলিবার উপযোগী ব্যবস্থা করিলেন। আবার তাঁহার চিত্তে ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। একদিকে নবগঠিত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রতি তীব্র মমত্ববোধ, অন্যদিকে সত্যকাম সন্ন্যাসীর নিঃসঙ্গ সাধনার আবেগ, এই দুই বিরুদ্ধ ভাব-সংঘাতে বিচলিত বিবেকানন্দ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, সমস্ত বন্ধন, এমন কি, গুরুভাইদের স্বার্থলেশহীন প্রেমবন্ধন পর্যন্ত ছিন্ন করিতে হইবে। যে শক্তিবলে শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্ আদর্শ প্রচার করা যায়, সেই শক্তি অর্জন করিব অন্যথা সেই চেষ্টায় প্রাণ দিব, এই সঙ্কল্প তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল।

তখন রামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ঘুষুড়ী গ্রামে বাস করিতেছিলেন। স্বামিজী মঠ পরিত্যাগ করিয়া যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার আশীর্বাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় তথায় আগমন করিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পবিত্রচরণ-যুগল বন্দনা করিয়া তিনি গভীর শ্রদ্ধার সহিত বলিলেন, "মা! যে পর্যন্ত শ্রীগুরুর ঈপ্সিত কার্য সম্পন্ন করিতে না পারি, সে পর্যন্ত আর ফিরিয়া আসিব না; তুমি আশীর্বাদ কর, যাহাতে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।"

করুণাময়ী জননী বীরসন্তানের শিরে কল্যাণ-হস্ত রক্ষা করিয়া ঠাকুরের নাম গ্রহণপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন। সে পুণ্যস্পর্শে স্বামিজীর হৃদয় এক দিব্যভাবে পূর্ণ হইল। তাঁহার মনে হইল, তিনি এমন এক মহাশক্তিবলে বলীয়ান হইলেন, যাহা বাধা, বিপত্তি, সংশয়দ্বন্দ্বে তাঁহার হৃদয় অবিচলিত রাখিবে; এমন কি, মৃত্যুর বিভীষিকা পর্যন্ত তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না।

১৮৯০-এর জুলাই মাসে মঠবাটী পরিত্যাগ করিবার পর স্বামিজী প্রথম ভাগলপুরের উকীল মথুরানাথ সিংহ মহাশয়ের ভবনে কয়েকদিন যাপন করিলেন। সেখান হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দজীর সহিত দেওঘরে আসিলেন। এখানে স্বামিজী শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একদিন তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করেন। দেওঘর হইতে কাশীতে আসিয়া তিনি

প্রমদাদাস বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিমালয় তাঁহাকে তখন আকর্ষণ করিতেছে, অধিকদিন তিনি কাশীতে ছিলেন না। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি প্রমদাদাস বাবুকে বলিয়া গেলেন, "যখন আমি ফিরিয়া আসিব, তখন সমাজের উপর বোমার মত ফাটিয়া পড়িব এবং সমাজ আমার অনুবর্তী হইবে।" তার পর অযোধ্যা ও নৈনীতাল হইয়া তিনি বদরী, কেদারের পথে আলমোড়ায় উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী লালা বদরী সাহা সন্ন্যাসীদ্বয়ের বাসের জন্য একটি উদ্যান-বাটিকা ছাড়িয়া দিলেন। কয়েকদিন পর সংবাদ পাইয়া স্বামী সারদানন্দ ও কৃপানন্দজী আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। এইকালে বরাহনগর মঠের অধিকাংশ সন্ন্যাসীই তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ হৃষীকেশ, হরিদ্বার ইত্যাদি স্থানে কুটির নির্মাণ করিয়া অথবা গিরিগুহায় বাস করিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় রত হইয়াছিলেন।

হিমালয়ের বৈরাগ্যোদ্দীপক মনোহর গম্ভীর শ্রী স্বামিজীর সমাধিলিপ্সু মনকে অন্তর্মুখীন করিয়া তুলিল। তিনি প্রত্যহ রজনীযোগে গোপনে গিরিগুহায় ধ্যান করিতেন।

* * *

বিবেকানন্দের ধ্যান-স্তিমিত-লোচনে সত্যধর্ম মূর্তিমান হইয়া উঠিল। আগতপ্রায় নবযুগের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা বহন করিতে হইবে, ভবিষ্য ভারতের উদ্বোধনকল্পে সত্ত্ব-রজের মিলনবেদীর উপর সেবাধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ইহার পূর্বে নির্বিকল্প সমাধিলাভ হইবে না। এ দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি প্রবল সচেষ্ট যুদ্ধঘোষণা করিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে বিরক্তির সহিত গিরিগুহা ত্যাগ করিয়া আলমোড়ায় ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বল্পকাল পরেই গুরুভ্রাতৃগণসহ উত্তর-খণ্ড পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

এই সময় স্বামী তুরীয়ানন্দজী কর্ণপ্রয়াগে, অলকানন্দাতীরে আশ্রম রচনা করিয়া তপস্যায় রত ছিলেন। স্বামিজী গুরুভ্রাতৃগণসহ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্ট হইলেন। তথা হইতে বদরীনারায়ণ অভিমুখে প্রস্থান করিবেন এমন সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজী পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ দেরাদুনে ফিরিয়া আসিলেন। অখণ্ডানন্দজী সুস্থ হইলে স্বামিজী গুরুভ্রাতৃগণসহ হৃষীকেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বেদান্তাদি শাস্ত্র চর্চা, ধ্যান, জপ ইত্যাদিতে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। হৃষীকেশ স্বামিজীর অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ বোধ হইত। এই সময়ের আনন্দময় দিনগুলির স্মৃতি তিনি শেষ দিবস পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার 'পরিব্রাজক' নামক পুস্তকে মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিয়াও গিয়াছেন :—

"হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশহাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোণা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদ হিম-শীতল 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারী', আর সেই অদ্ভুত 'হর্ হর্ হর্' তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সাম্‌নে গিরি-নির্ঝরের 'হর্ হর্' প্রতিধ্বনি। সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ! সে গঙ্গাজলপ্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ!!*** গেলবারে আমি একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান কর্‌তাম। পান কল্লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জন-

স্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদ-সঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বীসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, সে অমরাবতীসম প্যারিস, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত; আর শুনতাম—সেই 'হর্ হর্', দেখতাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে মস্তিষ্কে শিরায় শিরায় সঞ্চার কর্‌ছেন, আর গর্জে গর্জে ডাক্‌ছেন—'হর্ হর্, হর্'!!"

স্বামিজীর দীর্ঘপথভ্রমণ-শ্রান্ত দেহ উগ্র তপস্যার ভার সহ্য করিতে পারিল না। প্রবল জ্বর ও ডিপথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন নাড়ীর গতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঘর্ম আরম্ভ হইল; তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ অন্তিম সময় নিকটবর্তী ভাবিয়া শোকে ও উদ্বেগে অধীর হইয়া উঠিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলে মিলিয়া কাতরভাবে ভগবচ্চরণে তাঁহার প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক অজ্ঞাতনামা অপরিচিত সন্ন্যাসী দৈবযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সকলকে ক্রন্দনপরায়ণ দেখিয়া কৌতূহলের সহিত কুটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। রোগীর অবস্থা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া সন্ন্যাসিগণকে অভয় দিয়া একটা ঔষধ খাওয়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, স্বামিজী কিয়ৎকাল পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন এবং কথা বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একজন সন্ন্যাসী তাঁহার মুখের নিকট কান লইয়া শুনিলেন, তিনি বলিতেছেন "ভাই তোমরা ভয় পাইও না, আমি মরিব না।" ক্রমে স্বামিজী সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "অজ্ঞানাবস্থায় আমি অনুভব করিলাম এখনও আমার বহু কর্ম অবশিষ্ট আছে, তাহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেহত্যাগ হইবে না।"

হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বামিজী হিমালয়ের চির-ঈপ্সিত লোভনীয় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া 'আর্যদের আদিবাস, সামনিনাদিত' পঞ্চনদে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং স্বামিজী মীরাটে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া একে একে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অখণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, কৃপানন্দ ও অদ্বৈতানন্দজী আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। শেঠজীর উদ্যানবাটিকা দ্বিতীয় বরাহনগর মঠ হইয়া উঠিল। কীর্তন, ধ্যান, জপ, বেদান্তচর্চা, শাস্ত্রালাপ, উপস্থিত জিজ্ঞাসুগণকে ধর্মোপদেশ দান অবিরাম চলিতে লাগিল। গুরুভ্রাতৃবৃন্দের স্নেহমোহে ভুলিয়া তিনি অযথা সময় নষ্ট করিতেছেন না তো? এইরূপ চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র স্বামিজী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি সত্বরই এস্থান পরিত্যাগ করিব এবং একাকী ভ্রমণ করাই আমার অভিপ্রায়; অতএব তোমরা কেহ আমার অনুসরণ করিও না।" স্বামী অখণ্ডানন্দজী স্বামিজীর সহচর হইবার আশায় বিনীতভাবে তাঁহার সম্মতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। স্বামিজী উত্তর দিলেন, "আমি লক্ষ্য করিতেছি, তোমাদের স্নেহবন্ধনও কর্ম করিবার পথে প্রবল অন্তরায়স্বরূপ। অতএব যাহাকে দেখিলে স্নেহমায়ার উদ্রেক হইবে, তাহাকে সঙ্গী করা কর্তব্য নহে। গুরুভ্রাতৃপ্রীতিও মায়া কিম্বা তদপেক্ষাও বেশী।" এইরূপে নানা প্রকারে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া স্বামিজী মীরাট পরিত্যাগ করিলেন।

এতদিন পরে শ্রীগুরুর ইঙ্গিত সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসী শিক্ষাদাতা আচার্যরূপে ভারতভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং ক্রমে পঞ্চনদ অতিক্রম করিয়া ‘সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত’ মিশ্রিত ‘প্রতাপের দেশ—পদ্মিনীর ভূমি’ বীরপ্রসবিনী রাজপুতনায় প্রবেশ করিলেন।

১৮৯১, ফেব্রুয়ারী মাস। স্বামিজী আলোয়ার স্টেশনে অবতরণ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার বাবু গুরুচরণ লস্কর মহাশয় এবং তাঁহার বন্ধুস্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের মৌলবীসাহেব আনন্দের সহিত স্বামিজীর থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। স্বামিজী বাজারের উপরে যে ক্ষুদ্র ঘরখানিতে থাকিতেন, প্রচুর লোকসমাগম নিবন্ধন তথায় স্থানাভাব ঘটিতে লাগিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়র পণ্ডিত শম্ভুনাথজী আগ্রহের সহিত তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসিলেন।

প্রত্যহ বেলা নয়টা হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত, হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রযুবকগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার উদার ধর্মমতসমূহ শ্রবণ করিতেন। দার্শনিক আলোচনা অথবা কোন কূটপ্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে স্বামিজী সহসা ভাবোন্মত্ত হইয়া জ্ঞানদাস, সুরদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভক্তকবিগণের রচিত সংগীত মধুর কণ্ঠে গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া তুলিতেন। ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামীর তীব্র সমালোচক স্বামিজীর যুক্তিপূর্ণ উত্তরগুলি শ্রবণে জিজ্ঞাসুমাত্রেই সন্তুষ্ট হইতেন। সাজাইয়া গুছাইয়া অথবা অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া বা লোকের মনরক্ষা করিয়া কথা বলিতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত স্বামিজী জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেন; তাঁহার মধ্যে পাণ্ডিত্য বা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত হইত না। এই প্রশ্নোত্তর-সভায় নানাপ্রকার আলোচনার মধ্যে একজন হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, “বাবাজী! আপনি গেরুয়া পরিধান করিয়াছেন কেন?”

“কারণ, গেরুয়া ভিক্ষুকের বসন।” স্বামিজী সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “যদি আমি সাধারণের মত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া ভ্রমণ করি, তাহা হইলে দরিদ্র ভিক্ষুকগণ আমাকে অর্থশালী মনে করিয়া ভিক্ষা চাহিবে। আমি নিজেই একজন ভিক্ষুক, বিশেষ আমার হাতে এক পয়সাও নাই। প্রার্থীকে নিরাশ করিতে আমি হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাই; কিন্তু আমার গৈরিকবসন দেখিয়া তাহারা তাহাদেরই মত একজন ভিক্ষুক মনে করিয়া আমার নিকট আর ভিক্ষা চাহিবে না।” স্বামিজীর এই উত্তরটির মধ্যে দরিদ্রের প্রতি কি গভীর সমবেদনার আকুল উচ্ছ্বাস লুক্কায়িত! কি সুন্দর, কি হৃদয়গ্রাহী!!

এই অদ্ভুত শক্তিশালী সন্ন্যাসীর বিষয় অবগত হইয়া, একদিন আলোয়ার রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর তাঁহাকে স্বালয়ে আহ্বান করিলেন। স্বামিজীর সহিত পরিচিত হইয়া দেওয়ান বাহাদুর অতীব আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বালয়ে রাখিয়া পরদিনই মহারাজ বাহাদুরের নিকট এক পত্র লিখিলেন, “এখানে একজন মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অদ্ভুত অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। মহারাজ বাহাদুর ইঁহার সহিত আলাপ করিলে সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।” মহারাজ মঙ্গলসিংহ তখন রাজধানী হইতে দুই মাইল দূরবর্তী এক প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে তৎপর দিবসই তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। দেওয়ান বাহাদুরের ভবনে স্বামিজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহারাজ স্বামিজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। দুই এক কথার পরই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামিজী

মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, আপনি একজন বিদ্বান ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। আপনি ইচ্ছা করিলেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন কেন?”

স্বামিজী বলিলেন, “মহারাজ! অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। আপনি রাজকার্য অবহেলা করিয়া কেন সাহেবদের সহিত মৃগয়া ইত্যাদি বৃথা আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করেন?”

রাজানুচরগণ স্পন্দিত-হৃদয়ে এই অসমসাহসিক সাধুর অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া মহারাজ উত্তর করিলেন, “হ্যাঁ, কিন্তু কেন করি, তাহা বলিতে পারি না। তবে উহা আমার ভাল লাগে, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।”

স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন, “ভাল লাগে বলিয়া আমিও ফকীরের বেশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াই।”

কিছুকাল বাক্যালাপের পরই মহারাজ বুঝিতে পারিলেন যে, এই কৃতবিদ্য সন্ন্যাসী কেবলমাত্র সুপণ্ডিত নহেন, নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। কৌতূহলবশেই হউক, আর প্রকৃত সত্য জানিবার আগ্রহেই হউক, মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, “দেখুন বাবাজী মহারাজ! মূর্তিপূজায় আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, ইহার জন্য আমার কি দুর্গতি হইবে?” মহারাজকে হাস্য করিতে দেখিয়া স্বামিজী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “মহারাজ কি আমার সহিত রহস্য করিতেছেন?”

মহারাজের মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর হইল, তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, “না—না স্বামিজী! প্রকৃতই আমি কাঠ, মাটি, পাথর বা ধাতুর মূর্তিগুলিকে সাধারণের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে পারি না; ইহার জন্য কি আমাকে পরকালে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে?”

—“নিজের বিশ্বাসানুযায়ী উপাসনা করিলে পরকালে শাস্তি পাইতে হইবে কেন? মূর্তিপূজায় আপনার বিশ্বাস নাই, মন্দ কি?” স্বামিজীর উত্তর শুনিয়া উপস্থিত অনেকেই বিস্ময়ের সহিত ভাবিতে লাগিলেন, যাঁহাকে তাঁহারা বহুবার শ্রীশ্রীবিহারিজীর মন্দিরে শ্রীমূর্তির সম্মুখে ভজন গাহিতে গাহিতে ভাবাবেশে অশ্রুবিগলিত নেত্রে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইতে দেখিয়াছেন, তিনি কেন মূর্তিপূজার সমর্থনকল্পে যুক্তিপ্রদর্শন করিলেন না? স্বভাবতঃই তাঁহাদের হৃদয় নানা সন্দেহে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সহসা কক্ষবিলম্বিত মহারাজের একখানি আলোক-চিত্রের উপর স্বামিজীর দৃষ্টি পতিত হইল। স্বামিজীর ইচ্ছাক্রমে চিত্রখানি আনীত হইলে, তিনি উহা হস্তে লইয়া দেওয়ান বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানি বোধ হয় মহারাজ বাহাদুরের প্রতিকৃতি?” দেওয়ান বাহাদুর সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলেন।

“উত্তম,”—স্বামিজী চিত্রখানি ভূমিতলে রাখিয়া দেওয়ান বাহাদুরকে বলিলেন, “আপনি ইহার উপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করুন।” কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেওয়ান বাহাদুর শঙ্কাবিমিশ্র-বিস্মিত-দৃষ্টিতে স্বামিজীর প্রতি চাহিলেন। উপস্থিত সকলেই স্বামিজীর অদ্ভুত কার্যের কারণ নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া রুদ্ধশ্বাসে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বামিজী উচ্চকণ্ঠে সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আপনাদের মধ্যে যে-কেহ ইহার উপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করুন। ইহা তো একখণ্ড কাগজ ব্যতীত আর কিছুই নহে? আপনারা অগ্রসর হইতেছেন না কেন?” সকলেই একবার স্বামিজীর একবার মহারাজের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। দেওয়ান বাহাদুর অবশেষে বলিয়া উঠিলেন, “আপনি বলেন কি

স্বামিজী! মহারাজের চিত্রের উপর আমরা কি থুৎকার প্রদান করিতে পারি?"

"মহারাজের চিত্র হউক, তাহাতে কি আসে যায়? ইহাতে তো আর মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত নাই, এ একটুকরা কাগজ মাত্র। ইহা মহারাজের মত নড়িতে চড়িতে অথবা কথা বলিতে পারে না; তথাপি আপনারা অসম্মত হইতেছেন কেন?" স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা থুৎকার প্রদান করিতে পারিবেন না, তাহা জানি, কারণ আপনারা মনে করিতেছেন ইহার উপর নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলে মহারাজের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা হইবে। কেমন ঠিক কি না?" সমবেত জনসঙ্ঘ কুণ্ঠিত-আনন্দে নীরবদৃষ্টিভঙ্গীতে স্বামিজীর উক্তি সমর্থন করিলেন। তখন স্বামিজী মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন মহারাজ! একদিক দিয়া বিচার করিলে ইহা আপনি নহেন, অপর দিক দিয়া দেখিলে এই চিত্রের মধ্যেও আপনার অস্তিত্ব আছে, সেই কারণেই কেহ নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইলেন না; কারণ ইঁহারা আপনার অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত সেবক, মহারাজের অসম্মানজনক কোন কার্য করিতে ইঁহাদের পক্ষে সংকুচিত হওয়া স্বাভাবিক। ইঁহারা আপনাকে ও চিত্রখানিকে তুল্য সম্ভ্রমদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। সেইরূপ প্রস্তর বা ধাতুর প্রতিমাগুলিও শ্রীভগবানের বিশেষ গুণবাচক মূর্তি। ঐগুলি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র ভক্তের মনে সেই ভগবানের কথাই উদয় হয়। ভক্ত মূর্তির ভিতর দিয়া ভগবানেরই উপাসনা করেন, ধাতু বা প্রস্তর পূজা করেন না। আমি বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কখনও কোন হিন্দুকে বলিতে শুনি নাই, 'হে ধাতু! হে প্রস্তর! আমি তোমাকে পূজা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।' মহারাজ! একই অনন্ত ভাবময় ভগবান—যিনি সর্বজনোপাস্য ও সচ্চিদানন্দরূপ—ভক্তগণ তাহাকেই স্ব স্ব ভাবানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন।" বলিতে বলিতে স্বামিজীর বদনমণ্ডল এক দিব্যবিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মহারাজ কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে চাহিয়া যুক্তকরে বলিলেন, "স্বামিজী! আপনার কৃপায় মূর্তিপূজা সম্বন্ধে এক অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। বাস্তবিকই আপনার দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে আমিও এ পর্যন্ত একজনও কাষ্ঠ বা প্রস্তরাদির উপাসক দেখি নাই। এতদিন আমি মূর্তিপূজার প্রকৃত রহস্য বুঝি নাই বা বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। অদ্য আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিলেন।" স্বামিজী বিদায় হইবেন এমন সময় মহারাজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্বক বলিলেন, "স্বামিজী! কৃপা করিয়া আমাকে আশীর্বাদ করুন।"

স্বামিজী স্নিগ্ধহাস্যে কল্যাণ বর্ষণ করিয়া বলিলেন, "একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও কৃপা করিবার অধিকার নাই। আপনি সরলভাবে তাঁহার চরণে শরণাগত হউন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে কৃপা করিবেন।"

স্বামিজী প্রস্থান করিলে মহারাজ বলিলেন, "দেওয়ানজী, আমি কখনও এরূপ একজন মহাপুরুষের দর্শনলাভ করি নাই। ইঁহাকে আরও কিছুদিন আপনার আলয়ে রাখিতে চেষ্টা করুন।" দেওয়ানজী বলিলেন, "এই অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা সন্ন্যাসী কোনপ্রকার অনুরোধ শুনিবেন কি না সন্দেহ, তবে চেষ্টার ত্রুটি করিব না।"

দেওয়ান বাহাদুরের আগ্রহাতিশয্যে তিনি তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু কথা রহিল, সর্বদা সকল অবস্থার নির্বিচারে সকলেই তাঁহার সহিত প্রয়োজন হইলে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। বলা বাহুল্য, দেওয়ানজী আনন্দের সহিত স্বামিজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

আলোয়ারবাসী কয়েকজন বিশ্বাসী ও পবিত্রহৃদয় যুবক ইতোপূর্বেই স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর উপদেশে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের সহিত মহানন্দে যাপন করিয়া স্বামিজী সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। গুরুগতপ্রাণ শিষ্যবৃন্দ নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন; অগত্যা তাঁহাদিগের সহিত স্বামিজী আলোয়ার হইতে আঠার মাইল দূরবর্তী পাণ্ডুপোল গ্রামে উপস্থিত হইয়া হনুমানজীর মন্দিরে রাত্রিযাপন করিলেন। প্রভাতে শ্রীশ্রীমহাবীরজীর পূজা করিয়া শিষ্যবৃন্দকে আলোয়ারে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন; স্বয়ং একাকী যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে জয়পুরে উপনীত হইলেন।

এদিকে স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামিজীর বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি জয়পুরে উপনীত হইয়া শুনিলেন, রাজপ্রাসাদে একজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ সাধু বাস করিতেছেন, যিনি ইংরেজী ও সংস্কৃতে অনর্গল কথা বলিতে পারেন। স্বামিজী ব্যতীত আর কেহই নহেন, ইহা মনে মনে স্থিরনিশ্চয় করিয়া অখণ্ডানন্দজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দপ্রকাশ করা দূরে থাকুক বরং ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "তুমি আমার অনুসরণ করিয়া ভাল কর নাই, সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থান কর।" অখণ্ডানন্দজী দুঃখিতান্তঃকরণে জয়পুর পরিত্যাগ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, গুরুভ্রাতৃগণের প্রতি এরূপ নির্মম হওয়ার নিশ্চয়ই কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে।

জয়পুররাজের জনৈক সভাপণ্ডিত অসাধারণ ব্যাকরণবিদ্ ছিলেন। স্বামিজী তাঁহার নিকট পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিতজী বিবিধ প্রকারে বুঝাইয়া দিলেও ক্রমাগত তিন দিবস চেষ্টা করিয়াও স্বামিজী প্রথম সূত্রটির ভাষ্য আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। চতুর্থ দিবস পণ্ডিতজী বলিলেন, "স্বামিজী! আমার নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়া আপনার বিশেষ লাভ হইবে না, যেহেতু তিন দিবস ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও আপনাকে একটি সূত্র বুঝাইতে পারিলাম না।" স্বামিজী পণ্ডিতজীর বাক্যে লজ্জিত হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যে পর্যন্ত না সূত্রার্থ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইতেছি, ততক্ষণ আহার, পানীয় ইত্যাদি গ্রহণ করিব না।

একপ্রহর পরেই স্বামিজী পণ্ডিতজীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি স্বামিজীর মুখে উক্ত সূত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর অনন্যচিত্ত হইয়া স্বামিজী অধ্যয়নে রত হইলেন এবং দুই সপ্তাহ মধ্যেই অষ্টাধ্যায়ীর সমস্যাগুলির নিরসন করিয়া অধ্যাপক সমীপে বিদায়গ্রহণ করিলেন। কেহ যেন না মনে করেন, মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সমগ্র পাণিনি অধ্যয়ন শেষ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, বরাহনগর মঠে তিনি দুই বৎসরকাল পাণিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, জয়পুরে পণ্ডিতজীর নিকট কোন কোন অংশের ব্যাখ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন মাত্র। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া উত্তরকালে অনেকেই সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন করিতেন। তিনি উত্তর দিতেন, "যোগীর পক্ষে ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। আত্মার সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া এক বিষয়ে নিয়োগ করিলে ত্রিলোকে এমন কি রহস্য আছে যাহা অবগত না হওয়া যায়?"

জয়পুরের প্রধান সেনাপতি সরদার হরসিংহের সহিত স্বামিজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার আলয়ে স্বামিজী প্রায়ই ধর্মালোচনা করিতেন। কথিত

আছে, সরদার সাহেব মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। একদিন রাজপথে শ্রীকৃ বিগ্রহসহ শোভাযাত্রা চলিয়াছে, স্বামিজী সহসা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন "দেখুন, শ্রীভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ।" সরদারজীর ভাবান্তর হইল, অশ্রুসি নয়নে তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরি পাইয়া বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, "স্বামিজী, বহুবার তর্ক করিয়া যে বিষয় বুঝি পারি নাই, আজ আপনার কৃপায় সেই অপূর্ব দর্শন লাভ হইল।"

স্বামিজী পরিহাস-রসিক ছিলেন। অবিশ্বাসী অথচ তার্কিকদিগকে জব করিয়া তিনি সর্বদাই আমোদ পাইতেন। একদিন তিনি কতিপয় ব্যক্তির সহি ধর্মালোচনা করিতেছেন, এমন সময় জয়পুরের বিখ্যাত পণ্ডিত সূরজ নারায় সেখানে আসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "আমি একজন বেদান্তী আমি অবতার পুরুষদের বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করি না। পৌরাণি অবতারেও আমার বিশ্বাস নাই। আমরা সকলেই ব্রহ্ম। আমার সহিত একজ অবতারের পার্থক্য কি?" স্বামিজী উত্তর দিলেন, "আপনার কথাই সত্য। ত হিন্দুরা মৎস্য কচ্ছপ বরাহকেও অবতার বলে। তাহার মধ্যে আপনি কোন্‌টি?" সভায় হাসির রোল উঠিল, পণ্ডিতজী অপ্রস্তুত হইয়া নিরস্ত হইলেন।

জয়পুর হইতে বিদায় লইয়া স্বামিজী আজমীঢ়ে আসিলেন এবং মনোহ আবু পর্বতে এক গুহায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কোটা-দরবারের একজ মুসলমান উকীল স্বামিজীকে তদবস্থায় দেখিয়া স্বালয়ে লইয়া গেলেন। এ ধর্মপ্রাণ উদারহৃদয় মুসলমান ভদ্রলোক স্বামিজীর গুণাবলীর পরিচয় পাই কোটার প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাঁহা আলাপ করাইয়া দেন। একদিন মৌলবী সাহেবের আহ্বানে, খেতরির রা বাহাদুরের সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন লাল তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে কেবল মাত্র কৌপীন পরিহিত স্বামিজী তখন একখানি খাটিয়ায় শুইয়া মুদি নেত্রে বিশ্রাম করিতেছিলেন। মুন্সীজী মনে মনে ভাবিতেছেন, "অতি সাধার ভবঘুরে সাধু, ভেকধারী চোর জুয়াচোরও হইতে পারে।" এমন সময় স্বামি উঠিয়া বসিলেন। আলাপ আরম্ভ হইল। জগমোহন প্রশ্ন করিলেন, "স্বামিজী আপনি হিন্দু-সন্ন্যাসী হইয়া মুসলমানের বাড়িতে আছেন; আপনার খাদ্য পানী মাঝে মাঝে এই মুসলমান ভদ্রলোক ছুঁইয়া ফেলিতে পারেন।" স্বামিজী উত্ত দিলেন, "মহাশয়, আপনার একথা বলিবার অর্থ কি? আমি সন্ন্যাসী; আমি সমস্ত সামাজিক আচার নিয়মের উর্ধ্বে। আমি একজন মেথরের সহিত বসি আহার করিতে পারি। ইহা ঈশ্বরের নির্দেশ, অতএব আমি নির্ভয়। শাস্ত্রে আমার ভয় নাই কেননা শাস্ত্র ইহা সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার ভ আপনাদের মত সবজান্তা ইংরাজীনবিশদিগকে। আপনারা শাস্ত্র ও ভগবানের ধ ধারেন না। আমি সর্বভূতে ব্রহ্ম জ্ঞান করি। আমার নিকট আবার উচ্চনী স্পৃশ্যাস্পৃশ্য কি?" 'শিব শিব' উচ্চারণ করিয়া স্বামিজী তন্ময় হইলেন, তাঁহা বদনমণ্ডল স্বগীয় বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ আলাপের প জগমোহন মুগ্ধ হইলেন। রাজা বাহাদুর সেক্রেটারীর নিকট স্বামিজীর বক্তৃ শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শন কামনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

স্বামিজী মুন্সীজীর সহিত রাজভবনে আসিলেন। রাজা গভীর শ্রদ্ধার সহি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করাইলেন এবং স্বয়ং তাঁহার সম্মু দাঁড়াইয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "স্বামিজী! জীবনটা কি?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসিল, "একটা অন্তর্নিহিত শক্তি যেন ক্রমাগত স্ব স্বরূ

ব্যক্ত হইবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছে, আর বহিঃপ্রকৃতি তাহাকে দাবাইয়া রাখিতেছে; এই সংগ্রামের নামই জীবন।”

রাজা আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, স্বামিজীও তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। রাজা তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গভীর আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং কয়েকদিন পর তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন। ধর্মপ্রাণ রাজা অজিতসিংহ ও তাঁহার সেক্রেটারী মুন্সীজী স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গুরুভক্ত শিষ্যের ব্যাকুল আগ্রহ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্বামিজীকে কিছুদিন রাজপ্রাসাদে বাস করিতে হইল।

রাজার সভাপণ্ডিত নারায়ণ দাস তৎকালে সমগ্র রাজপুতানায় সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। স্বামিজী এই সুযোগে তাঁহার নিকট পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রতিভায় বিস্মিত হইয়া পণ্ডিতজী একদিন তাঁহাকে বলিলেন, “স্বামিজী! আমার যাহা শিখাইবার ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। এরূপ প্রতিভা মানবে সম্ভব, ইহা আপনাকে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।” স্বামিজী এই পণ্ডিতজীকে চিরদিন অধ্যাপকের মত শ্রদ্ধা করিতেন।

খেতরির রাজা অপুত্রক ছিলেন। একদিন গুরুসদনে স্বীয় দুঃখ নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, “যাহাতে আমার একটি পুত্রসন্তান হয়, আপনি দয়া করিয়া আমাকে সেই আশীর্বাদ করুন।” রাজার প্রার্থনা শুনিয়া স্বামিজী চিন্তিত হইলেন। অবশেষে কাতর আবেদন উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বলিলেন, “শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে।”

কিয়দ্দিবস পর স্বামিজী পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। রাজা বাহাদুর দুঃখিতান্তঃকরণে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

গুজরাটের মরুময় প্রদেশ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া ক্রমে আহ্মেদাবাদ, লিম্বডি, জুনাগড়, ভোজ, ভেরাওল, প্রভাস ও সোমনাথের বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া স্বামিজী পোরবন্দরে উপনীত হইলেন। লিম্বডির মহারাজ বাহাদুর ইতোমধ্যে স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন স্বামিজীকে পোরবন্দরের রাজপথে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া মহারাজা তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসিলেন।

পোরবন্দরের বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ মহোদয়ের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার পুনরায় পাঠস্পৃহা জাগিয়া উঠিল। সন্ন্যাসি-ছাত্রের সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতজীও তাঁহাকে মহাভাষ্য পড়াইতে লাগিলেন। পণ্ডিত নারায়ণ দাসের নিকট স্বামিজী উহার অধিকাংশই পাঠ করিয়াছিলেন; এক্ষণে অবশিষ্টভাগ শেষ করিয়া উৎসাহের সহিত বেদান্তের ব্যাসসূত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঘটনাক্রমে এই সময় গোবর্ধন মঠের জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য মহারাজ পোরবন্দরে আগমন করেন। তদুপলক্ষে তাঁহার সভাপতিত্বে লিম্বডি রাজভবনে স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর এক বিচারসভা আহূত হয়। পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ মহোদয় স্বামিজী সমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

স্বামিজীর প্রতিভার খ্যাতি ইতোপূর্বেই পণ্ডিতমণ্ডলী শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেজন্য অনেকেই তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। দুই একজন বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত অন্যান্য পণ্ডিতগণের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহা মহা পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে সহসা বাদে আহূত

হইয়া সম্ভ্রম-সঙ্কুচিত লজ্জায় স্বামিজীর বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল। অবশেষে স্বীয় অধ্যাপকের সম্মতি গ্রহণ করিয়া তিনি ধীরভাবে উত্থাপিত কূটপ্রশ্নগুলি একে একে মীমাংসা করিয়া দিতে লাগিলেন। স্বামিজীর বিনয়, পাণ্ডিত্য ও তেজস্বিতা প্রভৃতি সন্দর্শনে পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য মহারাজও তাঁহাকে সন্নিকটে আহবান করিয়া হর্ষোচ্ছ কণ্ঠে আশীর্বাদ এবং সস্নেহ ব্যবহারে আপ্যায়িত করিলেন।

স্বামিজীর অসাধারণ ধীশক্তি ও পবিত্র চরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া একদিন তাঁহার অধ্যাপক পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গজী বলিলেন, “স্বামিজী! এদেশে ধর্মপ্রচার করিয়া আপনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। আপনার উদারভাবসমূহ আমাদের দেশের লোক অনেকে বিলম্বে বুঝিবে। বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া আপনি পাশ্চাত্যদেশে গমন করুন। সেখানকার লোক মহত্ত্বের ও প্রতিভার সম্মান করিতে জানে। আপনি নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উপর সনাতন ধর্মের অপূর্ব জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করিয়া এক অভিনব যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেন।”

স্বামিজী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, “একদিন প্রভাসে সমুদ্র-তীরে দাঁড়াইয়া দূর দিক্‌চক্রবালে আলোকমণ্ডিতশীর্ষ তরঙ্গমালার নৃত্যভঙ্গী দেখিতেছিলাম; সহসা যেন মনে হইল এই বিক্ষোভিত সিন্ধু অতিক্রম করিয়া আমাকে কোন সুদূর দেশে যাইতে হইবে; কিন্তু তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে বুঝিতে পারি না।”

এই সময় ঘটনাচক্রে স্বামী ত্রিগুণাতীত হিঙ্গুলাজ তীর্থে যাইবার পথে তথায় উপনীত হন। লিম্বডি রাজপ্রাসাদে একজন মহাপণ্ডিত ‘পরমহংস’ অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া দর্শনার্থে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, পরমহংস আর কেহই নহেন, তাঁহাদের প্রিয়তম নেতা নরেন্দ্রনাথ। কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিলেন, “ভাই সারদা! ঠাকুর যেসব কথা বলিতেন, যাহা আমি চপলতাবশতঃ তখন হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, এক্ষণে সেগুলির সত্যতা ক্রমে ক্রমে অনুভব করিতেছি। আমার মনে হয়, আমার ভিতর যে শক্তি আছে, তাহা দ্বারা জগৎ ওলট-পালট করিয়া দিতে পারি।” স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রস্থান করিলে পাছে অন্যান্য গুরুভাইগণ তাঁহার সংবাদ জানিয়া বিরক্ত করেন, এই আশঙ্কায় স্বামিজী পোরবন্দর পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকা, মাণ্ডবী, পালিটানা ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করিয়া বরোদায় আসিয়া বরোদারাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর মণিভাই-এর অতিথি হইলেন। এখানে তিনি তিন সপ্তাহ ছিলেন এবং মাঝে মাঝে দুই-এক দিনের জন্য মধ্যভারতের কয়েকটি স্থান দর্শন করেন। এইকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনসমষ্টির পরিচয় লাভের জন্য তাঁহার আগ্রহ যেন শতগুণ বর্ধিত হইয়াছিল। গুজরাট, কাথিয়াবাড় এবং বোম্বাই অঞ্চলের বহু ছোট বড় দেশীয় নৃপতি ও শাসকমণ্ডলীর সহিতও তিনি ইচ্ছা করিয়া পরিচিত হন। জনসাধারণের দারিদ্র্য, দুঃখ ও অজ্ঞতার প্রতিকারকল্পে ধনী রাজা মহারাজারা অগ্রসর হইলে কার্য অধিকতর সহজ হইবে তৎকালে এই ধারণা তাঁহার ছিল। বরোদা হইতে খাণ্ডোয়া হইয়া একজন বাঙালী ভদ্রলোকের পরিচয়পত্রসহ তিনি বোম্বাইয়ের ব্যারিষ্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসের অতিথি হন। এই সময় বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা কলিকাতার একখানি ইংরেজী খবরের কাগজে প্রকাশিত সহবাস-সম্মতির বয়স নির্ধারণ আইন সম্পর্কে বাদানুবাদের প্রতি স্বামিজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাঙ্গলার শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও যে নির্লজ্জভাবে এমন একটা আইনের প্রতিবাদ

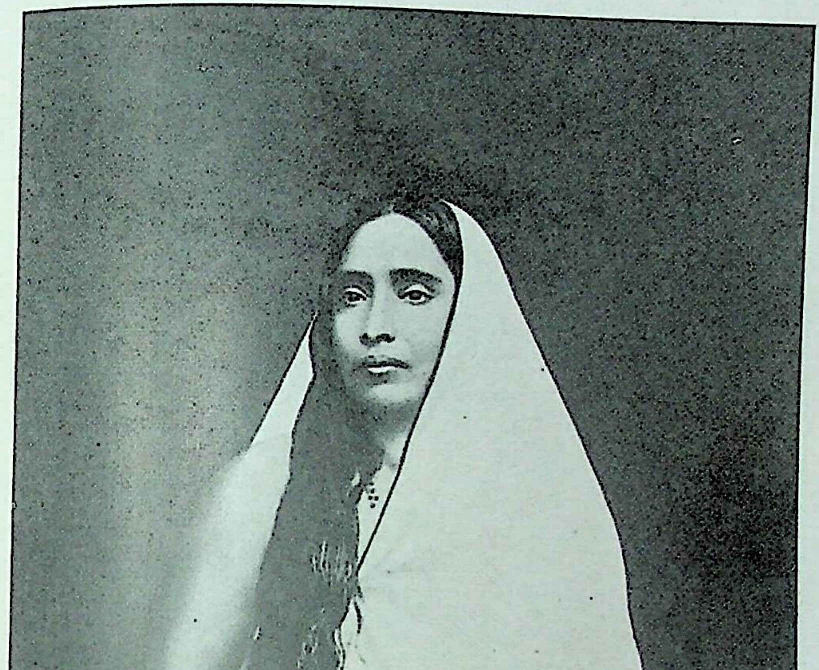

করিতে পারেন, ইহা দেখিয়া স্বামিজী মরমে মরিয়া গেলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বাল্যবিবাহের অসামঞ্জস্য ও কুফলের তীব্র সমালোচনা করিলেন। গৈরিকধারী একজন হিন্দু-সন্ন্যাসীর উদারভাব দর্শনে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত রাজনীতিক বিস্মিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

১৮৯২, সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে পুণাগামী ট্রেণের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে স্বামিজী বসিয়া আছেন, গাড়িতে আরও তিনজন মারাঠী যুবক যাত্রী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘোর তর্কযুদ্ধ চলিয়াছে। তর্কের বিষয় ছিল—সন্ন্যাস। দুইজন যুবক, রাণাডে ইত্যাদি সংস্কারকগণের প্রতিধ্বনি করিয়া সন্ন্যাসের অকর্মণ্যতা ও নানা দোষ প্রদর্শন করিতেছিলেন, অপর একজন তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া ভারতের সুপ্রাচীন সন্ন্যাসের মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন। এই যুবকই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। পার্শ্বে উপবিষ্ট সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তর্করত যুবকগণের যুক্তি ও উক্তি মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলেন; অবশেষে লোকমান্য তিলকের পক্ষাবলম্বন করিয়া তিনিও তর্কযুদ্ধে যোগ দিলেন। এই 'ইংরেজী-জানা' সন্ন্যাসীর প্রখর প্রতিভায় যুবকগণ বিশেষভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। স্বামিজী ধীরভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, সন্ন্যাসীরাই ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করিয়া জাতীয় জীবনের উচ্চাদর্শ সমগ্র ভারতে এতাবৎকাল প্রচার করিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি এই সন্ন্যাসই জাতীয় জীবনের আদর্শকে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও এতকাল শিষ্য পরম্পরায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ভণ্ড স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে মাঝে মাঝে সন্ন্যাস লাঞ্ছিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের সমগ্র সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে ব্যক্তি-বিশেষের ভণ্ডামীর জন্য দায়ী করা অসঙ্গত। এই সুপণ্ডিত সন্ন্যাসীর বাক্‌বিভূতি ও গভীর পাণ্ডিত্য দর্শনে লোকমান্য তিলক মহারাজ মুগ্ধ হইলেন এবং পুণা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া স্বামিজীকে স্বালয়ে লইয়া গেলেন। স্বামিজীও তিলক মহারাজের প্রখর প্রতিভা ও বেদাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখিয়া সানন্দে তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উভয়ে পরাধীন ভারতের সমস্যাগুলির আলোচনায় তৃপ্ত হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পুণায় তিলক-ভবনে যাপন করিয়া স্বামিজী মহাবালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একদিন লিম্বডির ঠাকুর সাহেব স্বীয় গুরুকে রাজপথে দীনবেশে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "এইরূপ অনর্থক ভ্রমণক্লেশ সহ্য করিতেছেন কেন? আর আপনাকে ছাড়িয়া দিব না। দয়া করিয়া আমার সঙ্গে চলুন, লিম্বডিতে আপনার স্থায়ীভাবে থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

স্বামিজী উত্তর করিলেন, "মহারাজ! একটা অদ্ভুত শক্তি আমাকে জোর করিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। ঠাকুর আমার স্কন্ধে এক মহান্ কার্যভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যে পর্যন্ত না উহা শেষ হইবে, ততদিন বিশ্রাম করিবার আশা বৃথা। যদি জীবনে কখনও বিশ্রাম করিবার অবসর পাই, তাহা হইলে আপনার সহিত আসিয়া বাস করিব।"

বিবেকানন্দ আবার পথে বাহির হইলেন। মারমাগোয়া হইয়া বেলগামে উপস্থিত হইয়া একজন মারাঠী ভদ্রলোকের অতিথি হইলেন। তাঁহার পুত্র অধ্যাপক জি. এম. ভাটে তাঁহাদের অভিনব অতিথি সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা দেখি যে, সরল, উদার, অকপট স্বামিজীর পাণ্ডিত্য, নিরভিমান বিনয় এবং তীব্র জাতীয়তাবোধে স্থানীয় শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

বেলগামের বন-বিভাগের কর্মচারী হরিপদ মিত্র মহাশয় বাঙ্গালী সন্ন্যা পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ধর্মানুরাগে মুগ্ধ হইয়া সস্ত্রীক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইখানে স্বামি আমেরিকায় গিয়া শিকাগো-ধর্মসভায় যোগদানের অভিপ্রায় হরিপদবাবুর নি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিপদবাবু যখন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাঁদা সং করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন স্বামিজী তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। কয়েক পর মিত্র-দম্পতির নিকট বিদায় লইয়া স্বামিজী বেলগাম হইতে বাঙ্গালো উপস্থিত হইলেন।

মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান আর. কে. শেষাদ্রি বাহাদুর স্বামিজীর স আলাপ করিয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে মহারাজা চামরাজে ওয়াডিয়ারের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। মহারাজা তরুণ সন্ন্যা অলৌকিক প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলেন। ব বাহুল্য, স্বামিজী শ্রদ্ধাস্পদ অতিথিরূপে রাজভবনে বাস করিতে লাগিলে মহীশূরাধিপ অত্যন্ত সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্বামিজী স সময় বালকের মত সরলভাবে মহারাজার কোন কার্যে ত্রুটি দেখিলে তাহ তীব্র সমালোচনা করিতেন; মহারাজা তাহাতে বড়ই আনন্দানুভব করিতে একদিন স্বামিজীর সস্নেহ ভর্ৎসনায় মহারাজা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করি কহিলেন, "স্বামিজী! আমি এত বড় একজন মহারাজা, আমাকে আপনার করা উচিত, খোসামোদ করা উচিত। ভবিষ্যতের জন্য আপনি সাবধান হই নতুবা আপনার জীবন সংকটাপন্ন হইতে পারে।"

স্বামিজী বালকোচিত সরলতার সহিত মহারাজার কথাগুলি বিশ্বাস ক গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "আপনার অসংগত কার্য ও উক্তি সমর্থন করি জন্য তো বহু পারিষদ আছেন। আমি সন্ন্যাসী—সত্যই আমার তপস্যা। স জড়দেহের অনিষ্টাশংকায় সত্যকে পরিত্যাগ করিব? আপনি হিন্দুরাজা হ একজন হিন্দুসন্ন্যাসীর নিকট কি এইরূপ হীনোচিত কার্য প্রত্যাশা করেন

এইরূপ নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্যই স্বামিজী মহীশূরাধিপের ক হইতে পারিয়াছিলেন। মহারাজা একদিকে যেমন তাঁহার সহিত পরিহাস রহস্যালাপ করিতেন, অপরদিকে তেমনি গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন; এমন একদিন মহারাজা স্বামিজীর পাদপূজা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কি স্বামিজী এমন প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, মহারাজাকে বাধ্য হ উক্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। এই পার্থিব যশ-সম্মান ও ঐশ্ব আকাঙ্ক্ষাহীন সন্ন্যাসী যে স্বীয় অমল চরিত্রের প্রভাবে রাজাধিরাজ হইতে মেথরের পর্যন্ত হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

একদিন দেওয়ানজীর সভাপতিত্বে রাজপ্রাসাদে এক দার্শনিক বিচার আহূত হয়। বাঙ্গালোর নগরের প্রায় সমস্ত পণ্ডিতবর্গ এই বিচারসভায় যো করেন। স্বামিজীও মহারাজার অনুরোধে সভায় যোগদান করিলেন। বেদা বিচার আরম্ভ হইল। পণ্ডিতবর্গ বেদান্তের বিভিন্ন প্রকার মতবাদ সম করিয়া বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বমত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় অপরের সম মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য তুমুল তর্কের ঝড় বহিল—বি বহুক্ষণেও তাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নিস্তব্ধ হই

অবশেষে দেওয়ানজীর অনুরোধে স্বামিজী দণ্ডায়মান হইয়া স পণ্ডিতমণ্ডলীকে শ্রদ্ধা সহকারে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় দ

মণ্ডিত মুখশ্রী ও বিদ্যুৎবর্ষী উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় অনতিবিলম্বেই বয়োবৃদ্ধ সুবিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। স্বামিজী স্বভাব-সুমধুর-কণ্ঠে সুললিত সংস্কৃতে, সর্বসংশয়চ্ছেদী বিভিন্ন প্রকার মতবাদগুলি যে পরস্পরবিরোধী নহে, পরন্তু একে অন্যের পরিপূরক, ইহা অপূর্ব যুক্তিবলে প্রমাণ করিয়া বুঝাইলেন। বেদান্তশাস্ত্র কতকগুলি দার্শনিক মতবাদের সমষ্টি নহে, উহা সাধক-জীবনের বিভিন্নাবস্থায় অনুভূত সত্যসমূহ। অতএব একটিকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে হইলে আপাতবিরুদ্ধ অপরটিকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। স্বামিজীর অভিনব বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী চমৎকৃত হইলেন এবং সমস্বরে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজা বলিলেন, “স্বামিজী! আপনার জন্য কিছু করিতে পারিলে বড়ই সন্তুষ্ট হইতাম; আপনি তো কিছুই গ্রহণ করিবেন না।”

স্বামিজী তাঁহার ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে দেশের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, “আমাদের বর্তমান প্রয়োজন পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সহায়ে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করা; কিন্তু ইউরোপীয়দিগের দ্বারে দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র ক্রন্দন ও ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। উহারা যেমন বর্তমান উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দিবে, বিনিময়ে আমাদেরও উহাদিগকে কিছু দিতে হইবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে দিবার মত এক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্যতীত আর কি আছে? সেইজন্য সময় সময় আমার ইচ্ছা হয় যে, বেদান্তের অত্যুদার ধর্ম প্রচার করিতে পাশ্চাত্যদেশে গমন করিব। যাহাতে এই আদান-প্রদান সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীরই স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় চেষ্টা করা কর্তব্য। আপনার ন্যায় মহাকুলপ্রসূত শক্তিশালী রাজন্যবর্গ চেষ্টা করিলে অল্পায়াসেই কার্য আরম্ভ হইতে পারে। আপনিই এই মহৎকার্যে অগ্রসর হউন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।”

মহারাজা অভিনিবেশ সহকারে স্বামিজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, স্বামিজী যদি পাশ্চাত্যদেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে গমন করেন, তাহা হইলে তিনি সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন; এমন কি, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কয়েক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। স্বামিজী প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, আমি এখনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। আমি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই পরিব্রাজব্রত উদ্‌যাপিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিব না—এমন কি, তাহার পর কি করিব, কোথায় যাইব, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।”

অবশেষে একদিন স্বামিজীকে বিদায় লইতে উদ্যত দেখিয়া মহারাজা তাঁহাকে বিবিধ বহুমূল্য দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন। স্বামিজী উহার মধ্য হইতে বহু অনুরোধে বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি ধাতবদ্রব্যের সংস্রবহীন ক্ষুদ্র চন্দনকাষ্ঠের হুঁকা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। দেওয়ানজী স্বামিজীর ক্ষুদ্র পুঁটলীর মধ্যে একতাড়া নোট গুঁজিয়া দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া স্বামিজী অগত্যা তাঁহার নিকট হইতে কোচিন পর্যন্ত একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে টিকিট লইলেন। দেওয়ানজী কোচিন রাজ্যের দেওয়ানজীর নিকট একখানি পরিচয়-পত্র দিয়া

বেলগামের বন-বিভাগের কর্মচারী হরিপদ মিত্র মহাশয় বাঙ্গালী সন্ন্যাসী পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া আসেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ধর্মানুরাগে মুগ্ধ হইয়া সস্ত্রীক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইখানে স্বামি আমেরিকায় গিয়া শিকাগো-ধর্মসভায় যোগদানের অভিপ্রায় হরিপদবাবুর নি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিপদবাবু যখন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাঁদা স করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন স্বামিজী তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। কয়েক পর মিত্র-দম্পতির নিকট বিদায় লইয়া স্বামিজী বেলগাম হইতে বাঙ্গালো উপস্থিত হইলেন।

মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান আর. কে. শেষাদ্রি বাহাদুর স্বামিজীর সহি আলাপ করিয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে মহারাজা চামরাজে ওয়াডিয়ারের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। মহারাজা তরুণ সন্ন্যাসী অলৌকিক প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলেন। ব বাহুল্য, স্বামিজী শ্রদ্ধাস্পদ অতিথিরূপে রাজভবনে বাস করিতে লাগিলে মহীশূরাধিপ অত্যন্ত সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্বামিজী স সময় বালকের মত সরলভাবে মহারাজার কোন কার্যে ত্রুটি দেখিলে তৎক্ষ তীব্র সমালোচনা করিতেন; মহারাজা তাহাতে বড়ই আনন্দানুভব করিতে একদিন স্বামিজীর সস্নেহ ভর্ৎসনায় মহারাজা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করি কহিলেন, "স্বামিজী! আমি এত বড় একজন মহারাজা, আমাকে আপনার ভ করা উচিত, খোসামোদ করা উচিত। ভবিষ্যতের জন্য আপনি সাবধান হইবে নতুবা আপনার জীবন সংকটাপন্ন হইতে পারে।"

স্বামিজী বালকোচিত সরলতার সহিত মহারাজার কথাগুলি বিশ্বাস করি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "আপনার অসংগত কার্য ও উক্তি সমর্থন করি জন্য তো বহু পারিষদ আছেন। আমি সন্ন্যাসী—সত্যই আমার তপস্যা। স জড়দেহের অনিষ্টাশংকায় সত্যকে পরিত্যাগ করিব? আপনি হিন্দুরাজা হই একজন হিন্দুসন্ন্যাসীর নিকট কি এইরূপ হীনোচিত কার্য প্রত্যাশা করেন?"

এইরূপ নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্যই স্বামিজী মহীশূরাধিপের শ হইতে পারিয়াছিলেন। মহারাজা একদিকে যেমন তাঁহার সহিত পরিহাস রহস্যালাপ করিতেন, অপরদিকে তেমনি গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন; এমন একদিন মহারাজা স্বামিজীর পাদপূজা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কি স্বামিজী এমন প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, মহারাজাকে বাধ্য হই উক্ত সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। এই পার্থিব যশ-সম্মান ও ঐশ্বর্য আকাঙ্ক্ষাহীন সন্ন্যাসী যে স্বীয় অমল চরিত্রের প্রভাবে রাজাধিরাজ হইতে দী মেথরের পর্যন্ত হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

একদিন দেওয়ানজীর সভাপতিত্বে রাজপ্রাসাদে এক দার্শনিক বিচারস আহূত হয়। বাঙ্গালোর নগরের প্রায় সমস্ত পণ্ডিতবর্গ এই বিচারসভায় যোগদ করেন। স্বামিজীও মহারাজার অনুরোধে সভায় যোগদান করিলেন। বেদান্তে বিচার আরম্ভ হইল। পণ্ডিতবর্গ বেদান্তের বিভিন্ন প্রকার মতবাদ সম করিয়া বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বমত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় অপরের সমর্থি মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য তুমুল তর্কের ঝড় বহিল—কি বহুক্ষণেও তাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নিস্তব্ধ হইলে

অবশেষে দেওয়ানজীর অনুরোধে স্বামিজী দণ্ডায়মান হইয়া সমবে পণ্ডিতমণ্ডলীকে শ্রদ্ধা সহকারে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় লাব

মণ্ডিত মুখশ্রী ও বিদ্যুৎবর্ষী উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় অনতিবিলম্বেই বয়োবৃদ্ধ সুবিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। স্বামিজী স্বভাব-সুমধুর-কণ্ঠে সুললিত সংস্কৃতে, সর্বসংশয়চ্ছেদী বিভিন্ন প্রকার মতবাদগুলি যে পরস্পর-বিরোধী নহে, পরন্তু একে অন্যের পরিপূরক, ইহা অপূর্ব যুক্তিবলে প্রমাণ করিয়া বুঝাইলেন। বেদান্তশাস্ত্র কতকগুলি দার্শনিক মতবাদের সমষ্টি নহে, উহা সাধক-জীবনের বিভিন্নাবস্থায় অনুভূত সত্যসমূহ। অতএব একটিকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে হইলে আপাতবিরুদ্ধ অপরটিকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। স্বামিজীর অভিনব বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী চমৎকৃত হইলেন এবং সমস্বরে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজা বলিলেন, “স্বামিজী! আপনার জন্য কিছু করিতে পারিলে বড়ই সন্তুষ্ট হইতাম; আপনি তো কিছুই গ্রহণ করিবেন না।”

স্বামিজী তাঁহার ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে দেশের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, “আমাদের বর্তমান প্রয়োজন পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সহায়ে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করা; কিন্তু ইউরোপীয়দিগের দ্বারে দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র ক্রন্দন ও ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। উহারা যেমন বর্তমান উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দিবে, বিনিময়ে আমাদেরও উহাদিগকে কিছু দিতে হইবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে দিবার মত এক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্যতীত আর কি আছে? সেইজন্য সময় সময় আমার ইচ্ছা হয় যে, বেদান্তের অত্যুদার ধর্ম প্রচার করিতে পাশ্চাত্য-দেশে গমন করিব। যাহাতে এই আদান-প্রদান সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীরই স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় চেষ্টা করা কর্তব্য। আপনার ন্যায় মহাকুলপ্রসূত শক্তিশালী রাজন্যবর্গ চেষ্টা করিলে অল্পায়াসেই কার্য আরম্ভ হইতে পারে। আপনিই এই মহৎকার্যে অগ্রসর হউন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।”

মহারাজা অভিনিবেশ সহকারে স্বামিজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, স্বামিজী যদি পাশ্চাত্যদেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে গমন করেন, তাহা হইলে তিনি সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন; এমন কি, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কয়েক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। স্বামিজী প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, আমি এখনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। আমি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই পরিব্রাজব্রত উদ্‌যাপিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিব না—এমন কি, তাহার পর কি করিব, কোথায় যাইব, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।”

অবশেষে একদিন স্বামিজীকে বিদায় লইতে উদ্যত দেখিয়া মহারাজা তাঁহাকে বিবিধ বহুমূল্য দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন। স্বামিজী উহার মধ্য হইতে বহু অনুরোধে বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি ধাতবদ্রব্যের সংস্রবহীন ক্ষুদ্র চন্দন-কাষ্ঠের হুঁকা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। দেওয়ানজী স্বামিজীর ক্ষুদ্র পুঁটুলীর মধ্যে একতাড়া নোট গুঁজিয়া দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া স্বামিজী অগত্যা তাঁহার নিকট হইতে কোচিন পর্যন্ত একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে টিকিট লইলেন। দেওয়ানজী কোচিন রাজ্যের দেওয়ানজীর নিকট একখানি পরিচয়-পত্র দিয়া

বলিলেন, “স্বামিজী! আমার একটি অনুরোধ দয়া করিয়া রাখিবেন। আপ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া কষ্টভোগ করিবেন না; কোচিন রাজ্যের দেওয়ানজী আপনা শ্রীশ্রীরামেশ্বর পর্যন্ত যাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।”

মহীশূরের দেওয়ান স্যার শেষাদ্রি আয়ারের সহিত স্বামিজীর প্রগাঢ় বন্ধ আমরণ অক্ষুণ্ণ ছিল। স্বামিজী আমেরিকা হইতে স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত কর এবং ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে দেওয়ানজীর সহিত পত্রালাপ করিতে স্বামিজী আমেরিকায় সাফল্যলাভ করিবার পর কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় ধ প্রচারক তাঁহার কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করেন। বিবেকানন্দ প্রত্যাশা করি ছিলেন, ভারত হইতে ইহার প্রতিবাদ হইবে। কিন্তু তাহা হইতেছে না দেখি তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া দেওয়ানজীকে একখানি পত্র লেখেন। দেওয়ানজী উত্তর পাইবার পর স্বামিজী (২০শে জুন, ১৮৯৪) শিকাগো হইতে তাঁহা যে পত্র লেখেন, তাঁহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

“প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব, আপনার সহৃদয় পত্রখানি আজই পাইলাম। তঁ হঠকারিতার সহিত কঠিন কথা লিখিয়া আপনার মহৎ হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি, তজ্জ দুঃখ বোধ করিতেছি। আপনার মৃদুভাষায় সংশোধনগুলি শিরোধার্য করিল “শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্”—গীতা। কিন্তু আপনি ভাল করি জানেন, আমি ভালবাসার প্রেরণা হইতেই ঐরূপ লিখিয়াছি। নিন্দুকেরা পরো ভাবেও আমার কোন উপকার করে নাই, অন্যদিকে আমার গুরুতর ক্ষ করিয়াছে। একথা তো সত্য যে হিন্দুরা, আমি যে তাহাদের প্রতিনিধি এক আমেরিকানদের জানাইবার জন্য একটি অঙ্গুলীও উত্তোলন করে নাই। আ প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য আমেরিকানদের ধন্যবাদ দিয়া এবং আমি যে তাহা প্রতিনিধি একথা জানাইবার জন্য আমার স্বদেশবাসী কি করিয়াছে? * * তাহারা আমেরিকানদের বলিতেছে, আমি আমেরিকায় আসিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া আসলে আমি একজন প্রতারক ছাড়া কিছুই নই। ইহাতে আদর অভ্যর্থনার দি হইতে কোন ইতরবিশেষ হয় নাই, কিন্তু আমার কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ ব্যাপ অনেকে ইহার ফলে হাত গুটাইয়া লইতেছেন। আমি এক বৎসর হইল এখ আসিয়াছি, অথচ ভারতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও আমেরিকানদের এক বলিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না যে, আমি প্রতারক নহি। ইহা ছাড়া এখন পাদ্রীরা আমার বিরুদ্ধে প্রচারিত মতামত সংগ্রহ করিতেছে, ভারতের খৃ কাগজগুলি হইতে আমার নিন্দাসূচক উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া প্রচার করিতে আপনি ভাল করিয়াই জানেন যে এখানকার লোকেরা ভারতে খৃষ্টান ও হিন্দ মধ্যে পার্থক্য কতখানি তাহা অল্পই বুঝে।

“আমি প্রধানতঃ এদেশে আমার স্বদেশের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করি আসিয়াছি। * * * দেওয়ানজী সাহেব, ইহার জন্য সঙ্ঘ ও অর্থ দুইই আব —প্রথম দিকে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য কিছু অর্থ চাই। কিন্তু ভারতে আমা কে টাকা দিবে? * * * এই কারণেই আমি আমেরিকায় আসিয়াছি। আপ মনে আছে, আমি দরিদ্রদের নিকট ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়াছি, ধনী টাকা লই নাই, কেননা তাঁহারা আমার ভাব ও আদর্শ বুঝে না। * * * এ বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীরা আমেরিকানদের এটুকু পর্য বলিতে পারিল না যে, আমি প্রতারক নহি, সত্যসত্যই সন্ন্যাসী এবং হিন্দুদে প্রতিনিধি। ইহাতে কয়েকটি কথা মাত্র খরচ—ইহাও তাহারা করিল না। বাহ আমার স্বদেশবাসিগণ! * * দেওয়ানজী সাহেব, আমি ইহাদের ভালবাসি।

আমার দীর্ঘ পত্রে আমার কর্মপ্রণালী বিস্তারিত লিখিলাম। * * * প্রিয় বন্ধু, আপনি আমাকে কল্পনা-বিলাসী বা স্বপ্নাতুর ভাবিতে পারেন, কিন্তু অন্ততঃ এটুকু বিশ্বাস করিবেন, আমি অকপট এবং আমার সর্বপ্রধান দোষ এই আমি আমার স্বদেশকে সর্বহৃদয় দিয়া ভালবাসি—গভীরভাবে ভালবাসি।”

কোচিনের রাজধানী ত্রিচুড়ে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া রমণীয় মালবার প্রদেশের মধ্য দিয়া স্বামিজী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে উপস্থিত হইলেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহশিক্ষক অধ্যাপক সুন্দরম্ আয়ার তাঁহাকে সমাদরের সহিত অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী তাঁহার মধ্যস্থতায় ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, দেওয়ান বাহাদুর এবং প্রিন্স মার্তণ্ড বর্মার সহিত আলাপ করেন। উক্ত রাজকুমারের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী উত্তর ভারত, রাজপুতানা এবং পশ্চিম ভারতের দেশীয় নৃপতিদের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে বরোদার গাইকোয়াড়ের বিদ্যাবত্তা, কর্মকুশলতা ও দেশপ্রীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি স্বামিজীর পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায় মুগ্ধ হন। এইকালের কথা স্মরণ করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের এস. কে. নায়ার লিখিয়াছেন—

“বিখ্যাত পণ্ডিত মহারাজা-কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক রঙ্গচারিয়ার এবং স্বামিজী উভয়েই ইংরাজী ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত; তাঁহারা পরস্পরের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া সুখী হইতেন। স্বামিজীর সহিত কিছুকাল আলাপ করিলেই তাঁহার প্রখর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইত না এমন ব্যক্তি বিরল। সম্মিলিত বা পৃথকভাবে বহু ব্যক্তির বিভিন্ন শ্রেণীর প্রশ্নের যুগপৎ উত্তর দিবার তাঁহার পরমাশ্চর্য দক্ষতা ছিল। কখনো স্পেনসার, কখনো সেক্সপীয়র, কখনো কালিদাস, কখনো বা ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, ইহুদী জাতির ইতিহাস, আর্যসভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তি, বেদ, ইস্‌লাম ধর্ম অথবা খৃষ্টান ধর্ম—যে কোন বিষয়েই প্রশ্ন হউক না কেন, স্বামিজী সঙ্গত উত্তর দিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। তাঁহার সর্বাবয়ব মহত্ত্ব ও সরলতা মণ্ডিত। পবিত্র হৃদয়, অনাড়ম্বর জীবন, উদার ও প্রাণখোলা ব্যবহার, দূরপ্রসারী জ্ঞান ও গভীর সহানুভূতিই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব।”

মাদুরায় রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সুপণ্ডিত রাজা স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য শিক্ষা বিস্তার ও কৃষির উন্নতি বিষয়ে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীকে আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত আলোচনা করিতে দেখিয়া রাজা বিস্মিত হন। স্বামিজী বলিলেন, মোক্ষ সন্ন্যাসীর লক্ষ্য হইলেও ভারতবর্ষের জনমণ্ডলীর উন্নতি সাধনের চেষ্টাও যে মোক্ষলাভের সোপান, আমি গুরুর নিকট এই আদর্শই পাইয়াছি। মাদুরায় কয়েকদিন কাটাইয়া বন্ধনমুক্ত সিংহের ন্যায় স্বামিজী দক্ষিণ ভারতের বারাণসী রামেশ্বরে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিব এবং সুবৃহৎ মন্দিরাদি দর্শন করিয়া কন্যাকুমারী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

স্বামিজীর অপূর্ব ভারত-ভ্রমণ-কাহিনী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব বিধায় সংক্ষেপে সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলাম। কখনও বা রাজাধিরাজের শীতল মর্মর-হর্ম্যে বিশ্রামরত স্বামিজী—পার্শ্বে নরপতি আদেশ পালনের জন্য যুক্তকরে দণ্ডায়মান; কখনও বা রৌদ্রদীপ্ত প্রচণ্ড-মরুর তপ্ত-বালুকাপূর্ণ বক্ষে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর স্বামিজী—সম্মুখে সামান্য বণিক খাদ্য-পানীয়ের লোভ দেখাইয়া ব্যংগপরায়ণ। কখনও বা রাজা, মহারাজা, উচ্চবংশজাত

ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আগ্রহপূর্ণ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া দরিদ্র চর্মকার-গৃহে ভিক্ষা গ্রহণপূর্বক তাহাকে কৃতার্থ করিতেছেন; আবার কখনও বা ক্রমাগত পাঁচ ছয় দিবস নিয়মিত আহার-পানীয় বিবর্জিত হইয়া তরুতলে বসিয়া প্রসন্নহাস্যে, ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। আদর, সম্মান, ভক্তি, উপেক্ষা, তাড়না কিছুতেই তাঁহার চিত্ত বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। সে অপূর্ব তিতিক্ষা, অসীম ধৈর্য, অলৌকিক ত্যাগশক্তি, অপার পরদুঃখকাতরতা মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমরা যাহাকে দুঃখকষ্ট বলি, যাহার সামান্য স্পর্শে আমরা ব্যথিত চিত্তে আর্তনাদ করিয়া "ভগবানের বিচার নাই" বলিয়া ধিক্কার দেই, মূর্তিমান সন্ন্যাস এই মহাপুরুষ অবিচলিতভাবে তাহা সহ্য করিয়াছেন—কেবল সহ্য নয়—ঐগুলি লইয়া তিনি যেন আনন্দে উন্মত্ত। তিনি দুঃখকষ্ট হইতে পলায়নের চেষ্টা কোনদিন করেন নাই, বরং স্বীয় সমগ্র যোগৈশ্বর্য গোপন করিয়া মানবজাতির সমগ্র দুর্বলতা সমগ্র পাপভার সমগ্র দুঃখকষ্ট নিজস্কন্ধে বহন করিয়া, আমাদের মত মানুষ সাজিয়া, জগতের কল্যাণ কামনায় নবজাগরণের পুণ্যবারতা লইয়া প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া গিয়াছেন। ইহাপেক্ষা অধিক স্বার্থত্যাগ, অধিক তপস্যা বর্তমান যুগে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। স্বামিজী ভারত-ভ্রমণে বহির্গত হইবার প্রাক্কালে জনৈক ভক্তিভাজন বন্ধুকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আশীর্বাদ করিবেন, যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূরাপহত হইয়া যায় —for 'we have taken up the cross, Thou has laid it upon us and grant us strength that we bear it unto death. Amen'—The Imitation of Christ.

কারণ—"আমরা জগতের দুঃখকষ্টরূপ ক্রুশ ঘাড়ে করিয়াছি, হে পিতঃ, তুমিই আমাদিগকে বল দাও, যেন উহা আমরণ বহন করিতে পারি।"

এই অশান্ত ভ্রমণের মধ্য দিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির পরিচয় পাইয়া স্বামিজী যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সামান্য নহে। কিন্তু সর্বোপরি জনসাধারণের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ফলস্বরূপ দুঃখই তাঁহার বিশাল হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার পরিব্রাজক জীবনে তিনি প্রায় সর্বদাই রাজ-রাজড়াদের অতিথি হইয়াছেন, যাচিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়াছেন। এই কালে তাঁহার ধারণা ছিল, পাশ্চাত্যভাবে উন্মত্ত, অপরিমিত বিলাসী এবং অমিতব্যয়ী দেশীয় রাজাদিগের চিত্তে জাতির প্রতি সহানুভূতি সঞ্চারিত হইলে জনসাধারণের কল্যাণ হইবে।* তিনি মনে করিতেন, ইহারা বিলাসে যে অর্থ ব্যয় করে তাহার কিয়দংশ

---

* ১৮৯৪ সালের ২৩শে জুন শিকাগো হইতে স্বামিজী মহীশূরের মহারাজাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—" * * * ভারতের সর্ববিধ দুর্গতির মূল কারণ দরিদ্র জনসাধারণের দুরবস্থা। পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্ররা বর্বর, তুলনায় আমাদের দেশের দরিদ্ররা দেব-প্রকৃতি; এই কারণে আমাদের দেশের দরিদ্রের উন্নতিবিধান সহজে সম্ভবপর। আমাদের নিম্নশ্রেণীগুলির প্রতি একমাত্র কর্তব্য তাহাদের শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের প্রনষ্ট ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, তোমরাও মানুষ; চেষ্টা করিলে সকলের মত তোমরাও উন্নতি লাভ করিতে পার। এই বোধ তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের জনসাধারণ এবং নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে সেবার এই বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র। এ-পর্যন্ত এদিক দিয়া কিছুই করা হয় নাই। গুরু-পুরোহিতকুল এবং বিদেশী রাজশক্তি দ্বারা শত শত শতাব্দী পদদলিত হওয়ার ফলে, তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ।

"তাহাদিগকে আদর্শ ideas দিতে হইবে: তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে যাহাতে জগতে কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই মুক্তির পথ

শিক্ষা বিস্তার ও কৃষির উন্নতিতে নিয়োগ করিলে জনসাধারণের সুনিশ্চিত কল্যাণ হইতে পারে, এবং ইহারা পাশ্চাত্য বিলাসের অনুকরণ না করিলে, ইহাদের দেখাদেখি সাধারণ ধনীরাও স্বজাতির সহিত সামাজিকতা ছিন্ন করিয়া সাহেবীয়ানায় অভ্যস্ত হইবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহার এই ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছিল। দেশের কল্যাণের জন্য রাজা মহারাজা ধনী অপেক্ষা তিনি চরিত্রবান শিক্ষিত যুবকদের প্রতিই অধিক নির্ভরশীল হইয়াছিলেন। যুবক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিন্তা ও চরিত্রের অতি দ্রুত পরিবর্তন এই কালে হইয়াছিল। ১৮৮৮-তে যে অশান্ত পরিব্রাজক বরাহনগর মঠ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়াছিল, আর ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে যে বিবেকানন্দকে আমরা দাক্ষিণাত্যের পথে পথে ভ্রমণ করিতে দেখিলাম, এই দুই সম্পূর্ণ না হইলেও পৃথক ব্যক্তি। এমন আশ্চর্য মানসিক বিকাশ অতি অল্প মানবেই সম্ভব। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মংগল-হস্ত যেন আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করিয়া, তাঁহাকে ভারত ভ্রমণের ছলে জাতীয় জীবনের মর্মান্তিক সমস্যার সহিত মুখোমুখি করিয়া দিলেন।

সম্মুখে অনিলান্দোলিত বীচি-বিক্ষোভময়ী উচ্ছ্বসিত সুনীল জলধি; পশ্চাতে মরু-গিরি-কান্তার-পরিশোভিতা শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ—আর তাহার সর্বশেষ প্রস্তরখানির উপর যোগাসনে সমাসীন নব্য ভারতের মন্ত্রগুরু—পরিব্রাজকাচার্য বিবেকানন্দ! কি মহিমময় দৃশ্য!

স্বামিজী ভাবিতেছেন, শ্রীগুরুর আদেশবাণী শিরোধার্য করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি; ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ, রাজা, মহারাজা, পণ্ডিত, মূর্খ

বাছিয়া লইতে পারিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক পুরুষ ও নারী প্রত্যেককেই স্ব স্ব মুক্তি-বিধানের পথ করিয়া লইতে হয়। তাহাদের কেবল এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে যে কতকগুলি কার্যকরী আদর্শ দেওয়া,—অবশিষ্ট যাহা কিছু তাহার ফলস্বরূপ আপনিই আসিবে। আমাদের কাজ হইল রাসায়নিক উপাদানগুলি একত্র সমাবেশ করা, প্রাকৃতিক নিয়মেই সেগুলি দানা বাঁধিয়া উঠিবে। আমাদের কর্তব্য তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব ঢুকাইয়া দেওয়া। বাদ বাকী যা কিছু তাহারাই করিয়া লইবে। ভারতের জন্য ইহাই প্রয়োজন। অনেকদিন হইল, আমার মনে এই কার্যপ্রণালীর ভাবগুলি রহিয়াছে। ভারতে তাহার সার্থকতার উপায় না দেখিয়া আমি এদেশে আসিয়াছি।

"আমাদের দেশের দরিদ্রদের শিক্ষাদানের পথে বিঘ্ন প্রচুর। ধরিয়া লওয়া যাক, মহারাজা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইবে না। কেননা, ভারতে দারিদ্র্য এত ভয়াবহ যে গরীবের ছেলেরা পিতার সাহায্যের জন্য কৃষিক্ষেত্রে যাইবে, অথবা অন্যত্র কিছু উপার্জন করিবার চেষ্টা করিবে। বিদ্যালয়ে আসা তাহার পরের কথা। যদি দরিদ্র বালক শিক্ষাকেন্দ্রে না আসিতে পারে, তাহা হইলে শিক্ষা তাহার গৃহে লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের দেশে হাজার হাজার একাগ্রলক্ষ্য আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া ধর্মপ্রচার করিয়া থাকেন। ইহাদের একটা অংশকে যদি লৌকিকবিদ্যা-শিক্ষকরূপে সংঘবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে গিয়া ধর্মপ্রচারের সহিত শিক্ষাও দিতে পারিবেন।

"মনে করুন এমন দুইজন শিক্ষক ম্যাজিক লণ্ঠন, ভূগোলক, মানচিত্র, প্রভৃতি লইয়া অপরাহ্নে কোন গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা অজ্ঞলোকদের জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, বিভিন্ন দেশ ও জাতির গল্প শুনাইতে পারেন। সাধারণ লোক এক জীবনে বই পড়িয়া যাহা না শিখিতে পারে, কানে শুনিয়া তার চেয়ে বেশী শিখিতে পারিবে। ইহার জন্য প্রয়োজন একটি সংঘের এবং সংঘ গঠন করিতে অর্থের আবশ্যক। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার মত মানুষ ভারতে যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের অর্থ নাই। চাকা ঘুরানই কঠিন, একবার ঘুরাইয়া দিতে পারিলে ক্রমশঃ তাহার গতিবেগ বর্ধিত হয়। আমি আমার স্বদেশে সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিয়াছি, ধনীদের সহানুভূতি উদ্রেক করিতে পারি নাই।"

প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি; অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; পরিব্রাজক ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি কি করিব? আরও কি কর্ম অবশিষ্ট রহিয়াছে?

কন্যাকুমারীর শ্রীমন্দির পার্শ্বে প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট যোগিবর ধ্যানস্থ হইলেন। মহাপুরুষের তপোমার্জিত নির্মল পবিত্র চিত্ত-দর্পণে মাতৃভূমির অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ চিত্রসমূহ একে একে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। আশা-আনন্দ-উদ্বেগ-অমর্ষ-স্তম্ভিত-হৃদয় বীর সন্ন্যাসীর ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে “বর্তমান ভারত” দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। “এই আমার ভারতবর্ষ—আমার প্রিয় মাতৃভূমি!”—ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল।

তিনি দেখিলেন, ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দৈন্য-দুঃখ, রোগ-শোকে জর্জরিত। একদিকে প্রবল বিলাসমোহে উন্মত্ত, ক্ষমতামদগর্বিত ধনিকগণ দরিদ্রগণকে নিষ্পেষিত করিয়া বিলাসতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতেছে, অপরদিকে অনাহারে জীর্ণশীর্ণ ‘ছিন্নবসন, যুগযুগান্তের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালক-বালিকাগণ’—হা অন্ন, হা অন্ন রবে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। শিক্ষাদীক্ষার অভাবে নিম্নজাতীয়গণ, পুরোহিত সম্প্রদায়ের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ব্যবহারে সনাতন ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ; কেবল তাহাই নহে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি হিন্দুধর্মকেই অপরাধী স্থির করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণে উদ্যত, কোটী কোটী লোক দিন দিন অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে উচ্চাশা নাই, বিশ্বাস নাই, নৈতিক বল নাই। শিক্ষিত নামধেয় অপূর্ব শ্রেণীর জীবগণ তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করতঃ নব নব সমাজ ও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপূর্বক হিন্দুধর্মের মস্তকে অগ্নিময় অভিশাপ বর্ষণে নিরত। ধর্ম কেবল প্রাণহীন আচার-নিয়মের সমষ্টি ও কুসংস্কারের লীলাভূমি। ফলে বর্তমান ভারত প্রায় ‘আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কালপরিপ্লুত মহাশ্মশানে পরিণত’। কাম-কাঞ্চনত্যাগী আজন্মসমাধিলিপ্সু সন্ন্যাসীর বজ্রকঠোর বিশাল হৃদয় করুণায় দ্রব হইল।

বোধিদ্রুমমূলসমাসীন শাক্যকুমার গৌতমবুদ্ধের ন্যায় তাঁহার প্রাণ সহস্র সহস্র অজ্ঞ, মোহান্ধ, অত্যাচারপীড়িত, উপেক্ষিত ‘দেবঋষির বংশধরগণের’ জন্য কাঁদিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলেন, “আমরা লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ইহাদেরই অন্নে জীবনধারণ করিয়া ইহাদের জন্য করিতেছি কি? তাহাদিগকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছি! ধিক্!! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “খালি পেটে ধর্ম হয় না, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই।’ ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে অগ্রসর হওয়া মূঢ়তা মাত্র। ধর্ম তাহাদের যথেষ্ট আছে, এক্ষণে প্রয়োজন শিক্ষা-বিস্তার, চাই অশন-বসনের সংস্থান; কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইবে? এ কার্যে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমতঃ চাই মানুষ; দ্বিতীয়তঃ অর্থ।”

কটির কৌপীন-মাত্র-সম্বল, কপর্দকহীন সন্ন্যাসী তিনি, তিনি কি করিতে পারেন? নিবিড় নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। গভীর—গভীরতম চিন্তায় তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল আলোড়িত হইল। সহসা নৈরাশ্যের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া আশার দিব্যজ্যোতিঃ স্ফুরিত হইল! প্রগাঢ় অনুভূতিতে অভিভূত হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের আশীর্বাদে এ মহাকার্যভার আমি গ্রহণ করিব। তাঁহারই ইচ্ছায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিবে, যাহারা গতানুগতিকভাবে স্বার্থান্ধ হইয়া ভোগলালসার পশ্চাতে ধাবিত হইবে না—যাহারা নরনারায়ণসেবায় সর্বস্ব অর্পণ

করিয়া এই মহান্ যুগচক্র বিবর্তনের সহায়ক হইবে। কিন্তু অর্থ কোথা হইতে আসিবে? এই চিন্তাভার মস্তিষ্কে লইয়া হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি; ধনী, রাজা, মহারাজা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি, দরিদ্রের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু কেবল মৌখিক সহানুভূতিলাভ করিয়াছি মাত্র। কেবল মাত্র হিন্দুস্থানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা অনর্থক সময় নষ্ট করা মাত্র। এই বিস্তীর্ণ জলধি উত্তীর্ণ হইয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্রগণের প্রতিনিধিস্বরূপ আমি পাশ্চাত্যদেশে গমন করিব। সেখানে মস্তিষ্কবলে অর্থ উপার্জন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিব। এবং অবশিষ্ট জীবন মাতৃভূমির উন্নতি-কল্পে ব্যয় করিব, অথবা এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিব।”

* * *

মোক্ষকামী সন্ন্যাসী মনুষ্যত্ব ও মাতৃভূমির সেবকরূপে ধ্যানাসন হইতে উত্থিত হইলেন। দ্বিধা রহিল না, সংশয় সঙ্কোচ কাটিয়া গেল, মহান্ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ ও নিয়োগ তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিলেন। অদ্বৈত-বেদান্তের ভেরীনিনাদে ভারতের প্রসুপ্ত মনুষ্যত্বের জাগরণ, সমষ্টিমুক্তি ব্যতীত নিজের মুক্তি তুচ্ছ, ইহা তিনি উপলব্ধি করিলেন। প্রত্যেক মহৎ জীবনে যাহা ঘটে, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল, উদ্দাম অশান্ত জীবনের স্রোতাবর্তে নূতন তরঙ্গ উঠিল। বিবেকানন্দের মানসিক বিকাশ এক স্তর অতিক্রম করিয়া অন্য স্তরে উপনীত হইল। সংসারবিমুখ যোগী, লক্ষ কোটি নরনারীর কল্যাণকল্পে যোদ্ধৃবেশে সত্যের তরবারি হস্তে সমরক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। ভারতবর্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া বিবেকানন্দের অভিনব যাত্রার সূচনা হইল।

কন্যাকুমারী ত্যাগ করিয়া, রামনাদের মধ্য দিয়া তিনি ফরাসী অধিকৃত পাণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে কতিপয় শিক্ষিত যুবক তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িলেন এবং ভ্রমণ-শ্রান্ত স্বামিজী কয়েকদিন বিশ্রাম করিবার সুযোগ পাইলেন। এইখানে, একজন দক্ষিণী গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কার লইয়া স্বামিজী বাদে প্রবৃত্ত হন। স্বামিজীর উন্নতিমুখীন প্রস্তাবগুলিকে যুক্তি অপেক্ষা গালিবর্ষণ দ্বারা অভিসম্পাত করিতে করিতে পণ্ডিতজী অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। স্বামিজী যখন বলিলেন, সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে শাস্ত্রের কোন সঙ্গত বাধা নাই, তখন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। স্বামিজী শান্তভাবে যতই বুঝাইবার চেষ্টা করেন, পণ্ডিতজী ততই অঙ্গভঙ্গী করিয়া এবং স্থূল শিখা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, ‘কদাপি ন’ ‘কদাপি ন’। বিচারসভার এই পরিণতি দেখিয়া, স্বামিজী সমবেত শিক্ষিত যুবকদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ধর্ম বলিয়া প্রচলিত আচার-ব্যবহারগুলি সত্যই সত্যধর্ম কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দায়িত্ব অদ্যকার শিক্ষিত যুবকদের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। আমাদিগকে অতীত ও প্রচলিত প্রথার গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া বর্তমানের উন্নতিশীল জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। যদি আমরা দেখি বাঁধাধরা আচার নিয়ম সমাজের বিকাশ ও পরিপুষ্টির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, যদি ঐগুলি আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের পক্ষে অন্তরায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা যত শীঘ্র উহা ত্যাগ করি, ততই মঙ্গল।

যুগধর্ম-প্রচারকের স্পষ্ট সতেজ কণ্ঠস্বরে যেন প্রত্যাদেশ ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভারতের অবজ্ঞাত জনসমষ্টি মাথা তুলিতেছে, চির-উপেক্ষিত শূদ্র তাহার অধিকার ও মনুষ্যত্বের দাবী উপস্থিত করিবে, সে দিন আসন্ন। আজ প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের কর্তব্য অধঃপতিত জনসমষ্টির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা, সমাজ-

প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি; অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; পরিব্রাজক ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি কি করিব; আরও কি কর্ম অবশিষ্ট রহিয়াছে?

কন্যাকুমারীর শ্রীমন্দির পার্শ্বে প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট যোগিবর ধ্যানস্থ হইলেন। মহাপুরুষের তপোমার্জিত নির্মল পবিত্র চিত্ত-দর্পণে মাতৃভূমির অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ চিত্রসমূহ একে একে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। আশা-আনন্দ-উদ্বেগ-অমর্ষ-স্তম্ভিত-হৃদয় বীর সন্ন্যাসীর ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে "বর্তমান ভারত" দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। "এই আমার ভারতবর্ষ—আমার প্রিয় মাতৃভূমি!"—ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল।

তিনি দেখিলেন, ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দৈন্য-দুঃখ, রোগ-শোকে জর্জরিত। একদিকে প্রবল বিলাসমোহে উন্মত্ত, ক্ষমতামদগর্বিত ধনিকগণ দরিদ্রগণকে নিষ্পেষিত করিয়া বিলাসতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতেছে, অপরদিকে অনাহারে জীর্ণশীর্ণ 'ছিন্নবসন, যুগযুগান্তের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালক-বালিকাগণ'—হা অন্ন, হা অন্ন রবে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। শিক্ষাদীক্ষার অভাবে নিম্নজাতীয়গণ, পুরোহিত সম্প্রদায়ের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ব্যবহারে সনাতন ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ; কেবল তাহাই নহে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি হিন্দুধর্মকেই অপরাধী স্থির করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণে উদ্যত, কোটী কোটী লোক দিন দিন অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে উচ্চাশা নাই, বিশ্বাস নাই, নৈতিক বল নাই। শিক্ষিত নামধেয় অপূর্ব শ্রেণীর জীবগণ তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করতঃ নব নব সমাজ ও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপূর্বক হিন্দুধর্মের মস্তকে অগ্নিময় অভিশাপ বর্ষণে নিরত। ধর্ম কেবল প্রাণহীন আচার-নিয়মের সমষ্টি ও কুসংস্কারের লীলাভূমি। ফলে বর্তমান ভারত প্রায় 'আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কালপরিপ্লুত মহাশ্মশানে পরিণত'। কাম-কাঞ্চনত্যাগী আজন্মসমাধিলিপ্সু সন্ন্যাসীর বজ্রকঠোর বিশাল হৃদয় করুণায় দ্রব হইল।

বোধিদ্রুমমূলসমাসীন শাক্যকুমার গৌতমবুদ্ধের ন্যায় তাঁহার প্রাণ সহস্র সহস্র অজ্ঞ, মোহান্ধ, অত্যাচারপীড়িত, উপেক্ষিত 'দেবঋষির বংশধরগণের' জন্য কাঁদিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলেন, "আমরা লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ইহাদেরই অন্নে জীবনধারণ করিয়া ইহাদের জন্য করিতেছি কি? তাহাদিগকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছি! ধিক্!! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই।' ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে অগ্রসর হওয়া মূঢ়তা মাত্র। ধর্ম তাহাদের যথেষ্ট আছে, এক্ষণে প্রয়োজন শিক্ষা-বিস্তার, চাই অশন-বসনের সংস্থান; কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইবে? এ কার্যে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমতঃ চাই মানুষ; দ্বিতীয়তঃ অর্থ।"

কটির কৌপীন-মাত্র-সম্বল, কপর্দকহীন সন্ন্যাসী তিনি, তিনি কি করিতে পারেন? নিবিড় নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। গভীর—গভীরতম চিন্তার তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল আলোড়িত হইল। সহসা নৈরাশ্যের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া আশার দিব্যজ্যোতিঃ স্ফুরিত হইল! প্রগাঢ় অনুভূতিতে অভিভূত হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের আশীর্বাদে এ মহাকার্যভার আমি গ্রহণ করিব। তাঁহারই ইচ্ছায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিবে, যাহারা গতানুগতিকভাবে স্বার্থান্ধ হইয়া ভোগলালসার পশ্চাতে ধাবিত হইবে না, যাহারা নরনারায়ণসেবায় সর্বস্ব অর্পণ

করিয়া এই মহান্ যুগচক্র বিবর্তনের সহায়ক হইবে। কিন্তু অর্থ কোথা হইতে আসিবে? এই চিন্তাভার মস্তিষ্কে লইয়া হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি; ধনী, রাজা, মহারাজা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি, দরিদ্রের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু কেবল মৌখিক সহানুভূতিলাভ করিয়াছি মাত্র। কেবল মাত্র হিন্দুস্থানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা অনর্থক সময় নষ্ট করা মাত্র। এই বিস্তীর্ণ জলধি উত্তীর্ণ হইয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্রগণের প্রতিনিধিস্বরূপ আমি পাশ্চাত্যদেশে গমন করিব। সেখানে মস্তিষ্কবলে অর্থ উপার্জন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিব। এবং অবশিষ্ট জীবন মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে ব্যয় করিব, অথবা এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিব।”

* * *

মোক্ষকামী সন্ন্যাসী মনুষ্যত্ব ও মাতৃভূমির সেবকরূপে ধ্যানাসন হইতে উত্থিত হইলেন। দ্বিধা রহিল না, সংশয় সঙ্কোচ কাটিয়া গেল, মহান্ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ ও নিয়োগ তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিলেন। অদ্বৈত-বেদান্তের ভেরীনিনাদে ভারতের প্রসুপ্ত মনুষ্যত্বের জাগরণ, সমষ্টিমুক্তি ব্যতীত নিজের মুক্তি তুচ্ছ, ইহা তিনি উপলব্ধি করিলেন। প্রত্যেক মহৎ জীবনে যাহা ঘটে, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল, উদ্দাম অশান্ত জীবনের স্রোতাবর্তে নূতন তরঙ্গ উঠিল। বিবেকানন্দের মানসিক বিকাশ এক স্তর অতিক্রম করিয়া অন্য স্তরে উপনীত হইল। সংসারবিমুখ যোগী, লক্ষ কোটি নরনারীর কল্যাণকল্পে যোদ্ধৃবেশে সত্যের তরবারি হস্তে সমরক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। ভারতবর্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া বিবেকানন্দের অভিনব যাত্রার সূচনা হইল।

কন্যাকুমারী ত্যাগ করিয়া, রামনাদের মধ্য দিয়া তিনি ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে কতিপয় শিক্ষিত যুবক তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িলেন এবং ভ্রমণ-শ্রান্ত স্বামিজী কয়েকদিন বিশ্রাম করিবার সুযোগ পাইলেন। এইখানে, একজন দক্ষিণী গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কার লইয়া স্বামিজী বাদে প্রবৃত্ত হন। স্বামিজীর উন্নতিমুখীন প্রস্তাবগুলিকে যুক্তি অপেক্ষা গালিবর্ষণ দ্বারা অভিসম্পাত করিতে করিতে পণ্ডিতজী অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। স্বামিজী যখন বলিলেন, সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে শাস্ত্রের কোন সঙ্গত বাধা নাই, তখন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। স্বামিজী শান্তভাবে যতই বুঝাইবার চেষ্টা করেন, পণ্ডিতজী ততই অঙ্গভঙ্গী করিয়া এবং স্থূল শিখা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, 'কদাপি ন' 'কদাপি ন'। বিচারসভার এই পরিণতি দেখিয়া, স্বামিজী সমবেত শিক্ষিত যুবকদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ধর্ম বলিয়া প্রচলিত আচার-ব্যবহারগুলি সত্যই সত্যধর্ম কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দায়িত্ব অদ্যকার শিক্ষিত যুবকদের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। আমাদিগকে অতীত ও প্রচলিত প্রথার গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া বর্তমানের উন্নতিশীল জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। যদি আমরা দেখি বাঁধাধরা আচার নিয়ম সমাজের বিকাশ ও পরিপুষ্টির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, যদি ঐগুলি আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের পক্ষে অন্তরায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা যত শীঘ্র উহা ত্যাগ করি, ততই মঙ্গল।

যুগধর্ম-প্রচারকের স্পষ্ট সতেজ কণ্ঠস্বরে যেন প্রত্যাদেশ ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভারতের অবজ্ঞাত জনসমষ্টি মাথা তুলিতেছে, চির-উপেক্ষিত শূদ্র তাহার অধিকার ও মনুষ্যত্বের দাবী উপস্থিত করিবে, সে দিন আসন্ন। আজ প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের কর্তব্য অধঃপতিত জনসমষ্টির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা, সমাজ-

জীবনে সমানাধিকারের আদর্শ প্রচার করা, গুরু-পুরোহিতের অত্যাচার নির্মূল করা এবং গুণগত বর্ণ-বিভাগের বিকৃতি যে কৃত্রিম জাতিভেদ, যাহা জাতীয় অধঃপতনের কারণ, বেদান্তের উচ্চতত্ত্বগুলির সহায়তায় তাহা দূর করা।

* * *

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য এই সময় সরকারী কাজে পণ্ডিচেরী আসিয়াছিলেন। তিনি একদিন দণ্ডকমণ্ডলুহস্ত স্বামিজীকে রাজপথে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন—এই কৃতবিদ্য সন্ন্যাসীই ত্রিবান্দ্রমে, অধ্যাপক সুন্দরম্ আয়ারের গৃহ হইতে আসিয়া কয়েকদিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন। এই বাঙালী সন্ন্যাসীর সহিত সেই প্রথম পরিচয় অতি সাধারণ ভাবেই হইয়াছিল। মন্মথবাবু ত্রিবান্দ্রমে আসিয়াছেন শুনিয়া স্বামিজী একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলেন—মহাশয়, দক্ষিণী রান্না খাইতে খাইতে হাঁপাইয়া উঠিয়াছি, বাঙলা দেশের অন্নব্যঞ্জন পাইবার আশায় আপনার অতিথি হইতেছি। সেই পরিচয় অল্প কয়েক দিনেই ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীকে পাইয়া মন্মথবাবুর আনন্দের সীমা রহিল না। কয়েকদিন পরেই কার্য সমাপ্ত করিয়া তিনি স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া মাদ্রাজাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মাদ্রাজে উপস্থিত হইবার কিছুদিন পরেই স্বামিজীর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শিক্ষিত-সমাজের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র ও অধ্যাপকগণ প্রত্যহ তাঁহার নিকট ধর্ম ও সাহিত্যালোচনার জন্য সমাগত হইতে লাগিলেন। অনেক যুবক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতেন: কিন্তু বিচার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই তাঁহারা বুঝিতেন যে, এই সন্ন্যাসীর সমর্থিত বেদান্তমতের সহিত তুলনায় তাঁহাদের যুক্তিগুলি বালকের অস্ফুট উক্তির মতোই অকিঞ্চিৎকর। ছাত্রজীবনে বিবেকানন্দও বড় কম তার্কিক ছিলেন না, তাহা আমরা পূর্ব অধ্যায়েই আলোচনা করিয়াছি। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া একজন তরুণ যুবকের মনে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেগুলির সহিত তিনি নিজেও প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন: কাজেই উত্তর প্রদান করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। যাহা হউক, মন্মথবাবুর ভবন শীঘ্রই ধর্মালোচনার একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিল। স্বামিজীর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিহীন উদার ধর্মমত মাদ্রাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সন্দেহ নাই। পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অন্তরালে তাঁহার যে সমবেদনাকাতর বিশাল-হৃদয় নির্বিচারে সকলকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য, আশ্রয় দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত, তাহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইয়াই এই যুবকসম্প্রদায় স্বামিজীকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছেন শুনিয়া মাদ্রাজ সহরের সুপ্রসিদ্ধ নাস্তিক, খৃষ্টিয়ান কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক সিঙ্গরাভেলু মুধলিয়র মহাশয় হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। একদিন সদলবলে সজ্জিত হইয়া স্বামিজীকে তর্কে আহ্বান করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, স্বামিজী কিছুতেই তাঁহার যুক্তিজাল খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন না: কিন্তু কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি নীরব হইতে বাধ্য হইলেন।

স্বামিজীর স্বচ্ছ প্রশান্ত ললাটে মহিমার বিচ্ছুরিত দ্যুতি, শান্তোজ্জ্বল নেত্রের করুণার চিরবিগলিত-অমৃতনির্ঝর, বিস্ময়স্তম্ভিত মুধলিয়র তাঁহার মধ্যে

কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। বাহিরের লোক দেখিল, তাঁহার গণ্ডে অশ্রুধারা! নাস্তিকতা অন্তর্হিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অনুতপ্ত হৃদয়ে তিনি স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী ইঁহাকে আদর করিয়া “কিডি” বলিয়া ডাকিতেন এবং যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আজীবন সংযমী, দৃঢ়চেতা মুধলিয়রের গুরুভক্তি অতুলনীয়! স্বামিজী আমেরিকায় থাকিতেই ইনি শ্রীগুরুর আদেশে নবপ্রতিষ্ঠিত “প্রবুদ্ধ ভারত” নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন এবং স্বল্পকাল পরেই সংসারধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া ‘নর-নারায়ণ’ সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে যুক্তরাজ্যে শিকাগো মহামেলার অঙ্গস্বরূপ এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন হইতেছিল। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে উপযুক্ত প্রতিনিধিগণ সভায় যোগদান করিতে পারিবেন, এমত ঘোষণা করা হইয়াছিল। স্বামিজীর কয়েকজন উৎসাহী মাদ্রাজী শিষ্য তাঁহাকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদিন সত্যসত্যই তাঁহারা পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বামিজীর হস্তে উক্ত অর্থ প্রদান করিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে বিরাট সভায় উপস্থিত হইবার মত যোগ্যতা তাঁহার আছে কি না, ভাবিতে গিয়া স্বামিজী মহাসমস্যায় পতিত হইলেন। অবশেষে শিষ্যবৃন্দের হস্তে উক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, “বৎসগণ! আমি শ্রীশ্রীজগন্মাতার হস্তের যন্ত্রমাত্র। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনিই আমাকে তথায় প্রেরণ করিবেন। এই অর্থ তোমরা দরিদ্রনারায়ণ সেবায় ব্যয় কর; দেখি মায়ের কি ইচ্ছা।” বহু আয়াসে সংগৃহীত অর্থ কার্যান্তরে ব্যয়িত হইবার আদেশ পাইয়া তাঁহাদের বুক দমিয়া গেল। কিন্তু গুরু-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়! বিমনায়মান শিষ্যবৃন্দকে প্রবোধ দিয়া স্বামিজী বলিলেন, “আমি সন্ন্যাসী, সঙ্কল্প করিয়া কোন কাজ করা আমার উচিত নহে। যদি ইহা ভগবানের ইচ্ছা হয়, তিনিই উপায় নির্ধারণ করিবেন, তোমাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।”

সহসা হায়দরাবাদ হইতে মন্মথবাবুর বন্ধু ষ্টেট্-ইঞ্জিনিয়র মধুসূদন চ্যাটার্জির নিকট হইতে স্বামিজীকে তথায় প্রেরণ করিবার জন্য এক পত্র আসিল। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষিতসমাজ স্বামিজীকে তাঁহাদিগের মধ্যে অল্প কয়েকদিনের জন্য পাইবার আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া মন্মথবাবু স্বামিজীর শিষ্যমণ্ডলী এবং তাঁহার সম্মতি লইয়া মধুসূদনবাবুকে জানাইলেন যে, স্বামিজী ১০ই ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদে উপস্থিত হইবেন।

স্বামিজী ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া বিস্ময়ে চাহিয়া দেখেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিপুল জনসঙ্ঘ আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতেছে। রাজা শ্রীনিবাস রাও, মহারাজ রম্ভরাও বাহাদুর, পণ্ডিত রতনলাল, শাম-সুল-উলেমা সৈয়দআলী বিলগ্রামী, নবাব ইমাদজঙ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দার নেওয়াজজঙ্গ বাহাদুর, রায় হুকুমচাঁদ এম-এ, এল-এল-ডি, শেঠ চতুর্ভুজ, শেঠ মতিলাল, ক্যাপ্টেন রঘুনাথ প্রভৃতি হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও প্ল্যাট্‌ফর্মে উপস্থিত। কুণ্ঠাসঙ্কুচিত, লালরক্তিম, আড়ষ্টবৎ দণ্ডায়মান দণ্ডকমণ্ডলুহস্ত তরুণ সন্ন্যাসীর দেবদুর্লভ অঙ্গকান্তি দর্শন করিয়া সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মধুসূদন চ্যাটার্জি তাঁহার হাত ধরিয়া সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আনন্দের সহিত তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া মধুসূদনবাবুর বাঙ্গলোয় লইয়া গেলেন।

নিজাম বাহাদুরের শ্যালক নবাব স্যার খুরসিদ জঙ্গ বাহাদুর কর্তৃক আহূত

জীবনে সমানাধিকারের আদর্শ প্রচার করা, গুরু-পুরোহিতের অত্যাচার নির্মূল করা এবং গুণগত বর্ণ-বিভাগের বিকৃতি যে কৃত্রিম জাতিভেদ, যাহা জাতীয় অধঃপতনের কারণ, বেদান্তের উচ্চতত্ত্বগুলির সহায়তায় তাহা দূর করা।

* * *

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য এই সময় সরকারী কাজে পণ্ডিচেরী আসিয়াছিলেন। তিনি একদিন দণ্ডকমণ্ডলুহস্ত স্বামিজীকে রাজপথে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন—এই কৃতবিদ্য সন্ন্যাসীই ত্রিবান্দ্রমে, অধ্যাপক সুন্দরম্ আয়ারের গৃহ হইতে আসিয়া কয়েকদিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর সহিত সেই প্রথম পরিচয় অতি সাধারণ ভাবেই হইয়াছিল। মন্মথবাবু ত্রিবান্দ্রমে আসিয়াছেন শুনিয়া স্বামিজী একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলেন—মহাশয়, দক্ষিণী রান্না খাইতে খাইতে হাঁপাইয়া উঠিয়াছি, বাঙ্গলা দেশের অন্নব্যঞ্জন পাইবার আশায় আপনার অতিথি হইতেছি। সেই পরিচয় অল্প কয়েক দিনেই ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীকে পাইয়া মন্মথবাবুর আনন্দের সীমা রহিল না। কয়েকদিন পরেই কার্য সমাপ্ত করিয়া তিনি স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া মাদ্রাজাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মাদ্রাজে উপস্থিত হইবার কিছুদিন পরেই স্বামিজীর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শিক্ষিত-সমাজের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র ও অধ্যাপকগণ প্রত্যহ তাঁহার নিকট ধর্ম ও সাহিত্যালোচনার জন্য সমাগত হইতে লাগিলেন। অনেক যুবক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতেন: কিন্তু বিচার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই তাঁহারা বুঝিতেন যে, এই সন্ন্যাসীর সমর্থিত বেদান্তমতের সহিত তুলনায় তাঁহাদের যুক্তিগুলি বালকের অস্ফুট উক্তির মতোই অকিঞ্চিৎকর। ছাত্রজীবনে বিবেকানন্দও বড় কম তার্কিক ছিলেন না, তাহা আমরা পূর্ব অধ্যায়েই আলোচনা করিয়াছি। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া একজন তরুণ যুবকের মনে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেগুলির সহিত তিনি নিজেও প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন: কাজেই উত্তর প্রদান করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। যাহা হউক, মন্মথবাবুর ভবন শীঘ্রই ধর্মালোচনার একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিল। স্বামিজীর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিহীন উদার ধর্মমত মাদ্রাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সন্দেহ নাই। পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অন্তরালে তাঁহার যে সমবেদনাকাতর বিশাল-হৃদয় নির্বিচারে সকলকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য, আশ্রয় দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত, তাহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইয়াই এই যুবকসম্প্রদায় স্বামিজীকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছেন শুনিয়া মাদ্রাজ সহরের সুপ্রসিদ্ধ নাস্তিক, খৃষ্টিয়ান কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক সিঙ্গরাভেলু মুধলিয়র মহাশয় হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। একদিন সদলবলে সজ্জিত হইয়া স্বামিজীকে তর্কে আহবান করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, স্বামিজী কিছুতেই তাঁহার যুক্তিজাল খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন না: কিন্তু কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি নীরব হইতে বাধ্য হইলেন।

স্বামিজীর স্বচ্ছ প্রশান্ত ললাটে মহিমার বিচ্ছুরিত দ্যুতি, শান্তোজ্জ্বল নেত্রদ্বয় করুণার চিরবিগলিত অমৃতনির্ঝর, বিস্ময়স্তম্ভিত মুধলিয়র তাঁহার মধ্যে

কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। বাহিরের লোক দেখিল, তাঁহার গণ্ডে অশ্রুধারা! নাস্তিকতা অন্তর্হিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অনুতপ্ত হৃদয়ে তিনি স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী ইঁহাকে আদর করিয়া "কিডি" বলিয়া ডাকিতেন এবং যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আজীবন সংযমী, দৃঢ়চেতা মুধালিয়রের গুরুভক্তি অতুলনীয়! স্বামিজী আমেরিকায় থাকিতেই ইনি শ্রীগুরুর আদেশে নবপ্রতিষ্ঠিত "প্রবুদ্ধ ভারত" নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন এবং স্বল্পকাল পরেই সংসারধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া 'নর-নারায়ণ' সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে যুক্তরাজ্যে শিকাগো মহামেলার অঙ্গস্বরূপ এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন হইতেছিল। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে উপযুক্ত প্রতিনিধিগণ সভায় যোগদান করিতে পারিবেন, এমত ঘোষণা করা হইয়াছিল। স্বামিজীর কয়েকজন উৎসাহী মাদ্রাজী শিষ্য তাঁহাকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। একদিন সত্যসত্যই তাঁহারা পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বামিজীর হস্তে উক্ত অর্থ প্রদান করিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে বিরাট সভায় উপস্থিত হইবার মত যোগ্যতা তাঁহার আছে কি না, ভাবিতে গিয়া স্বামিজী মহাসমস্যায় পতিত হইলেন। অবশেষে শিষ্যবৃন্দের হস্তে উক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! আমি শ্রীশ্রীজগন্মাতার হস্তের যন্ত্রমাত্র। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনিই আমাকে তথায় প্রেরণ করিবেন। এই অর্থ তোমরা দরিদ্রনারায়ণ সেবায় ব্যয় কর; দেখি মায়ের কি ইচ্ছা।" বহু আয়াসে সংগৃহীত অর্থ কার্যান্তরে ব্যয়িত হইবার আদেশ পাইয়া তাঁহাদের বুক দমিয়া গেল। কিন্তু গুরু-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়! বিমনায়মান শিষ্যবৃন্দকে প্রবোধ দিয়া স্বামিজী বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, সংকল্প করিয়া কোন কাজ করা আমার উচিত নহে। যদি ইহা ভগবানের ইচ্ছা হয়, তিনিই উপায় নির্ধারণ করিবেন, তোমাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।"

সহসা হায়দরাবাদ হইতে মন্মথবাবুর বন্ধু ষ্টেট্-ইঞ্জিনিয়র মধুসূদন চ্যাটার্জির নিকট হইতে স্বামিজীকে তথায় প্রেরণ করিবার জন্য এক পত্র আসিল। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষিতসমাজ স্বামিজীকে তাঁহাদিগের মধ্যে অল্প কয়েকদিনের জন্য পাইবার আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া মন্মথবাবু স্বামিজীর শিষ্যমণ্ডলী এবং তাঁহার সম্মতি লইয়া মধুসূদনবাবুকে জানাইলেন যে, স্বামিজী ১০ই ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদে উপস্থিত হইবেন।

স্বামিজী ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া বিস্ময়ে চাহিয়া দেখেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিপুল জনসঙ্ঘ আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতেছে। রাজা শ্রীনিবাস রাও, মহারাজ রম্ভরাও বাহাদুর, পণ্ডিত রতনলাল, শাম-সুল-উলেমা সৈয়দআলী বিলগ্রামী, নবাব ইমাদজঙ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দার নেওয়াজজঙ্গ বাহাদুর, রায় হুকুমচাঁদ এম-এ, এল-এল-ডি, শেঠ চতুর্ভুজ, শেঠ মতিলাল, ক্যাপ্টেন রঘুনাথ প্রভৃতি হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও প্ল্যাট্ফর্মে উপস্থিত। কুণ্ঠাসঙ্কুচিত, লালরক্তিম, আড়ষ্টবৎ দণ্ডায়মান দণ্ডকমণ্ডলুহস্ত তরুণ সন্ন্যাসীর দেবদুর্লভ অঙ্গকান্তি দর্শন করিয়া সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মধুসূদন চ্যাটার্জি তাঁহার হাত ধরিয়া সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আনন্দের সহিত তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া মধুসূদনবাবুর বাঙ্গলোয় লইয়া গেলেন।

নিজাম বাহাদুরের শ্যালক নবাব স্যার খুরসিদ জংগ বাহাদুর কর্তৃক আহূত

হইয়া স্বামিজী ১২ই ফেব্রুয়ারী নিজাম বাহাদুরের প্রাসাদে উপনীত হইলেন। নবাব বাহাদুর হিন্দুধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন।

স্বামিজীকে সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তিনি স্বীয় পার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করাইলেন এবং আগ্রহের সহিত তাঁহার সঙ্গে ধর্মবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম ও খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কালে স্বামিজী উক্ত ধর্মত্রয়ের মূল সূত্রগুলি আলোচনা করিয়া উহাদের সমন্বয়ভূমি দেখাইয়া দিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, তিনি সভ্যজগতের সম্মুখে বেদান্তশাস্ত্রসহায়ে ধর্ম-সমন্বয় প্রচার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, দূর ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার ধর্মদ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হইবে এবং সকলেই নির্বিবাদে স্ব স্ব ভাবানুযায়ী ঈশ্বরোপাসনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। নবাব বাহাদুর স্বামিজীর যুক্তিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে গমনের ব্যয়স্বরূপ একসহস্র মুদ্রা তখন প্রদান করিতে চাহিলেন। স্বামিজী বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "নবাব বাহাদুর, ইতিপূর্বে আমার পরম বন্ধু মহীশূরের মহারাজ বাহাদুর এবং শিষ্য রামনাদের রাজা আমাকে পাশ্চাত্যদেশে গমন করিবার জন্য অর্থসাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু আমার মনে হয়, এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। যদি কখনও পাশ্চাত্যদেশে গমন করিবার জন্য ভগবানের আদেশ পাই, তাহা হইলে নবাব সাহেবকে নিবেদন করিব।"

স্থানীয় শিক্ষিত-ব্যক্তিবর্গের আগ্রহে স্বামিজী মহবুব কলেজে প্রায় একসহস্র শ্রোতার সম্মুখে 'পাশ্চাত্যদেশে আমার বার্তা' শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিত রতনলাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামিজীর বক্তৃতা অতীব হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে স্বামিজী হায়দরাবাদস্থ বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যদিও শিকাগো-ধর্মসভায় যাইবার চিন্তা এককালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কয়েকজন মিলিত হইয়া অর্থসংগ্রহ করিতে রামনাদ, মহীশূর ও হায়দরাবাদে গমন করিলেন। মহামতি আনন্দচার্লু, মাননীয় জাস্টিস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহোদয় প্রমুখ অনেকেই তাঁহাকে ধর্মসভায় প্রেরণকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন দেখিয়া স্বামিজী চিন্তিত হইলেন। একদিন তাঁহার অন্যতম শিষ্য মিঃ আলাসিংগা পেরুমলকে ডাকিয়া বলিলেন, "যদি আমার আমেরিকা গমন একান্তই মায়ের-ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে যাইতে হইবে। তোমরা আমাকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করিতে সংকল্প করিয়াছ। আমিও জনসাধারণের মুখপাত্রস্বরূপই যাইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু এই কার্যে জনসাধারণের সম্মতি আছে কিনা, তাহা অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অতএব কেবলমাত্র রাজা, মহারাজাদের নিকট সাহায্য গ্রহণ না করিয়া জনসাধারণের নিকট তোমরা ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহ কর।" গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই নিঃস্বার্থপর, পবিত্রহৃদয় মাদ্রাজী যুবকগণের অসীম গুরুভক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে।

ইতিমধ্যে একদিন স্বামিজী স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দিব্যদেহে সমুদ্রকূল হইতে বিস্তীর্ণ সলিলোপরি পদব্রজে অগ্রসর হইতেছেন এবং তাঁহাকে

অনুসরণ করিবার জন্য হস্ত-সঙ্কেতে ইঙ্গিত করিতেছেন। এইবার সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ-সন্দেহ বিদূরিত হইল, স্বামিজী আমেরিকা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, এ পর্যন্ত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশ লওয়া হয় নাই। তাঁহার আদেশ ও আশীর্বাদ ব্যতীত সুদূর বিদেশে যাওয়া কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্বামিজী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট স্বীয় সংকল্প বিস্তারিত বর্ণন করিয়া এক পত্র লিখিলেন।

প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র নরেন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া স্নেহবিহ্বলা জননী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের নেতা, রাজাধিরাজসেবিত বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁহার দৃষ্টিতে সংসারানভিজ্ঞ বালকমাত্র, তাঁহাকে কোন্ প্রাণে সুদূর বিদেশ-যাত্রায় অনুমতি দিবেন! কিন্তু ঠাকুরের আদেশ সমস্ত সমস্যা মীমাংসা করিয়া দিল। অগত্যা স্নেহমুগ্ধ-হৃদয় বাঁধিয়া জগতের কল্যাণ-কামনায় স্বামিজীর সংকল্পে তিনি আনন্দে সম্মতি প্রদান করিলেন।

যথাসময়ে পত্রোত্তর আসিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। পত্রখানি পরমভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিয়া স্বামিজী ভাবাবেগে অশ্রুসিক্তনেত্রে, বালকের মত আনন্দ-বিহ্বল হইয়া কক্ষমধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় লোকে দেখিলে কি মনে করিবে ভাবিয়া তিনি স্বীয় উদ্বেলিত হৃদয় শান্ত করিবার জন্য অপরের অলক্ষ্যে সমুদ্রতীরে চলিয়া গেলেন। মন্মথবাবুর ভবনে নিয়মিত সময়ে তদীয় শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় স্বামিজী তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৎসগণ! শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ পাইয়াছি, সমস্ত সংশয়-ভাবনা দূর হইয়াছে, আমি আমেরিকা যাইবার জন্য প্রস্তুত। করুণাময়ী জননী আশীর্বাদ করিয়াছেন, আর চিন্তা কি?" আনন্দে ও বিস্ময়ে উৎসাহোদ্দীপ্ত শিষ্যবৃন্দ কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামিজীর যাত্রার সুবন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত প্রস্তুত, এমন সময় খেতরি-রাজভবন হইতে মুন্সী জগমোহন লাল আসিয়া বন্দোবস্ত ওলট-পালট করিয়া দিলেন।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রায় দুই বৎসর পূর্বে স্বামিজী খেতরি-পতি রাজা মঙ্গলসিংহকে পুত্র হইবার আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। গুরুকৃপায় রাজা পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে রাজপুত্রের অন্নপ্রাশনে যাহাতে স্বামিজী উপস্থিত থাকিয়া রাজপরিবারের আনন্দবর্ধন করেন, তদুদ্দেশ্যে স্বামিজীকে খেতরিতে লইয়া যাইবার জন্য মুন্সীজী মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী ও তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্যবৃন্দের কোন আপত্তি টিকিল না। জগমোহন বলিলেন, "গুরুজি! অন্ততঃ একদিনের জন্যও আপনাকে খেতরিতে যাইতে হইবে, অন্যথায় রাজাজী হৃদয়ে নিদারুণ আঘাতপ্রাপ্ত হইবেন। আমেরিকা যাইবার বন্দোবস্তের জন্য আপনার ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। রাজা সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন, আপনি আমার সহিত খেতরিতে চলুন।"

অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর স্বামিজী বোম্বাই হইতে আমেরিকা যাত্রা করিবেন, স্থির হইল। খেতরি-যাত্রার আয়োজন প্রস্তুত দেখিয়া স্বামিজী উপস্থিত শিষ্যবৃন্দের নিকট বিদায় লইলেন। একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম-উপাধিধারী যুবকবৃন্দ রাজপথে অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রীশ্রীগুরুদেবের অভয় চরণে পতিত হইয়া দীনভাবে আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রিয়তম শিষ্যবৃন্দকে ছাড়িয়া যাইতে স্বামিজীর হৃদয় ব্যথিত হইল, বহুকষ্টে ভাবাবেগ দমন করিয়া মন্থরপদে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন।

খেতরিতে শুভ অন্নপ্রাশনোৎসব নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেলে স্বামিজী

রাজশিষ্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মুন্সী জগমোহন লাল সমভিব্যাহারে বোম্বাই নগরে উপনীত হইলেন। মিঃ আলসিংগা পেরুমল ইতোপূর্বে গুরুদর্শন কামনায় মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই আগমন করিয়াছিলেন; তিনি ষ্টেশনেই স্বামিজীর সহিত মিলিত হইলেন।

জগমোহন লালকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ক্রয় করিতে দেখিয়া স্বামিজী ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। জগমোহন বুঝাইলেন যে, তিনি রাজগুরু, অতএব সেইভাবে তাঁহার সজ্জিত হওয়া কর্তব্য। বক্তৃতা করিবার জন্য মহার্ঘ রেশমের আলখেল্লা ও পাগড়ী প্রস্তুত করা হইল। স্বামিজী অনন্যোপায় হইয়া শিষ্যের সদিচ্ছায় আর বাধাপ্রদান করিলেন না। দণ্ডকমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্রহস্তে ভ্রমণাভ্যস্ত স্বামিজী কেমন করিয়া প্রচুর বসন, ভূষণ ও দ্রব্যসম্ভারের তত্ত্বাবধান করিবেন ভাবিয়া বালকের ন্যায় অধীর হইয়া উঠিলেন।

ক্রমে যাত্রার দিন নিকটবর্তী হইয়া অবশেষে শুভমুহূর্ত সমাগত হইল। মুন্সী জগমোহন পূর্ব হইতেই স্বয়ং দেখিয়া স্বামিজীর জন্য জাহাজে একটি প্রথম শ্রেণীর কেবিন রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামিজী অশ্রুপূর্ণলোচনে শিষ্যদ্বয়ের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া বাষ্পীয়পোতে আরোহণ করিলেন। সহসা তীব্র বংশীধ্বনি তাঁহার হৃৎপিণ্ড আলোড়িত করিয়া স্বদেশের সহিত আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনাময় বার্তা জ্ঞাপন করিল। লৌহনির্মিত বিরাটকায় কূর্ম মন্থরগতিতে গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। দেখিতে দেখিতে স্বদেশের শ্যামল ছবিখানি অস্পষ্ট হইয়া আসিল—অবশেষে শেষ ধূসর রেখাটি পর্যন্ত দূর দিক্-চক্রবালরেখায় বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার নির্নিমেষ নেত্রের সম্মুখে ফেনশুভ্র-শির-তরংগমালা ভৈরবকল্লোলে উচ্ছ্বসিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ডেকের উপর প্রস্তরমূর্তির মত দণ্ডায়মান স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর মর্মের অন্তস্তল হইতে অসীম ক্রন্দন হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

হে রহস্যময় আত্মারাম গুরো! তুমি তো নিষ্কৃতি দিলে না! আজ সত্য-সত্যই ত্যাগপূত ভারতবর্ষ হইতে আমাকে ভোগবিলাসের লীলাভূমি পাশ্চাত্যদেশে লইয়া চলিলে! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!

* * *

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় বিদেশিগণের ভ্রান্তবিশ্বাস দূর করিয়া উহার সর্বজনীন উদার ভাবসমূহ আধুনিক মনের উপযোগী বৈজ্ঞানিক যুক্তিমণ্ডিত করিয়া প্রচার করিতে, পাশ্চাত্যের ভোগৈকসর্বস্ব জড়বাদের উন্মত্ত-কোলাহল মথিত করিয়া ত্যাগের পুণ্যবাণী শুনাইতে, স্বদেশীয় পাশ্চাত্য সভ্যতালোকপ্রাপ্ত, সনাতনধর্মে আস্থাহীন পরমুখাপেক্ষী, বিপথ-পরিচালিত মূঢ়গণকে অবলম্বনীয় কি, তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন নির্লজ্জ হিন্দুগণকে বিদেশীয়গণের পদতলে বসিয়া ধর্মশিক্ষাগ্রহণ হইতে বিরত করিয়া, আপনার ঘরে ধর্মানুসন্ধান করাইতে ভারতের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক-সত্যরত্নসমূহ জগতের সভ্যতাভাণ্ডারে প্রদান করিতে, একটা আসন্নপ্রায় ধ্বংসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পাশ্চাত্যজগৎকে ভারতের পদতলে বসিয়া ধর্মশিক্ষাগ্রহণকল্পে বজ্ররবে আহ্বান করিতে, সর্বোপরি "সকল ধর্মই সত্য এবং ঈশ্বরোপলব্ধির বিভিন্ন উপায় মাত্র"—স্বীয় আচার্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মৌলিক উপদেশবাণী, সিংহবিক্রমে সঙ্কীর্ণতা, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী ও ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রচার করিতে ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে, স্বীয় স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে সমুন্নতশির স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীগুরুর মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় চালিত হইয়া শিকাগো অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

আচার্য বিবেকানন্দ

(১৮৯৩—১৮৯৬)

> "I go forth to preach a religion, of which Buddhism is nothing but a rebel child and Christianity but a distant echo."—Swami Vivekananda.

বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িল। বিষণ্ণ বিমর্ষ সন্ন্যাসী বিব্রত হইয়া উঠিলেন। দণ্ড, কমণ্ডলু এবং গেরুয়া কাপড়ে মোড়া দু'চার খানা পুঁথির বেশী কোন সম্বল যাঁহার ছিল না, বাক্স-পেঁটরা, কাপড়-চোপড় সামলাইতে তাঁহার চিরদিনের অভ্যাসের সহিত বিরোধ বাধিল। "এখন এই সব যাহা সঙ্গে লইতে হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধানেই আমার সব শক্তি ব্যয় হইতেছে। বাস্তবিক, এ এক ঝঞ্ঝাট।" তবু শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।" স্বামিজী অন্যান্য যাত্রীদের সহিত, বিশেষভাবে জাহাজের কাপ্তেনের সহিত ভাব করিয়া লইলেন। অভিনব খাদ্য, ইউরোপীয় আচার-ব্যবহার ক্রমে তিনি আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। সাতদিন পর কলম্বো। সিংহলের রাজধানী। বৌদ্ধধর্মের দেশ। জাহাজ বন্দরে লাগিবামাত্র স্বামিজী গাড়ি করিয়া সহরটি দেখিয়া লইলেন। ভগবান বুদ্ধের মন্দিরে গিয়া বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ মহানির্বাণ মূর্তি শয়ান অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। মন্দিরের পুরোহিতদের সহিত তিনি আলাপ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা সিংহলী ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না দেখিয়া, স্বামিজী সে চেষ্টা ত্যাগ করিলেন। ভারত সমুদ্রের নীল জলরাশি বিক্ষুব্ধ করিয়া আবার জাহাজ চলিল। পথে মালয় উপদ্বীপের পিনাং ও সিঙ্গাপুর, দূরে উচ্চশৈল সমন্বিত সুমাত্রা। সিঙ্গাপুর হইতে হংকঙ। হংকঙে তিনদিন জাহাজ ছিল। এই অবসরে স্বামিজী সিকিয়াঙ নদীর মোহনা হইতে ৮০ মাইল দূরবর্তী দক্ষিণ চীনের রাজধানী ক্যাণ্টন সহর দেখিয়া আসিলেন। ক্যাণ্টনে কতকগুলি বৌদ্ধ মঠ ও সর্ববৃহৎ মন্দিরটি দর্শন করিলেন। আর দেখিলেন, প্রাচ্যের দারিদ্র্য, পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ ও বণিককুলের শোষণে সর্বত্র মানুষ ভারবাহী পশুতে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও চীন প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী এই দুই মহাজাতির অবস্থা তুলনা করিলেন। "চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতা-সোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দারিদ্র্যই তাহার এক কারণ। সাধারণ হিন্দুর বা চীনার পক্ষে তাহার প্রাত্যহিক অভাবই তাহার সময়ের এতদূর ব্যাপৃত করিয়া রাখে যে, তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না।"

এই দারিদ্র্যপীড়িত প্রাচ্যের মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী জাপান দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। চীনের সহিত কি বিস্ময়কর ব্যবধান! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নগরী, বাসগৃহগুলি ছবির মত, মনোহর উদ্যান, কৃত্রিম জলাশয়। রাস্তাগুলি চওড়া, সিধা। নাগাসিকি, কোবি বন্দর, ইয়াকোহামা, ওসাকা, কিয়াটো ও টোকিয়ো এই

কয়েকটি সহর পরিদর্শন করিয়া স্বামিজী এক পত্রে লিখিলেন,—"জাপানীরা বর্তমানকালে কি প্রয়োজন তাহা বুঝিয়াছে—তাহারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়াছে।" জাপানিগণের ক্ষিপ্র উন্নতি, সাহস ও উদ্যম দর্শনে চমৎকৃত হইয়া স্বদেশের দুর্দশা স্মরণে ব্যথিতহৃদয়ে ইয়াকোহামা হইতে তদীয় মাদ্রাজী শিষ্যগণকে এক পত্রে (১০ই জুলাই, ১৮৯৩) লিখিয়াছিলেন—"জাপানীদের সম্বন্ধে আমার কত কথা মনে উদয় হচ্ছে তা' একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ করে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতিবৎসর চীন ও জাপানে যাক্। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ।

"**আর তোমরা কি কোরছো? সারাজীবন কেবল বাজে বোক্‌ছো। এস, এদের দেখে যাও; তারপর যাও, গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হ'য়ে ভীমরতি ধরেছে! তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাতি যায়!! এই হাজার বছরের জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তি ক্ষয় কোরছো! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক্ খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিচ্ছিন্ন সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে—তোমাদের কি আছে বল দেখি? আর তোমরা এখন কোরছোই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারী কোরছো! ইউরোপীয়-মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছো, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০ টাকার কেরাণীগিরির উপরে পড়ে আছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকীল হ'বার মতলব কোরছো। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছেলের আশেপাশে একপাল ছেলে—তার বংশধরগণ—বাবা খাবার দাও, খাবার দাও করে উচ্চ চীৎকার তুল্‌ছে!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সব ডুবিয়ে ফেল্‌তে পারো না?

"এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও! কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনো ভাল কথা শুনবে না—তা'দের হৃদয়ও শূন্যময়, তা'র কখনও প্রসার হ'বে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে তা'দের জন্ম, আগে তা'দের নির্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহ'লে এস, আমরা ভাল হ'বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতিপ্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেয়ো না—সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ এইরূপ সহস্র যুবক বলি চান! মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।"

ইয়াকোহামা হইতে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া জাহাজ বঙ্কুবর বন্দরে নোঙ্গর ফেলিল। এখান হইতে রেলওয়ে-যোগে কানাডার মধ্য দিয়া তিনদিন পর তিনি শিকাগো সহরে প্রবেশ করিলেন। যে নগরী তাঁহার খ্যাতি দিগ্বিদিকে বিঘোষিত করিবে, সেই নগরীতে অপরিচিত, বিস্ময়বিহ্বল বালকের মত তিনি বিচরণ করিতে লাগিলেন। জনপূর্ণ রাজপথে গৈরিক পরিহিত সন্ন্যাসী নানাশ্রেণীর কৌতূহলী লোকের দ্বারা উত্ত্যক্ত ও অস্থির হইয়া উঠিলেন। বালকের দ

বিদ্রূপ করিতে করিতে তাঁহার পাছে পাছে চলিতে লাগিল। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। তাহার উপর বন্দর হইতে প্রতারণা চলিয়াছে। যে পারিতেছে, সেই অসম্ভব দাবী করিয়া তাঁহাকে ঠকাইতেছে। অর্থাদি ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কুলীরাও অসম্ভব হারে মজুরী দাবী করিল। অবশেষে এক হোটেলে উঠিয়া সেদিনের মত তিনি পরিত্রাণ পাইলেন।

পরদিন চলিলেন, বিখ্যাত বিশ্ব-প্রদর্শনী দেখিতে। জড়বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্ক্রিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ যন্ত্র, কত বিচিত্র পণ্যসম্ভার, শিল্পকলার কত নয়নাভিরাম নিদর্শন, পাশ্চাত্যের বিশাল গরিমা দেখিয়া স্বামিজী মুগ্ধ হইলেন। মানুষের আত্মবিশ্বাস, দূরাকাঙ্ক্ষা, দুর্লভের সন্ধানে জীবনমরণ পণ, ইহা সম্ভব করিয়াছে। পাশ্চাত্যের বেগবান সভ্যতাস্রোতে দ্রুত উন্নতিশীল জীবনের সহিত ভারতের মন্থর ক্ষীণ বিশীর্ণ জীবনধারার তুলনা করিতে করিতে নিঃসঙ্গ একক সন্ন্যাসী সন্ধ্যায় ক্লান্তপদে হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু অগ্নি বস্ত্রাবৃত থাকে না। পোষাক যতই অদ্ভুত হউক, সেই জ্যোতির্ময় নির্মল ললাট, আয়ত-লোচনের মর্মভেদী দৃষ্টি সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করে। কেহ কেহ স্বামিজীকে আবিষ্কার করিলেন। হুজুগপ্রিয় সংবাদপত্রের রিপোর্টারেরাও বাদ গেলেন না। কিন্তু ইহারা কৌতূহলী জনতামাত্র। স্বামিজী নিজে লিখিয়াছেন,—"বরদা রাও যে মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার স্বামী শিকাগো সমাজের মহাগণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহারা আমার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকে বিদেশীকে খুব যত্ন করিয়া থাকে কেবল অপরকে তামাসা দেখাইবার জন্য; অর্থসাহায্য করিবার সময় প্রায় সকলেই হাত গুটাইয়া লয়।" অত্যধিক খরচ দেখিয়া স্বামিজী চিন্তিত হইলেন। এখানে লোকে জলের মত টাকা খরচ করে। স্বামিজী চিন্তিত হইলেন।

তাহার উপর এক নূতন দুর্ভাবনায় তিনি বিমর্ষ হইলেন। একদিন সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলেন যে, ধর্মমহাসভা সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে আরম্ভ হইবে না। বিশেষতঃ যাঁহারা উক্ত সভার নিয়মাবলী অনুসারে পরিচয়পত্র লইয়া আসেন নাই, তাঁহারা সভায় প্রতিনিধিরূপে স্থান পাইবেন না। প্রতিনিধিরূপে ধর্মমহাসভায় যোগদান করিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে—কাজেই স্বামিজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইবার কোন সুযোগ দেখিলেন না।

এদিকে যে সামান্য অর্থ তখনও তাঁহার নিকট অবশিষ্ট ছিল, তাহাও আবার হোটেলওয়ালা ইত্যাদির অত্যধিক দাবী পূরণ করিতে একপক্ষকালের মধ্যেই প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গেল। যদিও তাঁহার স্থিরবিশ্বাস ছিল যে, ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত তাঁহাকে সর্বদা রক্ষা করিতেছে, তথাপি এক প্রবলতম সন্দেহের ঝড় উঠিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বিচলিত হৃদয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্বামিজী ভাবিতে লাগিলেন যে, উত্তপ্তমস্তিষ্ক কতকগুলি যুবকের পরামর্শে তিনি কেন আমেরিকায় আসিলেন? যাহা হউক, শিকাগোতে সঙ্কল্পসিদ্ধির কোন উপায় না দেখিয়া তিনি বোষ্টন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে রেলগাড়িতে এক বর্ষীয়সী মহিলার সহিত তাঁহার আলাপ হইল। এই ভদ্রমহিলা তাঁহার অদ্ভুত পোষাক দেখিয়া পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি যখন শুনিলেন, এই প্রাচ্যদেশীয় সন্ন্যাসী আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিতে আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে স্বালয়ে আতিথ্যগ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আশা দিলেন যে, তিনি স্বামিজীর প্রচারকার্যের সুবিধা করিয়া দিবেন। এই মহিলার গৃহে স্বামিজী

কিরূপ আরামে ছিলেন, তৎসম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন, "এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ আমার যে এক পাউন্ড খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন। এসব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে এখন অনাহার, শীত, আমার অদ্ভুত পোষাকের দরুণ রাস্তার লোকের বিদ্রূপ, এগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে।" যাহা হউক স্বামিজী এই মহিলার ভবনে আসিয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, কয়েকমাস চেষ্টা করিয়া যদি আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের সুবিধা করিয়া না উঠিতে পারি তাহা হইলে এখন হইতে ইংলণ্ডে গমন করিব; তবে কোন সুবিধা না পাইলে, দেশে ফিরিয়া শ্রীগুরুর দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা করিব।

শিকাগো ধর্মসভায় প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইলেও তাঁহার দৃঢ়হৃদয় বিচলিত হইল না। তিনি আগতপ্রায় বাধা ও বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য "ভগবানে বিশ্বাসরূপ দৃঢ় বর্মে" সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত হইলেন। এই মহিলার আলয় হইতে তিনি তাঁহার জনৈক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন, "এখানে আসিবার পূর্বে যেসব সোনার স্বপ্ন দেখিতাম, তাহা ভাঙ্গিয়াছে—এক্ষণে অসম্ভবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শতবার মনে হইয়াছিল, এদেশ হইতে চলিয়া যাই; কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের আদেশ পাইয়াছি, আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দর্শন করিতেছে। মরি বাঁচি উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।"

এ পর্যন্ত জগতের কোন মহৎকার্যই নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হয় নাই। পরাজয় ও ব্যর্থতার সহিত সংগ্রামের মধ্য দিয়াই তো মানবচরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠে। তাই আমরা দেখিতে পাই, দুর্দশার সর্বনিম্নস্তরে পড়িয়া যখন তিনি মৃত্যু স্থির বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখনও তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিতেছেন, "কোমর বাঁধ বৎস, প্রভু আমাকে এই কার্যের জন্য ডাকিয়াছেন। আমি সমস্ত জীবন নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছি, প্রাণপ্রিয় নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর ও বদমাস বলিয়াছে। আমি এ সমস্তই সহ্য করিয়াছি তাঁদের জন্য যারা আমায় উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে। বৎস! জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের হৃদয়বেদনা অনুভব কর, অকপট হইয়া ইহাদিগের জন্য ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া এই চিন্তাভার মস্তিষ্কে ও এই দুখভার হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। তথাকথিত ধনী ও বড়লোকদের দ্বারে দ্বারে গিয়াছি। অবশেষে হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই সুদূর বিদেশে সাহায্যলাভের প্রত্যাশায় উপস্থিত হইয়াছি। ভগবান দয়াময়! তিনি অবশ্যই সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে শীতে ও অনাহারে মরিতে পারি, কিন্তু হে যুবকগণ! আমি তোমাদের নিকট দরিদ্র, পতিত, উৎপীড়িতগণের জন্য এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। তোমরা এই ত্রিশকোটি নরনারীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর—যাহারা দিন দিন গভীরতম অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিতেছে! প্রভুর নাম জয়যুক্ত হউক—আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। এই চেষ্টায় শতজন প্রাণত্যাগ করিতে পারে, আর

সহস্রজন এই কর্মের জন্য প্রস্তুত হইবে। বিশ্বাস—সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস—জ্বলন্ত সহানুভূতি—অগ্রসর হও—অগ্রসর হও।”

* * *

স্বামিজী মহিলাগণের পরামর্শানুসারে পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সদাসর্বদা ব্যবহার করিবার জন্য একটা লম্বা কালো কোট প্রস্তুত করিলেন। গৈরিক-পাগ্‌ড়ি ও আলখেল্লা কেবলমাত্র বক্তৃতাকালে ব্যবহার করিবার জন্য রাখিয়া দিলেন। একদিন ঘটনাচক্রে পূর্বোক্ত মহিলার গৃহে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক মিঃ জে. এইচ. রাইট্‌ মহোদয়ের সহিত স্বামিজীর পরিচয় হয়। ইনি কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর স্বামিজীর উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বলিলেন, “আপনি শিকাগো মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে গমন করুন, তাহা হইলে বেদান্ত-প্রচারকার্যে অধিকতর সাফল্য-লাভ করিবেন।” স্বামিজী সরলভাবে প্রকৃত অসুবিধাগুলি খুলিয়া বলিলেন। অধ্যাপক আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “To ask you, Swami, for your credentials is like, asking the sun to state its right to shine!” রাইট্‌ সাহেব তৎক্ষণাৎ উক্ত মহাসভা-সংশ্লিষ্ট তাঁহার বন্ধু মিঃ বনি সাহেবকে এক-খানি পত্র লিখিয়া স্বামিজীর হস্তে প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে অন্যান্য কথার সহিত এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল : “দেখিলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন্দুসন্ন্যাসী আমাদের সকল পণ্ডিতগুলি একত্র করিলে যাহা হয়, তদপেক্ষাও বেশী পণ্ডিত!” এই পত্রখানি ও অধ্যাপক-প্রদত্ত একখানি রেলওয়ে টিকিট লইয়া স্বামিজী পুনরায় শিকাগো অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

স্বামিজী যে উৎসাহ, যে আনন্দ লইয়া বোষ্টন হইতে রওনা হইয়াছিলেন, শিকাগো রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইবামাত্র তাহা অন্তর্হিত হইল। এই বিরাট সহরে তিনি কেমন করিয়া ডাক্তার ব্যারোজ সাহেবের আফিস খুঁজিয়া বাহির করিবেন! পথিমধ্যে দুই চারিজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, তাঁহারা স্বামিজীকে নিগ্রো মনে করিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন; এমনকি, রাত্রিতে থাকিবার স্থানের আশায় একটি হোটেলের সন্ধান লইতে গিয়াও তিনি বিফলকাম হইলেন। অবশেষে কোনস্থানে আশ্রয় না পাইয়া রেলওয়ে মালগুদামের সম্মুখে পতিত একটি প্রকাণ্ড “প্যাকিং কেসের” মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরে তখন তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছিল। শীতের প্রখর বায়ুর তীব্র স্পর্শ, প্যাকিং কেসের মধ্যে ঘনীভূত অন্ধকার! দুঃসহ শীতের হস্ত হইতে দেহরক্ষা করিবার প্রচুর শীতবস্ত্রও তাঁহার নাই। অসীম উৎকণ্ঠায় রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে আশা ও উদ্যমে বুক বাঁধিয়া রাজপথে বহির্গত হইলেন। সমস্ত রাত্রি অনাহারে যাপন করায় প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় তাঁহার সর্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্যের আশায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মলিন জীর্ণ বসন, যাতনাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিয়া কাহারও করুণার উদ্রেক হইল না। কেহ ভর্ৎসনা করিল, কেহ দ্বারদেশ হইতে দূর করিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হইল, কেহ প্রবল উপেক্ষামিশ্রিত ঘৃণায় দ্বার রুদ্ধ করিল। শ্রান্ত, ক্লান্তিজড়িত অবসন্ন দেহে বিবেকানন্দ রাজপথপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন, প্রশান্তভাবে পূর্ণ নির্ভরতা লইয়া শ্রীগুরুর স্মরণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিত সুবৃহৎ প্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এক অপূর্ব সুন্দরী রমণী ধীরে ধীরে আসিয়া স্বামিজীকে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন

“মহাশয়! আপনি কি ধর্মমহাসভার একজন প্রতিনিধি?” স্বামিজী বিস্ময়াপন্ন কণ্ঠে সংক্ষেপে স্বীয় দুরবস্থার কথা বলিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি ব্যারো সাহেবের আফিসের ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। দয়ার্দ্র-হৃদয়া মহিলা স্বামিজীকে স্বালয়ে আহবান করিয়া ভৃত্যবর্গকে তাঁহার সেবার জন্য আদে করিলেন এবং প্রাতর্ভোজন সমাপ্ত হইলে তিনি স্বয়ং স্বামিজীকে ধর্মসভা লইয়া যাইবেন বলিলেন।

ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠতম কল্পনার ন্যায় অননুভবনীয় ঘটনাবৈচিত্র্যের ম দিয়া বিবেকানন্দের প্রবাস-জীবনের আর এক অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এই সহৃদ মহিলার নাম মিসেস্ জর্জ ডব্লিউ হেইল। অযাচিতভাবে ইনি স্বামি মাতৃস্থানীয়া হইয়া তাঁহাকে প্রচারকার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। য হউক, স্বামিজী বিশ্রামান্তে ইঁহার সহিত গিয়া ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মে প্রতিনিধিরূপে পরিগৃহীত হইলেন এবং প্রতিনিধিবর্গের জন্য নির্দিষ্ট বাটীর অতিথিরূপে বাস করিতে লাগলেন।

ধর্মসভার প্রথম অধিবেশনের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া স্বামিজী স্বয়ং জনৈ শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন :—“মহাসভা খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে ‘শিল্প প্রাসাদ’ নামক বাটীতে সমবেত হইলাম।

“সেখানে মহাসভার অধিবেশনের জন্য একটি বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষু অস্থায়ী হল নির্মিত হইয়াছিল। এখানে সর্বজাতির লোক সমবেত হইয়াছিল ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন—ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাইয়ের নগরকার, বীরচাঁদ গান্ধী জৈন-সমাজের প্রতিনিধিরূপে এবং এ বেসাণ্ট ও চক্রবর্তী থিয়োজফির প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। মজুমদারে সহিত আমার পূর্বপরিচয় ছিল, আর চক্রবর্তী আমার নাম জানিতেন। ব হইতে শিল্প-প্রাসাদ পর্যন্ত খুব ধুমধামের সহিত যাওয়া হইল এবং আমাদে সকলকেই প্ল্যাটফর্মের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বসান হইল। কল্পনা করিয়া দেখ নীচে একটি হল, তাহার পর প্রকাণ্ড গ্যালারী, তাহাতে আমেরিকার বাছবা ৬।৭ হাজার সুশিক্ষিত নরনারী ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া উপবিষ্ট আর প্ল্যাটফর্মে উপর পৃথিবীর সর্বজাতির পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি, যে জন্মাবচ্ছি কখনো সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করি সঙ্গীতাদি, বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়মিত রীতিপূর্বক ধুমধামের সহিত সভা আর হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করি দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন, অবশ্য আমার বু দুরদুর করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াই গেলাম যে, পূর্বাহ্নে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলে চক্রবর্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, আমি কিছু প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ব্যারো মহোদয় আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার গৈরিকবসনে শ্রোতৃবর্গের চি কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল।

“আমি আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আরও দু’এক কথা বলি একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি ‘আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃ বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্ব হইতে লাগিল যে, কান যেন কালা করিয়া দেয়। তারপর আমি বলিতে আর

করিলাম। যখন আমার বলা শেষ হইল, আমি তখন হৃদয়ের আবেগেই একেবারে যেন অবশ হইয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজ বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে, সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধরস্বামী সত্যই বলিয়াছেন, 'মূকং করোতি বাচালং'—হে ভগবান! তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তোল। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক! সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম। আর যেদিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেইদিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে, আর কোনদিন সেরূপ হয় নাই।"

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিবস! প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিগণ একত্র সম্মিলিত,—এই বিরাট সভায় সহস্র সহস্র উন্মুখ নরনারীর সম্মুখে স্বীয় অদ্বিতীয় আশীর্বাণী উচ্চারণ করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ দণ্ডায়মান হইলেন।

থিয়োজফিষ্ট সম্প্রদায়ের নেত্রী মিসেস্ এনি বেসাণ্ট ১৯১৪ সালের মার্চ মাসের 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "মহিমময় মূর্তি, গৈরিকবসন ভূষিত, শিকাগো সহরের ধূমমলিন ধূসরবক্ষে ভারতীয় সূর্যের মত ভাস্বর, উন্নতশির, মর্মভেদী দৃষ্টিপূর্ণ চক্ষু, চঞ্চল ওষ্ঠাধর, মনোহর অঙ্গভঙ্গী—ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিগণের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ আমার দৃষ্টিপথে প্রথম এইরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া খ্যাত, কিন্তু তাহা সমর্থনীয় নহে; কারণ প্রথম দৃষ্টিতে তিনি সন্ন্যাসী অপেক্ষা যোদ্ধা বলিয়াই অনুমিত হইতেন এবং তিনি প্রকৃতই একজন যোদ্ধা সন্ন্যাসী ছিলেন। এই ভারতগৌরব, জাতির মুখোজ্জ্বলকারী সর্বাপেক্ষা পুরাতন ধর্মের প্রতিনিধি উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম সত্যের জীবন্ত-ঘন-বিগ্রহস্বরূপ স্বামিজী অন্যান্য কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। দ্রুত উন্নতিশীল, উদ্ধত পাশ্চাত্য জগতে ভারতমাতা তাঁহার যোগ্যতম সন্তানকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এই দূত তাঁহার পুণ্য জন্মভূমির গৌরবকাহিনী বিস্মৃত না হইয়া ভারতের বার্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। শক্তিমান, দৃঢ়সংকল্প, পুরুষকারসম্পন্ন স্বামিজীর স্বমত সমর্থন করিবার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল।"

"অপর দৃশ্য আরম্ভ হইল—স্বামিজী সভামঞ্চে দণ্ডায়মান হইলেন। অপরাপর শক্তিমান প্রতিভাসম্পন্ন প্রতিনিধিগণ যদিও তাঁহাদের বার্তা সুন্দর-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্য প্রচারকের অতুলনীয় আধ্যাত্মিক বার্তার মহিমার সম্মুখে সেগুলি অবনত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠোত্থিত প্রত্যেক ঝঙ্কারময় শব্দটি আগ্রহান্বিত মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিপুল জনসঙ্ঘের মানসপটে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।"

থিয়োজফিষ্ট সম্প্রদায় যদিও স্বামিজীকে পদে পদে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন এবং সর্বপ্রযত্নে তাঁহার প্রচারকার্যের বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি এই বৈদ্যুতিক শক্তিশালী তেজস্বী হিন্দু-সন্ন্যাসীর পূত প্রভাব তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাই বিবেকানন্দের মিথ্যাগ্লানি রটনা করিয়া থিয়োজফিষ্টগণ যে অগৌরব সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বহুবর্ষ পরে মিসেস্ এনি বেসাণ্ট তাহাই ক্ষালন করিবার জন্য 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় "My impressions of Swami Vivekananda and his work" নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই! এক্ষেত্রে মিসেস্ বেসান্ট যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা ও প্রচারকল্পে অনুষ্ঠিত মহাসভায় সমবেত প্রাচ্যের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও সাধনার পরিচয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিলেন এবং চিরাচরিত প্রথায় শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিলেন। বিবেকানন্দ সম্বোধন করিবার রীতি প্রথম লঙ্ঘন করিলেন। পণ্ডিতী ভাষা নহে, জনসাধারণের ভাষায়, তিনি জনগণের হৃদয়ের দ্বারে আবেদন করিলেন। "আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ"—জনতার উচ্ছ্বসিত করতালি নিস্তব্ধ হইবার পর, 'পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বিবেকানন্দ পৃথিবীর নবীনতম জাতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত অকপট প্রেম ও সত্যের বাণী গণ-নারায়ণের সম্মিলিত হৃদয়ের প্রীতি-উৎসের মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া দিল। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কোন নির্দিষ্ট ঈশ্বরের কথা তিনি বলিলেন না, সকল ধর্মের জননী-স্বরূপা সনাতন ধর্মের কথা, যাহা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বহু বৈচিত্র্যে প্রকটিত অথচ স্বরূপতঃ একই মহান সত্যের মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে—সেই সার্বভৌমিক ধর্মের কথাই তিনি বলিলেন। বিবেকানন্দের কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধির বাণী বিঘোষিত হইল। নবযুগের মানুষ নবযুগধর্ম-প্রচারক তরুণ সন্ন্যাসীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।

ভ্রাতৃ সম্বোধনে প্রীতিউৎফুল্ল নরনারী উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিল আগতপ্রায় বিংশ শতাব্দীর নবযুগের আদর্শ—সমস্ত প্রকার ধর্মদ্বন্দ্ব, স্বাধীনতার নামে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার, জাতীয়তার নামে পরস্বলোলুপতা, ধর্মের নামে পরধর্মের প্রতি অযথা আক্রমণ পরিত্যাগ! প্রত্যেকেরই জাতিগত, ধর্মগত, সমাজগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত ভাব-বিনিময় করিতে হইবে, সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী অপরের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

১৯শে সেপ্টেম্বর স্বামিজীর 'হিন্দুধর্ম' নামক প্রসিদ্ধ বক্তৃতা হইয়া যাওয়ার পর ধর্মসভার প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে কয়েকজন একটা গুজব তুলিলেন যে, উহা বর্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্ম নহে। বিবেকানন্দ যে ভাবে আত্মার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অধিকাংশ হিন্দুই অজ্ঞ। সূক্ষ্ম তর্কযুক্তির দিক দিয়া তিনি মূর্তিপূজার দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া পাশ্চাত্য জগতের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কারণ জড়োপাসক পৌত্তলিক হিন্দুগণের ঐ প্রকার ব্যাখ্যা স্বপ্নেরও অগোচর; বিশেষতঃ বিবেকানন্দ অতি নীচবংশোদ্ভব এবং জাতিচ্যুত সমাজচ্যুত নগণ্য ব্যক্তি, ধর্মালোচনা উঁহার পক্ষে অনধিকারচর্চা মাত্র। এইরূপ বিবিধ নিন্দা প্রচার করিয়া তাঁহার জনৈক স্বদেশবাসী 'রেভারেণ্ড' প্রচারক ধর্মসভার কর্তৃপক্ষকে এই অশান্ত, চরিত্রহীন বালককে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিবার পরামর্শ দিলেন। এই সময়োচিত পরামর্শে ধর্মসভার সুবিবেচক কর্তৃপক্ষ অবশ্য সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহারা স্বামিজীকে তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে প্রতিবাদী পক্ষের উত্থাপিত আপত্তিগুলি খণ্ডন করিবার জন্য আহবান করিলেন। বেদান্তদর্শনের সহিত বর্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্মের কি সম্বন্ধ আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা-সভায় আচার্যদেব ২২শে সেপ্টেম্বর এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে ভারতের 'বর্তমান ধর্ম

সমূহের আলোচনা-সভাতেও তিনি প্রতিবাদিগণের উত্থাপিত বিদ্বেষপূর্ণ যুক্তিগুলি দৃঢ়তার সহিত খণ্ডন করিয়া হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা ও বিশালতা প্রতিপন্ন করিলেন। ২৫শে তারিখ যখন তিনি 'হিন্দুধর্মের সার' নামক বক্তৃতা প্রদান করিতে করিতে সহসা নীরব হইয়া সমবেত জনসঙ্ঘকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, এই সভামধ্যে যাঁহারা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত, তাঁহারা হস্ত উত্তোলন করুন,—প্রায় সপ্ত সহস্র ব্যক্তির মধ্যে তিন-চারিখানি হস্ত উত্তোলিত হইল মাত্র। 'যোদ্ধা সন্ন্যাসী' গৈরিক-উষ্ণীষ-মণ্ডিত-শির ঊর্ধ্বে তুলিয়া দৃঢ়সম্বন্ধ বাহুদ্বয় বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া, ভর্ৎসনাদৃপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তবু তোমরা আমাদিগের ধর্ম সমালোচনা করিবার স্পর্ধা রাখ!" সমগ্র সভা কুণ্ঠিত হইয়া রহিল। ঈষৎ হাস্যে স্বামিজী পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

শিকাগো মহাসভার মূল অধিবেশন ও বৈজ্ঞানিক শাখায় স্বামিজী দশ-বারটি বক্তৃতা দেন। মানুষের জ্ঞানের সাধনা জড় ও চৈতন্য জগতে সত্যের সন্ধানে একই সার্বভৌম সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সর্বজনীন ধর্মের এই মর্মকথাই তিনি স্বীয় মৌলিক ভঙ্গীতে প্রত্যেকটি বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অবশেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার শেষ অধিবেশনে যুগধর্ম-প্রবর্তক আচার্যদেব তাঁহার সর্বশেষ বক্তৃতায় প্রত্যয়সিদ্ধকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, যাঁহারা এই সভার কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়াও কোন ধর্মবিশেষই কালে জগতের একমাত্র ধর্ম হইয়া যাইবে, অথবা কোন বিশেষধর্মই ঈশ্বরলাভের একমাত্র পন্থা এবং অন্যান্য ধর্মগুলি ভ্রান্ত, এইরূপ ভাব অন্তরের পোষণ করিবেন, তাঁহারা বাস্তবিকই করুণার পাত্র। "* * * খৃষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না, হিন্দু ও বৌদ্ধেরও খৃষ্টান হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পরস্পরের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ও প্রকাশের নিয়মানুগ হইয়া বিস্তার লাভ করিবে।

"* * * এই ধর্মমহাসভা * * প্রমাণ করিল * * * আধ্যাত্মিকতা, পবিত্রতা, এবং দাক্ষিণ্য কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের একচেটিয়া বস্তু নহে। এবং প্রত্যেক বিশেষ ধর্মসাধনায়ই মহানচরিত্র নরনারীরা আবির্ভূত হইয়াছেন। * * অতঃপর প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় * * প্রতিরোধ সত্ত্বেও লিখিত হইবে,—'যুদ্ধ নহে সাহায্য' 'ধ্বংস নহে আত্মস্থ করিয়া লওয়া', 'ভেদদ্বন্দ্ব নহে সামঞ্জস্য ও শান্তি'।"

ভাবীযুগের এই মহামিলনের বার্তা ধর্মমহাসভাকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র সভ্যজগতে বিঘোষিত হইল। আর কে কি বলিলেন, তাহা লইয়া কোন কৌতূহল দেখা গেল না। সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে বিবেকানন্দের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল, অবজ্ঞাত পরপদ-দলিত ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। খৃষ্টান ধর্ম ও খৃষ্টানী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার সমস্ত কল্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল—ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তারা বিমর্ষ হইলেন।

খৃষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতের ধর্ম ও সমাজকে যথেষ্ট উন্নত ও মার্জিত করিয়াছে বলিয়া চাটুকারসুলভ দুর্বল ও কাতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া 'করতালি' লাভ করিবার আশায় বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন নাই। তিনি গিয়াছিলেন শিক্ষাগুরুরূপে অদ্বৈতবাদের মণিময় দীপ লইয়া ভোগান্ধকারাচ্ছন্ন পাশ্চাত্য জাতিকে মুক্তিপথ দেখাইতে। নিজের ইচ্ছায় নহে, ভগবানের মঙ্গলেচ্ছার দাস হইয়া! তাঁহার বার্তা জগৎ শুনিতে বাধ্য। যাঁহারা নীচ ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া এই মহৎকার্যে বিঘ্নোৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন,

pressions of Swami Vivekananda and his work" নামক প্রব লিখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই! এক্ষেত্রে মিসেস্ বেসাণ্ট যথেষ্ট সৎসাহসের পরি দিয়াছেন এবং ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা ও প্রচারকল্পে অনুষ্ঠিত মহাসভায় সমবে প্রাচ্যের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও সাধনার পরিস পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিলেন এবং চিরাচরিত প্রথায় শ্রোতৃবৃন্দ সম্বোধন করিলেন। বিবেকানন্দ সম্বোধন করিবার রীতি প্রথম লঙ্ঘন করিলেন পণ্ডিতী ভাষা নহে, জনসাধারণের ভাষায়, তিনি জনগণের হৃদয়ের দ্বারে আবে করিলেন। "আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ"—জনতার উচ্ছ্বসিত করতা নিস্তব্ধ হইবার পর, 'পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে প্রতিনিধি বিবেকানন্দ পৃথিবীর নবীনতম জাতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত অকপট প্রেম ও সত্যের বাণী গণ-নারায়ণে সম্মিলিত হৃদয়ের প্রীতি-উৎসের মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া দিল। কোন বিশে সম্প্রদায়ের কোন নির্দিষ্ট ঈশ্বরের কথা তিনি বলিলেন না, সকল ধর্মের জন স্বরূপা সনাতন ধর্মের কথা, যাহা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বহু বৈচিত্র্যে প্রকটি অথচ স্বরূপতঃ একই মহান সত্যের মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে—সেই সার্বভৌমি ধর্মের কথাই তিনি বলিলেন। বিবেকানন্দের কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণে সাধনা ও সিদ্ধির বাণী বিঘোষিত হইল। নবযুগের মানুষ নবযুগধর্ম-প্রচার তরুণ সন্ন্যাসীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।

ভ্রাতৃ সম্বোধনে প্রীতিউৎফুল্ল নরনারী উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনি আগতপ্রায় বিংশ শতাব্দীর নবযুগের আদর্শ—সমস্ত প্রকার ধর্মদ্বন্দ্ব, স্বাধীনতা নামে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার, জাতীয়তার নামে পরস্বলোলুপতা, ধর্মের নামে পরধর্মে প্রতি অযথা আক্রমণ পরিত্যাগ! প্রত্যেকেরই জাতিগত, ধর্মগত, সমাজগত স্বাত রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত ভাব-বিনিময় করিতে হইবে, সংকীর্ণতা ত করিয়া স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী অপরের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চে করিতে হইবে।

১৯শে সেপ্টেম্বর স্বামিজীর 'হিন্দুধর্ম' নামক প্রসিদ্ধ বক্তৃতা হইয়া যাও পর ধর্মসভার প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে কয়েকজন একটা গুজব তুলিলেন যে, উ বর্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্ম নহে। বিবেকানন্দ যে ভাবে আত্মার মহিমা ঘো করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অধিকাংশ হিন্দুই অজ্ঞ। সূক্ষ্ম তর্কযুক্তির দিক দি তিনি মূর্তিপূজার দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া পাশ্চাত্য জগতের চক্ষে ধূলি নিক্ষে করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কারণ জড়োপাসক পৌত্তলিক হিন্দুগণের ঐ প্র ব্যাখ্যা স্বপ্নেরও অগোচর; বিশেষতঃ বিবেকানন্দ অতি নীচবংশোদ্ভব এবং জা চ্যুত সমাজচ্যুত নগণ্য ব্যক্তি, ধর্মালোচনা উঁহার পক্ষে অনধিকারচর্চা মাত্র। এই বিবিধ নিন্দা প্রচার করিয়া তাঁহার জনৈক স্বদেশবাসী 'রেভারেণ্ড' প্রচার ধর্মসভার কর্তৃপক্ষকে এই অশান্ত, চরিত্রহীন বালককে সভা হইতে বহিষ্ক করিবার পরামর্শ দিলেন। এই সময়োচিত পরামর্শে ধর্মসভার সুবিবে কর্তৃপক্ষ অবশ্য সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহারা স্বামিজী তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে প্রতিবাদী পক্ষের উত্থাপিত আপত্তিগুলি খণ্ডন করি জন্য আহ্বান করিলেন। বেদান্তদর্শনের সহিত বর্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্মে কি সম্বন্ধ আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা-সভায় আচার্যদেব ২২শে সেপ্টেম্বর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণে ভারতের 'বর্তমান ধ

সমূহের আলোচনা-সভাতেও তিনি প্রতিবাদিগণের উত্থাপিত বিদ্বেষপূর্ণ যুক্তিগুলি দৃঢ়তার সহিত খণ্ডন করিয়া হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা ও বিশালতা প্রতিপন্ন করিলেন। ২৫শে তারিখ যখন তিনি 'হিন্দুধর্মের সার' নামক বক্তৃতা প্রদান করিতে করিতে সহসা নীরব হইয়া সমবেত জনসঙ্ঘকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, এই সভামধ্যে যাঁহারা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত, তাঁহারা হস্ত উত্তোলন করুন,—প্রায় সপ্ত সহস্র ব্যক্তির মধ্যে তিন-চারিখানি হস্ত উত্তোলিত হইল মাত্র। 'যোদ্ধা সন্ন্যাসী' গৈরিক-উষ্ণীষ-মণ্ডিত-শির ঊর্ধ্বে তুলিয়া দৃঢ়সম্বন্ধ বাহুদ্বয় বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া, ভর্ৎসনাদৃপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তবু তোমরা আমাদিগের ধর্ম সমালোচনা করিবার স্পর্ধা রাখ!" সমগ্র সভা কুণ্ঠিত হইয়া রহিল। ঈষৎ হাস্যে স্বামিজী পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

শিকাগো মহাসভার মূল অধিবেশন ও বৈজ্ঞানিক শাখায় স্বামিজী দশ-বারটি বক্তৃতা দেন। মানুষের জ্ঞানের সাধনা জড় ও চৈতন্য জগতে সত্যের সন্ধানে একই সার্বভৌম সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সর্বজনীন ধর্মের এই মর্মকথাই তিনি স্বীয় মৌলিক ভংগীতে প্রত্যেকটি বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অবশেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার শেষ অধিবেশনে যুগধর্ম-প্রবর্তক আচার্যদেব তাঁহার সর্বশেষ বক্তৃতায় প্রত্যয়সিদ্ধকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, যাঁহারা এই সভার কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়াও কোন ধর্মবিশেষই কালে জগতের একমাত্র ধর্ম হইয়া যাইবে, অথবা কোন বিশেষধর্মই ঈশ্বরলাভের একমাত্র পন্থা এবং অন্যান্য ধর্মগুলি ভ্রান্ত, এইরূপ ভাব অন্তরের পোষণ করিবেন, তাঁহারা বাস্তবিকই করুণার পাত্র। "* * * খৃষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না, হিন্দু ও বৌদ্ধেরও খৃষ্টান হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পরস্পরের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ও প্রকাশের নিয়মানুগ হইয়া বিস্তার লাভ করিবে।

"* * * এই ধর্মমহাসভা * * প্রমাণ করিল * * * আধ্যাত্মিকতা, পবিত্রতা, এবং দাক্ষিণ্য কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের একচেটিয়া বস্তু নহে। এবং প্রত্যেক বিশেষ ধর্মসাধনায়ই মহানচরিত্র নরনারীরা আবির্ভূত হইয়াছেন। * * অতঃপর প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় * * প্রতিরোধ সত্ত্বেও লিখিত হইবে,—'যুদ্ধ নহে সাহায্য' 'ধ্বংস নহে আত্মস্থ করিয়া লওয়া', 'ভেদদ্বন্দ্ব নহে সামঞ্জস্য ও শান্তি'।"

ভাবীযুগের এই মহামিলনের বার্তা ধর্মমহাসভাকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র সভ্যজগতে বিঘোষিত হইল। আর কে কি বলিলেন, তাহা লইয়া কোন কৌতূহল দেখা গেল না। সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে বিবেকানন্দের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল, অবজ্ঞাত পরপদ-দলিত ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। খৃষ্টান ধর্ম ও খৃষ্টানী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার সমস্ত কল্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল—ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তারা বিমর্ষ হইলেন।

খৃষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতের ধর্ম ও সমাজকে যথেষ্ট উন্নত ও মার্জিত করিয়াছে বলিয়া চাটুকারসুলভ দুর্বল ও কাতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া 'করতালি' লাভ করিবার আশায় বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন নাই। তিনি গিয়াছিলেন শিক্ষাগুরুরূপে অদ্বৈতবাদের মণিময় দীপ লইয়া ভোগান্ধকারাচ্ছন্ন পাশ্চাত্য জাতিকে মুক্তিপথ দেখাইতে। নিজের ইচ্ছায় নহে, ভগবানের মংগলেচ্ছার দাস হইয়া! তাঁহার বার্তা জগৎ শুনিতে বাধ্য। যাঁহারা নীচ ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া এই মহৎকার্যে বিঘ্নোৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন,

তাঁহারা স্বদেশীয় হউন অথবা বিদেশী হউন, কিছু আসে যায় না, তাঁহাদের অযাচিত উপদেশ উদারহৃদয় মার্কিন বুদ্ধিজীবীরা গ্রাহ্য করিলেন না; তাঁহারা আগ্রহভরে নবযুগাচার্যকে আদরে ও সম্ভ্রমে বরণ করিয়া লইলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী হইতে তাঁহাদিগকে নরকভীতি, অত্যুৎকট পাপভীতি ও সুখময় স্বর্গলাভের প্রলোভন দেখানো হইয়াছে, যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহারা শুনিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহারা পাপী, অপবিত্র, অধর্ম! সহসা তাঁহারা শুনিলেন, সুদূর প্রাচ্যদেশ হইতে সমাগত আচার্য তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া অভয় দিয়া বলিতেছেন, “হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে অস্বীকার করেন। পাপী? তোমরা অমৃতের সন্তান! এই পৃথিবীতে পাপ বলিয়া কিছু নাই, যদি থাকে, তবে মানুষকে পাপী বলাই এক ঘোরতর পাপ! তুমি সর্বশক্তিমান আত্মা-শুদ্ধ, মুক্ত, মহান্! ওঠো, জাগো—স্বস্বরূপ বিকাশ করিতে চেষ্টা কর।”

মার্কিন দেশ বিবেকানন্দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। ধর্মসভার অধিবেশনে প্রথম অভিভাষণের পর হইতেই শত শত ব্যক্তি স্বামিজীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। অপরিচিত সন্ন্যাসীর নাম সমগ্র সভ্য জগতে বিদ্যুৎপ্রবাহবৎ ছড়াইয়া পড়িল। সংবাদপত্রসমূহ দুন্দুভিনিনাদে ধর্মমহাসভায় তাঁহার বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। *New York Herald* তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিলেন—‘শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দই শ্রেষ্ঠতম বিগ্রহ। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মনে হয়, ধর্মমার্গে এ-হেন সমুন্নত জাতির নিকট আমাদের ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা।’

The Press of America লিখিলেন—

“হিন্দুদর্শন ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, সমবেত পরিষদবর্গের অগ্রগণ্য প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি তাঁহার অভিভাষণ দ্বারা বিরাট সভাকে যেন সম্মোহিনী শক্তিবলে মোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্তমান প্রত্যেক খৃষ্টিয়ান চার্চের অন্তর্গত ধর্মযাজক এবং প্রচারকগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু স্বামিজীর বাগ্মিতার বাত্যাতরঙ্গে তাঁহাদের বক্তব্য বিষয়সমূহ ভাসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞানপ্রদীপ্ত সৌম্য-মুখমণ্ডল-নিঃসৃত বক্তৃতাপ্রবাহে—ইংরেজী ভাষার মাধুর্যে সুপরিস্ফুট হইয়া—তাঁহার চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসগুলি শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল।”

১৮৯৪, ৫ই এপ্রিলের *Boston Evening Transcript* মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—“He is really a great man, noble, simple, sincere, and learned beyond comparison with most of our scholars.” অর্থাৎ তিনি প্রকৃতই একজন মহাপুরুষ, উদার, সরল এবং জ্ঞানী। আমাদের বিজ্ঞব্যক্তিদিগের মধ্যে গুণগৌরবে অনেকেই তাঁহার সমকক্ষ নহেন।

মহাবোধি সোসাইটীর জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ ধর্মপাল মহোদয় ১৮৯৪, ১২ই এপ্রিলের ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

“স্বামী বিবেকানন্দের সুবৃহৎ প্রতিকৃতিসমূহ শিকাগোর পথে পথে লটকাইয়া রাখা হইয়াছে, তন্নিম্নে “সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ” লিখিত। সহস্র সহস্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পথিক এই প্রতিকৃতিগুলির প্রতি ভক্তিভরে সম্মান প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছে।”

শিকাগো মহামেলার অঙ্গীয় বিজ্ঞান সভার সভাপতি মিঃ স্নেল লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ‘পাইওনিয়র’ পত্রিকায় উক্ত মহামেলা সম্পর্কে যে বিবরণ প্রদান

করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ পড়িলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, আচার্যদেব পাশ্চাত্য সমাজ ও ধর্মের উপর কি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

"হিন্দুধর্ম এই মহাসভা এবং জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, অপর কোন ধর্মসংঘ তদ্রূপ করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দুধর্মের একমাত্র আদর্শ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দই এই মহাসভায় অবিসংবাদিতরূপে সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় এবং প্রভাবান্বিত ব্যক্তি। তিনি এই ধর্মমহামণ্ডলীর বক্তৃতামঞ্চে এবং বিজ্ঞানশাখার সভায় প্রায়শঃ বক্তৃতা করিয়াছেন; এই বিজ্ঞানশাখায় আমি সভাপতিরূপে বৃত হইয়া সম্মানিত হইয়াছিলাম। খৃষ্টিয়ান অথবা অখৃষ্টিয়ান কোন বক্তাই কোন সময়েই এমন উৎসাহের সহিত সমাদর প্রাপ্ত হন নাই। তিনি যে স্থানেই যাইতেন, তথায়ই জনতার বৃদ্ধি হইত এবং লোকে তাঁহার প্রত্যেক কথা শুনিবার জন্য সাগ্রহে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। মহাসভার পর হইতেই তিনি যুক্তরাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে বিপুল জনমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন এবং সর্বত্রই অশেষ প্রকারে অভিনন্দিত হইতেছেন। তিনি খৃষ্টিয়ান ধর্মমন্দিরের বেদীসমূহ হইতে বক্তৃতা প্রদানের জন্য বহুবার আহূত হইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন এবং বিশেষতঃ যাঁহারা তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত, তাঁহারা সর্বদাই উচ্চকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন। অত্যন্ত গোঁড়া খৃষ্টিয়ানও তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন, স্বামিজী মানুষের মধ্যে "অতি-মানুষ'।

"এতদ্দেশে হিন্দুদের কার্যকরী শক্তিগুলি, স্বামী বিবেকানন্দের পরিশ্রমে বিশেষভাবে প্রেরণালাভ করিয়াছে। বর্তমান প্রচলিত ইংরেজীভাবাপন্ন শক্তিহীন, অসার, অপ্রাকৃত হিন্দুধর্মের প্রতিবাদস্বরূপ,—প্রকৃত হিন্দুধর্মের এরূপ বিশ্বস্ত কোন প্রতিনিধি ইতোপূর্বে আমেরিকার তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগের সম্মুখে উপস্থিত হন নাই। সাময়িক উত্তেজনায় নহে—বাস্তবিকই আমেরিকাবাসী নিঃসন্দেহরূপে সত্য সত্যই স্বামিজীর প্রস্থানের পর তাঁহার পুনরাগমন প্রত্যাশায় অথবা শঙ্করমতাবলম্বী তাঁহার সহযোগীদের মধ্যে কাহারও আগমনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিবে। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত 'গোঁড়া', তাঁহাদের স্বল্প—অতি স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই স্বামিজীর কৃতকার্যতায় ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে; কিন্তু এইরূপ মন্তব্য অস্বাভাবিক এবং অপ্রচলিত ধর্মমতাবলম্বীদিগের নিকট হইতে আসিয়াছে; কিন্তু ভারতভূমির গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীর সার্বজনীন মহানুভবতা এবং সদাশয়তাগুণে, জ্ঞানগৌরব এবং ব্যক্তিগত চরিত্রমাধুর্যে অত্রত্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসা তিরোহিত ইইতেছে।

"ভারতবর্ষ স্বামিজীকে প্রেরণ করিয়াছেন—তজ্জন্য আমেরিকা ধন্যবাদ দিতেছে। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব হৃদয়-মনের উদারতা যাহারা এখনও শিক্ষা করে নাই, আমেরিকার সেই সন্তানদিগকে স্বীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে—যদি সম্ভবপর হয়—তবে স্বামিজীর মত আরও কয়েকটি আদর্শ পুরুষকে পাইবার জন্য আমেরিকা প্রার্থনা জানাইতেছে এবং যাহারা তাঁহাদের উপদেশ দ্বারা সর্বভূতে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই এবং সর্বভূতাশ্রয় অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিতে শিখে নাই, তাহাদিগকে সমুন্নত করিতে আরও কয়েকটি আদর্শ পুরুষের প্রয়োজন বোধ করিতেছে।"

এইরূপে মাসের পর মাস ধরিয়া আচার্যদেবের পবিত্র চরিত্র, অদ্ভুত প্রতিভা এবং তাঁহার প্রচারিত বার্তা সম্বন্ধে আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে যুক্তিপূর্ণ

আলোচনা প্রকাশ হইতে লাগিল। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ, খ্যাতনামা অধ্যাপকবৃন্দ, দার্শনিক, থিয়োজফিস্ট এবং সুশিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী ও সত্যান্বেষীজনগণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে দলে দলে আসিতে লাগিলেন। তিনি রাজপথে বহির্গত হইলেই সহস্র সহস্র ব্যক্তি কেবল তাঁহাকে দেখিবার জন্যই উন্মত্ত হইয়া উঠিত। বস্তুতঃ যে সম্মানের শতাংশের একাংশও একজন সাধারণ লোকের মস্তিষ্কবিকৃতি আনয়ন করিতে পারে, তিনি অবিচলিত হৃদয়ে তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন। এই জগদ্ব্যাপী খ্যাতিকে তিনি নিজস্ব বলিয়া কোনদিনই গ্রহণ করেন নাই; বরং যে সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্রোড়ে তাঁহার জন্ম, তিনি সেই সনাতনধর্মের মহিমাই, এই সমস্ত সম্মান, খ্যাতি ও যশের মধ্য দিয়া নিবিড়তরভাবে অনুভব করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন যে, কালের স্রোত ফিরিয়াছে। সভ্যজগতের নিকট পুনরায় অমৃতের বার্তা বহন করিবার জন্য ভারত প্রস্তুত হইয়াছে, আর তাহার ফলস্বরূপ তাঁহাকে এই দেশে আসিতে হইয়াছে! তিনি নিজেকে যন্ত্রস্বরূপই মনে করিতেন; কাজেই সাধারণের নিন্দাস্তুতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি নিঃসঙ্কোচে স্বীয় বার্তা ব্যক্ত করিতেন। তিনি প্রকৃতই সময় সময় ভাবাবেগে দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, “আমি সামান্য দূত মাত্র, আমার কার্য সমাচার বহন করা।”

এই দেশব্যাপী সম্মান ও প্রতিপত্তির মধ্যে, যশোলাভে উৎফুল্ল হইয়া তিনি তাঁহার প্রিয় মাতৃভূমির কথা বিস্মৃত হন নাই, হইতে পারেন না। নির্ভীক সন্ন্যাসী ধর্মমহাসভায় দাঁড়াইয়া সমগ্র খৃষ্টানগণকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিলেন যে, “দরিদ্র পৌত্তলিকগণের পাপী আত্মার উদ্ধারকল্পে তোমরা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মিশনরী প্রেরণ করিতেছ, তাহাদের দেহরক্ষাকল্পে দুমুঠো ভাতের বন্দোবস্ত করিতে পার কি? যখন লক্ষ লক্ষ ‘হিদেন’ দুর্ভিক্ষে অনাহারে মরিয়া যায়, তখন তোমরা—খৃষ্টানগণ তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য কিছু করিয়াছ কি? তোমরা ভারতের নগরে নগরে বড় বড় ভজনালয় প্রস্তুত করিয়াছ, কিন্তু ধর্ম আমাদের যথেষ্ট আছে। আমরা চাহিতেছি রুটী, তোমরা দিতেছ প্রস্তরখণ্ড! ক্ষুধিত ব্যক্তিকে, তাহার দুঃখ-কষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান বা দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতে যাওয়া, মনুষ্যত্বের অবমাননা করা নহে কি? আমি আমার স্বদেশবাসী অনাহারক্লিষ্ট জনগণের অন্নসংস্থানের আশায় তোমাদের দেশে আসিয়াছি; কিন্তু আমি বেশ বুঝিতেছি, খৃষ্টানদিগের নিকট হিদেনদিগের জন্য কোনপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা করা দুরাশা মাত্র।”

ধর্মসভা অবসান হইবার অব্যবহিত পরেই একটি ‘বক্তৃতা কোম্পানী’ স্বামিজীকে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন নগরে বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। স্বামিজী সাগ্রহে তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়া যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন নগরে বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। জনপ্রিয় আচার্যের অভিনব বার্তা আমেরিকাবাসীরা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেক নগরে সসম্মানে অভ্যর্থিত হইতে লাগিলেন এবং বহু স্থান হইতে সাগ্রহ আহ্বান আসিতে লাগিল।

উলঙ্গ, নরমাংসাহারী, অসভ্য ভারতবাসী সম্বন্ধে মিশনরী প্রভুগণের কৃপায় পাশ্চাত্য জগতের যে কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল, স্বামিজীর নিকট ভারতের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার কথা শুনিয়া অনেকেরই সে ধারণা পরিবর্তিত হইল। অনেক সুবিজ্ঞ স্বজাতিহিতৈষী পণ্ডিত ও ধর্মযাজক বিবেকানন্দের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন এবং প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন যে,

হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতার পদতলে বসিয়া শিক্ষাগ্রহণ করিবার দিন সত্যসত্যই উপস্থিত হইয়াছে। অর্থলোলুপ, জড়োপাসক, দেহাত্মবাদী পাশ্চাত্য জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে বেদান্তের অপূর্ব ধর্ম যে-কোন আকারেই হউক গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের প্রচারকরূপে পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন নাই, আচার্যরূপে তাঁহাদিগের সম্মুখে দৃপ্তসিংহের মত দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি উচ্চরবে খৃষ্টানগণকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "তোমাদের খৃষ্টধর্ম কোথায়? এই স্বার্থ-সংগ্রাম, অবিরাম ধ্বংসের চেষ্টার মধ্যে যীশুখৃষ্টের স্থান কোথায়?"

যুক্তরাজ্যের প্রতি নগরে তিনি বহু সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন; এমনকি অনেক ধর্মযাজক পর্যন্ত তাঁহার ধর্মব্যাখ্যায় চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে স্ব স্ব ভজনালয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সাধারণের শ্রদ্ধা বা দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যদি তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগরিমা কীর্তন করিয়া শ্রুতিমধুর চাটুবাক্য উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইত কি না সন্দেহ—এমন কি হয়তো তাঁহার প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইত। তিনি অদ্বৈতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া বেদান্ত-নিহিত সার সত্যগুলি আধুনিক মনের উপযোগী যুক্তিমণ্ডিত করিয়া সরলভাবে প্রকাশ করিতেন, তাহার মধ্যে দেশাচার ও লোকাচারের সহিত আপোষের ভাব বিন্দুমাত্র পরিলক্ষিত হইত না। তিনি গ্রাহ্য করিতেন না—বিদেশীরা তাঁহার বার্তা কিভাবে গ্রহণ করিবে, অথবা উহা শ্রবণ করিয়া তাহাদের মনে কি ভাবের উদয় হইবে। অনেক সময় তাঁহার নির্ভীক সমালোচনায় বিরক্ত হইয়া অনেকে তাঁহার সহিত তর্কে অগ্রসর হইতেন, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আত্মমত সমর্থনকল্পে স্বামিজী কখনও অপ্রস্তুত থাকিতেন না। বক্তৃতার পর প্রায়ই তিনি এইরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহূত হইতেন। স্বামিজীর তর্ক করিবার প্রণালী সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া *Java State Register* লিখিয়াছেন—

> যে স্বামিজীকে তর্কযুক্তি দ্বারা পরাজিত করিবার প্রয়াসী হইয়াছে, সে দুর্ভাগার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যুত্তর বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ সমুদ্গীর্ণ হইত এবং দুঃসাহসিক প্রশ্নকর্তা ভারতীয় ক্ষুরধার বুদ্ধিদ্বারা আহত হইয়া স্তম্ভিতবৎ প্রতীয়মান হইতেন। তাঁহার মানসিক কার্যপ্রণালী এমন তীক্ষ্ণ, এমন সমুজ্জ্বল, এমন তত্ত্বপরিপূর্ণ, এমন সুমার্জিত যে, তাহা সময়ে সময়ে শ্রোতৃবৃন্দকে তড়িতাহতবৎ করিত এবং অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সর্বদাই অনুধাবন করিবার বিষয় হইয়া থাকিত।

অন্তরের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া, সত্যকে টানিয়া বুনিয়া বিকৃতভাবে প্রকাশ করিবার প্রয়াস কখনও তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত না, কাজেই তাঁহার সমালোচনাগুলি সময় সময় তীব্র ও অসহনীয় বলিয়া বোধ হইত। যীশুখৃষ্ট ও তাঁহার উপদেশের প্রতি স্বামিজীর যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও তিনি বর্তমান প্রচলিত খৃষ্টধর্মের দোষ, ত্রুটী ও ভণ্ডামীগুলিকে উজ্জ্বল অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেন। স্বামিজীর এই নির্ভীক সমালোচনায় চিন্তাশীল ভাবুক মাত্রেই সন্তুষ্ট হইতেন; কিন্তু জগতের সকলেই উদারহৃদয় এবং সৎসমালোচনা শুনিবার জন্য প্রস্তুত নহেন। সমগ্র যুক্তরাজ্যব্যাপী তাঁহার অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা দর্শনে

এবং অর্থোপার্জনের বিঘ্নস্বরূপ মনে করিয়া কতিপয় হীনচেতা খৃষ্টান মিশনরী নগরে নগরে তাঁহার কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং তাঁহার প্রত্যেক বন্ধুকে শত্রুরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা কেবলমাত্র স্বামিজীর পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, অধিকন্তু সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকগণকে অর্থপ্রদানে বশীভূত করিয়া স্বামিজীকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। থিয়োজফিষ্ট নেতাগণ এই সমস্ত মিশনরিগণের পশ্চাতে থাকিয়া ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। বিবেকানন্দের অপরাধ —তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন: ভারতীয় ঋষিগণের কোন গুপ্তবিদ্যা নাই, আকাশে উড্ডীয়মান খেচরবৃত্ত্যবলম্বী কোন মহাত্মার সহিত হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। বিশেষতঃ হিন্দুধর্মে গুপ্ত বা গোপনীয় কিছুই নাই, যেহেতু উহা যুক্তিসহ সত্যসমষ্টি, প্রকাশ্য দিবালোক অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। যাহা হউক, থিয়োজফিষ্টদের বিবেকানন্দভীতি ক্রমে এতদূর বর্ধিত হইল যে, তাঁহারা প্রচার করিয়া দিলেন, সমিতির সভ্যগণ যদি কেহ ভ্রমেও বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে যায়, তাহা হইলে সে সমিতির সর্বপ্রকার সহানুভূতি হারাইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর সুযোগ বুঝিয়া এই হীনকার্যে যোগ দিলেন তাঁহার স্বদেশবাসী জনৈক খ্যাতনামা "রেভারেন্ড" ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক। ইনি নানাপ্রকার স্বকপোলকল্পিত জঘন্য অপবাদ রটনা করিয়া স্বামিজীকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া স্বামিজীকে প্রচারকার্যে নিরস্ত করিবার জন্য ভয় প্রদর্শন করিতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হন নাই।

বিবেকানন্দের আপনাতে-আপনি অটল চরিত্র নিন্দুকের শ্লেষ ও কুৎসাবাক্যে বিচলিত হইবার বস্তু নহে। তিনি নির্বিকার চিত্তে নীরবে আপন কার্য করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা না করিয়া কেবল বলিতেন, "সাধারণ মানবের কর্তব্য তাহার ঈশ্বরস্বরূপ সমাজের আদেশ পালন করা, জ্যোতির তনয়গণ (Children of Light) কখনও সেরূপ করেন না। ইহাই সনাতন নিয়ম। একজন নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক মতামতের সহিত খাপ খাওয়াইয়া, তাহার সর্বশুভদাতা সমাজের নিকট হইতে বিবিধ সুখ-সম্পদ প্রাপ্ত হয়। অপর ব্যক্তি একাকী দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া সমাজকে তাঁহার দিকে তুলিয়া ধরেন। আমার অন্তরলোকের সত্যের বাণী না শুনিয়া আমি কেন বাহিরের লোকের খেয়াল অনুসারে চলিতে যাইব? এই নির্বোধ জগৎ আমাকে যাহা যাহা করিতে বলিতেছে, তাহা করিতে গেলে আমাকে এক নিম্নস্তরের জীব বিশেষে পরিণত হইতে হইবে, তদপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়। আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা আমি নিজের ভাবেই বলিব। আমি আমার বাক্যগুলি হিন্দু ছাঁচেও ঢালিব না, খৃষ্টানী ছাঁচেও ঢালিব না বা অন্য কোনও ছাঁচেও ঢালিব না। আমি উহাদিগকে শুধু নিজের ছাঁচে ঢালিব—এইমাত্র।"

স্বামিজীর বিরুদ্ধে এই সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা স্বামিজীকে সাবধান হইবার পরামর্শ দিলেন এবং স্থানীয় কোনপ্রকার সামাজিক ব্যবহারের সমালোচনা করিতে নিষেধ করিলেন ও সুমিষ্ট বাক্যে সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট প্রকৃতি দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গঠিত হইয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই, এ সমস্ত নীচ ষড়যন্ত্রকারীদের প্রাণপণ চেষ্টাগুলি প্রচণ্ড অবহেলাভরে উপেক্ষা করিয়া তিনি জনৈক সহৃদয়া মহিলাকে লিখিতেছেন—

“* * * কী? সংসারের ক্রীতদাসসমূহ কি বলিতেছে, তদ্দ্বারা আমার হৃদয়ের বিচার করিব! ছিঃ! ভগ্নী, তুমি সন্ন্যাসীকে চেন না। বেদ বলেন, ‘সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ”, কারণ তিনি গীর্জা, ধর্মমত, ঋষি (Prophet) শাস্ত্র প্রভৃতি ব্যাপারের কোন ধার ধারেন না। মিশনরী কিম্বা অন্য যে-কেহ হউক, তাহারা যথাসাধ্য চীৎকার ও আক্রমণ করুক, আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করি না।”

ভর্তৃহরির ভাষায়—

“চণ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শূদ্রোঽথবা তাপসঃ
কিংবা তত্ত্ববিবেকপেশলমতির্যোগীশ্বরঃ কোঽপি কিম্।
ইত্যুৎপন্ন বিকল্পজল্পমুখরৈঃ সম্ভাষ্যমানা জনৈ—
র্নক্রুদ্ধাঃ পথি নৈব তুষ্টমনসো যান্তি স্বয়ং যোগিনঃ॥”

ইনি কি চণ্ডাল অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা শূদ্র, অথবা তপস্বী, অথবা তত্ত্ববিচারে পণ্ডিত কোন যোগীশ্বর? এইরূপে নানা জনে নানা আলোচনা করিতে থাকিলেও যোগিগণ রুষ্টও হন না, তুষ্টও হন না, তাঁহারা আপন মনে চলিয়া যান।

তুলসীদাসও বলিয়াছিলেন—

“হাথী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁখে হাজার,
সাধুওঁকা দুর্ভাব নহী যব নিন্দে সংসার।”

যখন হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তখন হাজার কুকুর পিছু পিছু চীৎকার করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু হাতী ফিরিয়াও চাহে না। সেইরূপ যখন সমাজে কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, তখন একদল সংসারী লোক ক্রমাগত তাঁহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে থাকে।

সহিষ্ণু কাঠিন্যে দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীরের মত তাঁহার সুদৃঢ় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সর্বদা, সকল অবস্থায়, মস্তক উন্নত করিয়া থাকিত; তাঁহার ত্যাগপূত মহিমা একান্ত অপরিচিত ব্যক্তির স্থূলদৃষ্টিতেও অনাড়ম্বরে প্রতিভাত হইত; কাজেই জনসাধারণ ঐ সমস্ত কল্পিত নিন্দায় সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না; বরং উহার দ্বারা বিপরীত ফলই ফলিল, অনেকেই বিবেকানন্দের চরিত্র ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার বন্ধু হইয়া পড়িলেন। তবুও আচার্যদেবের চরিত্রের আর একটা দিক্ ছিল, যাহা অপূর্ব ও মনোহর। অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত ও নিন্দিত হইয়াও তাঁহার জিহ্বা ভ্রমেও কখনও কাহারও উপর অভিশাপ বর্ষণ করে নাই। যদি দৈবাৎ কেহ তাঁহাকে গালি দিত, তখন গম্ভীরভাবে “শিব” “শিব” বলিতে বলিতে তাঁহার বদন-মণ্ডল স্নিগ্ধ গাম্ভীর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; যদি কেহ তাঁহাকে প্রতিবাদ করিবার কথা ক্ষুব্ধ-উত্তেজনা-বশে স্মরণ করাইয়া দিত, তিনি সস্নেহহাস্যে উত্তর দিতেন, “ইহা তো শুধু প্রিয়তম প্রভুরই বাণী।”

যেদিন শিকাগো ধর্মমহাসভায় আচার্যদেবের অদ্ভুত সাফল্যের বার্তা ভারতবর্ষের নগরে নগরে আলোচিত হইতে লাগিল, সে দিন হইতে ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হইল। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত শিক্ষিত ভারতবাসী এই অপরিচিত বীর সন্ন্যাসীর কার্যাবলীর বিবরণ কৌতূহল-মিশ্রিত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। রামনাদাধিপ রাজা ভাস্কর বর্মা সেতুপতি ও খেতরির রাজা বাহাদুর—রাজ-শিষ্যদ্বয় প্রকাশ্য দরবারে আড়ম্বরের সহিত প্রজাবৃন্দকে আহ্বান করিয়া ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বলকারী শ্রীগুরুর কার্যাবলীর প্রশংসা করিলেন এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিলেন।

মাদ্রাজের রাজা স্যার রামস্বামী মুধলিয়ার ও দেওয়ান বাহাদুর স্যার* সুব্রাহ্মণ্য আয়ারের নেতৃত্বে এক মহতী সভা আহূত হইল। খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া স্বামিজীর প্রচারকার্যের সমর্থন করিলেন এবং উক্ত সভার রিপোর্টসহ তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া এক পত্র লেখা হইল।

স্বামিজীর জন্মভূমি কলিকাতা সহরের শিক্ষিত সমাজেও উৎসাহ ও আনন্দ পরিলক্ষিত হইল। স্বামিজীর মহিমাসমুজ্জ্বল প্রচার-কার্য সমর্থন করিয়া তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বুধবার রাজা প্যারীমোহন মুখার্জীর সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভা আহূত হইল। সভারম্ভের নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্বে টাউনহল সহস্র সহস্র দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, মধুসূদন স্মৃতিতীর্থ, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, মহেশচন্দ্র শিরোমণি, তারাপদ বিদ্যাসাগর, কেদারনাথ বিদ্যারত্ন, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গ ও মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব, জজ গুরুদাস ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (সম্পাদক, Indian Nation), নরেন্দ্রনাথ সেন (Indian Mirror), ডাক্তার জে. বি. ডেলী (Indian Daily News), ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী) এবং কলিকাতা সহরের খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও বিদ্বন্মণ্ডলী সমাগত হইয়াছিলেন।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ বিবেকানন্দের গৌরবগর্বে উৎফুল্ল হইয়া উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা আচার্যদেবের কার্যপ্রণালী সমর্থন করিলেন। সমগ্র সভা একবাক্যে হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে বিবেকানন্দ স্বামীকে ধন্যবাদ দিবার জন্য উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সভাপতি মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে শিকাগো ধর্মসভার সভাপতি ও স্বামিজীর নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন।

রাজাবাহাদুরের পত্রোত্তরে ডাক্তার ব্যারোজ লিখিয়াছিলেন—

(অনুবাদ)

২৯৫৭, ইণ্ডিয়ানা এভেনিউ, শিকাগো
১২ই অক্টোবর, ১৮৯৪

রাজা প্যারীমোহন মুখার্জী, সি-এস-আই
প্রিয় মহাশয়!

কলিকাতার টাউনহলে বিরাট সভার বিবরণসহ আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমি এইমাত্র পাইলাম। আমি ইহাতে সাতিশয় সম্মানিত হইয়াছি। শিকাগোর ধর্মমহামণ্ডলীতে আপনার বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দ সসম্মানে গৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি বাগ্মিতাশক্তিতে চুম্বকাকর্ষণের ন্যায় সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এবং স্বীয় ব্যক্তিগত প্রভাব সম্যক্‌রূপে বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে, ধর্মানুশীলনে লোকের চিন্তা ও আগ্রহ বিশেষভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছে। প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতা এবং অধ্যাপনার বন্দোবস্ত হইতেছে, আমেরিকার জনমণ্ডলী

---

* সুব্রাহ্মণ্য আয়ার পরে ভারতবাসীর প্রতি বৃটিশ সরকারের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীর প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতা পোষণ করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস যে, আপনাদের সুপ্রাচীন পবিত্র সাহিত্য হইতে আমাদিগকে অনেক বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত,
জন হেনেরী ব্যারোজ

১৮৯৪, ১৮ই নবেম্বর নিউইয়র্ক হইতে স্বামিজী অভিনন্দনের উত্তরে রাজা প্যারীমোহনের নিকট লিখেন—

'কলিকাতা টাউনহলের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব আমি পাইয়াছি। আমার জন্মভূমির অধিবাসীদের সদয় বাক্যে এবং আমার সামান্য কার্যের সহৃদয় অনুমোদনের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

"আমি ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছি, কোন ব্যক্তি বা জাতি, অন্যান্য সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না। ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অথবা পবিত্রতাবোধ হইতে যেখানেই ঐরূপ চেষ্টা হইয়াছে সেখানেই ফল অতি শোচনীয় হইয়াছে। আমার মনে হয়, অপরের প্রতি ঘৃণার ভিত্তিতে কতকগুলি প্রথার প্রাচীর তুলিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনই ভারতের পতন ও দুর্গতির কারণ। অতীতকালে পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধসম্প্রদায়গুলির সংমিশ্রণ হইতে হিন্দুদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্যই ঐ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থাকে অতীত ও বর্তমানে যে কোন ভ্রান্ত যুক্তিদ্বারা উহার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস হউক না কেন, যে অপরকে ঘৃণা করিবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, ইহা অলঙ্ঘনীয় নীতি। তাহার ফলে, প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে যাহারা সর্বাগ্রগামী ছিল—আজ তাহারা জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে—তাহারা আজ সকলের ঘৃণার পাত্র। আমাদের পূর্বপুরুষগণের ভেদনীতির ফলে কি অবস্থা হইয়াছে, আমরা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

"আদানপ্রদান জগতের নিয়ম। ভারতবর্ষ যদি আবার উঠিতে চায়, তাহা হইলে তাহার গুপ্তভাণ্ডারে যাহা সঞ্চিত আছে, তাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে এবং বিনিময়ে অন্যে যাহা দিবে তাহা গ্রহণ করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু; প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু। আমরা সেইদিন হইতেই মরিতেছি, যেদিন আমরা অন্যান্য জাতিকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলাম এবং সম্প্রসারণ ব্যতীত আমাদের এই মৃত্যু কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে জগতের সকল জাতির সহিত মিলামিশা করিতে হইবে। যে কোন হিন্দু, যে বিদেশে যায়, সে গৌণভাবে দেশের হিতসাধন করিয়া থাকে এবং তুলনায় সে শত শত কুসংস্কার ও স্বার্থপরতার সমষ্টিমূর্তি ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, ঐ লোকগুলি নিজেও জড়বৎ থাকিবে অপরকেও কিছু করিতে দিবে না। পাশ্চাত্য জাতিগুলি জাতীয় জীবনের যে আশ্চর্য সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা চরিত্ররূপ দৃঢ় স্তম্ভগুলির উপর রক্ষিত। যতদিন আমরা ঐরূপ চরিত্র সৃষ্টি করিতে না পারিতেছি, ততদিন উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করা বৃথা।

"যে অপরকে স্বাধীনতা দিবার জন্য প্রস্তুত নহে, সে কি স্বাধীনতালাভের যোগ্য! অনাবশ্যক হা-হুতাশ এবং বিলাপ না করিয়া আসুন আমরা দৃঢ়চিত্তে মানুষের মত কাজে লাগিয়া যাই। আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, যে বস্তু যাহার সত্যকার প্রাপ্য, তাহা হইতে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। আমাদের অতীত মহৎ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমাদের ভবিষ্যৎ মহত্তর

হইবে সন্দেহ নাই। শঙ্কর আমাদিগকে পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ রাখুন।"

শিকাগো ধর্মমহাসভার অব্যবহিত পর হইতে প্রায় এক বৎসরকাল পর্যন্ত আচার্যদেব যুক্তরাজ্যের নগরে নগরে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণ প্রকাশ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত তাঁহার বক্তৃতা ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনাগুলি হইতে আমরা জানিতে পারি, ১৮৯৪, ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ডিট্রয়েটের ইউনিটেরিয়ান চার্চে ধারাবাহিকরূপে কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজী ডিট্রয়েটের প্রধানতঃ মিশিগণের ভূতপূর্ব গবর্ণর-পত্নী মিসেস জন্. জে. ব্যাগলীর অতিথিরূপে এবং পরে দুই সপ্তাহকাল শিকাগো মহামেলা কমিশনের সভাপতি, যুক্তরাজ্যের অন্যতম সেনেটর টমাস্ ডব্লিউ পামারের ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

মার্চ এপ্রিল মে ও জুন, এই চারিমাসকাল তিনি অবিরাম শিকাগো, নিউ-ইয়র্ক এবং বোষ্টনের চতুষ্পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র-বৃহৎ নগরগুলিতে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। জুন মাসে তিনি নিউ ইংলণ্ডের 'গ্রীণএকারে' একটি কনফারেন্সে বক্তৃতা করিবার জন্য গমন করেন। তথায় কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র বেদান্তদর্শন শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। স্বামিজীও আগ্রহের সহিত তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। এই ছাত্রগণ তাঁহাদের অধ্যাপকের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য বৃক্ষতলে ভারতীয় রীতির অনুকরণ করিয়া ভূমিতলে আচার্যদেবকে ঘিরিয়া উপবেশন করিতেন। ইহার পর তিনি সমস্ত শরৎকাল বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করিয়া অক্টোবর মাসের শেষভাগে বাল্টীমোর ও ওয়াশিংটন নগরে বক্তৃতা প্রদান করিয়া নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন। নিউইয়র্কের একটি ক্ষুদ্র পারিবারিক সভায় 'ব্রুকলিন নৈতিক সভা'র সভাপতি প্রসিদ্ধ ডাক্তার লুইস্ জি. জেনস্, স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং উক্ত নৈতিক সভার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য স্বামিজীকে আহ্বান করিলেন। সভার পক্ষ হইতে স্বামিজী 'পউচ ম্যানসন' নামক সুবৃহৎ ভবনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সহস্র সহস্র শ্রোতার সম্মুখে প্রত্যহ ধারাবাহিকরূপে বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন।

ব্রুকলিন নৈতিক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিই স্বামিজীর বেদান্ত-প্রচারকার্যের আরম্ভ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। এই সময় হইতেই স্বামিজী নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে নিরস্ত হইলেন এবং নিউইয়র্কে স্থায়িভাবে বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দিবার জন্য একটি ক্লাস খুলিতে সঙ্কল্প করিলেন। বক্তৃতা কোম্পানীর সাহায্যে বক্তৃতা প্রদান ব্যবসায় হিসাবে খুব লাভজনক হইলেও তিনি উক্ত কোম্পানীর সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। বক্তৃতা প্রদান করিয়া অর্থোপার্জন করা তাঁহার মনঃপূত ছিল না। নিউইয়র্কে আসিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে জনসাধারণ বিনামূল্যেই তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবেন। ব্রুকলিন ও গ্রীণএকারে স্বামিজী যে কয়েকজনকে শিষ্যপদে বৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারা আগ্রহের সহিত নব-প্রতিষ্ঠিত ক্লাসে যোগদান করিলেন। ১৮৯৫-এর ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এই কার্য নিয়মিতরূপে আরম্ভ হইল। ক্রমাগত যশ ও খ্যাতির বিবরণ শুনিতে শুনিতে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কাজেই বক্তৃতা করা অপেক্ষা ব্যক্তি-বিশেষের ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্যা ভঞ্জন করিয়া দেওয়া এবং শিষ্যগণের অনভ্যস্ত মনকে ভারতীয় সাধনার উপযোগী করিয়া তুলিতেই সমধিক যত্নবান হইলেন।

সাধারণের সাগ্রহ আহ্বান হইতে নিষ্কৃতি পাইতে তাঁহাকে সমধিক বেগ পাইতে হইল, কিন্তু তথাপি তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। যদি বাস্তবিকই কাহারও প্রকৃত ধর্মলাভ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহ জাগিয়া থাকে, তবে সে ভারতীয় শিষ্যের ন্যায় গুরুসদনে আগমন করুক, ইহাই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বক্তৃতার সাময়িক উত্তেজনায় যে উৎসাহ দেখা যায়, তাহা অতি অল্প স্থানেই স্থায়ী ফল প্রসব করে, ইহাও আচার্যদেব অনতিবিলম্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

অক্লান্তকর্মা আচার্যদেবের প্রত্যেকটি ভঙ্গীর মধ্যেই এমন একটা দৃশ্যমান অনাসক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিত, যাহার একটা সুস্পষ্ট হেতু খুঁজিয়া পাওয়া আমেরিকানদের পক্ষে অসাধ্য ছিল; কারণ তাহাদের জাগতিক জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়া তাহারা এই ভারতীয় যোগীকে মাপিতে গিয়া প্রথমেই একটা ভুল করিয়া বসিত যে, এই ব্যক্তি অর্থোপার্জনের সহজ পন্থাটি পরিত্যাগ করিয়া বড় ভাল কাজ করেন নাই। বক্তৃতা দিয়া স্বামিজী সময় সময় প্রচুর অর্থ পাইতেন বটে, কিন্তু তাহা হস্তগত হইবার পূর্বেই দান করিয়া বসিতেন। আমেরিকার ও ভারতবর্ষের অনেক দাতব্য ভাণ্ডার স্বামিজীর নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে আশাতীত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অনেক সময় বিস্মিত হইয়াছেন। স্বামিজীর আয়ব্যয় হিসাব-নিকাশের যদি একখানি খাতা থাকিত, তাহা হইলে আমরা দেখিতাম, যে অনুপাতে দান করিলে এ সংসারে দাতা বলিয়া পরিচিত হওয়া যায়, তিনি তাহার গণ্ডী ছাড়াইয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইখানে আমরা দেখিতে পাই, পাশ্চাত্যের মোহময়ী বিলাসের মরীচিকা, প্রবল অর্থলালসা তাঁহার সন্ন্যাসকে বিচলিত করিতে পারে নাই। যে সমাজে প্রতিপদে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সেই সমাজের বক্ষেই তিনি কাল কোথায় থাকিবেন, কি খাইবেন, না ভাবিয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া দিয়াছেন। প্রথম প্রথম হুজুগে মাতিয়া আমেরিকাবাসী তাঁহার প্রশংসাধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিলেও অল্প লোকই ধর্মশিক্ষার্থে শিষ্যরূপে তাঁহার পদতলে উপবেশন করিয়াছেন। তাঁহার গুণমুগ্ধগণ তাঁহাকে বন্ধুভাবেই সম্মান করিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন; গুরুরূপে, আচার্যরূপে ভক্তি করেন নাই; কিন্তু যখন বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহার বাক্য ও কার্যের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই, তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে পাইয়াছেন, যিনি তথাকথিত ঐন্দ্রিয়িক ভোগসুখকে তৃণবৎ জ্ঞান করেন; আদর প্রতিপত্তি সম্মান যশ অর্থ কিছুতেই যাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় না। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, এই অদ্ভুত পুরুষ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাদের কল্যাণকামনায় হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্মের অগাধসমুদ্রমথিতসুধা, অদ্বৈতামৃত লইয়া তাঁহাদের দ্বারদেশে উপস্থিত, তখনই না তাঁহার পদতলে বসিয়া ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন!

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, যদিও শিকাগো মহাসভার পর হইতেই বিবেকানন্দ একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি বেদান্ত-প্রচারকার্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাকে অনেক অসম্ভবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর জগজ্জননী তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে বিরাট সভামধ্যে দাঁড় করাইয়া ভাবী শতাব্দীর চিন্তারাজ্যে একজন অপ্রতিহত যোদ্ধার পদ প্রদানপূর্বক মহিমাসমুন্নত শিরে যেমন 'যশের কণ্টকমুকুট' পরাইয়া দিয়াছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাকী জীবনটুকু যথাসাধ্য কণ্টকাকীর্ণ, বাধা ও বিপত্তিবহুল করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার সভ্য ও অর্ধসভ্য জাতি সমবায়ে গঠিত মার্কিন

জাতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অন্ধ কুসংস্কার, অসার অহঙ্কার, উদ্দাম ভাব-প্রবণতা, অব্যবস্থিত-চিত্ততা বিদেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই আমেরিকায় পদার্পণ করিবামাত্র বুঝিতে পারিতেন। যে কোন প্রকার নূতন মতবাদ বা ধর্ম হউক না কেন, তাহা যুক্তিপূর্ণই হউক বা ভ্রমপ্রমাদের সমষ্টিই হউক, তাহার সমর্থক আমেরিকায় মিলিবেই মিলিবে। যে-কোন প্রকারেই হউক, জনকতক লোকের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারিলে অর্থোপার্জনের একটা সুগম পন্থা নির্মাণ করিয়া লওয়া যায়। আমেরিকাবাসীর এই দুর্বলতাকে সুলভ মৃগয়ায় পরিণত করিয়া ধর্মতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, ভৌতিক কান্ড—মহাত্মাগণের জলে, স্থলে, শূন্যে অবাধ বিচরণ ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় মতবাদ পূর্ব হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল এবং প্রচুর অর্থ দক্ষিণা দিয়া স্থূলদৃষ্টি অন্ধবিশ্বাসী নরনারী পরলোকের বার্তা জানিবার জন্য ঐ সমস্ত অলৌকিক রহস্যজড়িত সমিতির সভ্য হইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিত। পারিপার্শ্বিক এইরকম অবস্থার মধ্যে বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে যুক্তিপন্থী বিবেকানন্দকে যে কি অসীম ধৈর্যসহকারে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা অল্পায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

এই সমস্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত, অলৌকিক রহস্যের পশ্চাতে ধাবমান নরনারীর মধ্য হইতে প্রকৃত সত্যতত্ত্বান্বেষী ও ঈশ্বর-লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বহু আয়াসসহকারে বাছিয়া বাহির করিয়া তবে বিবেকানন্দ শিক্ষাদান-কার্যে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঐ সমস্ত সমিতির কর্তৃপক্ষগণ বিবেকানন্দকে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিবার জন্য প্রথমে প্রলোভন ও অনুরোধ, অবশেষে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাঁহার মতে বা কার্যে বা চিন্তায় 'গুপ্ত' বিষয় কিছুই ছিল না; তিনি নির্ভীকভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন, "আমি সত্যাগ্রহী ও সত্যের উপাসক; সত্য কখনও কোন অবস্থায় মিথ্যার সহিত সন্ধি করিবে না। যদি সমগ্র- জগৎ আজ একমত হইয়া আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলেও সত্যই বলবত্তর থাকিবে।"

তাহার পর খৃষ্টান মিশনরিগণ! ইঁহারা বিবেকানন্দ প্রচারিত ধর্মমত, তর্ক ও যুক্তি দ্বারা খন্ডন করিতে না পারিয়া প্রতিপদে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। যে-কেহ তাঁহার বন্ধু হইল, তাঁহাকেই শত্রু করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হয়ত কোন পরিবারে ধর্মোপদেশ দিবার জন্য স্বামিজী আহূত হইয়াছেন, ইঁহারা পূর্বাহ্ণে তাহা জানিতে পারিয়া ঐ পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন যে, উঁহার কথার ও কার্যের মিল নাই, উঁহার চরিত্র এই প্রকার—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহারা সেইসব কথা শুনিয়া কেহ বা পত্র লিখিয়া নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতেন; কোন স্থানে স্বামিজী গিয়া দেখিতেন যে, বাড়ীর লোকজন দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। অথবা এমন ঘটনা ঘটিত যে, ঐ সকল ব্যক্তিই নিজেদের ভুল স্বীকার করিয়া স্বামিজীর নিকট আসিয়া অনুতাপ করিত। স্বামিজীর আমেরিকান শিষ্য ও শিষ্যাগণের মধ্যে এরকম ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। যাহা হউক, এই মিশনরী প্রভুগণ প্রকারান্তরে স্বামিজীর প্রচারকার্যের সুবিধাই করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু নিউইয়র্কে ধর্মপ্রচার-কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে স্বামিজীকে অপর এক প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের সম্মুখীন হইতে হইল। ইঁহারা আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ (স্বাধীন-চিন্তাবাদী) 'Free-Thinkers' । এই দলের মধ্যে নাস্তিক জড়বাদী, সন্দেহবাদী, যুক্তিবাদী—বিভিন্ন প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তি থাকিলেও

বা তৎসংশিলষ্ট ব্যাপারমাত্রকেই জুয়াচুরি ও কুসংস্কার জ্ঞানে উপেক্ষা করিবার সময় সকলেই একমত। ইঁহারা দম্ভসহকারে একদিন বিবেকানন্দকে তাঁহাদের সমাজগৃহে বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

স্বামিজী তাঁহাদিগের উত্থাপিত যুক্তিগুলি খন্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিলেন। এই বিচারের সুবিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা অনাবশ্যক। তারপর হইতেই আমরা দেখিতে পাই, অনেক 'Free-Thinker' স্বামিজীর উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। 'Free-Thinker'-গণ নীরব হইবার পরেই বিবেকানন্দের প্রচারকার্য নির্বিঘ্নে ক্ষিপ্রতার সহিত প্রসারলাভ করিয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমান করা যায়, বিবেকানন্দের প্রচারকার্যের ইতিহাসে ইহা সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা।

স্বামিজীর ধর্মপ্রচারকল্পে পাশ্চাত্যদেশে গমনের কারণ সম্বন্ধে আমরা ইতোপূর্বে যথাস্থানে অনেক কথাই বলিয়াছি, তথাপি আর একটি কথা বলা এস্থলে একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। একদল লোক বলেন, হিন্দুধর্ম কোনদিনই প্রচারশীল ধর্ম নহে এবং বিবেকানন্দের আমেরিকা বা পাশ্চাত্যদেশে গমন ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের অনুকরণ মাত্র। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার বিবেকানন্দের মধ্যে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের বহু প্রভাবও দেখিতে পান।

বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে গমন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি যদি কেবলমাত্র ব্যক্তি-বিশেষের অনুকরণরূপে দেখিয়াই ক্ষান্ত না হইত, তাহা হইলে দেখিত, নিখিল-ধর্মমতসমূহের জননী-স্বরূপা ভারতবর্ষ বহুবার জগৎকে তাহার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দান করিয়াছে; দেখিত, যখন কোন শক্তিমান জাতি জাগ্রত হইয়া পৃথিবীকে এক অখন্ড রাজনৈতিক সূত্রে বাঁধিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছে, তখন সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া ভারতীয় চিন্তাসমূহ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রীক, রোমক, ব্যাবিলন ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার গঠনকল্পে ভারত কি কি উপাদান প্রদান করিয়াছিল, তাহাও সূক্ষ্মদৃষ্টি চিন্তাশীল ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। বৌদ্ধধর্মের জগৎ, উপপ্লাবন, অশোকের ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ, ইহাও ঐতিহাসিক ঘটনা। ঠিক সেই কারণেই, যখন তমোভাব-বহুল রজঃশক্তি সহায়ে বলদৃপ্ত পাশ্চাত্য জাতিসমূহ জাতিগত স্বার্থ-সাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমগ্র জগতে এক যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল, তখন বহুদিবস পরে ভারত এই অভিনব সভ্যতাভান্ডারে স্বীয় যুগযুগান্তরের সঞ্চিত চিন্তাসমূহ দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। আর সেই চেষ্টারই প্রথম ফল, বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে গমন। অতএব উহা আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষের অনুকরণ বলিয়া ভ্রম হইলেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আর পাশ্চাত্যদেশে গমন ব্যাপারটা যদি অনুকরণই হইয়া থাকে, তথাপি প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই দেখিতে পাইবেন যে, বিবেকানন্দ কোনক্রমেই রামমোহন বা কেশবচন্দ্রের প্রতিধ্বনি নহেন; বরং দেখিবেন যে, বিবেকানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতিবাদ—তীব্র প্রতিবাদ! কেশবচন্দ্রের সর্বশেষ পরিবর্তিত মত, 'নববিধান' রূপে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার 'নববিধানের' সার্বভৌমিকতা এক উদার কল্পনাপ্রসূত বস্তুতন্ত্রহীন আদর্শ, যাহা প্রত্যেক বিশেষ সভ্যতার বৈশিষ্ট্যকে সেই সভ্যতার অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঁচ সভ্যতার পাঁচ বৈশিষ্ট্যকে গ্রথিত করিয়া এক অভূতপূর্ব, অত্যাশ্চর্য, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক সমাজ-বিজ্ঞান-বিরোধী মহামিলন। এই কারণেই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতিবাদ। কেশবচন্দ্র

খৃষ্টান ধর্মের প্রতি যে অতিমাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন, বিবেকানন্দ ঘাতসংঘাতে প্রতিক্রিয়ার ফলে অদ্বৈতবেদান্তের শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার প্রতিরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে খৃষ্টানী মোহ কেশব ও কৈশবদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল, যে খৃষ্টানী ঢোল বাঙলার ইংরাজী-শিক্ষিত তরুণ নরনারী লইয়া তাঁহারা গড়িতে গিয়াছিলেন, এবং শিব গড়িতে গিয়া দৈবদুর্বিপাকে অন্য এক জানোয়ার গড়িয়াছিলেন, বিবেকানন্দ তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। খৃষ্টানী মোহ তথা পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতার মোহ হইতে তিনি জাতিকে সতর্ক করিয়া দিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। এই পাশ্চাত্য ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই তাঁহাকে ত্যাগের ক্ষুরধার শাণিত পথে আচার্য শঙ্করের পর নিখিল ভূভারতে সন্ন্যাসের পতাকা উড্ডীন করিতে হইয়াছিল। অথচ পাশ্চাত্যের যে শিব ও শক্তি এ উভয়কেই তিনি দুইহাতে বরণ করিয়া লইয়াছেন। নিজের ভূমিতে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বকে, বিশ্বজনীনকে হৃদয়ে বাহুতে ও মস্তিষ্কে ধারণ করিয়াছেন।

রামমোহনের কর্মক্ষেত্র ছিল অধিকতর বিস্তৃত। তাঁহার বিলাত গমনের প্রায় ৪০ বৎসর পর কেশবচন্দ্র বিলাত গমন করেন এবং কেশবচন্দ্রের বিলাত গমনের প্রায় ২২ বৎসর পরে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচার আরম্ভ হয়। ১৮৩০, ১৮৭১, ১৮৯৩—এই সমস্ত বিভিন্ন স্মরণীয় তারিখগুলির মধ্য দিয়া শুধু ঐতিহাসিকের চক্ষে দেখিলেও দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলাদেশে ১৮৩০ হইতে ১৮৯৩-এর মধ্যে আধুনিক ধর্মচিন্তার ইতিহাসে কি পরিবর্তন, কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। ইহাদের একের উপর অন্যের প্রভাব থাকা অনিবার্য; কিন্তু ইহাদের যে স্বাতন্ত্র্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অন্ধ ব্যতীত কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, সব সমাজেই অন্ধ আছে এবং থাকে।

নিউইয়র্কের প্রশ্নোত্তর ক্লাসে স্বামিজী ধারাবাহিকরূপে জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। নাতিবৃহৎ কক্ষটিতে উৎসুক ছাত্র ও ছাত্রিগণের যথেষ্ট স্থানাভাব হইত, তথাপি তাঁহারা কষ্টস্বীকার করিয়া ভারতীয় প্রথানুসারে পা মুড়িয়া তাঁহাদের প্রিয় আচার্যকে ঘিরিয়া বসিতেন। তাঁহার রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি শ্রবণ করিয়া কয়েকজনের আগ্রহ এত বর্ধিত হইল যে, তাঁহারা স্বামিজীর নিকট যোগশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ঐ বিষয়ে সফলকাম হইবার জন্য যোগশাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী ব্রহ্মচর্য, সাত্ত্বিক আহার ইত্যাদি নিয়মগুলিও শ্রদ্ধার সহিত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই সময় স্বামিজীও যোগীর ন্যায় দৈহিক কঠোরতা অবলম্বন করিলেন, কারণ তিনি সর্বদাই জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে শিষ্যদিগের সম্মুখে একটা জীবন্ত আদর্শরূপে বিরাজ করিতেন। তাঁহার নিউইয়র্কের ক্ষুদ্র আবাসস্থলটি সন্ন্যাসী ও সত্যকামীদের সমবায়ে একটি ক্ষুদ্র মঠবিশেষ হইয়া উঠিল।

রাজযোগের বক্তৃতাগুলির খ্যাতি এত সুবিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, যেদিন রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবার কথা থাকিত, সেদিন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপকগণ আসিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র কক্ষটি পূর্ণ করিয়া ফেলিতেন এবং আগ্রহের সহিত তাঁহার যোগশাস্ত্রের যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার বক্তৃতাগুলি একত্র করিয়া 'রাজযোগ' প্রকাশিত হয়। স্বামিজী উহার পরিশিষ্টে পাতঞ্জল দর্শনের একটি সুবিস্তৃত ও যুক্তিপূর্ণ ভাষ্য যোগ করিয়া দেন। উচ্চতম মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের দিক দিয়া পুস্তকখানি মনীষী পাঠক-সমাজে চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। পুস্তকখানি

পাঠ করিয়া আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত জেমস্ এত মুগ্ধ হন যে, স্বামিজীর সহিত স্বয়ং আসিয়া দেখা করেন। 'রাজযোগ' প্রকাশিত হইবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উহার তিনটি সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছিল। পণ্ডিত-মণ্ডলী স্বামিজীর প্রতিভাপ্রসূত প্রথম পুস্তকখানিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে কৃপণতা করেন নাই।

ইতোমধ্যে স্বামিজী বহু প্রতিষ্ঠাবান শিষ্য এবং প্রচারকার্যের সহায়ক বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ম্যাডাম্ মেরী লুইস (স্বামী অভয়ানন্দ), লিয়ঁ ল্যান্ডস্‌বার্গ (স্বামী কৃপানন্দ), মিসেস্ ওলি বুল, ডাক্তার অ্যালান ডে, মিস্ এস. ই. ওয়াল্ডো, প্রফেসার ওয়াইম্যান, প্রফেসার রাইট্ ও ডাক্তার ষ্ট্রীটের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় সুবিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম ক্যালভে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। নিউইয়র্কের ধনীসমাজের মিঃ ও মিসেস্ ফ্রান্সিস্ লিগেট এবং মিস্ জে· ম্যাক্‌লিয়ডও স্বামিজীর বন্ধু হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার প্রচারকার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। 'ডিক্‌সন সোসাইটি'র মেম্বারগণ স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া গভীর শ্রদ্ধাসহকারে হিন্দু আদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য উৎসাহের সহিত কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন।

১৮৯৫ সালে স্বামিজীকে কি কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। অপরিচিত বিদেশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের মধ্যে এবং নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে অদ্বৈত-বেদান্ত প্রচার করা অতি সুকঠিন কাজ। আমেরিকার প্রচুর বিলাসের মধ্যে তাঁহার অন্তরাত্মা সময় সময় বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। তাঁহার অদম্য কর্মশক্তি, প্রবল উৎসাহ সময় সময় যেন মন্দীভূত হইত; তখন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ গভীর ক্ষোভের সহিত স্বীয় জীবনের গত দিবসগুলির প্রতি চাহিয়া বলিয়া উঠিতেন—

"I long, oh, I long for my rags, my shaven head, my sleep under the trees, and my food from begging."

অবিশ্রান্ত উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ-সমন্বিত বক্তৃতা প্রদান এবং শিক্ষাদান কার্যে পরিশ্রান্ত স্বামিজী নির্জনে বিশ্রাম করিবার জন্য তাঁহার এক শিষ্যার সেণ্ট লরেন্স নদীর উপর 'সহস্র দ্বীপোদ্যান' ভবনে কতিপয় একান্ত অনুরাগী শিষ্য ও শিষ্যা সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। এখানে সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা স্বামিজীর পবিত্র সঙ্গে বাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম মিস্ এস. ই. ওয়াল্ডো লিখিয়াছেন :—

"এই গন্ধর্ব রাজ্যে আমরা আচার্যদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাঁহার অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্তাসমন্বিত অপূর্ব রচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত করিয়াছিলাম—তখন আমরাও জগৎকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, জগৎ আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে প্রতিদিন সান্ধ্যভোজন সমাপনান্তে আমরা সকলে উপরকার বারান্দাটিতে গমন করিয়া আচার্যদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না, কারণ আমরা সমবেত হইতে না হইতেই তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি আমাদিগের সহিত প্রত্যহ দুই ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল যাপন করিতেন। এক অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী রজনীতে (যেদিন নিশানাথ প্রায় পূর্ণাবয়ব ছিলেন) কথা কহিতে কহিতে চন্দ্রাস্ত হইয়া গেল; আমরাও যেমন কালক্ষেপের বিষয় কিছু

জানিতে পারি নাই, স্বামিজীও যেন ঠিক তদ্রূপই জানিতে পারেন নাই। এই সকল কথোপকথন লিপিবন্ধ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয় নাই, শুধু শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়েই গ্রথিত হইয়া আছে। এই সকল দিব্য অবসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্মানুভূতি-সকল লাভ করিতাম, তাহা আমাদিগের কেহই ভুলিতে পারিবেন না। স্বামিজী ঐ সকল সময়ে তাঁহার হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিতেন; ধর্মলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে যে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেগুলি যেন পুনরায় আমাদের নেত্রগোচর হইত; তাঁহার গুরুদেবই যেন সূক্ষ্মশরীরে তাঁহার মুখাবলম্বনে আমাদিগের নিকট কথা কহিতেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং সমুদয় ভয় দূর করিতেন। অনেক সময়ে স্বামিজী যেন আমাদের উপস্থিতিই ভুলিয়া যাইতেন; আমরা পাছে তাঁহার চিন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়া ফেলি, এই ভয়ে যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া থাকিতাম। তিনি আসন হইতে উঠিয়া বারান্দাটির সংকীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেন। এই সময়ে তিনি যেরূপ কোমলপ্রকৃতি ছিলেন এবং সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন, তেমন আর কখনও নহে। তাঁহার গুরুদেব যেরূপে তাঁহার শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হয়ত অনেকটা তদনুরূপই ব্যাপার; তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাবমুখে কথা কহিয়া যাইতেন, আর শিষ্যগণ শুনিয়া যাইতেন।

"স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত সেই একই ভাব, আমরা এক ঘনীভূত ধর্মভাবের রাজ্যে বাস করিতাম।

"স্বামিজী বালকের ন্যায় ক্রীড়াশীল ও কৌতুকপ্রিয় হইলেও এবং সেভাবে পরিহাস করিতে ও কথার চোটপাট জবাব দিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, কখনও মুহূর্তের জন্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেন না। প্রতি জিনিসটি হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার এবং উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন এবং এক মুহূর্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু-পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন। স্বামিজী পৌরাণিক গল্পসমূহের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন; আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন আর্যগণ অপেক্ষা কোন জাতির মধ্যেই এত অধিক পরিমাণে পৌরাণিক গল্পের প্রচলন নাই। তিনি আমাদিগকে ঐ সকল গল্প শুনাইয়া প্রীতি অনুভব করিতেন এবং আমরাও শুনিতে ভালবাসিতাম; কারণ তিনি কখনও এই সকল গল্পের অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে এবং উহা হইতে মূল্যবান ধর্মবিষয়ক উপদেশ আবিষ্কার করিয়া দিতে বিস্মৃত হইতেন না। কোন ভাগ্যবান ছাত্রমণ্ডলী এরূপ প্রতিভাবান আচার্য লাভে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবার এমন সুযোগ পাইয়াছিলেন কি না, সন্দেহ"।*

মিসেস্ এম. সি. ফাঙ্কি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"মনে মনে দৃঢ়সংকল্প ছিল যে, কোন সময়ে, কোথাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবই করিব; যদি আমাদিগকে তজ্জন্য সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিতে হয়, তাহাও স্বীকার। প্রায় দুই বৎসর আমরা তাঁহার খোঁজ পাইলাম না এবং মনে করিলাম, হয়তো তিনি ভারতে ফিরিয়া গিয়াছেন; কিন্তু একদিন অপরাহ্নে একজন বন্ধু আমাদিগকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি এখনও এই দেশেই আছেন এবং গ্রীষ্ম অবকাশটি থাউজ্যান্ড

---

* দেববাণী—স্বামী বিবেকানন্দ

আইল্যাণ্ড পার্কে' যাপন করিতেছেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিব, এই দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া আমরা পরদিন প্রাতে যাত্রা করিলাম।

"অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি জনকোলাহল হইতে দূরে আসিয়া বাস করিতেছেন, এমন অবস্থায় তাঁহার শান্তিভঙ্গ করিবার দুঃসাহস করিয়াছি, এই ভাবিয়া আমরা যারপরনাই ভীত হইলাম; কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের মধ্যে এমন এক আগুন জ্বালিয়াছিলেন, যাহা নির্বাপিত হইবার নহে। এই অদ্ভুত ব্যক্তি ও তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধে আমাদিগকে আরও জানিতে হইবেই হইবে। সেদিন অন্ধকারময়ী রজনী, ঝুপঝাপ বৃষ্টি হইতেছে, আবার আমরাও দীর্ঘ পথভ্রমণে শ্রান্ত, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মনে শান্তি নাই।

"তিনি আমাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন? আর যদি না করেন, তবে আমাদের উপায়? আমাদের হঠাৎ মনে হইল যে, একব্যক্তি, যিনি আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত অবগত নন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুশত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসা হয়ত বা মূর্খতার কার্য হইয়াছে। ** পরে এই ঘটনা প্রসঙ্গে আচার্যদেব আমাদিগকে এইরূপে অভিহিত করিতেন—'আমার শিষ্যদ্বয়, যাঁহারা শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা রাত্রিকালে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া আসিয়াছিলেন।' তাঁহাকে কি বলিব, পূর্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু যেমন আমরা বুঝিলাম যে, সত্য সত্যই আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, অমনি আমরা সেই সব ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতা ভুলিয়া গেলাম; আর আমাদের মধ্যে একজন কোনমতে অস্ফুট স্বরে বলিতে পারিল—'আমরা ডিট্রয়েট্ হইতে আসিতেছি এবং মিসেস্ পি. আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।' আর একজন বলিলেন—'ভগবান্ ঈশা এখনও পৃথিবীতে বর্তমান্ থাকিলে যেরূপে আমরা তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উপদেশ ভিক্ষা করিতাম, আমরা আপনার নিকট সেইরূপেই আসিয়াছি।' তিনি আমাদিগের প্রতি অতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—'শুধু যদি ভগবান্ খৃষ্টের ন্যায় তোমাদিগকে এই মুহূর্তে মুক্ত করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিত!' * * * আমরা তথায় বারজন ছিলাম এবং বোধ হইতেছিল, যেন জ্বালাময়ী ঐশী শক্তি (Pentecostal Fire) অবতরণ করিয়া পুরাকালে খৃষ্ট-শিষ্যগণের ন্যায় আচার্যদেবকেও স্পর্শ করিয়াছিল। একদিন অপরাহ্ণে ত্যাগ-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে গৈরিকবসনধারী যতিগণের আনন্দ ও স্বাধীনতার বর্ণনা করিতে করিতে সহসা তিনি উঠিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণেই ত্যাগ-বৈরাগ্যের চরম সীমাস্বরূপ ('Song of the Sannyasin') 'সন্ন্যাসীর গীতি' শীর্ষক কবিতাটি লিখিয়া ফেলিলেন। আমার মনে হয়, তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য ও কোমলতাই আমাকে ঐ কালে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছিল। পিতা তাঁহার সন্তানদের যে চক্ষে দেখেন, তিনিও আমাদের সেই চক্ষে দেখিতেন, যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। প্রাতঃকালে ক্লাসের কথোপকথনগুলি শুনিয়া সময়ে সময়ে আমাদের মনে হইত, যেন তিনি ব্রহ্মকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; এমন সময়ে হয়ত তিনি সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেন এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন 'এখন আমি তোমাদের জন্য রন্ধন করিতে যাইতেছি।' আর কত ধৈর্যের সহিত তিনি উনানের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য কোন কিছু ভারতীয় আহার্য প্রস্তুত করিতেন! ডিট্রেয়েটে শেষ বারও তিনি আমাদের জন্য অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী পণ্ডিতাগ্রগণ্য, জগদ্বিখ্যাত বিবেকানন্দ শিষ্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবগুলি স্বহস্তে পূরণ করিয়া দিতেছেন, শিষ্যগণের পক্ষে কি অপূর্ব

উদাহরণ! তিনি ঐ সকল সময়ে কত কোমল, কত করুণস্বভাব হইতেন! কত কোমলতাময় পুণ্যস্মৃতিই না তিনি আমাদিগকে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন!"*

*　　　*　　　*

বহুদিন পর স্বামিজী নগরীর কোলাহল, প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘর্ষ, বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সহস্র দ্বীপোদ্যানে' আসিবার প্রাক্কালে তিনি 'গ্রীণএকার কনফারেন্সে' বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হন, কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত দার্শনিকমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করা অপেক্ষা ভবিষ্যৎ বেদান্ত প্রচারকার্যের সহযোগিরূপে, কয়েকজন শিষ্যকে গড়িয়া তোলাই অধিকতর প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ সাতটি সপ্তাহ ব্যাপিয়া তিনি যে অমূল্য উপদেশাবলী প্রদান করিয়াছিলেন, পরে উহা 'Inspired Talks' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'দেববাণী' পুস্তকখানি উহারই বঙ্গানুবাদ। যাহাহউক, এইস্থানে স্বামিজী পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্য ও দুইজনকে সন্ন্যাস প্রদান করিলেন। অবশেষে পুনরায় নবোৎসাহ লইয়া নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়া বেদান্ত প্রচার-কার্যে ব্রতী হইলেন।

নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়াই আচার্যদেব ইংলণ্ড যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মে মাসেই স্বামিজী বেদান্তানুরাগিণী মিস্ হেনরিয়েটা মুলার কর্তৃক ইংলণ্ডে আহূত হইয়াছিলেন। অবশেষে মিঃ ই. টি. ষ্টার্ডি স্বামিজীকে পুনঃ পুনঃ লণ্ডনে আগমন করিবার জন্য পত্র লিখিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে স্বামিজীর বন্ধু নিউইয়র্কের জনৈক ধনকুবের স্বয়ং স্বামিজীকে সঙ্গে করিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ড লইয়া যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে স্বামিজী আনন্দে সম্মতি প্রদান করিলেন। ক্রমাগত দুই বৎসর অবিশ্রান্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পর সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে আশা করিয়া গুরুগতপ্রাণ শিষ্যবৃন্দও আপত্তি করিলেন না। অবশেষে প্রচারকার্যের ভার স্বামী অভয়ানন্দ, কৃপানন্দ এবং সিস্টার হরিদাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামিজী আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে নিউইয়র্ক হইতে ফ্রান্সের প্যারী নগরে উপস্থিত হইলেন। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি প্যারী নগরের ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করিয়া ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আমেরিকা পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে স্বামিজী সংবাদ পাইলেন যে ভারতীয় কোন কোন মিশনারিচালিত সংবাদপত্রে তাঁহার নিন্দা রটনা করা হইতেছে। স্বামিজীর আহার্য দ্রব্য সম্বন্ধে কতগুলি কথা শ্রবণ করিয়া হিন্দুগণের মধ্যেও অনেকে তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার সম্পর্কে জঘন্য বিবরণসহ পুস্তিকা, 'হ্যাণ্ডবিল' ইত্যাদি বিতরিত হইতেছে। রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্রস্বরূপ 'বঙ্গবাসী' কাগজ এই সময় হইতেই বিবেকানন্দের নিন্দাপ্রচার অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। খৃষ্টান মিশনরিগণের অবশ্য ক্রোধের উদয় হওয়া স্বাভাবিক; কেননা, স্বামিজী খৃষ্টানগণকে হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, এমনকি, অনেককে হিন্দুও করিতে

---

* দেববাণী—স্বামী বিবেকানন্দ

ছিলেন; বিশেষত তাঁহাদের স্বার্থেরও স্বামিজী যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছিলেন। মিশনরিগণ ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়া অসভ্য, নরমাংসভুক বন্য, বর্বর 'হিদেনদিগের' পৈশাচিক আচার-ব্যবহারের বর্ণনা করিয়া ইহাদিগকে 'অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য' ধনী ও বড়লোকদিগের নিকট প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন! কিন্তু বিবেকানন্দের বক্তৃতায় অনেকেরই মিশনরীবর্ণিত কাহিনীগুলিতে অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছিল; পাছে তাঁহারা আর হিদেনদিগের প্রভু ঈশার স্বর্গরাজ্যে আনয়নের জন্য অর্থসাহায্য না করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা যে চঞ্চল হইয়া উঠিবেন এবং বিবেকানন্দের নিন্দাপ্রচার করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। যদিও বরাহনগর মঠে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ এই সমস্ত কাহিনী বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মাদ্রাজী ও অপরাপর ভারতীয় শিষ্যবৃন্দ ক্রমাগত গুরুনিন্দা শ্রবণ করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। দুই বৎসর কাল কাপুরুষ নিন্দুকগণ কর্তৃক হেয়ভাবে আক্রান্ত হইয়াও স্বামিজী প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ করেন নাই; কিন্তু শিষ্যবৃন্দের মনোভাব অবগত হইয়া তিনি প্যারী হইতে ইংলণ্ডযাত্রার প্রাক্কালে উহাদিগকে একখানি পত্র লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন, কারণ কোন কোন মিশনরীপুঙ্গব তাঁহাকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বক্তা বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া স্বামিজী সময় সময় ভাবাবেগে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসতৃষ্ণা, পরধন-লোলুপতা, স্বার্থপর আন্তর্জাতিক আইনসমূহকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেন; সেই সমস্ত বক্তৃতার স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া মিশনরিগণ তাঁহাকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বক্তা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় একটি প্রকাশ্য সভায় রেভাঃ কালীমোহন ব্যানার্জী তাঁহাকে রাজনৈতিক বক্তা বলিয়া উল্লেখ করায় স্বামিজী তাঁহার শিষ্যগণকে প্রতিবাদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং উক্ত ভদ্রলোককে সংবাদপত্রে স্বমত সমর্থন করিবার জন্য আহ্বান করিতে বলিয়াছিলেন। নানা কারণে স্বামিজী শিষ্যবৃন্দকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে লিখিলেন—"আমি আশ্চর্য হইতেছি যে, তোমরা মিশনরিগণের প্রচারিত আহাম্মকিগুলি শুনিয়া বিচলিত হইয়াছ! যদি কোন হিন্দু আমাকে গোঁড়া হিন্দুগণের মত আহারপ্রণালী অবলম্বন করিতে অযাচিত পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বলিও তাঁহারা যেন একজন ব্রাহ্মণ পাচক ও তাহার সঙ্গে কিছু টাকা প্রেরণ করেন! এক পয়সা সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই অথচ বিজ্ঞের মত উপদেশ দিবার বেলায় খুব যোগ্যতা আছে দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। অপরদিকে, যদি মিশনরিগণ বলিয়া থাকেন যে, আমি 'কামকাঞ্চন' ত্যাগরূপ সন্ন্যাস-জীবনের মহত্তম ব্রত ভঙ্গ করিয়াছি, তবে তাঁহাদিগকে বলিও যে, তাঁহারা ঘোরতর মিথ্যাবাদী।*** মনে রাখিও, আমি কাহারও নির্দেশমত চলিতে প্রস্তুত নহি! আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমি ভালরূপেই জানি। কোনপ্রকার হট্টোগোল, নিন্দা ইত্যাদি আমি গ্রাহ্য করি না! আমি কি কোন ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের ক্রীতদাস?*** তোমরা কি বলিতে চাও যে, আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিষ্ঠুর প্রকৃতি, দুর্বলচেতা নাস্তিকভাবাপন্ন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বাস করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি? আমি সর্বপ্রকার কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি! ঐ সমস্ত কাপুরুষ ও রাজনৈতিক আহাম্মকির সহিত আমার কোন সংস্রব নাই। ঈশ্বর এবং সত্যই আমার একমাত্র রাজনীতি, বাদবাকী যা কিছু আবর্জনা মাত্র।"

যুগপ্রয়োজনে অবতীর্ণ মহাপুরুষগণ সত্য ও লোকাচারের সহিত আপোষ

করিয়া শান্ত, শিষ্ট ও সদালাপী মানুষটি সাজিয়া সমাজে চলাফেরা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন না! তাঁহাদিগকে সাধারণের সহিত সমানস্তরে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করা বৃথা! হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকল্পে যে মহাশক্তি বিবেকানন্দের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহার জগৎ-উপপ্লাবী প্রবাহ রোধ করিবার জন্য কয়েকজন মেরুদণ্ডহীন ব্রাহ্ম-প্রচারক যে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পথরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে ক্ষুদ্র প্রয়াসের উল্লেখ না করাই শ্রেয়!

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন। প্রভুত্বের অহমিকায় স্ফীত সাম্রাজ্যগর্বী ইংরাজগণ 'অর্ধ-বর্বর' পরাধীন জাতির একজন ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসীকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে স্বামিজী দ্বিধাসঙ্কুচিত চিত্তে লণ্ডনে প্রবেশ করিলেন। স্বদেশাভিমানী বিবেকানন্দের চিত্তে ইংরাজজাতি সম্পর্কে বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করা স্বাভাবিক। ভারতে ইংরাজ শাসক ও বণিকগণ ভারতবাসীর প্রতি মাঝে মাঝে যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে ঐরূপ ধারণা হওয়া আশ্চর্য নহে! কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পূর্ব ধারণা দূর হইল। ইংলণ্ডের শিক্ষিত ও অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ সর্বশ্রেণীর ইংরাজের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া ইংরাজ চরিত্রের মহত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন। "ইংরাজ জাতির উপর আমাপেক্ষা অধিক ঘৃণাসম্পন্ন হইয়া আর কেহই বৃটিশ ভূমিতে পদার্পণ করেন নাই। * * * এখানে এমন কেহই উপস্থিত নাই, যিনি ইংরাজ জাতিকে আমাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।" ইংরাজ-চরিত্রের ক্ষাত্রিয়শৌর্য এবং আত্মসংযম, তাহাদের অকুতোভয় উদ্যম, অধ্যবসায়, লঘু ভাবাবেগহীন গাম্ভীর্যের স্বামিজী ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও নিয়মানুবর্তিতা, তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ সহ বিনীত আনুগত্য দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইংরাজ সহজে কোন ভাবে গলিয়া পড়ে না; কিন্তু যাহা একবার সত্য বলিয়া জানে, তাহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরে। আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডই স্বামিজীকে অধিকতর আকৃষ্ট করিল।

'Cyclonic Hindoo' —(আচার্যদেব যেখানে যাইতেন, সেইখানেই জনসাধারণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইত বলিয়া পাশ্চাত্যবাসীরা তাঁহাকে ঐ নাম দিয়াছিলেন) লণ্ডনেও তরঙ্গ তুলিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রশ্নোত্তর এবং অপরাহ্নে বক্তৃতার মধ্য দিয়া প্রচারকার্য চলিল। নিউইয়র্কের মতই লণ্ডনে স্বামিজীকে ঘিরিয়া জনতার ভীড়। স্বামিজী উৎসাহের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমিতে ভারতের বার্তা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, "সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মত, ভাবপ্রচারের যন্ত্র ইতিপূর্বে আর হয় নাই। এই যন্ত্রের কেন্দ্রে আমি আমার ভাবধারা ঢালিয়া দিতে চাহি, তাহা হইলেই উহা সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িবে। * * আধ্যাত্মিক আদর্শ নিপীড়িত জাতিসমূহের মধ্য হইতেই আসিয়াছে। (ইহুদী ও গ্রীক)।"

একদিন স্বামিজী 'পিকাডেলী প্রিন্সেস্ হলে' সহস্রাধিক শ্রোতার সম্মুখে 'আত্মজ্ঞান' বিষয়ে গভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ এক বক্তৃতা করিলেন। পাশ্চাত্য বহির্মুখ দর্শন, বিজ্ঞান এবং সমাজ-জীবনের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা, সংবাদপত্র ও সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহার বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া বহু শিক্ষিত নরনারী দলে দলে তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতাটি এমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, পরদিন বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলিতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও আলোচনা বাহির হইয়াছিল।

'The Standard' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন :—

"রামমোহনের পর, একমাত্র কেশবচন্দ্র সেনকে বাদ দিলে, 'প্রিন্সেস হলে'র বক্তা হিন্দুর মত আর কোন শক্তিশালী ভারতীয় ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে অবতীর্ণ হন নাই। * * বক্তৃতামুখে তিনি আমাদের কারখানা, ইঞ্জিন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া এবং পুঁথি-পুস্তকের দ্বারা মনুষ্যজাতির কতটুকু হিত হইয়াছে, বুদ্ধ এবং যীশুর কয়েকটী বাণীর সহিত তাহার তুলনা করিয়া অতি নির্ভীক, তীব্র তাচ্ছিল্যপূর্ণ সমালোচনা করেন। বক্তৃতাকালে তিনি কোন স্মারকলিপি ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আড়ষ্টতাহীন, দ্বিধাহীন।"

'The London Daily Chronicle' লিখিয়াছেন :—

"জনপ্রিয় হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অবয়বে বুদ্ধদেবের চির-পরিচিত মুখের (The classic face of Buddha) সৌসাদৃশ্য অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। আমাদের বণিক-সমৃদ্ধি, আমাদের শোণিতলোলুপ যুদ্ধ, আমাদের ধর্মমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন—'এই মূল্যে নিরীহ হিন্দুরা তোমাদের শূন্যগর্ভ আস্ফালনপূর্ণ সভ্যতার অনুরাগী হইবে না'।"

'ওয়েষ্টমিনষ্টার গেজেট' নামক বিখ্যাত পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধি স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত পত্রিকায় 'লণ্ডনে ভারতীয় যোগী' শীর্ষক স্বামিজী সম্বন্ধে একটি নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রতিনিধির সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে স্বামিজী বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট তিনি যে বার্তা পাইয়াছেন, তাহা জগতে প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, নূতন কোন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। বিশেষ কোন ধর্মমতেরও তিনি প্রচারক নহেন; তাঁহার বিশ্বাস, বেদান্তের উদার জ্ঞানসমষ্টি সকল ধর্ম সম্প্রদায়ই স্ব স্ব ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।

বেদান্তের ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্যের ভিত্তির উপর দ্রুত-উন্নতিশীল, আপাত-মনোরম পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত না করিলে যে উহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, ইহা তিনি বার বার বলিয়াছেন। গভীর দূরদৃষ্টিবলে ভাবী শতাব্দীর ভয়াবহ ধ্বংসের করাল দৃশ্য দর্শন করিয়াই বোধহয় তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন—"সাবধান! আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ একটা আগ্নেয়গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, উহা যে-কোন মুহূর্তেই অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে। এখনও যদি তোমরা সাবধান না হও, তাহা হইলে আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যে তোমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।"

প্রায় একমাসকাল মধ্যেই স্বামিজী লণ্ডনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। এই সময়ে একটি বক্তৃতা-সভায় মিস্ মার্গারেট ই. নোবল (সিষ্টার নিবেদিতা) স্বামিজীর সহিত পরিচিতা হন। এই অসাধারণ বিদুষী মহিলা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং শিক্ষক-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি ছিল। মিস্ নোবল স্বামিজীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্না হইলেও সহসা তাঁহাকে 'আচার্য' বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। প্রতিদিবস তিনি স্বামিজীর বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর ক্লাসগুলিতে নিয়মিতরূপে আসিতেন। স্বামিজীর পবিত্র নিঃস্বার্থপর চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া অবশেষে মিস্ নোবল তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু তিনি তাঁহার মনোগত ভাব প্রকাশ না করিয়া নীরবে এই মনীষী সন্ন্যাসীকে বিবিধপ্রকারে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

স্বামিজী আমেরিকার মত ইংলণ্ডেও প্রচারকার্যে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা যাইবার প্রাক্কালে তিনি জনৈক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন—"ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য আশাতীত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আগামী সপ্তাহে আমি আমেরিকা যাত্রা করিব শুনিয়া অনেকেই বিষণ্ণ হইয়াছেন। আমি চলিয়া গেলেই, যে কার্য হইয়াছে, তাহার ফল অনেকাংশে নষ্ট হইয়া যাইবে, অনেকেই এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি তাহা মনে করি না। আমি মানুষ অথবা কোন বস্তুর উপর নির্ভর করি না,—প্রভুই আমার একমাত্র আশ্রয়। তিনিই আমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কর্ম করিতেছেন।"

১৮৯৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা স্বামিজীর প্রচারকার্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"আমরা আনন্দের সহিত লিখিতেছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনস্থ বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার হিন্দুদর্শন ও যোগ সম্বন্ধীয় ক্লাসগুলিতে বহু উৎসাহী ও শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতৃমণ্ডলী উপস্থিত থাকেন। লণ্ডনস্থ জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—'লণ্ডন সহরের কতিপয় বিভবশালিনী বিলাসিনী সম্ভ্রান্ত মহিলা চেয়ারের অভাবে মেজেতে পা মুড়িয়া বসিয়া গুরুভক্ত ভারতীয় শিষ্যের মত ভক্তিভরে স্বামিজীর উপদেশ শুনিতেছেন, ইহা বাস্তবিকই বিরল দৃশ্য।' আমরা শুনিয়াছি, ক্যান্‌নস্‌, উইলবারফোর্স, হেজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক তিনি সসম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছেন। প্রথমোক্ত মহোদয়ের বাসভবনে স্বামিজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি 'লেভী' আহূত হইয়াছিল, তাহাতে লণ্ডনের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। * * * সংবাদদাতা আরও জানাইতেছেন যে, স্বামিজী ইংরেজী ভাষায় জনগণের হৃদয়ে ভারতবর্ষের প্রতি যে ভালবাসা ও সহানুভূতি উদ্বোধিত করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই ভারতের উন্নতি-সহায়ক শক্তিগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিবে'।"

ইংলণ্ডে প্রচারকার্যে ব্যস্ত থাকাকালীন, স্বামিজী আমেরিকা হইতে পুনঃ পুনঃ শিষ্য ও ভক্তগণের আহ্বান-পত্র পাইতে লাগিলেন। আমেরিকায় প্রচারকার্যে প্রসারতা হেতু সকলেই সত্বর তাঁহার উপস্থিতি কামনা করিতে লাগিলেন; এদিকে বন্ধু ও শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে লণ্ডনেই থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকালে পুনরায় লণ্ডনে ফিরিয়া আসিবার আশ্বাস দিয়া তিনি আমেরিকা যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন; ইতোমধ্যে বোষ্টন-বাসিনী জনৈকা ধনাঢ্যা মহিলা স্বামিজীর প্রচারকার্যের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন অঙ্গীকার করিয়া এক পত্র লেখায় স্বামিজী ইহা প্রভুরই লীলা ভাবিয়া আমেরিকা যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইংলণ্ডস্থ শিষ্যমণ্ডলীকে একটি সমিতি গঠন করিয়া শ্রীশ্রীভগবদ্‌গীতা ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র নিয়মিতরূপে আলোচনা করিবার জন্য উপদেশ দিলেন।

কিঞ্চিদধিক তিনমাস কালের মধ্যেই স্বামিজী লণ্ডনে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেবলমাত্র অপূর্ব বক্তৃতা-শক্তিবলে নহে; তাঁহার অসাধারণ কর্মজীবন, বাক্য ও কার্যের সৌসাদৃশ্য, চরিত্রগত শুভ্র সম্মোহিনী শক্তি ব্যক্তিমাত্রকেই আকৃষ্ট করিয়া ফেলিত। চিন্তাশীল যে-কোন ব্যক্তি অতি সামান্য সময়ের জন্যও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, তিনিই চিন্তা করিবার মত কত নূতন তত্ত্ব, নূতন নীতি, নূতন আদর্শ পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই প্রত্যেকেই শ্রদ্ধামুগ্ধ হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন—ঈশ্বরের দূতস্বরূপ

মহাপুরুষ দুর্বল ও সংকীর্ণচেতা মানবের কল্যাণ কামনায় এক উদার ধর্মের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বক্তা মিঃ রবার্ট ইংগারসোলের মত যুক্তিপন্থী অজ্ঞেয়বাদীও স্বামিজীর বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়াছিলেন—ইহাতেই বোঝা যায়, তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের কি অসাধারণ প্রভাব!

দর্শন ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ইংগারসোল সন্দেহবাদী ও ভোগবাদী ছিলেন। ধর্ম, ঈশ্বর, উপাসনা ইত্যাদি বিষয়গুলি তিনি সর্বদাই উপহাস-সহকারে উপেক্ষা করিতেন; অথচ তিনি এত জনপ্রিয় বক্তা ছিলেন যে, একমাত্র বক্তৃতা করিয়াই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অর্জন করিতেন। অপরদিকে স্বামী বিবেকানন্দ কঠোর সংযমী সন্ন্যাসী, প্রত্যেক ধর্মের সমর্থক, বেদান্তদর্শনের প্রচারক; এতদুভয়ের মিলন বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ! একদিন কোন দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে ইংগারসোল বলিয়া উঠিলেন, "এই জগৎটা একটা কমলালেবুর মত, যতদূর পারা যায় নিংড়াইয়া ইহার রস পান করা উচিত। পরলোক বলিয়া কিছু আছে, তাহার যখন কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাইতেছি না, তখন ইহজীবনটাকেও একটা মিথ্যা আশায় বঞ্চনা করিয়া কোন লাভ নাই। কে জানে কবে মৃত্যু হইবে, অতএব যথাসাধ্য তৎপরতার সহিত জগৎকে উপভোগ করা উচিত।"

স্বামিজী মৃদুহাস্যে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কিন্তু জগৎরূপ কমলালেবুর রস বাহির করিবার প্রণালী আমি তোমার চেয়ে ভাল রকমই জানি, কাজেই তোমার চেয়ে অধিক রস পাইয়া থাকি। আমি জানি আমার মৃত্যু নাই, অতএব তোমার মত আমার তাড়াতাড়ি নাই। আমার জগৎ হইতে কোনপ্রকার ভয়ের কারণ নাই; স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সম্পত্তি ইত্যাদির কোন বন্ধন নাই, আমার নিকট জগতের সকল নরনারীই সমান ভালবাসার পাত্র, সকলেই আমার নিকট ঈশ্বরস্বরূপ! ভাব দেখি, মানুষকে ভগবান দেখিয়া আমি কত আনন্দ পাই! আমি নিরুদ্বেগে রস পান করিতেছি। তুমিও আমার প্রণালী অনুসারে এই জগৎরূপ কমলালেবুটি নিংড়াইতে আরম্ভ কর—দেখিবে, সহস্রগুণে অধিক রস পাইবে। একটি ফোঁটাও বাদ যাইবে না।" স্বামিজীর এইরূপ স্পষ্ট সরল অথচ স্নেহপূর্ণ উত্তরগুলিই ইংগারসোলের দৃঢ়হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিল। মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমেরিকার দুইজন তৎকালীন প্রসিদ্ধ বক্তার বন্ধুত্ব সংস্কারমুক্ত মনের ঔদার্যেরই পরিচায়ক।

এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে, অনেকে স্বামিজীর নির্ভীক স্পষ্ট উত্তরে আহত হইয়া বিরক্তিভরে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বজাতি বা স্বদেশের নিন্দা তিনি কদাচ সহিতে পারিতেন না। স্বধর্ম বা স্বজাতির পক্ষ সমর্থন করিয়া দৃপ্ত সিংহের মত যখন তিনি গ্রীবা উন্নত করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত, যেন ইনি অভিমানশূন্য উদাসীন সন্ন্যাসী নহেন, মধ্যযুগের কোন গর্বিত জাত্যভিমানী উদ্ধত অহংকারী রাজপুত বীর!

লণ্ডনে এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত; কারণ অনেক ইংরাজ পণ্ডিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মিশনরিগণের অদ্ভুত বিবরণ পাঠ করিয়া অজ্ঞ হইলেও বিজ্ঞ সমালোচকের আসন গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। একদিন সভামধ্যে স্বামিজী ভারতের গৌরব বর্ণনা করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্বোক্ত প্রকার একজন সমালোচক প্রশ্ন করিলেন—"ভারতের হিন্দুগণ কি করিয়াছে? তাহারা এ পর্যন্ত একটি জাতিকে জয় করিতে পারে নাই।" "পারে নাই নয়—তাহারা করে নাই! আর ইহাই হিন্দুজাতির গৌরব যে, তাহারা কখনও ভিন্নজাতির রক্তে ধরিত্রী

রঞ্জিত করে নাই! কেন তাহারা পরদেশ অধিকার করিবে? তুচ্ছ ধনের লালসায়? ভগবান চিরদিন ভারতকে দাতার মহিমময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন! তাহারা জগতের ধর্মগুরু; পরস্বাপহারী রক্তপিপাসু দস্যু ছিল না! আর সেই কারণেই আমি আমার পিতৃপুরুষদের গৌরবে গর্ব অনুভব করিয়া থাকি।"

হয়ত অপর কেহ প্রশ্ন করিলেন, "আপনাদের মহাপুরুষেরা যদি মানবসমাজকে ধর্মদান করিবার জন্য এতই ব্যগ্র ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহারা এদেশে ধর্মপ্রচার করিতে আসেন নাই কেন?" মৃদুহাস্যে স্বামিজী উত্তর করিলেন, "তখন তোমাদের পূর্বপুরুষগণ বন্য বর্বর ছিলেন; সবুজবর্ণ বৃক্ষপত্ররসে উলঙ্গ দেহ রঞ্জিত করিয়া গিরিগুহায় বাস করিতেন। তাঁহারা কি অরণ্যে ধর্মপ্রচার করিবেন?"

কেহ বা স্বামিজীকে যীশুখৃষ্ট বা খৃষ্টানধর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে শুনিয়া মনে মনে মহা বিরক্ত হইতেন এবং অনধিকারচর্চা মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "স্বামিজী! আপনি খৃষ্টান নহেন, অতএব খৃষ্টধর্মের আদর্শ বুঝিবেন কিরূপে?"

তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিত, "তিনি প্রাচ্যদেশীয় এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, আমিও প্রাচ্যদেশীয় সন্ন্যাসী। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য জগৎ এখনও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে নাই। তিনি কি বলেন নাই, 'যাও তোমার সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া আইস, তারপর অনুসরণ কর?' তোমাদের দেশের কয়জন বিলাসী ধনী-উষ্ট্র, স্বর্গ প্রবেশের দ্বার সূচীছিদ্র মনে করিয়া সর্বত্যাগী হইয়াছেন?" প্রশ্নকর্তারা নীরব হইয়া স্বামিজীর কঠোর সত্যের মর্ম চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহা আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয়, কেন্দ্রীভূত গুরুশক্তিস্বরূপ এই মহাপুরুষ পাশ্চাত্যদেশে তাঁহার বার্তা নির্ভীক দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই।

স্বামিজীর অনুপস্থিত কালে স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ এবং মিস্ ওয়াল্ডো (হরিদাসী) উৎসাহের সহিত প্রচারকার্য চালাইতেছিলেন; তাঁহারাও যে-কোন নগরে যাইতেন, সেইখানে শত শত উৎসুক শ্রোতা শ্রদ্ধাসহকারে হিন্দু-দর্শনের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য সমাগত হইতেন। নিউইয়র্ক ছাড়া, স্বামিজীর শিষ্যগণ বাফেলো ও ডিট্রয়েট নগরে দুইটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ৬ই ডিসেম্বর স্বামিজী নিউইয়র্কে পদার্পণ করিয়া পুনরায় প্রচারকার্য আরম্ভ করিলেন। বোষ্টনবাসিনী পূর্বোক্ত মহিলার সাহায্যে ৩৯ সংখ্যক ষ্ট্রীটে দুইটি প্রশস্ত কক্ষ ভাড়া লওয়া হইল। আচার্যদেব, শিষ্য স্বামী কৃপানন্দের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কক্ষ দুইটিতে দেড় শতাধিক ছাত্রের স্থান হইত। এইস্থানে স্বামিজী কর্মযোগ সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। এই বক্তৃতাগুলি একত্র করিয়াই পরে স্বামিজীর 'কর্মযোগ' নামক পুস্তকখানি সংকলিত হইয়াছে। 'কর্মযোগ' ছাড়া স্বামিজী আরও কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। 'সার্বভৌমিক ধর্মের আদর্শ" নামক প্রসিদ্ধ বক্তৃতাটিও এই সময় প্রদত্ত হয়।

স্বামিজীর শিষ্যগণ তাঁহার বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বহুদিন হইতেই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত লোকাভাবে এতদিন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইতোপূর্বে কয়েকজন সাংকেতিক-লেখক নিযুক্ত

হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অনেক স্থলেই স্বামিজীর অনুসরণ করিতে পারিতেন না। এই সময় ইংলন্ড হইতে মিঃ জে. জে. গুডউইন নামক জনৈক অভিজ্ঞ সাঙ্কেতিকলিপিবিদ্ নিউইয়র্কে উপস্থিত হইলেন। স্বামিজীর শিষ্যগণ তাঁহাকে কার্যে নিযুক্ত করিয়া আশাতীত সুফল প্রাপ্ত হইলেন। মিঃ গুডউইনকে প্রায় অধিকাংশ সময়ই স্বামিজীর সহিত যাপন করিতে হইত, আর ইহার ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল। তিনি স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সাধুহৃদয় গুডউইনের অক্লান্ত গুরুসেবা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হইত। স্বামিজী ইঁহাকে 'বিশ্বস্ত গুডউইন' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। স্বামিজীর যে অমূল্য বক্তৃতাবলী আমরা পুস্তকাকারে পাইয়াছি, তাহার প্রায় সমস্তই মিঃ গুডউইনের অক্লান্ত চেষ্টার ফল। কেবলমাত্র 'রাজযোগ' পুস্তকখানিই স্বামিজী বিশেষ চিন্তা করিয়া একজন শিষ্যের দ্বারা লিখাইয়াছিলেন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ছাড়া বাকী সমস্তই তাঁহার বক্তৃতা। মিঃ গুডউইনের মত বিশ্বস্ত ও দক্ষ লেখক কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই স্বামিজীর অধিকাংশ বক্তৃতাই আমরা বর্তমান আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি।

খৃষ্টমাস পর্বোপলক্ষে মিসেস্ ওলি বুল কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামিজী বোষ্টনে গমন করিলেন। কেম্‌ব্রিজের মহিলাগণ কর্তৃক আহূত হইয়া স্বামিজী 'ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ" সম্বন্ধে একটি বিবিধ তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উহা শ্রবণ করিয়া তত্রত্য বিদুষী নারীসমাজ মুগ্ধ হইলেন এবং স্বামিজীর অজ্ঞাতসারেই তাঁহার মাতাকে ধন্যবাদ দিয়া একখানি পত্র লিখিবার সঙ্কল্প করিলেন। ভার্জিন মেরীর ক্রোড়ে বালক যীশুর একখানি মনোরম চিত্রসহ তাঁহারা লিখিয়াছিলেন—

"জগতের কল্যাণে জননী মেরীর অবদানস্বরূপ খৃষ্টদেবের আবির্ভাবের দিন আমরা উৎসবানন্দে অতিবাহিত করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। আমাদের মধ্যে আপনার পুত্রকে পাইয়া আজ আপনাকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানাইতেছি। আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে সেদিন 'ভারতে মাতৃত্বের আদর্শ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া তিনি আমাদের নরনারী ও শিশুদের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মাতৃপূজা শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে শক্তি-সমুন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিবে।

"আপনার এই সন্তানের মধ্যে আপনার জীবন ও কার্যের যে প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া আপনার নিকটই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের যে নিয়ন্তা, সে দেবতার প্রকৃত আশীর্বাদ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ুক, হৃদয়ে এই বাস্তব স্মৃতি লইয়া আপনার জীবন্ত আদর্শ যেন তাঁহাকে কার্যক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে, এই কথা স্মরণে রাখিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার এই সামান্য নিদর্শন আপনি গ্রহণ করিবেন।"

বোষ্টন হইতে ফিরিয়া স্বামিজী নিউইয়র্কের হার্ডিম্যান হোমে প্রতি রবিবার বিনামূল্যে বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রুক্‌লিন মেটাফিজিক্যাল সোসাইটি ও নিউইয়র্ক পিপলস্ চার্চে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিও শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ দলে দলে নরনারী আসিতে লাগিল। বক্তৃতা প্রদান ছাড়াও তিনি প্রতিদিন দুইবার করিয়া প্রশ্নোত্তর ক্লাসে উপস্থিত থাকিয়া জিজ্ঞাসু মাত্রেরই ধর্মসমস্যাগুলি আগ্রহের সহিত ভঞ্জন করিতেন এবং রাজযোগ বা বিশেষ শনপ্রণালীসমূহ ব্যক্তিবিশেষকে যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন নামক প্রকাণ্ড হলে

'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতাগুলি এত সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী হইত যে, প্রত্যহ প্রায় দুই সহস্র শ্রোতা দুই ঘণ্টা কাল অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াও দণ্ডায়মান হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ করিতেন। এই মাসেই তিনি হার্টফোর্ড মেটাফিজিক্যাল সোসাইটিতে আহূত হইয়া 'আত্মা ও ঈশ্বর' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রুক্‌লিন নৈতিক সভাতেও তিনি কয়েকটি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। এতৎসম্বন্ধে হেলেন হান্টিংটন (Helen Huntington) নামে ব্রুক্‌লিনস্থ জনৈক সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিত ব্যক্তি 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

"ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদের মধ্যে এমন একজন ধর্মগুরু বা শিক্ষককে প্রেরণ করিয়াছেন. যাঁহার উন্নততর দার্শনিক মতবাদ ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে এতদ্দেশের নৈতিক জীবনে প্রবিষ্ট হইতেছে। এই অসাধারণ শক্তিশালী এবং পবিত্র পুরুষ এক সমুন্নত আধ্যাত্মিক জীবনযাপন-প্রণালী, এক সার্বভৌমিক ধর্ম, অযাচিত দয়া, আত্মত্যাগ এবং মানববুদ্ধিগম্য পবিত্রতম ভাবনিচয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের মধ্যে এমন এক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, যাহা সম্প্রদায় ও মতবাদের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, উন্নতি ও পবিত্রতা বিধায়ক, দিব্যানন্দপ্রদ এবং সর্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক—যাহা ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রেম ও অনন্ত দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। * * *

"স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্য ও অনুচরগণ ছাড়া বহু বন্ধুলাভ করিয়াছেন। বন্ধু ও ভ্রাতৃভাবের সাম্য সহায়ে তিনি সমাজের সর্বস্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার কথোপকথন ও বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের নগরের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া থাকেন এবং ইতোমধ্যেই তাঁহার প্রভাব গভীরভাবে বিস্তৃত হইয়াছে ও একটা আধ্যাত্মিক জাগরণের প্রবল স্রোত অপ্রত্যক্ষভাবে প্রবাহিত হইতেছে। কোন প্রশংসা বা নিন্দা তাঁহাকে অনুমোদন বা প্রতিবাদকল্পে উত্তেজিত করিতে পারে নাই, অর্থ ও প্রতিপত্তিও তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার বা কোন বিষয়ে পক্ষপাতী করিয়া তুলিতে পারে নাই। অন্যায্য অনুগ্রহ প্রত্যাশার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাইলে তিনি ঐরূপ অজ্ঞতাপ্রসূত অগ্রসর ব্যক্তিগুলিকে স্বীয় অপ্রতিহত ব্যক্তিত্ব প্রভাবে নিবারণ করিয়া সর্বদাই ধর্ম-প্রচারকোচিত অনাসক্তির ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। কুকর্মী ও অসৎ চিন্তাকারী ব্যতীত তিনি কাহারও দোষ প্রদর্শন করিতেন না, কিন্তু অপর পক্ষে আবার পবিত্রতা ও উন্নত জীবনযাপন-প্রণালী অবলম্বন করিতে উৎসাহ প্রদান করিতেন। মোটের উপর তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিলে রাজারাও চরিতার্থ হন।"

স্বামিজীর ধর্মব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া বহু নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার ষ্ট্রীট্ নামক জনৈক ভক্তিমান শিষ্য সংসার ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করায় স্বামিজী তাঁহাকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া স্বামী যোগানন্দ নাম প্রদান করিলেন। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে তিনজন সুপণ্ডিত শিষ্যকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া স্বামিজী তাঁহাদের সাহায্যে বেদান্ত ও যোগের ক্লাসগুলি চালাইতে লাগিলেন। দলে দলে নরনারী স্বামিজীর উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের 'বৈদান্তিক' বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর অন্যতমা শিষ্যা আমেরিকার সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখিকা মিসেস্ এল্লা হুইলার উইলকক্স ১৯০৭, ২৬শে মে 'নিউইয়র্ক আমেরিকান' পত্রিকায় স্বামিজীর কথা আলোচনা করিতে গিয়া যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, উহা

পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, যে-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা-ক্লাসগুলিতে যোগ দিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; অথবা উন্নততর, শান্তিপ্রদ জীবন গঠন করিবার প্রচুর উপাদান পাইয়াছেন। মিসেস্ উইলকক্স লিখিয়াছেন—

"বার্ বৎসর পূর্বে ঘটনাক্রমে একদিন সন্ধ্যাবেলায় শুনিলাম, ভারতবর্ষ হইতে বিবেকানন্দ নামে জনৈক দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক নিউইয়র্কে আসিয়াছেন এবং আমার বাড়ীর কয়েকখানা বাড়ী পরেই একস্থানে নিয়মিতরূপে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন; আমরা (আমি ও আমার স্বামী) কৌতূহলবশতঃ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে গিয়াছিলাম এবং দশ মিনিট যাইতে না যাইতেই অনুভব করিলাম, আমরা সূক্ষ্ম, জীবনপ্রদ, রহস্যময় এক ভাবরাজ্যে নীত হইয়াছি। আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ রুদ্ধশ্বাসে বক্তৃতার শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম।

"বক্তৃতান্তে আমরা নূতন সাহস, নূতন আশা, নবীন শক্তি ও অভিনব বিশ্বাস লইয়া জীবনের দৈনন্দিন বৈচিত্র্যের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমার স্বামী বলিলেন, 'ইহাই দর্শনশাস্ত্র, ইহাই ঈশ্বর-ধারণা, আমি বহুদিন হইতে যাহা অন্বেষণ করিতেছি, ইহা সেই ধর্ম।' ইহার পর কয়েক মাস ধরিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচীন ধর্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে এবং তাঁহার অসাধারণ মনের সত্য-রত্নসমূহ, শক্তি ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় চিন্তাগুলি সংগ্রহ করিতে গমন করিতেন। কখনও কয়েক রাত্রি বিরক্তি ও উৎকণ্ঠায় অনিদ্রায় যাপন করিয়া তিনি স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিতে যাইতেন এবং বক্তৃতান্তে বাহিরে আসিয়া হিমমলিন রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে হাসিয়া বলিতেন, 'এখন আমি সুস্থ হইয়াছি; আর বিরক্তির কিছুই নাই। মানবাত্মা সম্বন্ধীয় উদার ও বিস্তৃত ধারণা লইয়া আমার কর্তব্যকর্ম ও আনন্দের মধ্যে যোগদান করিব'।"

ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে তিনি পুনরায় নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন; তথা হইতে যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ডিট্রয়েট উপস্থিত হন। ডিট্রয়েটে তাঁহার প্রচারকার্যের বর্ণনা করিয়া তাঁহার অন্যতমা শিষ্যা মিসেস্ এম. সি. ফাঙ্কি লিখিয়াছেন—"১৮৯৬-এর প্রথমভাগে দুই সপ্তাহের জন্য তিনি ডিট্রয়েটে আগমন করেন। সঙ্গে তাঁহার সাঙ্কেতিক-লেখক বিশ্বস্ত গুডউইন। তাঁহারা রিশ্লুতে কয়েকখানি ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। রিশ্লু একটি ক্ষুদ্র 'ফ্যামিলি হোটেল'—তথায় একাধিক লোক সপরিবারে বাস করিত। তত্রত্য বৃহৎ বৈঠকখানাটি তিনি ক্লাসের অধিবেশন ও বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করিতে পাইতেন; কিন্তু উহা এত বড় ছিল না যে, উহাতে সেই বিপুল জনসঙ্ঘের স্থান সঙ্কুলান হয় এবং দুঃখের বিষয়, অনেককে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত। বৈঠকখানা, দরদালান, সিঁড়ি এবং পুস্তকাগারে সত্য সত্যই এক তিল স্থান থাকিত না। সেই কালে তিনি একেবারে ভক্তিমাখা ছিলেন। ভগবৎপ্রেমই তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণাস্বরূপ ছিল। তিনি যেন একপ্রকার ঐশ্বরিক উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, প্রেমময়ী জগজ্জননীর প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল। ডিট্রয়েটে সাধারণের সমক্ষে তাঁহার শেষ উপস্থিতি বেথেল মন্দিরে। জনৈক অনুরাগী ভক্ত রাবি লুইস্ গ্রোস্ম্যান তথায় যাজকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেদিন রবিবার, সন্ধ্যাকাল এবং জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, আমাদের ভয় হইয়াছিল, বুঝি লোক বিহ্বল হইয়া একটা কি করিয়া বসে।

রাস্তার উপরেও অনেকদূর পর্যন্ত ঠাসা লোক এবং শত শত ব্যক্তি ফির গিয়াছিল। স্বামিজী সেই বৃহৎ শ্রোতৃসংঘকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—'পাশ্চাত্য জগতে ভারতের বাণী' ও 'সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ'। তাঁহার বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। সে রজনীতে আচার্যদেবকে যেমনটি দেখিয়াছি, তেমনটি আর কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার সৌন্দর্যের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাহা এ পৃথিবীর নহে। ম হইতেছিল, যেন আত্মাপক্ষী দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছে এবং সেই সময়েই আমি প্রথম তাঁহার আসন্ন দেহাবসানের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলা বহুবর্ষের অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলে এবং তিনি যে অধিকদিন এ পৃথিবীতে থাকিবেন না, তাহা তখনই বুঝি পারা গিয়াছিল। আমি 'না, এ কিছুই নহে' বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলা কিন্তু প্রাণে প্রাণে উহার সত্যতা উপলব্ধি করিলাম। তাঁহার বিশ্রামের প্রয়ো হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ভিতর হইতে বুঝিতেছিলেন, তাঁহাকে কার্য করি যাইতে হইবে।"

গোঁড়া খৃষ্টান মিশনরিগণ স্বামিজীকে আক্রমণ করিয়া নানাপ্রকার নি রটাইতে লাগিলেন। সাধারণকে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে নিষেধ করি লাগিলেন। ধর্মযাজক রাবি লুইস্ গ্রোস্‌ম্যান স্বামিজী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধার গুলির প্রতিবাদ করিয়া সংকীর্ণহৃদয় মিশনরিগণের কার্যপ্রণালীর নিন্দা করি লাগিলেন। যাহা হউক, যথেষ্ট বাধা সত্ত্বেও প্রত্যহ স্বামিজীর বক্তৃতা আর হইবার পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট স্থানটি জনাকীর্ণ হইয়া যাইত, শত শত ব্য স্থানাভাবে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেন। কয়েকজন হিন্দুধর্মগ্রহণাভিলা ব্যক্তিকে দীক্ষা প্রদান করিয়া স্বামিজী ডিট্রয়েট হইতে বোষ্টনে গমন করিলে স্বামী কৃপানন্দ ডিট্রয়েটে প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে মিঃ ফক্স দর্শনশাখার গ্রাজুয়েট ছা গণের সম্মুখে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য স্বামিজীকে আহ করিলেন। স্বামিজী আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। বিবিধ দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডি অধ্যাপক ও শত শত গ্রাজুয়েট ছাত্রের সম্মুখে স্বামিজী ২৫শে মার্চ 'বেদা দর্শন' সম্বন্ধে একটি গভীর তত্ত্বসমন্বিত বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ঐ বক্তৃ ছাত্রদের আগ্রহাতিশয্যে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। অধ্যাপক রেভাঃ এভা (Rev. C. C. Everett, D.D., LL.D.). আনন্দের সহিত উহার এক ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন:

"স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে এবং তাঁহার কর্ম সম্বন্ধে সর্বা কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়াছেন; হিন্দু চিন্তাপ্রণালী অপেক্ষা অধিকতর হৃদয় বিষয় আর নাই। হেগেল বলেন, স্পিনোজার মত-ই সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বের গোড়া কথা। বেদান্তদর্শন সম্বন্ধেও এই অভিমত প্রকাশ করা যাইতে পারে। বিবেকানন্দ আমাদিগকে এই শিক্ষা এরূপ সফলতার সহিত প্রদান করিতে পারিয়াছেন, যে তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।"

নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী বেদান্তালোচনা ও যোগশিক্ষার জ একটি স্থায়ী কেন্দ্র গঠন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এদিকে ইংলণ্ড হইতে পুনঃ পুনঃ আহ্বান আসিতে লাগিল। স্বামিজী ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাব

করিবেন ইহা পূর্বেই স্থির হইয়াছিল। তদনুসারে শিষ্য ও ভক্তবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বামিজী স্থায়ীরূপে নিউইয়র্কে একটি 'বেদান্ত সোসাইটি' স্থাপন করিলেন। প্রসিদ্ধ ধনী মিঃ ফ্রান্সিস এইচ. লিগেট্ মহোদয় গুরুদেবের সম্মতি ও ইচ্ছাক্রমে উক্ত সমিতির সভাপতি হইলেন। সিস্টার হরিদাসীকে স্বামিজী শক্তিসঞ্চার ও আশীর্বাদ করিয়া যোগশিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলেন। স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ, যোগানন্দ এবং কতিপয় ব্রহ্মচারী বেদান্তের প্রচারক নিযুক্ত হইলেন। দানশীলা মিস্ মেরী ফিলিপস্, মিসেস্ আর্থার স্মিথ, মিঃ এবং মিসেস্ ওয়াল্টার গুডইয়ার এবং প্রসিদ্ধা গায়িকা মিস্ এমা থার্সবি প্রভৃতি নিউইয়র্কস্থ প্রতিষ্ঠাবান্ শিষ্য ও শিষ্যাগণ উৎসাহের সহিত সমিতির কার্য চালাইতে লাগিলেন। শিষ্যবর্গের সম্মতি ও অনুরোধে স্বামিজী তাঁহার গুরুভাই স্বামী সারদানন্দজীকে সত্বর ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। ইংলণ্ড হইতে উক্ত স্বামিজীকে নিউইয়র্কে প্রেরণ করিবেন অঙ্গীকার করিয়া আচার্যদেব ১৮৯৬-এর ১৫ই এপ্রিল পুনরায় লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রায় তিন বৎসরকাল তাঁহার আমেরিকায় প্রচারকার্যের গৌরবময় ইতিহাস আলোচনা করিলে ভক্তি, বিস্ময় ও সম্ভ্রমে অতি অবিশ্বাসীরও মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। স্বজাতির, স্বদেশের, স্বধর্মের, মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি যে-ভাবে ভারতীয় দর্শন প্রচার করিয়াছেন, তাহা চিরদিনই জগতের ইতিহাসে একটি শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিবার অধ্যায়রূপে বিরাজিত থাকিবে। শিকাগো বিদুষী সমাজের অন্যতমা নেত্রী মিসেস্ লিগেট্ সত্যই বলিয়াছেন—"A Grand Seigneuor. In all my experience I have met but two celebrated personages that could make one feel perfectly at ease without themselves for an instant losing their own dignity—one the German Emperor, the other, Swami Vivekananda."

অর্থাৎ "তিনি (বিবেকানন্দ) সত্যই মহানুভব ছিলেন। আমার জীবনে দুইজন সুবিখ্যাত ব্যক্তির সহিত দেখা হইয়াছে, যাঁহারা ব্যক্তিগত মর্যাদা কোন অবস্থাতেই ক্ষুণ্ণ না করিয়া অনাড়ম্বরে প্রত্যেককেই উহা অনুভব করাইতে পারেন—একজন জার্মান সম্রাট্, অপর স্বামী বিবেকানন্দ।"

আমেরিকা হইতে আচার্যদেবের পত্র পাইয়া স্বামী সারদানন্দ কালবিলম্ব না করিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এপ্রিল মাসের প্রথম হইতে মিঃ ই. টি. ষ্টার্ডির অতিথিরূপে বাস করিয়া পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত আলোচনা সমিতিতে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। আচার্যদেব লণ্ডনে আসিয়া তাঁকে ষ্টার্ডি সাহেবের ভবনে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সারদানন্দজীও যে বহুদিন-নিরুদ্দিষ্ট 'নেতা শ্রীনরেন্দ্রনাথকে' দেখিয়া সমধিক উল্লসিত হইলেন, ইহা বলাই বাহুল্য! আচার্যদেব আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট আলমবাজার মঠের ও অন্যান্য রামকৃষ্ণভক্তগণের কুশল সংবাদ অবগত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

সারদানন্দজী ও স্বামিজী লণ্ডনের সেণ্ট জর্জেস্ রোডে মিস্ মুলার ও মিঃ ষ্টার্ডির অতিথিরূপে বাস করিয়া পূর্ণ উদ্যমে ও উৎসাহের সহিত প্রচারকার্য আরম্ভ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, এ সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র দলে দলে শিক্ষিত নরনারী তাঁহার দর্শন কামনায়, কেহ বা উপদেশ লাভের জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার কার্যপ্রণালীর বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। মে মাসের প্রথম হইতে

স্বামিজী নিয়মিতরূপে শিক্ষাদান ও প্রশ্নোত্তর ক্লাস চালাইতে লাগিলেন এবং 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। মে মাসের শেষভাগে তিনি ভক্তি, কর্ম ও যোগ সম্বন্ধেও কতকগুলি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ক্লাব, সভা, সমিতি, ড্রয়িংরুম ইত্যাদিতে বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি প্রত্যহ আহূত হইতে লাগিলেন। মিসেস্ আনি বেশান্ত কর্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার অ্যাভিনিউ রোডস্থ ভবনে একদিন স্বামিজী 'ভক্তি' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। কর্ণেল অল্‌কটও উক্তদিবস তথায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ ৬ই জুন 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—"স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারকার্য এখানে সুন্দররূপে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ দলে দলে নরনারী তাঁহার বক্তৃতা-ক্লাসে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলিও বাস্তবিক কৌতূহলোদ্দীপক। সেদিন এ্যাংলিকান চার্চের অন্যতম নেতা মিঃ ক্যানন হাউইস (Haweis) তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি শিকাগো মহামেলাতেই স্বামিজীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সেই সময় হইতেই ভালবাসেন। মঙ্গলবার স্বামিজী 'Sesame Club'-এ 'শিক্ষা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য মহিলাগণ এই অতি প্রয়োজনীয় সমিতিটি স্থাপন করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত আধুনিক প্রথার তুলনা করিয়া দেখাইলেন যে, মানুষ গড়িয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিবিধ প্রকার তথ্য দিয়া মস্তিষ্ক পূর্ণ করা নহে।" তিনি যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, মানুষের মনই অনন্ত জ্ঞানের খনি; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত জ্ঞানই উহাতে ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। মানবের অন্তর্নিহিত ঐ জ্ঞানের বহির্বিকাশের সাহায্য করাই প্রত্যেক প্রকার শিক্ষা-প্রণালীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তিনি উপমা দিলেন যে, যেমন 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' বিষয়ক জ্ঞান পূর্ব হইতেই মানুষের অন্তরে বিদ্যমান ছিল, আপেলের পতনটি নিউটনের পক্ষে উক্ত জ্ঞানের বিকাশের সহায়তা করিল মাত্র।

মিসেস্ মার্টিন নাম্নী জনৈকা বিদুষী ও ধনাঢ্যা রমণী একদিন তাঁহার আলয়ে স্বামিজীকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। তিনি 'আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৪ই জুনের 'The London American' পত্রিকা এই বক্তৃতার সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

> "স্বামিজী হিন্দুধর্মকে কেবল জড় ও অন্ধ পৌত্তলিকতার অপবাদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন তাহা নহে, বরং ইহাকে এমন এক সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, ইহার প্রতি মানবজাতির শ্রদ্ধা না হইয়া থাকিতে পারে না। * * * বুধবার দিবস অতীব দুর্যোগ সত্ত্বেও বহুসংখ্যক ভদ্রলোক ও মহিলা মিসেস্ মার্টিনের আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন; এমনকি, রাজপরিবার হইতেও কয়েকজন গোপনভাবে উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামিজী অক্সফোর্ড গিয়া ২৮শে মে জগদ্বিখ্যাত আচার্য মোক্ষমূলরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মোক্ষমূলর ইতোপূর্বে 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় 'প্রকৃত মহাত্মা' শীর্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, উহা পাঠ করিয়া বিবেকানন্দ পূর্ব হইতেই অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে আচার্য বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে

আসিয়া কেশবের ধর্মমতের সহসা পরিবর্তনই সর্বপ্রথম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন হইতেই ঐ মহাত্মার জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে যেখানে যতটুকু পান, তাহাই তিনি আগ্রহ ও শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিয়া আসিতেছেন। স্বামিজীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্র ও উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া অধ্যাপক বলিলেন যে, যদি তিনি তাঁহাকে আবশ্যক মত উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি জীবনী লিখিতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, স্বামিজী আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে অধ্যাপক প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ' নামক বিখ্যাত পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। উহা বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে প্রচারকার্যের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে অবশেষে স্বামিজী যখন বলিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ আজকাল সহস্র সহস্র ব্যক্তি কর্তৃক উপাসিত হইতেছেন"—অধ্যাপক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "যদি এইরূপ মহাপুরুষ উপাসিত না হন, তাহা হইলে কাহার উপাসনা হইবে?" স্বামিজীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া অধ্যাপক উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তাঁহাকে জগতের নিকট পরিচিত করিবার জন্য আপনারা কি করিতেছেন?" কথায় কথায় স্বামিজীর প্রচারকার্যের কথা উঠিল। অধ্যাপক স্বামিজীর বেদান্ত প্রচারকার্যের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন। ভোজনান্তে অধ্যাপক স্বামিজী ও তাঁহার শিষ্য ষ্টার্ডি সাহেবকে লইয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও 'Bodleian Library' দেখাইলেন। স্বামিজী অধ্যাপকের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অসীম জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভারতবর্ষের প্রতি অধ্যাপকের অসীম ভালবাসা স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীকে মুগ্ধ করিল। বিবেকানন্দ উল্লাসের সহিত প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কবে ভারতে যাইবেন? যিনি আমাদিগের পূর্বপুরুষের চিন্তাসমূহ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকলেই আনন্দের সহিত প্রস্তুত হইবে সন্দেহ নাই।" অধ্যাপকের প্রশান্ত বদনমণ্ডল সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অশ্রুভারাক্রান্তনেত্রে একরূপ অজ্ঞাতসারেই তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে হয়ত আর আমি ফিরিব না: আমার দেহ আপনাদিগকে তথায়ই সৎকার করিতে হইবে।" * * * রাত্রিকালে স্বামিজী যখন স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধ অধ্যাপক ঝড়বৃষ্টি সত্ত্বেও স্বামিজীকে বিদায়াভিনন্দন দিবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী লজ্জিত হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আমাকে বিদায় দিবার জন্য আপনি এত কষ্ট করিয়া না আসিলেই পারিতেন।" অধ্যাপক প্রীতিছলছলনেত্রে উত্তর করিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের একজন যোগ্যতম শিষ্যের দর্শনলাভের সৌভাগ্য প্রত্যহ উপস্থিত হয় না।" এই দর্শনেই অধ্যাপকের সহিত স্বামিজীর প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। স্বামিজী আজীবন অধ্যাপকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। যদিও আর উভয়ের দেখাসাক্ষাতের সুবিধা হয় নাই, তাহা হইলেও তাঁহারা নিয়মিতভাবে পত্র দ্বারা পরস্পরের কুশল সংবাদ অবগত হইতেন।

যে সমস্ত ইংরাজ শিষ্যা ও শিষ্য স্বামিজীর কার্যে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মিস্ মূলার, মিস্ নোবল্ (নিবেদিতা), মিঃ গুডউইন, মিঃ ষ্টার্ডি প্রভৃতির কথা আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আগমন করিয়া স্বামিজী ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও শ্রীমতী সেভিয়ারকে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হন। এই ধর্মপ্রাণ সেভিয়ার-দম্পতি তাঁহার ভারতীয় কার্যের

জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। মিসেস্ সেভিয়ার শিষ্যা হইয়াও স্বামিজীর মাতৃস্থানীয়া হইয়াছিলেন; স্বামিজী তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন।

ইতোমধ্যে সেভিয়ার-দম্পতি ও মিস্ মুলার স্বামিজীকে লইয়া সুইজারল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করিতে যাইবেন সঙ্কল্প করিলেন; তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কয়েক মাস কঠোর পরিশ্রমের পর তাঁহার বিশ্রাম করিবার একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল।

জুলাই মাসের শেষভাগে শিষ্য ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে স্বামিজী লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া জেনিভা নগরীতে উপনীত হইলেন। তখন জেনিভা নগরীতে একটি শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামিজী সুইজারল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, উৎসাহভরে সমস্ত দিবস প্রদর্শিত দ্রব্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে একটি বেলুন দেখিয়া তিনি বেলুনে উঠিবার জন্য অধীরভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সূর্যাস্তের পূর্বে বেলুন আকাশে উড়িবে না শুনিয়া স্বামিজী বালকের ন্যায় অধীরভাবে সঙ্গিগণকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, এখনও কি সময় হয় নাই? মিসেস্ সেভিয়ার আকাশ-ভ্রমণটা নিরাপদ নহে মনে করিয়া আপত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী তাঁহার কোনপ্রকার আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না, বরং তাঁহাকে পর্যন্ত বেলুনে উঠিতে বাধ্য করিলেন। সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। ঊর্ধ্ব হইতে সূর্যাস্তের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া স্বামিজী অতীব আনন্দিত হইলেন। বেলুন হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা সকলে ফটো তুলিয়া প্রফুল্লচিত্তে হোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন।

জেনিভা হইতে স্বামিজী সদলে 'Castle of Chillon' দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন। তথায় তিনদিবস থাকিয়া 'Mont Blanc' অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদমালাপরিশোভিত মনোরম পার্বত্য প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া স্বামিজীর পরিব্রাজক জীবনের মধুর স্মৃতিসমূহ মানসপটে জাগিয়া উঠিল। হিমালয়ের শান্তিশীতল ক্রোড়ে আশ্রম রচনা করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবার একটা প্রবলতম আগ্রহ তাঁহার বহুদিন হইতে ছিল। সঙ্গিগণের নিকট হিমালয়ের সৌন্দর্য বর্ণন করিতে করিতে স্বামিজী বলিলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, হিমালয়ে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া অবশিষ্ট জীবন ধ্যান ও তপস্যায় কাটাইয়া দেই। উক্ত মঠে আমার ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ অবস্থান করিবে, আমি তাহাদিগকে 'কর্মী' রূপে গঠন করিয়া তুলিব। ভারতীয়রা পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচারকার্যে ব্রতী হইবে, অপরদল ভারতের উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে।" স্বামিজীর শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্কল্প অবগত হইয়া উৎসাহের সহিত বলিলেন, "নিশ্চয়ই স্বামিজী! ভবিষ্যৎ কার্যের জন্য এইরূপ একটি মঠ আমাদের একান্ত আবশ্যক।" আলপস্ পর্বতশিখরে বসিয়া স্বামিজী শিষ্যবৃন্দের সহিত যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা পরে আলমোড়া মায়াবতী মঠরূপে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

অতঃপর কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা দুই সপ্তাহের জন্য একটি পার্বত্য গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। চারিদিকে তুষারমণ্ডিত আলপস্ পর্বতের শৃঙ্গমালাবেষ্টিত স্তব্ধ গ্রামখানিতে আসিয়া স্বামিজী যেন জগতের কর্মকোলাহল স্বীয় প্রচারকার্য, দার্শনিক বিচার ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখ হইয়া উঠিল। স্বামিজীর অভিপ্রায় বুঝিয়া কেহই তাঁহাকে বিরক্ত করিতেন না, তিনি নীরবে অধিকাংশ সময়েই ধ্যানমগ্ন হইয়া

থাকিতেন। দুই সপ্তাহের পরিপূর্ণ বিশ্রামে স্বামিজীর দীর্ঘবর্ষত্রয়ের শ্রম-ক্লান্তি যেন অপনোদিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হইল।

ইতোমধ্যে জার্মানীর কীলনগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পল ডয়সন স্বামিজীকে আহ্বান করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। উহা লণ্ডন হইতে স্বামিজীর ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল। স্বামিজী পত্রখানা পাইয়া জার্মানী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পথিমধ্যে জার্মানীর কয়েকটি ইতিহাস-প্রখ্যাত নগর ও রাজধানী দর্শন করিয়া (Kiel) কীলনগরীতে উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী আসিয়াছেন শুনিয়া অধ্যাপক তাঁহাকে প্রাতর্ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেভিয়ার-দম্পতিকেও নিমন্ত্রণ করিতে অবশ্য অধ্যাপক ভুলেন নাই। পরদিন প্রভাতে ১০টার সময় তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র অধ্যাপক ও তৎপত্নী তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামিজীর প্রচারকার্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াই অধ্যাপক বেদ ও উপনিষদ সম্বন্ধে স্বরচিত একখানি গ্রন্থ হইতে স্বামিজীকে পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। অধ্যাপক বলিলেন যে, বেদ ও বেদান্তের মধুর মোহিনী শক্তি ক্ষণকালের মধ্যেই বাহ্যজগৎ ভুলাইয়া দেয়, উহা পড়িতে আরম্ভ করিলেই মন এক উন্নত আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে চলিয়া যায়। অধ্যাপকের মতে, মানব-মস্তিষ্ক সত্যের অনুসন্ধানে রত হইয়া যে সমস্ত বিষয় আবিষ্কার করিয়াছে, উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন ও শাঙ্করভাষ্য তাহার শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। বেদান্তের চর্চাই অধ্যাপকের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। ইঁহার সহিত বেদান্ত ও উপনিষদের আলোচনা করিয়া স্বামিজী প্রীত হইলেন। অধ্যাপক ডয়সন বেদান্ত বা উপনিষদ্‌কে কেবলমাত্র সূক্ষ্ম দর্শনশাস্ত্র না বলিয়া উচ্চতম ও পবিত্রতম নৈতিকজীবন যাপন করিবার একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দেশ করিলেন। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখায় ১৮৮৩ সালে তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উপসংহারে নিম্নোদ্ধৃত অংশ স্বামিজীকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন— "And so the Vedanta in its unfalsified form, is the strongest support of pure morality, is the greatest consolation in the sufferings of life and death. Indians keep to it."—অবিকৃত বেদান্ত-দর্শন, পবিত্র নীতি-সমূহের সুদৃঢ় ভিত্তি এবং জীবন ও মৃত্যুর দুঃখসমূহের পরম সান্ত্বনার স্থল। হে ভারতবাসি! ইহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাক। স্বামিজী তাঁহাকে স্বীয় উপলব্ধি হইতে উপনিষদের কতকগুলি জটিল ও দুর্বোধ্য শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। প্রাতর্ভোজনের পরও অধ্যাপক তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন না, এমনকি মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যও অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সেদিন অধ্যাপকের একটি কন্যার জন্মতিথি ছিল, কাজেই তাঁহার শ্রদ্ধেয় অতিথিকে বিদায় দিতে পারিলেন না। অধ্যাপক-দম্পতি তাঁহাদের ভারতভ্রমণ কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বামিজী মধুর ব্যবহারে অধ্যাপকের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন।

নানাপ্রকার আলোচনা চলিতেছে, এমন সময় অধ্যাপক কার্যান্তরে উঠিয়া গেলেন; স্বল্পকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, স্বামিজী একখানি কবিতা পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছেন। তিনি এত অভিনিবেশ সহকারে পড়িতেছিলেন যে, অধ্যাপকের আহ্বান তাঁহার কর্ণে পৌঁছিল না। পুস্তকখানি শেষ করিয়া স্বামিজী অধ্যাপকের প্রতি চাহিয়া বুঝিলেন যে, তিনি অনেকক্ষণ তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "পুস্তকখানি পাঠ করিতেছিলাম। আপনি হয়তো অনেকক্ষণ আসিয়াছেন, ক্ষমা করিবেন।" উত্তর

শুনিয়া অধ্যাপক যে কথাটা বিশ্বাস করিলেন না, তাহা তাঁহার ভাবভঙ্গিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। স্বামিজী তাহা বুঝিতে পারিয়া কথোপকথনের মধ্যে উক্ত পুস্তক হইতে পঠিত কথাগুলি অনর্গল আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বিস্ময়ের সহিত অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন, "এ পুস্তকখানি নিশ্চয় আপনি ইতোপূর্বে পাঠ করিয়াছেন, নতুবা কেবলমাত্র চোখ বুলাইয়া চারিশত পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে আয়ত্ত করা কেবল দুঃসাধ্য নহে—অসাধ্য!"

স্বামিজী স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "সংযতমনা যোগীর পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। আমার মতে এই ক্ষমতা সকলেই লাভ করিতে পারে। আপনি জানেন আমি কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসী। আজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের ফলস্বরূপ এই ক্ষমতা স্বতঃই আমাতে উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে অনেকেই ইহা বিশ্বাস নাও করিতে পারেন, কিন্তু ভারতে ব্রহ্মচর্যবলে এরূপ স্মৃতিশক্তির অধিকারী বিরল হইলেও একেবারে অদৃশ্য হয় নাই।"

অধ্যাপক স্বামিজীর যুক্তি শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির কথা আমরা অবগত আছি। বাল্যকালে স্বামিজীর প্রখর প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এরূপ অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি নহে। খেতরিতে ব্যাকরণ পাঠকালীন তিনি যে প্রতিভার ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, উহা দৈবশক্তি নহে, বহুবর্ষব্যাপী অটুট সংযম ও কঠোর সাধনায় তাঁহার ব্রহ্মচর্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্যের প্রত্যেকটি ব্রত তিনি শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। বিবাহ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার ব্যাপারের স্মৃতি পর্যন্ত যাহাতে মনে স্থান না পায়, ইহাই তাঁহার সন্ন্যাসের আদর্শ ছিল। শিষ্যবর্গকে, এমনকি, নিজেকে পর্যন্ত ঐ সম্বন্ধীয় আশঙ্কা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মচর্যরূপ মহৎ ব্রতের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং বলিতেন যে, শরীর ও মনের উচ্চতম শক্তিগুলির বিকাশের জন্য ব্রহ্মচর্যব্রত জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় শিরায় শিরায় প্রবাহিত থাকা চাই। নির্জন বাস, সংযম ও গভীর চিত্তৈকাগ্রতা—এই তিনের সমবায়ে গঠিত জীবনই ব্রহ্মচর্যের আদর্শ! স্বামিজী প্রায়ই যুবকবৃন্দকে ব্রহ্মচর্য পালনে প্রোৎসাহিত করিতে গিয়া ভাবাবেগে দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, "যদি তোমরা কামক্রোধাদির শত প্রলোভনেও অবিচলিত থাকিয়া চতুর্দশ বৎসর সত্যের সেবা করিতে পার, তবে এমন এক দিব্যতেজে তোমাদের হৃদয় পূর্ণ হইবে যে, তোমরা যাহা অসত্য বলিয়া জান, তাহা সাধারণ লোকে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে না। এইরূপে তুমি স্বদেশ ও সমাজের উপকারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে।" এমনকি, কেবলমাত্র অবিবাহিত জীবন যাপন করাটাও তাঁহার নিকট একটা মহৎ আধ্যাত্মিক সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইত। ধর্মের জন্য অথবা অন্য কোন মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অবিবাহিত জীবন যাপন করাটা অনেকেই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাভিচার বলিয়া নির্দেশ করেন। বিবাহিত জীবনের উচ্চ আদর্শকে অবশ্য স্বামিজী কখনই অশ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস উভয় আশ্রমকেই তুল্যদৃষ্টিতে দেখিতেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহিত জীবনের এক মহান্ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন সত্য কিন্তু তথাপি তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি আজন্ম সন্ন্যাসী হইয়াও বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। আদর্শ গৃহী ও আদর্শ সন্ন্যাসী, মানব-সমাজে দুয়েরই প্রয়োজন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এতদ্ উভয় আদর্শই পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল।

স্থূলদৃষ্টি মানবের পক্ষে তাঁহাকে এককালে গৃহী ও সন্ন্যাসীরূপে দেখা অসম্ভব ও দুঃসাধ্য হইবে বলিয়াই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি স্বামী বিবেকানন্দ ও নাগ মহাশয়। এক আদর্শ সন্ন্যাসী, অপর আদর্শ গৃহী!

বিবাহ করিয়া কি ধর্মসাধন বা অন্য কোন মহৎ কার্য করা যায় না? যাইবে না কেন, মোক্ষ কেবলমাত্র সন্ন্যাসীর একচেটিয়া পদার্থ নহে। তবে জনক ঋষি গৃহী হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এই এক নজীর খাড়া করিয়া যাঁহারা জনক ঋষি হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই কতকগুলি হতভাগা ছেলের জনক মাত্র, ঋষি জনক নহেন। গৃহে থাকিয়া ধর্মসাধন করা, যোগ ও ভোগ দুই-ই বজায় রাখিয়া মোক্ষলাভ করাই নাকি খুব বাহাদুরী! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ভুলিয়া যান যে, বাহাদুরী লওয়াটা জীবনের উদ্দেশ্য নহে। আর ইহাও ঠিক, সকলেই যদি বাহাদুরী দেখাইতে ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে মানব-জীবনের উচ্চতম ব্রতগুলি লুপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

অবিবাহিত জীবন যাপন করার আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া স্বামিজী মর্মান্তিক দুঃখ ও অভিমানের সহিত লণ্ডন হইতে লিখিয়াছিলেন, "* * * লণ্ডনের কার্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে; যতই দিন যাইতেছে, ততই ক্লাসে অধিক লোক-সমাগম হইতেছে। শ্রোতৃসংখ্যা যে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আর ইংরেজ জাতি বড়ই দৃঢ়প্রকৃতি ও নিষ্ঠাবান্। অবশ্য আমি চলিয়া গেলেই যতটা গাঁথনি হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পড়িয়া যাইবে; কিন্তু তারপর হয়ত কোন অসম্ভাব্য ঘটনা হইবে, হয়ত কোন দৃঢ়চেতা ব্যক্তি আসিয়া এই কার্যের ভার গ্রহণ করিবেন, প্রভু জানেন কিসে ভাল হইবে। আমেরিকায় বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দিবার জন্য বিশজন প্রচারকের স্থান হইতে পারে, কিন্তু কোথা হইতে বা প্রচারক পাওয়া যাইবে, আর তাহাদিগকে তথায় আনিবার জন্য টাকাই বা কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি কয়েকজন দৃঢ়চেতা খাঁটী লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের অর্ধেক জয় করিয়া ফেলা যাইতে পারে। কোথায় এরূপ লোক?

"আমরা যে সবাই আহাম্মকের দল—স্বার্থপর, কাপুরুষ! মুখে স্বদেশ-হিতৈষণার কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াইতেছি, আর আমরা মহাধার্মিক এই অভিমানে ফুলিয়া রহিয়াছি। মাদ্রাজীরা অপেক্ষাকৃত চট্‌পটে ও দৃঢ়তা সহকারে একটা বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু হতভাগাগুলি সকলেই বিবাহিত! বিবাহ! বিবাহ!! বিবাহ!!! পাষণ্ডেরা যেন ঐ একটা কর্মেন্দ্রিয় লইয়া জন্মিয়াছে —যোনিকীট—এদিকে আবার নিজেদের ধার্মিক ও সনাতন-পথাবলম্বী বলিয়া পরিচয়টুকু দেওয়া আছে! অনাসক্ত গৃহস্থ হওয়া অতি উত্তম কথা, কিন্তু এখন উহার ততটা প্রয়োজন নাই, চাই এখন অবিবাহিত জীবন! যাক্ বালাই! বেশ্যালয়ে গমন করিলে লোকের মনে ইন্দ্রিয়াসক্তির যতটা বন্ধন উপস্থিত হয়, আজকালকার বিবাহ প্রথায় ছেলেদের ঐ বিষয়ে প্রায় তদ্রূপ বন্ধন উপস্থিত হয়। এ আমি বড় শক্ত কথা বলিলাম, কিন্তু বৎস, আমি চাই এমন লোক—যাহাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত হইবে; আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ! আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি, যাহাদের উপর সব আশা করা যায়, তাহাদের সব গুণ, সব শক্তি আছে, কেবল যদি এইরূপ লাখ লাখ ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত পশুত্বের বেদীর সমক্ষে হত্যা না করা হইত। হে প্রভো, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত কর। মাদ্রাজ তখনি জাগিবে, যখন উহার হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ

অন্ততঃ একশত শিক্ষিত যুবক সংসার হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া কোমর বাঁধিবে এবং দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে। ভারতের বাহিরে এক ঘা দিতে পারিলে, উহার ভিতরের অযুত ঘায়ের তুল্য হয়। যাহা হউক, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, সব হইবে।"

স্বামিজী সত্বরই লণ্ডন যাত্রা করিবেন শুনিয়া অধ্যাপক আরও কিছুদিন তাঁহাকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী বলিলেন যে, তিনি শীঘ্রই ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন, অতএব যাত্রার পূর্বেই ইংলণ্ডের প্রচারকার্যের একটা সুবন্দোবস্ত করার একান্ত প্রয়োজন। অধ্যাপক স্বামিজীর উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাঁহার সহিত ইংলণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বামিজীর সহিত বেদান্তালোচনা করিয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র স্বামিজীর সঙ্গে কিছুদিন যাপন করিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার সহিত লণ্ডনে উপনীত হইলেন।

জুন মাসের শেষ ভাগে স্বামিজী, সারদানন্দজীকে আমেরিকায় প্রেরণ করিলেন। এদিকে ভারত হইতে অভেদানন্দজী আসিয়া লণ্ডনের কার্যে স্বামিজীর সহায় হইলেন। স্বামিজীর অনুপস্থিতকালে, ভারতীয় দর্শনে সুপণ্ডিত অভেদানন্দজীকেই প্রচারকার্যের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া স্বামিজী তাঁহাকে আবশ্যকমত শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে স্বামিজী অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি বক্তৃতা করিলেন। এই সুকঠিন কার্যে তিনি যে আশাতীতরূপে কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা 'জ্ঞানযোগ'খানি অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার 'জ্ঞানযোগে'র বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই প্রশ্ন আসে, ইহা কি কেবল পাণ্ডিত্য না আর কিছু? 'কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ' শীর্ষক বক্তৃতাগুলির মধ্য দিয়া তিনি ভবিষ্যৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক মহান্ আদর্শের অনুগামী হইবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইউরোপ যে আদর্শে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে হিন্দুর অদ্বৈতবাদ ও বেদান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। কেবলমাত্র জড়বিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া বর্তমান ইউরোপ যে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সে জ্বালাময় বিশ্বশোষী তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে একমাত্র প্রাচ্যের প্রাচীন দর্শন, ধর্ম ও অপূর্ব অদ্বৈতবেদান্ত। স্বামিজী ইউরোপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তির জ্বালাময় আগ্নেয়গিরির উপর যে চাকচিক্যময়, বাহ্যসম্পদশালী সভ্যতার স্বর্ণপুরী নির্মাণ করিয়াছেন, উহা যে-কোন মুহূর্তেই গৈরিক-নিঃস্রাবে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। আরও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "যদি তোমরা এই অভিনব বার্তাকে অস্বীকার কর, তাহা হইলে ভাবী পঞ্চাশৎ-বর্ষমধ্যে তোমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী!"

অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ হইতে স্বামিজী ভারতে ফিরিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমেরিকায় স্বামী সারদানন্দ ও ইংলণ্ডে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত ক্লাসের ছাত্র-সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছেন দেখিয়া স্বামিজী প্রচারকার্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। মিসেস্ ওলি বুল স্বামিজীর ভারতযাত্রার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি ভারতীয় কার্যের জন্য প্রয়োজনমত অর্থ প্রদান করিতে সম্মত আছেন। বিশেষতঃ স্বামিজী রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের জন্য

যে একটি স্থায়ী মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। স্বামিজী ইচ্ছা করিলেই প্রয়োজনমত অর্থ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। স্বামিজী মিসেস্ বুলের পত্র পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। আড়ম্বরের সহিত কোন কার্য আরম্ভ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। মাদ্রাজ, কলিকাতা ও হিমালয়ে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ধীরভাবে কার্য আরম্ভ করাই তিনি ভাল মনে করিলেন। মিসেস্ বুলকে পত্রোত্তরে স্বীয় মত জানাইয়া লিখিলেন যে, তিনি ভারতে গিয়া তাঁহাকে বিস্তারিত জানাইবেন। আপাততঃ কোনপ্রকার অর্থাদি গ্রহণ করিতে তিনি ইচ্ছা করেন না।

আচার্যদেব ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিবেন জানিতে পারিয়া ইংলণ্ডের বন্ধু ও শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে বিদায়াভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার 'Royal Society of Painters' সমিতির পিকাডেলীর প্রকাণ্ড হলে একটি সভা আহ্বান করিলেন। বিরাট জনসঙ্ঘ নীরবে বিষাদগম্ভীরভাবে আচার্যদেবকে বিদায়াভিনন্দন প্রদান করিলেন। অনেকে ভাবের আতিশয্যে কথা কহিতে পারিলেন না, শত শত নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। এ দৃশ্য দেখিয়া আচার্যদেবের কোমল হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত ঋষি, করুণাকাতর সন্ন্যাসী সহসা বলিয়া ফেলিলেন :—

"হয়ত আমি শ্রেয়ঃ মনে করিয়া এই দেহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারি, ইহাকে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু যে পর্যন্ত জগতের প্রত্যেকেই উচ্চতম সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিতেছে, ততদিন আমি মানবজাতির কল্যাণ কামনায় ধর্ম প্রচারে বিরত হইব না।"

ইহার কিছুদিন পরে একব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, অবতার ও মুক্তপুরুষের মধ্যে প্রভেদ কি? স্বামিজী প্রত্যক্ষভাবে তাহার কোন উত্তর না দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার মনে হয়, 'বিদেহ মুক্তি'ই সর্বোচ্চ অবস্থা। আমার সাধনাবস্থায় যখন আমি ভারত ভ্রমণে রত ছিলাম, তখন আমি দিনের পর দিন নির্জন গিরিগুহায় ধ্যান করিয়া কাটাইয়াছি, সময় সময় মুক্তিলাভ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অনাহারে তনুত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; কিন্তু এখন আমার বিন্দুমাত্রও মুক্তিলাভ করিবার কামনা নাই। যে পর্যন্ত একজন ব্যক্তিও মায়ায় বদ্ধ থাকিবে, সে পর্যন্ত আমি মুক্তি প্রার্থনা করি না। সমষ্টিমুক্তি ব্যতীত ব্যষ্টিমুক্তি সম্ভব নয়।"

প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও জননায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ১৮৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডন হইতে লিখিয়াছিলেন :—

"ভারতে কতকগুলি ব্যক্তির ধারণা যে, ইংলণ্ডে বিবেকানন্দের বক্তৃতা সবিশেষ ফলদায়ক হয় নাই, তাঁহার বন্ধু ও সমর্থকগণ সামান্য কার্যকে অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমি এখানে আসিয়া তাঁহার অসাধারণ প্রভাব সর্বত্রই দেখিতেছি। ইংলণ্ডের নানাস্থানে আমি বহু ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছি, যাঁহারা প্রকৃতপক্ষেই বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করেন। যদিও আমি তাঁহার সমাজভুক্ত নহি এবং ইহাও সত্য যে, তাঁহার সহিত আমার মতভেদও আছে, তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে, তিনি সত্য সত্যই বহু ব্যক্তির চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছেন ও তাহাদের হৃদয় উদার এবং প্রশস্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারকার্যের ফলেই আজকাল অধিকাংশ ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহে বহু আধ্যাত্মিক সত্য লুক্কায়িত আছে। তিনি স্থানীয় জনসাধারণের মনে কেবলমাত্র এইসব ভাবই প্রদান

করেন নাই, পরন্তু তিনি ভারত ও ইংলণ্ডকে এক সুবর্ণময় যোগসূত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। ইতোপূর্বে আমি মিঃ হাউইস্ (Howeis) লিখিত 'The Dead Pulpit' নামক প্রবন্ধ হইতে 'Vivekanandism' সম্বন্ধে যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই আপনি অবগত হইয়াছেন যে, বিবেকানন্দ-প্রচারিত মতবাদের প্রসারতা হেতু বহুশত ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টান চার্চের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন। * * * এতদ্ব্যতীত আমি বহু শিক্ষিত ইংরেজ ভদ্রলোককে দেখিয়াছি, যাঁহারা ভারতকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন এবং ভারতীয় ধর্মমত ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ শ্রবণ করিবার জন্য সততই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।"

স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে গমন এবং প্রচারকার্যের সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিজেই সম্যক সচেতন ছিলেন। তাঁহাকে প্রতি সপ্তাহে বারটি, চৌদ্দটি, কখনো বা ততোধিক বক্তৃতা করিতে হইত। এক এক সময় নূতন কি বলিব ভাবিয়া তিনি আকুল হইতেন। কিন্তু যিনি তাঁহাকে পাশ্চাত্যদেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনিই যেন সব যোগাইয়া দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহার চালকরূপে শক্তিসঞ্চার করিতেন, ইহা তিনি অনুভব করিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, গভীর রজনীতে তিনি কতদিন শুনিয়াছেন, পরবর্তী দিবস যে বক্তৃতা করিতে হইবে, তাহা যেন কে অনর্গল বলিয়া যাইতেছে। নূতন তত্ত্ব ও নূতন ভাবে ভরা এই বাণী যে শ্রীরামকৃষ্ণের তাহাতে তাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বার্তাবাহী যন্ত্রের মত তিনি কেবল তাঁহার বাণীই প্রচার করিতেন। এই কালে তাঁহার মধ্যে ঐশীশক্তির পরমাশ্চর্য বিকাশ ঘটিয়াছিল। দেখিবামাত্র তিনি লোকের অন্তর্নিহিত সমস্ত গুপ্তকথা জানিতে পারিতেন। স্পর্শমাত্র অপরের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতে পারিতেন। কিন্তু যোগলব্ধ এই সকল শক্তি স্বামিজী কদাচিৎ প্রয়োগ করিতেন।

পাশ্চাত্যের সহস্র সহস্র নরনারী কেবল তাঁহার চিত্তোন্মাদিনী বক্তৃতার মোহিনী-শক্তিতে আকৃষ্ট হয় নাই; সত্য ও প্রেমের অকপট ও অমোঘ শক্তিই তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "জগদেকারাধ্য আচার্যদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে যে অমূল্য স্মৃতির সম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার মনুষ্যজাতির প্রতি প্রেমই যে উজ্জ্বলতম রত্ন, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নির্দেশ করিতে পারি।" কি গভীর অনুকম্পা-উচ্ছল প্রেমপূর্ণ সে হৃদয়, যাহা সর্বদা সকল অবস্থায় ব্যক্তিমাত্রকেই আশার বাণী শুনাইবার জন্য উদার আগ্রহে উন্মুখ হইয়া থাকিত, উৎপীড়িত ও অপমানিত হইয়াও তাঁহার জিহ্বা আশীর্বাণী ব্যতীত অভিশাপ উচ্চারণ করে নাই। তিনি কখনই আপামর সাধারণের পক্ষ সমর্থন করিতে বিরত হইতেন না। দুর্বল পতিত জাতিসমূহের গুণ শতমুখে বর্ণনা করিতেন, দোষ উদ্ঘাটন করিয়া তাহাদিগকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলিতেন না। যাহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিবার কেহ নাই, স্বামিজী অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের স্বপক্ষে যাহা কিছু বলিবার আছে বলিয়া দিতেন। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, "তোদের স্বামিজীকে অদ্ভুত প্রতিভাশালী বেদান্তের পণ্ডিত বলিয়া ভালবাসি না, তাঁহার করুণায় সতত দ্রব হৃদয়ের জন্যই তাঁহাকে ভালবাসি।"

১৮৯৬-এর ৬ই জুলাই তিনি লণ্ডন হইতে জনৈক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন —"** তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, সহানুভূতি ও ধৈর্যের সহিত আমি প্রত্যহ নব নব শিক্ষা লাভ করিতেছি। আমার মনে হয়, উদ্ধতপ্রকৃতি 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান'দিগের

মধ্যেও আমি দেবত্ব উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বোধ হইতেছে যে, আমি ক্রমে ক্রমে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে চলিয়াছি, যেখানে 'শয়তান' বলিয়া যদি কেহ থাকে, তাহাকে পর্যন্ত ভালবাসিতে পারিব।

"বিশ বৎসর বয়সের সময় আমি এত একগুঁয়ে ও গোঁড়া (fanatic) ছিলাম যে, কাহারও সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতাম না। কলিকাতার যে সমস্ত রাস্তায় থিয়েটার ছিল, সেগুলির সম্মুখের ফুটপাতের উপর দিয়া হাঁটিতাম না, আর এখন তেত্রিশ বৎসর বয়সে আমি বেশ্যাগণের সহিত এক বাড়িতে অবস্থান করিতে পারি, এক মুহূর্তের জন্যও তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিবার কথা মনেও উদয় হইবে না। আমি কি দিনে দিনে খারাপ হইয়া যাইতেছি? অথবা আমি ক্রমে ক্রমে বিশ্বপ্রেমের দিকে অগ্রসর হইতেছি—যাহা প্রভু স্বয়ং? আমি শুনিয়াছিলাম, যে তাহার চতুর্দিকে মন্দ দেখিতে পায় না, সে কখনও ভাল কাজ করিতে পারে না! কই, আমি তো তাহা বুঝিতেছি না, বরং আমি দেখিতেছি, আমার কার্য করিবার শক্তি দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে। কোন কোন দিন আমার ভাব-সমাধি উপস্থিত হয়। তখন আমার মনে হয়, সব জিনিসকে আশীর্বাদ করি, ভালবাসি, আলিঙ্গন করি। আমি প্রকৃতই দেখিতেছি, মন্দ বলিয়া আমরা যাহা মনে করি, তাহা ভ্রান্তি মাত্র।"

আবাল্য সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করা সহজ নহে। পতিতা নারীদের প্রতি তাঁহার মনের বিরুদ্ধভাব কিভাবে দূর হইয়াছিল, তাহার একটি গল্প স্বামিজী প্রায়ই বলিতেন। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে খেতরি হইতে স্বামিজী জয়পুরে আসেন। গুরুদেবকে বিদায় দেবার জন্য খেতরির মহারাজা জয়পুর পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানে মহারাজা একজন নর্তকীকে আহ্বান করেন। বৈঠকখানার ঘরে নৃত্যগীতের আয়োজন হইয়াছে। মহারাজা গান শুনিতে আসিবার জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। স্বামিজী উত্তর দিলেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে নর্তকীর নৃত্যগীতের আসরে যোগদান অন্যায়। এই কথা শুনিয়া নর্তকীটি মর্মাহত হইল। মহারাজার গুরু তাহাকে অবজ্ঞা করিলেন, সে কি এতই ঘৃণ্য! নারীসুলভ অভিমানে তাহার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল। সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া ক্রন্দনকম্পিতকণ্ঠে সে গাহিল—

"প্রভু মেরা অবগুণ চিতে না ধরো।
সমদরশী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো॥"

এই অকৃত্রিম আর্ত আকূতি, পার্শ্ববর্তী কক্ষে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল—

"এক লোহা পূজামে রাখত,
এক রহত ব্যাধ ঘর পর,
পরশকে মন দ্বিধা নঁহী হৈ,
দুহুঁ এক কাঞ্চন করো॥
ইক নদিয়া ইক নার কহাবত মৈলী নীর ভরো।
জব্ মিলি দোনো এক বরণ ভয়ো, সুরসুরি নাম পর:
ইক মায়া ইক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগেরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥"

গণিকার কণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ সাধক সুরদাসের বাণী ঝঙ্কৃত হইয়া সন্ন্যাসীর চিত্ত আকুল করিল—"জ্ঞানী কাহে ভেদ করো। হায়! আমি অদ্বৈতবেদান্তবাদী সন্ন্যাসী, অথচ ভেদবুদ্ধি এত তীব্র যে বেশ্যা বলিয়া ঘৃণায় দর্শন পর্যন্ত করিলাম না। আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে একটা পর্দা উঠিয়া গেল, অনুতপ্তচিত্তে সেই নর্তকীর নিকট দুর্ব্যবহারের জন্য লজ্জা প্রকাশ করিলাম।"

অজ্ঞ, উৎপীড়িত, দরিদ্র, পতিতের তো কথাই নাই, সমাজে চিরঘৃণিতা বেশ্যাকে পর্যন্ত তিনি করুণার সহিত আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছেন। একদিন আমেরিকার এক প্রশ্নোত্তর সভায় একজন সহসা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "স্বামিজী! অপবিত্রতার ঘনীভূত প্রতিমারূপ বেশ্যাগণদ্বারা সমাজের অমঙ্গল ব্যতীত আর কিছু সাধিত হয় কি?" স্বামিজী তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিকে ফিরিয়া করুণার্দ্রকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "পথোপরি তাহাদিগকে দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। তাহারাই বর্মের মত দাঁড়াইয়া শত শত সতীকে লম্পটের অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেছে বলিয়া ধন্যবাদ দিও! তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িল। যখন আচার্য মোক্ষমূলর রামকৃষ্ণ-জীবনী প্রকাশ করেন, তখন রেভাঃ মজুমদার মহাশয় বিবিধ আপত্তি প্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাও উল্লেখ ছিল যে, "শ্রীরামকৃষ্ণের নৈতিক চরিত্র তাদৃশ উন্নত ছিল না, যেহেতু তিনি বেশ্যাদিগকে ঘৃণা করিতেন না।" বিধানাচার্যের এই উৎকট নীতিতত্ত্বের মর্ম অবশ্য মোক্ষমূলর উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নরম গরম দু'কথা জবাব দিয়াছিলেন।

এইরূপ কয়েকজন আদর্শ নীতিবাদীর পক্ষ হইতে জনৈক ভদ্রলোক স্বামিজীর নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তদুত্তরে স্বামিজী জনৈক গুরুভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন, "অদ্য রা—বাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন যে, দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে অনেক বেশ্যা যাইয়া থাকে, সেজন্য অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে। * * * তদ্বিষয়ে আমার বিচার এই—

"১। বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পারে তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।

* * *

"৫। যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচজাতি, ঐ গরীব ছোটলোক ভাবে, তাহাদের (যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যত কম হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক—মাতাল আসুক, চোর ডাকাত আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার।"

১৬ই ডিসেম্বর স্বামিজী শিষ্য ও শিষ্যাগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সেভিয়ার-দম্পতিসহ লন্ডন পরিত্যাগ করিলেন। মিঃ গুডউইন নেপল্‌সে স্বামিজীর সহিত মিলিত হইবেন বলিয়া সাউদাম্পটন হইতে ইতালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিশ্ববিজয়ী আচার্যদেবের কর্মময় জীবনের আর একটি গৌরবময় অঙ্কের অভিনয় সমাপ্ত হইল। তিনি ভারতে ফিরিবার জন্য বালকের ন্যায় অধীর হইয়া উঠিলেন। লন্ডন পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামিজী! চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবমুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার

মাতৃভূমি কেমন লাগিবে!" স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম; এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার নিকট এখন পবিত্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট তীর্থস্বরূপ।"

ফ্রান্সের মধ্য দিয়া আল্পস্ পর্বতমালা পশ্চাতে রাখিয়া পথিমধ্যে মিলান ও পিশা নগরী পরিদর্শন করিয়া স্বামিজী ও সেভিয়ার-দম্পতি ফ্লোরেন্স নগরীতে উপনীত হইলেন। ইতালীর চারুকলাবিদ্যার কেন্দ্রস্থান ফ্লোরেন্স নগরীর চিত্রশালা ও ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া স্বামিজী পার্কে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দৈবক্রমে শিকাগোর মিঃ এবং মিসেস্ হেইলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামিজীর দর্শন পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, শিকাগো মহামেলার অব্যবহিত পূর্বে মিসেস্ হেইলই তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান ও নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা স্বামিজীকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। স্বামিজী প্রচারকার্যোপলক্ষে যতবারই শিকাগোয় গিয়াছেন, ইঁহারা কোনোবারই তাঁহাকে হোটেলে অবস্থান করিতে দেন নাই।

ফ্লোরেন্স হইতে তাঁহারা ইতিহাসবিশ্রুত প্রাচীন রোমক জাতির কীর্তিকলাপের গৌরবময় শ্মশানভূমি মহানগরী রোমে প্রবেশ করিলেন। মিসেস্ সেভিয়ার পূর্ব হইতেই স্বামিজীর আমেরিকান বন্ধু মিস্ ম্যাকলিয়ডের নিকট হইতে রোমনগরীর ইংরাজসমাজে সুপরিচিতা মিস্ এডওয়ার্ডসের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মিস্ ম্যাকলিয়ডের ভ্রাতৃকন্যা মিস্ এল্বার্টা ষ্টারগিসও ইহার সহিত রোমে বাস করিতেছিলেন। এই রমণীদ্বয় স্বল্পকাল মধ্যেই স্বামিজীর ভক্ত হইয়া পড়িলেন এবং যে এক সপ্তাহকাল তিনি রোমে ছিলেন, ইঁহারা প্রত্যহ তাঁহাকে লইয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করিতে গমন করিতেন। রোম হইতে স্বামিজী নেপল্সে আগমন করিলেন। জাহাজ বন্দরে আসিবার বিলম্ব আছে দেখিয়া তাঁহারা ভিসুবিয়স্ আগ্নেয়গিরি ও পম্পাই নগরী দর্শন করিয়া লইলেন। ইতোমধ্যে সাউদাম্পটন হইতে ভারতগামী জাহাজ আসিয়া পড়িল। তন্মধ্যে মিঃ গুডউইনকে দেখিয়া স্বামিজী হৃষ্ট হইলেন। ৩০শে ডিসেম্বর তিনি সদলবলে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ

(১৮৯৭—১৮৯৯)

“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ”—বিবেকানন্দ

দীর্ঘ চার বৎসরের অশ্রান্ত ভ্রমণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বিবেকানন্দ জাহাজে বসিয়া হিসাব-নিকাশ করিতে লাগিলেন—কি দিলাম, কি লইয়া গেলাম! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও আধ্যাত্মিক ভাববিনিময়ের দ্বারা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন একজীবনের কাজ নহে। পাশ্চাত্যের সাহস, শক্তি, প্রতিভা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া দেখিয়া স্বামিজী যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন তেমনি রাজনীতির নামে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অজস্র উৎকোচ দিয়া ভোট, ব্যালটের সাহায্যে আধিপত্য, বণিকের শোষণনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদীর রাজ্যলিপ্সা দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষভাবে ভারতবিজয়ী ইংলণ্ডকে তিনি তাহার স্বস্বরূপে দেখিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন—“সংসার-সমুদ্রের সর্বজয়ী বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। * * ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিণীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর, এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। যে ইংলণ্ডের ধ্বজা কলের চিমনি, বাহিনী পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।”

সুদূর সম্প্রসারিত সূক্ষ্মদৃষ্টি লইয়া স্বামিজী আরো দেখিয়াছিলেন, বণিক বা বৈশ্যশাসিত এই ইউরোপের বুকে শূদ্রের বিদ্রোহ ধূমায়িত। “সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন। সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূলভিত্তি। * * * প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেকদিন ধূলি দেওয়া চলে না। * * *সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি ধৌত হইয়া যায়।” তাঁহার ঐতিহাসিক দৃষ্টি, পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া, উহার সমাজ-জীবনের গভীর অসামঞ্জস্যগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সমস্ত পৃথিবী যন্ত্রবলে মুষ্টিকবলে চাপিয়া ধরিয়া লোভ, পরজাতি-বিদ্বেষ এবং ঘৃণায় উন্মত্ত পশ্চিমের বিজয়োদ্ধত জয়যাত্রা তাহাকে আবার যুদ্ধ ও বিপ্লবের অপঘাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। পাশ্চাত্যের সমাজ-জীবনের আসন্ন শোকাবহ পরিণতি লইয়া তিনি মাঝে মাঝে তাঁহার বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের সহিত আলোচনা করিতেন। সিষ্টার ক্রিষ্টিন তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন, ইউরোপে পদার্পণ করিবার পরই তিনি ইহা অনুভব করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—“ইউরোপ এক আগ্নেয়গিরির পার্শ্বে রহিয়াছে। যদি এক আধ্যাত্মিক প্রবাহে এই আগুন না নিভে, তাহা হইলে ইহা ফাটিয়া পড়িবে।” (১৮৯৫)

সিস্টার ক্রিস্টিন আর একটি বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—“বত্রিশ বৎসর পূর্বে (১৮৯৬) তিনি (স্বামিজী) আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘পরবর্তীকালে যে বিরাট আলোড়নে আর একটি যুগের সূচনা হইবে, তাহা রাশিয়া হইতে, অথবা চীন হইতে আসিবে, আমি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু ইহা ঐ দুইটি দেশের একটিতেই ঘটিবে’।”*

“জগতে এখন বৈশ্যাধিকারের (বণিক) তৃতীয় যুগ চলিতেছে। চতুর্থ যুগে শূদ্রাধিকার (প্রলেটারিয়েট) প্রতিষ্ঠিত হইবে।”

‘বর্তমান ভারত’ প্রবন্ধেও স্বামিজী বৈশ্য যুগের দোষগুণ বিচার করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন—“এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে, তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্ররা একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে।”

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হইয়াও সমসাময়িক যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলির সমাজজীবনে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবেই সচেতন ছিলেন। ভাবী পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁহার ঐতিহাসিক বোধ কত তীক্ষ্ণ ছিল, ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডন হইতে জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত পত্রে আমরা তাহার পরিচয় পাই। তিনি লিখিতেছেন—

“মনুষ্যসমাজে পর্যায়ক্রমে চারিটি শ্রেণী আধিপত্য করিয়া থাকে—পুরোহিত, যোদ্ধা, বণিক এবং শ্রমিক। প্রত্যেক শাসনাধিকারে গৌরব ও ত্রুটি দুইই বিদ্যমান। যখন পুরোহিতকুল শাসন করেন, তখন বংশানুক্রমের ভিত্তিতে তাঁহারাই সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন, তাঁহাদের অধিকার বহুবিধ বিধিনিষেধের রক্ষাকবচ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। সর্ববিদ্যার তাঁহারাই অধিকারী; জ্ঞানদানের অধিকার একমাত্র তাঁহাদের একচেটিয়া। ইহার সুফল এই যে, এইকালে বিবিধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সূচনা। পুরোহিতরা মানসিক উৎকর্ষসাধনে যত্নবান, এই মানসিক বলের সাহায্যেই তাঁহারা শাসন করেন।

“ক্ষত্রিয়ের (সামন্ততান্ত্রিক যুগ) শাসন স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর, কিন্তু তাঁহারা অপরাপরকে বাদ দিয়া বিশেষ মণ্ডলীতে আবদ্ধ নহেন, ফলে এই যুগে শিল্পকলা ও সামাজিক সংস্কৃতির সর্বোচ্চ বিকাশ হয়।

“তাহার পরেই বৈশ্য-শাসন (বণিক ও শিল্পপতি)। ইহার নিঃশব্দ পেষণ এবং শোণিত শোষণ করিবার ক্ষমতা ভয়াবহ। ইহার সুবিধা এই, বণিক সকল দেশেই যায়, এবং সে বাহন হইয়া পূর্বোক্ত দুই যুগের ভাবধারা সর্বত্র প্রচার করে। ইহারা ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও অধিকতর সামাজিক, কিন্তু এই যুগে সংস্কৃতির অধঃপতন আরম্ভ হয়।

“ইহার পর আসিবে শ্রমিক (শূদ্র) শাসন। ইহার সুবিধা এই, বাহ্যসম্পদ ও দৈহিক সুখসুবিধা সমাজের সর্বস্তরে বিতরিত হইবে; ইহার অসুবিধা (সম্ভবতঃ) সংস্কৃতির অবনতি ঘটিবে। সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটিবে, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা বিরল হইবে।

---

* ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর জার সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের পর রাশিয়ায় কৃষক শ্রমিকের সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৪৯ সালে মহাচীনে জনগণের লোকতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বামিজীর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

"যদি এমন একটি রাষ্ট্রগঠন সম্ভবপর হয়, যেখানে পৌরোহিত্য যুগের জ্ঞান, সামন্ত যুগের সংস্কৃতি, বণিক যুগের বণ্টনের আদর্শ এবং শ্রমিক যুগের সাম্যের আদর্শ অব্যাহত থাকিবে, অথচ তাহাদের দোষগুলি থাকিবে না, তাহাই হইবে আদর্শ রাষ্ট্র। কিন্তু ইহা কি সম্ভব?

"যাহা হউক, প্রথম তিনটি যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন সর্বশেষ যুগের সময় উপস্থিত। তাহারা (শ্রমিকেরা) নিশ্চয়ই ইহা পারিবে—কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। * * আমি নিজে একজন সমাজতন্ত্রবাদী (সোশ্যালিষ্ট)—এই ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া নহে, কিন্তু পুরা রুটি না পাওয়া অপেক্ষা অর্ধেক রুটি ভাল।"

অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার ছাড়াও পাশ্চাত্যদেশে গমনের তাঁহার যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল না। দুর্বল জাতিগুলির অধিকার লঙ্ঘনের অর্থে দুঃসাহসিকতায় নির্লজ্জ, ভোগলোলুপ, আত্মপরায়ণ পাশ্চাত্যের নিকট পরাধীন দীনদরিদ্র ভারতবাসীর জন্য যে সাহায্য যে সুবিচার তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা পাইলেন না। অতুল ঐশ্বর্যশালী পাশ্চাত্যদেশে ভিক্ষা করিয়া তিনি যাহা পাইলেন, তাহা মুষ্টিভিক্ষা মাত্র। অথচ দারিদ্র্যে পীড়িত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের ভ্রষ্ট জীবনের প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারের ব্রত যে তাঁহার ব্রত। ভারতের চিন্তা-সম্পদে ইউরোপের দর্শন, সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে, ভারতের ঐশ্বর্যে ইউরোপ ঐশ্বর্যশালী হইয়াছে, ইহা ইউরোপ ভুলিয়াছে; সেজন্য কৃতজ্ঞ হওয়া তো দূরের কথা। এ দিক দিয়া বিচার করিলে স্বামিজীর পাশ্চাত্যদেশে গমনের প্রধান উদ্দেশ্য খুব বেশী সাফল্যলাভ করে নাই। কিন্তু তিনি ক্ষুব্ধ হইলেও নিরাশ হইলেন না। ভারতে নূতন করিয়া কার্য করিতে হইবে, ভারতের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন আবশ্যক। ধর্মকে জীবন্ত, সমাজকে গতিশীল করিয়া সৎসাহসী ও বীর্যবান মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে। "আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করিতে চাহি যাহাতে মানুষ তৈয়ারী হয়।" স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্থির করিলেন, এবার তাঁহার কর্মকেন্দ্র ভারতবর্ষ!

১৫ই জানুয়ারী সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিংহলের শ্যামল তটভূমি দৃষ্টি পথে পতিত হইল। হরিদ্রাভ বালুকাপূর্ণ বেলাভূমির স্বর্ণোজ্জ্বল রি অনিলান্দোলিত নারিকেল-বৃক্ষ-শীর্ষগুলির গাঢ় হরিৎ বর্ণ-সম্পদ সন্দর্শন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বালকের মত উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিলেন। জাহাজ ধীরে ধীরে কলম্বো বন্দরে প্রবেশ করিয়া নোঙ্গর করিল। তরঙ্গমালার দূপ্তসংঘাত-জনিত ভৈরব-কল্লোলের সহিত বাষ্পীয়পোতের গুরু-গম্ভীর বংশী-ধ্বনি মিলিত হইয়া যেন বিবেকানন্দের আগমনবার্তা ঘোষণা করিল।

স্বামিজী স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন, এ সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য নানা সহর প্রস্তুত হইল। সিংহল ও মাদ্রাজপ্রদেশের প্রধান প্রধান নগরের নাগরিকগণ সম্মিলিত হইয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। তিনি কলম্বোয় অবতরণ করিবেন সংবাদ পাইয়া তাঁহার দুইজন গুরুভ্রাতা ও কয়েকজন মাদ্রাজী শিষ্য পূর্বাহ্নে সেখানে আগমন করিলেন। কলম্বোর হিন্দুসমাজ স্বামিজীকে প্রথম অভ্যর্থনা করিবার গৌরবময় অধিকার পাইয়াছেন বলিয়া উৎসাহের সহিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যাঁহার জন্য দেশব্যাপী আলোচনা চলিতেছিল, তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না। যখন তাঁহার স্বদেশ অভিনব উৎসাহোল্লাসে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তখন নীরবে পোতাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া

ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যাগুলি চিন্তা করিতেছিলেন। নবীন ভারতের পুনরুত্থানকল্পে তিনি যে বার্তা প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, যে শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া জাতীয়-জীবন সরস, জাগ্রত ও মহিমময় করিয়া গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণ গ্রহণ করিবে কি না? যদি না করে, তাহা হইলে কি উপায় অবলম্বন করিবেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি সংশয়াতুর চিত্তে কলম্বো বন্দরে অবতীর্ণ হইলেন।

তাঁহার গৈরিক উষ্ণীষ-মণ্ডিত শির দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র, সমুদ্রতীরে সমবেত বিপুল জনসঙ্ঘ হর্ষোচ্ছলকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, অস্তগামী সূর্যের পীতাভ-লোহিত-রশ্মিমালা-স্নাত-সন্ন্যাসী বিস্ময়-বিমূঢ়বৎ দণ্ডায়মান হইলেন। যখন কলম্বোর হিন্দুসমাজের মুখপাত্রস্বরূপ মাননীয় কুমারস্বামী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে মনোহর যূথিকাপুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন যে, এ বিপুল অভ্যর্থনা আয়োজন তাঁহারই জন্য। যুগলাশ্বযোজিত শকটে আরোহণ করিয়া স্বামিজী নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পত্র-পুষ্প-পল্লব-রচিত তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া ক্রমে শোভাযাত্রা, পতাকা ও পুষ্পমাল্যশোভিত রাজপথ বাহিয়া 'দারুচিনি উদ্যান' সম্মুখে বিরাট মণ্ডপে উপনীত হইল। স্বামিজী শকট হইতে অবতরণ করিবামাত্র শত শত ব্যক্তি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মাননীয় কুমারস্বামী তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন।

সমবেত জনতার উৎসাহদীপ্ত আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে স্বামিজী অভিনন্দন-পত্রের উত্তর প্রদান করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন যে, "আমি কোন মহারাজা বা ধনকুবের বা প্রসিদ্ধ রাজনীতিক নহি, কপর্দকহীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মাত্র! আপনারা যে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন, ইহাতে আমি বুঝিতেছি, হিন্দুজাতি এখনও তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদ হারায় নাই! নতুবা একজন সন্ন্যাসীর প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে কেন? অতএব, হে হিন্দুগণ, তোমরা জাতীয়-জীবনের এই বিশেষত্ব হারাইও না। নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ধর্মাদর্শকে দৃঢ়বলে ধরিয়া রাখ।"

অতঃপর স্বামিজীকে বিশ্রামাগারে লইয়া যাওয়া হইল। কিয়ৎকালপরে তিনি দেখিলেন, যাঁহারা স্থানাভাবে মণ্ডপে তাঁহার দর্শনলাভে বিফলকাম হইয়াছেন, তাঁহারা গৃহদ্বারে সমবেত হইয়াছেন। স্বামিজী বারান্দায় আসিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্যরঞ্জিত বদনে নমস্কার করিলেন। সকলেই আগ্রহ ও ভক্তির সহিত তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী 'নারায়ণ' বলিয়া প্রত্যেককে আশীর্বাদ করিলেন।

১৬ই জানুয়ারী অপরাহ্নে তিনি 'ফ্লোরাল হলে' একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ!'

স্বামিজীর প্রিয়তম শিষ্য সাঙ্কেতিকলিপিবিদ্ মিঃ গুডউইন, একমাত্র যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমেই আমরা আচার্যদেবের বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে পাইয়াছি, তিনি সর্বদা ছায়ার মত শ্রীগুরুর পার্শ্বলগ্ন হইয়া থাকিতেন; স্বামিজীর বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতে বসিলেই তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে স্বতঃউচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ' কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামক পুস্তকে স্বামিজীর এতদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, অতএব আমি কেবল প্রয়োজনমত স্থানে স্থানে উহার

উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

পরদিবস অধিকাংশ সময়ই আচার্যদেব দর্শকবৃন্দের সহিত ধর্মালোচনা কাটাইয়া দিলেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় শিবমন্দির সন্দর্শনে গমন করিলেন। পথিমধ্যে দলে দলে ব্যক্তি তাঁহাকে পুষ্প ফল মাল্য ইত্যাদি উপহার দিতে লাগিলেন। নগরীর সৌধ-বাতায়নগুলি হইতে পুরনারিগণ পুষ্প ও গোলাপ জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরদ্বারে উপনীত হইবামাত্র 'জয় মহাদে ধ্বনি সহকারে সমবেত জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। শ্রীমন্দির দর্শন ও প্রদক্ষিণান্তে পুরোহিতগণের সহিত কিয়ৎকাল আলাপ করিয়া তিনি আবাস প্রত্যাবর্তন করিলেন। কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রায় রাত্রি আড়াইটা পর্যন্ত স্বামিজী তাঁহাদিগের সহি শাস্ত্রালোচনা করিলেন। পরদিবস প্রাতে কলম্বোর 'পাবলিক হলে' 'বেদান্ত দর্শ সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এই সভায় কয়েকজন ভারতবা ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চাল-চলন ভ ভঙ্গীতেও শ্বেতাঙ্গের অনুকরণ করিতেছেন দেখিয়া স্বামিজী দুঃখিতভা তাঁহাদিগকে মূঢ়ের মত পরানুকরণ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় স্বভাব ব রাখিবার উপদেশ দিলেন।

১৯শে জানুয়ারী তিনি কলম্বো হইতে স্পেশাল ট্রেনে কাণ্ডি অভিমুখে য করিলেন। স্বামিজীর কলম্বো হইতে জাহাজে মাদ্রাজ যাইবার সঙ্কল্প ছি কিন্তু সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থান হইতে ক্রমাগত সাগ্রহ আহ্বানসূ এত তার আসিতে লাগিল যে, তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। অবশে স্থলপথেই যাইবার সঙ্কল্প স্থির হইল।

কাণ্ডিতে হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের সংক্ষিপ্ত উ প্রদান করিয়া স্বামিজী জাফ্‌নাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বৌদ্ধযুগের প্রা কীর্তিসমূহের জন্য বিখ্যাত নগরী অনুরাধাপুরমে স্বামিজী স্থানীয় অধিবা বৃন্দের অনুরোধে 'উপাসনা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিলেন। বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রু শাখা হইতে উৎপন্ন সুপ্রাচীন পবিত্র অশ্বত্থবৃক্ষতলে সভার আয়োজন হইয়াছি অনুরাধাপুরম্ হইতে জাফ্‌না ১২০ মাইল দূরবর্তী। স্বামিজী সঙ্গিগণ স ব্যাহারে গো-শকটযোগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রত্যহ পা গ্রামসমূহ হইতে শত শত হিন্দু ও বৌদ্ধ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দাঁড় থাকিত। স্বামিজী বিস্মিত হইলেন যে, তাঁহার শিকাগো বক্তৃতার সাফল্যের সং সিংহলের গ্রামবাসী কৃষককুল পর্যন্ত শুনিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় স্বামিজী জাফ্‌নায় উপনীত হইলেন। সুসজ্জিত রাজপথের দিয়া ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা অগ্রসর হইল। স্থানীয় হিন্দু কলেজের প্র একটি মনোরম মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল। স্বামিজীকে তথায় লইয়া যাওয়া হই প্রায় পনর হাজার ব্যক্তি শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। নাগরিকগণের ও উৎসাহোচ্ছ্বাস বর্ণনাতীত। জাফ্‌নায় অভিনন্দনপত্রের সংক্ষিপ্ত উত্তর পরদিবস আচার্যদেব বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সিংহল ভ্রমণ স হইল। জাফ্‌না হইতে একখানি ষ্টীমার ভাড়া করিয়া স্বামিজী তাঁহার শিষ ও গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী সহকারে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করি পূর্ব হইতে সংবাদ পাইয়া রামনাদাধিপ রাজা ভাস্করবর্মা সেতুপতি সদল পাম্বানে উপস্থিত ছিলেন। বিপুল জনসঙ্ঘ সমুদ্রতীরে উদ্‌গ্রীব হইয়া স্বামি প্রতীক্ষা করিতেছিল। ষ্টীমার হইতে তীরে অবতরণ করিবার জন্য স্বামি

রাজকীয় সুসজ্জিত 'বোটে' আরোহণ করিলেন।

'প্রচারশীল হিন্দুধর্মের সর্বপ্রথম প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের মৃত্তিকায় শুভ পদার্পণ করিবামাত্র সমবেত জনসঙ্ঘ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রামনাদাধিপ ভূলুণ্ঠিত হইয়া স্বামিজীর চরণে পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির ভূমি স্পর্শ করিল। সন্ধ্যার রক্তাক্ত-ধূসর আকাশতলে সহস্র সহস্র প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিবিগলিত এ মহিমময় দৃশ্য ভারতের ইতিহাসে এক অপূর্ব ঘটনা! আচার্যদেব, রাজাজী ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সকলকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সমুদ্রতীরে বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে নাগলিঙ্গম্ পিলাই পাম্বানের অধিবাসিবৃন্দের পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন। রামনাদরাজ ও এম্. কে. নায়ার ভাবাবেগে স্বামিজীর গুণকীর্তন করার পর, স্বামিজী পাম্বানবাসীকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। উপসংহারে তিনি বলিলেন, "রামনাদের রাজা আমার উপর যে ভালবাসা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার আবেগ আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। যদি আমার দ্বারা কিছু কিছু সৎকার্য হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যেকটির জন্য ভারত এই মহাপুরুষের নিকট ঋণী, কারণ আমাকে শিকাগো পাঠাইবার কল্পনা তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। তিনি আমার মাথায় ঐ ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমাকে বার বার উত্তেজিত করেন। এক্ষণে তিনি আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে আরো অধিক কার্যের আশা করিতেছেন। যদি ইঁহার ন্যায় আরও কয়েকজন রাজা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণে আগ্রহান্বিত হইয়া জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।"

সভাভঙ্গে স্বামিজীকে তাঁহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট বাংলোয় লইয়া যাওয়া হইল। রাজাজীর আদেশানুসারে শকট হইতে অশ্ব উন্মোচন করা হইল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ. এমনকি, রাজা স্বয়ং ঐ শকট টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। পরদিবস স্বামিজী প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীরামেশ্বরের মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে এইস্থানে স্বামিজী তাঁহার পরিব্রাজক ব্রত উদ্‌যাপিত করিয়াছিলেন, তখন তিনি অপরিচিত সন্ন্যাসী মাত্র। রাজকীয় শকট মন্দিরসমীপবর্তী হইবামাত্র হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, মন্দিরের চিহ্নিত পতাকাসমূহ ও সঙ্গীতসম্প্রদায় সহকারে বিরাট শোভাযাত্রা প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিল। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সহস্রস্তম্ভোপরি বিরাজিত চাঁদ্‌নি ও বিরাট মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য সমূহ দর্শন করিলেন। দেবদর্শন সমাপ্ত হইলে স্বামিজীকে মন্দিরস্থ বহুমূল্য মণি মুক্তা হীরক প্রভৃতি দেখান হইল। অবশেষে তাঁহাকে বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করা হইল। স্বামিজীর ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা মিঃ নাগলিঙ্গম্ তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। স্বামিজী ভারতের অন্যতম পবিত্রধামের মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন—যত্র জীব তত্র শিব! এই মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রতি নরনারীর সেবায় অগ্রসর হওয়াই যথার্থ শিবভক্তি। কেবলমাত্র বসিয়া বসিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকার অপরূপ সৌন্দর্যের প্রশংসা করিয়া স্তোত্রপাঠসহকারে যে প্রতিমা বিশেষের সেবায় নিযুক্ত থাকে, সে প্রবঞ্চক মাত্র। তাহার ভক্তি পরিপক্ক হয় নাই।

সেদিন স্বামিজীর শুভাগমন উপলক্ষে সহস্র সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষসহকারে ভোজন করান হইল। বস্ত্র ও অর্থ বিতরিত হইল। ভারতের মৃত্তিকায় যে স্থানে স্বামিজী প্রথম পদস্থাপন করিয়াছিলেন, ভক্তিমান রামনাদাধিপ সেই

পুণ্যভূমির উপর একটি ৪০ ফুট উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই স্তম্ভগাত্রে লিখিত আছে—

"Satyameva Jayate—The monument erected by Bhaskara Sethupati, the Raja of Ramnad, marks the sacred spot, where His Holiness Swami Vivekananda's blessed feet first trod on Indian soil, together with the Swami's English disciples, on His Holiness's return from the Western Hemisphere, where glorious and unprecedented success attended His Holiness's philanthropic labours to spread the religion of Vedanta. January 27, 1897."

"সত্যমেব জয়তে—যে স্থানে মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ, পাশ্চাত্য জগতে বৈদান্তিক ধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়া, অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ের পর তাঁহার ইংরেজ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভারতের মৃত্তিকায় প্রথম পবিত্রপদপঙ্ক স্থাপন করেন, সেই পুণ্যস্থান চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিস্তম্ভ রামনাদাধিপ রাজা ভাস্কর সেতুপতি কর্তৃক নির্মিত হইল। জানুয়ারী ২৭, ১৮৯৭।"

রামেশ্বর হইতে স্বামিজী রামনাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে রামনাদবাসিগণ পূর্ব হইতেই যথাযোগ্য অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছিলেন। স্বামিজী বোট হইতে হ্রদতীরে অবতরণ করিবামাত্র তাঁহার সম্মানার্থ রাজপ্রাসাদে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। নগরীর সুসজ্জিত রাজপথের উপর দিয়া রাজকীয় শকটে আরোহণ করিয়া স্বামিজী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা, রাজভ্রাতা ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজকর্মচারীগণ পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ইংরেজী ও দেশীয় বাদ্যকরগণ ঐক্যতান বাজাইতে লাগিল। ইতোপূর্বেই অভ্যর্থনা মন্ডপ জনপূর্ণ হইয়াছিল, স্বামিজী সদলবলে সমাগত হইবামাত্র সমবেত জনসঙ্ঘ জয়ধ্বনিসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সময়োচিত বক্তৃতা-সহকারে রাজাবাহাদুর সভার উদ্বোধন করিলেন। অতঃপর রাজভ্রাতা দিনকর বর্মা সেতুপতি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন। অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে স্বামিজী একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। রাজাজী প্রস্তাব করিলেন যে স্বামিজীর শুভাগমন উপলক্ষে মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ ভান্ডারের জন্য সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া পাঠান হউক। উক্ত প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থিত হওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

পরমকুড়ি, মনমদুরা, মদুরা, ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর প্রভৃতি সহরে অশেষ প্রকারে অভিনন্দিত হইয়া স্বামিজী কুম্ভকোণমে পদার্পণ করিলেন। কুম্ভকোণম্-বাসী হিন্দুগণও স্বামিজীকে দুইখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে স্বামিজী বেদান্ত সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। মাদ্রাজে গিয়া তাঁহাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইবে বিবেচনায় তিনি তিন দিবস কুম্ভকোণমে বিশ্রাম করিয়া মাদ্রাজাভিমুখে রওনা হইলেন।

বিবেকানন্দ মাদ্রাজে আসিতেছেন, এ সংবাদ পাইয়া পূর্ব হইতেই মাদ্রাজবাসিগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইলেন। জষ্টিস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ারের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইল। প্রতি সৌধচূড়ায় বিরঞ্জিত পতাকাবলী, সুবৃহৎ তোরণমালায় পরিশোভিত রাজপথসমূহ, সমগ্র মাদ্রাজ নগরী অপূর্ব শোভায় সজ্জিত হইয়া স্বামিজীকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য উন্মুখ আগ্রহে

ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসিগণ দলে দলে রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত হইল। ট্রেন প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়াইবামাত্র সহস্র সহস্র কণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইল। নয়নাভিরাম বিবেকানন্দ গাড়ি হইতে অবতরণ করিবামাত্র অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। স্বামিজী কয়েক মিনিটের জন্য উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিয়া শকটারোহণ করিলেন। জষ্টিস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ উক্ত শকটে স্বামিজীর পার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করিলে পর শকট ধীরে ধীরে এটর্ণী বিলিগিরি আয়েঙ্গার মহোদয়ের 'ক্যাস্‌ল্ কর্‌নান' নামক অট্টালিকাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর না হইতেই উৎসাহী যুবকবৃন্দ গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া ফেলিলেন এবং নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে স্বামিজীর শিরে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দলে দলে নরনারী নারিকেল ইত্যাদি বিবিধ ফল তাঁহাকে শ্রদ্ধাসহকারে উপহার প্রদান করিতে লাগিল। কোন কোন পুরনারী রাজপথে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পঞ্চপ্রদীপ দিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পুষ্প-চন্দনে অর্ঘ্যদান করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব অভ্যর্থনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর দৃশ্য, জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা কম্পিতপদে জনতা ভেদ করিয়া শকট সমীপে আগমন করিলেন। স্বামিজীকে দর্শন করিবামাত্র তিনি ভাবে গদ্‌গদ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নয়নদ্বয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হইল; কারণ তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে, স্বামিজী সাক্ষাৎ শিবাবতার, অতএব তাঁহাকে দর্শনমাত্র তাঁহার সমস্ত পাপ ও মলিনতা অন্তর্হিত হইয়াছে, অন্তে তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

মাদ্রাজে স্বামিজীর শুভ পদার্পণ উপলক্ষে যে উৎসাহোচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে দৈনিক 'হিন্দু' নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"অদ্য স্বামী বিবেকানন্দকে রেলওয়ে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সম্মিলিত বিরাট জনসঙ্ঘের উৎসাহোচ্ছ্বাস ও ধর্মানুরাগ অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব। মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া বিশ্ববিখ্যাত সন্ন্যাসীকে যে গৌরবময় অভ্যর্থনা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এই মহাদেশের অন্তর্নিহিত ধর্মশক্তি সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্মসংস্কারকগণ ভারতে চিরদিনই এইরূপ অভ্যর্থনা পাইয়া আসিতেছেন। গোঁড়ামিই হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নহে, বর্তমান আচার-ব্যবহারগুলির পরিবর্তনও যে অবাঞ্ছনীয় তাহা নহে; যদি কোন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা দূর করিয়া নূতন কোন নিয়ম প্রবর্তন করিতে হয়, তাহা হইলে স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিরই কর্তৃস্থানীয় হইয়া উহা সমাধা করা উচিত। যখন কোন ধীর-হৃদয়, পবিত্র-মানস, প্রকৃত সংস্কারক নিষ্কাম ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য-সাধন-স্পৃহাবিমুক্ত-কল্যাণেচ্ছা লইয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হন, তখন আচার-নিয়ম শূন্যে মিলাইয়া যায়, চিরপোষিত ধারণা ও আদর্শ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি ও মতসমূহ বিলীন হইয়া যায়। স্বামিজীর প্রচারকার্যের সাফল্যের ইহাই একমাত্র রহস্য। সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সুদূর বিদেশে বেদান্তের পতাকা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সেজন্য আমরা চিরাচরিত প্রথানুসারে তাঁহাকে সাদর-অভ্যর্থনা করিতেছি। তাঁহার প্রতি আমাদের সহৃদয় সাদর সম্ভাষণের সহিত আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে অবস্থান যেমন তত্রত্য ভ্রাতৃগণের কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তদ্রূপ তাঁহার এতদ্দেশে অবস্থিতিও জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে।"

পরদিন রবিবার স্বামিজীকে প্রথামত অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হইল। খেতরির মহারাজা কর্তৃক প্রেরিত অভিনন্দন-পত্রখানি প্রদত্ত হইলে পর ক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়, সভা ও সমিতির পক্ষ হইতে সংস্কৃত, ইংরেজী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় প্রায় কুড়িখানি অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল। সভাস্থলে দশসহস্রাধিক ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অধিকাংশই হলের মধ্যে স্থান না পাইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, কাজেই সাধারণের অনুরোধক্রমে স্বামিজী বাহিরে আসিয়া একখানি গাড়ির কোচবক্সে আরোহণ করিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বামিজী যদিও গীতার ধরনে বক্তৃতা করিবার সুযোগ পাইয়া হৃষ্ট হইলেন, কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর জয়ধ্বনি ও হর্ষকোলাহলে রীতিমত বক্তৃতা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। অগত্যা স্বামিজী বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন যে, জনসঙ্ঘের এই অকৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়া তিনি হৃষ্ট হইয়াছেন, তবে এই উৎসাহকে স্থায়ী করা চাই। ভবিষ্যতে স্বদেশের জন্য অনেক বড় বড় কাজে এইরূপ প্রজ্বলিত উৎসাহাগ্নির প্রয়োজন হইবে।

পরদিবস মাদ্রাজ 'ভিক্টোরিয়া হলে' পঞ্চ সহস্র শ্রোতার সম্মুখে 'আমার সমর-নীতি' নামক সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ইহার পর ক্রমে ক্রমে 'ভারতীয় জীবনে বেদান্ত প্রয়োগ', 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ', 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক চারিটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। স্বামিজী মাদ্রাজে নয় দিবস আনন্দের সহিত শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর সহিত যাপন করিলেন। এই সময় একদিন একজন মহাপণ্ডিত স্বামিজীর সহিত বেদান্ত আলোচনা করিতে আসেন। তিনি স্বামিজীর বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "স্বামিজী! বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ইত্যাদি সমস্ত প্রকার মতবাদই সত্য এবং চরমোপলব্ধির পথে ভিন্ন ভিন্ন সোপান মাত্র, একথা তো পূর্বাচার্যগণ কেহই বলেন নাই।" আচার্যদেব মৃদুহাস্যে উত্তর করিলেন, "উহা আমার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। সেই-জন্যই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

আচার্যদেব যখন পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন বীরহৃদয় মাদ্রাজী যুবকবৃন্দ নিন্দা, শ্লেষ ও বিরোধিতায়ও অবিচলিত থাকিয়া শ্রীগুরু প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে বেদান্ত-প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ধন্য এই সাহসী, অকপট ও পবিত্র-হৃদয় যুবকবৃন্দ, যাঁহারা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিস্বরূপ স্বামিজীকে সর্বপ্রথম জগদ্‌গুরুস্বরূপ চিনিতে পারিয়াছিলেন! আজ ছয় বৎসর পর তাঁহাদিগের জগদেকারাধ্য গুরুদেবের স্বদেশ-প্রত্যাগমন উপলক্ষে মাদ্রাজ নগরী যে নয় দিবসব্যাপী বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা স্থায়িরূপে মাদ্রাজে একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। মাদ্রাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারণ আগ্রহের সহিত এ প্রস্তাব অনুমোদন করায় তাঁহারা স্বামিজীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং প্রচার-কেন্দ্র গঠনকল্পে তাঁহাকে মাদ্রাজে কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প আনন্দের সহিত অনুমোদন করিলেন এবং সত্বরই তিনি একজন সুযোগ্য গুরুভ্রাতাকে মাদ্রাজ প্রেরণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। কিয়দ্দিবস পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আসিয়া মাদ্রাজের কার্যভার গ্রহণ করিলেন। এদিকে কলিকাতা হইতে সাগ্রহ আহ্বান আসিতে লাগিল। বিশেষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব নিকটবর্তী বলিয়া গুরুগতপ্রাণ শিষ্যমণ্ডলী ও স্বামিজীর বন্ধুগণ দুঃখের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

দীর্ঘকাল ভারতের পল্লীনগরে পরিভ্রমণ করিয়া স্বামিজী জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি গভীর সহানুভূতির সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং আমরা পূর্বে বলিয়াছি, তিনি জনসাধারণের উন্নতিকল্পে রাজা মহারাজা ধনী ও অভিজাতবর্গের দ্বারা স্থায়ী কোন কাজ হইবে এ বিশ্বাসও হারাইয়াছিলেন। দাতার আসনে বসিয়া দূর হইতে পাশ্চাত্য লোকহিতবাদের আদর্শে কতকগুলি স্কুল কলেজ হাসপাতাল করিলেই জনসাধারণের উন্নতি হইবে না। দাতা বা উদ্ধারকর্তারূপে নহে, সেবকরূপে অন্নবস্ত্র, বিদ্যা, জ্ঞান লইয়া জনসাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধার সহিত কর্ম করিবার জন্য দৃঢ়হৃদয় কর্মী আবশ্যক—এই চিন্তা হইতেই বিবেকানন্দ প্রচারিত সেবক ধর্মের উদ্ভব। এই চিন্তা হইতেই তিনি ভারতবর্ষের সেবার জন্য আহবান করিলেন—চরিত্রবান, হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান যুবকদিগকে। “ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। * * রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহাদের বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারা যে মানুষ, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। সমাজের এই হীনাবস্থার প্রতিকারের জন্য তিনি চাহিয়াছিলেন—“লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানের দৃঢ়বিশ্বাস-রূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।” যাহাদিগকে এই মহৎ ব্রতের জন্য আচার্যদেব আহবান করিলেন, তাহাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলিলেন, “গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্যাদাহীন দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর। * * আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি। তাহারা আমাকে জুয়াচোর ভাবিয়াছে।”

পাশ্চাত্য দেশে তিনি বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য সার্বভৌমিক ধর্মের শাশ্বত সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, আর ভারতে ফিরিয়া তিনি আমাদের জরাজীর্ণ সভ্যতা, সমাজ ও প্রাণহীন ধর্মাচরণের গতানুগতিকতাকে অতি নির্মম আঘাত করিলেন। তাঁহার কলম্বো হইতে মাদ্রাজের বক্তৃতাগুলিতে নূতন তত্ত্ব, নূতন ভাব, নূতন কর্মপদ্ধতির পরিচয় পাইয়া দেশের অল্পসংখ্যক মনীষী ও হৃদয়বান ব্যক্তিরা বুঝিলেন, নবযুগের সূচনা করিবার মত অনুপম প্রতিভা ও অসামান্য হৃদয় লইয়াই এই সন্ন্যাসী স্বদেশের কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন। একটা জাতির গতানুগতিক চিন্তা ও কর্মকে যিনি ভাঙ্গিতে পারেন এবং ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারেন, সেই যুগ-প্রবর্তক আচার্য স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন—

“প্রায় শতাব্দী কাল ধরিয়া আমাদের দেশ সমাজ-সংস্কারকগণ ও তাঁহাদের নানাবিধ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশের কোন স্থায়ী হিতসাধন হয় নাই। * * গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পোষাকী ধরনের। এই সংস্কার চেষ্টাগুলি কেবল প্রথম দুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অন্য বর্ণকে নহে। সংস্কার করিতে হইলে উপর উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, মূলদেশ

পর্যন্ত যাইতে হইবে। * * দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানাস্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম সমাজ-সংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধির শোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না।"

বিবেকানন্দ তাঁহার পূর্বগামী সংস্কারকগণের দোষত্রুটি নির্ভীকভাবে উদ্ঘাটন করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "সংস্কারকেরা বিফলমনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন, আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রসূতিকে' বুঝিবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়া যান নাই; ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি!"

পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের নাগরিক জীবনে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলে দু'চার জন প্রতিভাশালী ও উদারহৃদয় সংস্কারক প্রাচীন সমাজের বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং এই বিদ্রোহ হইতেই পাশ্চাত্যের বিচারশূন্য অন্ধ অনুকরণমূলক সংস্কারযুগের সূত্রপাত। এই সংস্কার-প্রচেষ্টায় ইয়োরোপীয় ভাব-দাসত্ব দেখিয়া গভীর ক্ষোভের সহিত স্বামিজী ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেননা তাঁহার মতে এই সংস্কারযুগের—

(১) একটা ঐতিহাসিক বোধ ছিল না। কত বড় প্রাচীন সভ্যতার বংশধর এই জাতি, কত কত সংস্কারের মধ্য দিয়া যুগে যুগে কত কত মহাপুরুষকে বক্ষে ধারণ করিয়া আজ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যে ইহার অতীত ইতিহাস দ্বারা প্রভূতরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে, একথা সংস্কারযুগ আদৌ বুঝিতে পারে নাই।

(২) জাতীয় বিশেষত্ব বোধের অভাব। সংস্কারযুগ একথা চিন্তা করে নাই যে, প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে, যাহার জন্য সে বাঁচিয়া থাকিবার দাবী করিতে পারে, যাহার অভাবে তাহার বিলোপ বা মৃত্যু অনিবার্য। হিন্দুর জাতীয় বিশেষত্ব কি, তাহাও তাহারা বুঝে নাই বা তদ্বিষয়ে আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করে নাই। নিজের দেশ বা নিজের জাতি বলিয়া একটা সার্থক অভিমানও সংস্কারযুগের ছিল না বলিয়াই—

(৩) সংস্কারক সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা প্রকাশ্য সভায় "আমি হিন্দু নহি, একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি" বলিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হন নাই। এই সংস্কারযুগের যেন ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, যাহা কিছু হিন্দুর এবং হিন্দুত্ব, তাহাই ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য।

সংস্কারকগণের কার্যপ্রণালী স্বামিজী বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। মুষ্টিমেয় ইংরেজীশিক্ষিত নাগরিক ও উচ্চবর্ণকে লইয়া যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা সর্বস্তরে প্রসারিত হয় নাই। তাহার কারণ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। জাতীয় জীবনের সহিত বিচ্ছিন্ন, বিজাতীয় ও বৈদেশিক ভাবে অনুপ্রাণিত সংস্কারকগণকে লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী তাঁহার স্বকীয় আদর্শ ঘোষণা করিলেন :

"সংস্কারকগণ সমাজকে ভাঙিয়া চুরিয়া যেরূপে সমাজ সংস্কারের প্রণালী দেখাইলেন তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু

আধটু সংস্কার চান, আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কার প্রণালীতে; তাঁহাদের প্রণালী ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলা, আমার প্রণালী সংগঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।”

পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী যে কেবল ধ্বংসমূলক সংস্কার আন্দোলন হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া লইলেন তাহা নহে, অন্যদিকে একথাও বলিলেন যে, সর্ববিধ সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী রক্ষণশীল সমাজের যুক্তিহীন কুসংস্কারেরও তিনি পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার গঠনমূলক কার্যপ্রণালীর প্রথম নির্দেশ, সমাজের সর্বস্তরে ক্রমসঙ্কোচের পরিবর্তে সম্প্রসারণের শক্তি সঞ্চার। কেন্দ্রীভূত সমষ্টি শক্তি আপন বলে জাতীয়-জীবনের বিকাশের বাধাগুলি সরাইয়া অগ্রগতি সঞ্চার করিবে এবং এই কারণেই তিনি কোন বিশেষ সংস্কারের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সমাজের স্তরবিশেষে কতকগুলি আচার-ব্যবহার তুলিয়া দিলে অথবা প্রবর্তন করিলে জাতীয় উন্নতি হইল, এরূপ বিশ্বাস তিনি করিতেন না।

সামাজিক দুর্গতি ও ব্যাধির প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না। বর্তমান সমাজের উন্নতি ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য কতকগুলি প্রথার রদবদলের উপর নির্ভর করে না। জীবদেহে যদি কোন ব্যাধি প্রবেশ করে, তাহা হইলে এক এক অঙ্গে তাহা এক এক ভাবে প্রকাশ পায়। ব্যাধি ও ব্যাধির লক্ষণ দুই পৃথক বস্তু। মূল ব্যাধির চিকিৎসা না করিয়া কেবল দৃশ্যমান লক্ষণগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিলে ঐগুলি অন্য আকারে প্রকাশ পায়। অতএব সাময়িক প্রতিকারের জন্য লক্ষণগুলির উপশম চেষ্টা না করিয়া, মূল ব্যাধি দূর করিবার চেষ্টাই বিবেকানন্দের গঠনমূলক প্রণালী। সমাজদেহের মূল ব্যাধির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

“আমরাই আমাদের সর্বপ্রথম দুর্দশা, অবনতি ও দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী—আমরাই একমাত্র দায়ী। আমাদের অভিজাত পূর্বপুরুষগণ ভারতীয় জনসাধারণকে পদদলিত করিতে লাগিলেন—ক্রমশঃ তাহারা অসহায় হইয়া পড়িল। এই অবিরত অত্যাচারে দরিদ্র ব্যক্তিরা, তাহারা যে মানুষ তাহাও ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল। শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহারা বাধ্য হইয়া (ক্রীতদাসের মত) কেবল জল তুলিয়াছে ও কাঠ কাটিয়াছে। তাহাদিগকে এই বিশ্বাস করিতে শিখান হইয়াছে যে, গোলামী করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, তাহাদের জন্ম জল তুলিবার, কাঠ কাটিবার জন্য। আর যদি কেহ তাহাদের প্রতি দয়াপ্রকাশক দু’একটা কথা বলিতে চায়, তবে আধুনিককালের শিক্ষাভিমানী আমাদের স্বজাতীয়গণ, এই পদদলিত জাতির উন্নতিসাধনে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।”

বংশানুক্রমিকতা বা জন্মগত কৌলিকগুণের দোহাই দিয়া যে বর্বর ও পাশবিক মতবাদ দ্বারা মানুষকে হীন, অন্ত্যজ, পঞ্চম প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়, সেই মূঢ়তাকে স্বামিজী অতি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। কেননা, এই বিশ্বাস (তাহাও আবার পাশ্চাত্যের আসুরিক মতবাদ দ্বারা পুষ্ট) ভারতের তথাকথিত উচ্চবর্ণের অস্থিমজ্জায় রহিয়াছে। সংস্কারের প্রয়োজন সেইখানে। বাহির হইতে নহে, ভিতর হইতে এই মানসিক শ্রেষ্ঠত্বাভিমানস্বরূপ ব্যাধি দূর করিতে হইবে। এই ভ্রান্ত মতবাদকে আক্রমণ করিয়া স্বামিজী বলিলেন—

“যদি বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণ নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় অর্থব্যয় না করিয়া অস্পৃশ্য জাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থব্যয় কর। দুর্বলকে অগ্রে সাহায্য কর। ব্রাহ্মণ যদি বুদ্ধিমান হইয়াই

জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অপরের বিনা সাহায্যেই শিক্ষালাভ করিবে। যাহারা বুদ্ধিমান হইয়া জন্মগ্রহণ করে না, শিক্ষকগণ তাহাদের জন্যই নিয়োজিত হউক। আমার তো ইহাই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অতএব এই দরিদ্রদিগকে, ভারতের পদদলিত জনসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইতে হইবে। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সবলতা-দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নর-নারীকে, প্রত্যেক বালকবালিকাকে শুনাও এবং শিখাও যে, সবল-দুর্বল উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলের ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন—সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে।”

ভারতের উচ্চবর্ণীয়দের ধিক্কার দিয়া, পদদলিত জনসাধারণের প্রতি অপার সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বিবেকানন্দের বজ্রস্বর মন্দ্রিত হইয়াছে—

“আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা ‘ডম্‌ম্‌ম্‌’ বলে ডম্ফাই কর; তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি!! যাদের ‘চলমান শ্মশান’ বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর ‘চলমান শ্মশান’ হচ্ছ তোমরা। তোমাদের বাড়ি ঘর দুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার-ব্যবহার চাল-চলন দেখলেও বোধ হয় যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম!

“এ মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূতকাল লঙ্‌ লুঙ্‌ লিট্‌ সব একসঙ্গে। বর্তমানকালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ লোপ লুপ্‌। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা; আর দেরী কচ্ছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলীতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নি। এখনই ইংরাজরাজত্বে অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও।

“তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক; বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নেই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি-চুপ-করে দিনরাত খাটা, এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!!

“অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি: ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও। আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাও। কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমূতস্যন্দী

ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি—'বাহ গুরুকী ফতে'।"

সমাজসংস্কার বা সমষ্টি মানবের সামাজিক সমুন্নতির এই আদর্শই স্বামিজী বারম্বার বর্তমান ভারতের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। আমি উপরে স্বামিজীর যেসব মত উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে বুদ্ধিমান নরনারীরা তাঁহার সমাজসংস্কার প্রণালীর অভিনবত্ব উপলব্ধি করিবেন। বেদান্তের মহান তত্ত্বপ্রচারকেরা সমাজের সহিত আপোষ করিতে গিয়া, 'পারমার্থিক' সত্য, 'ব্যবহারিক' জগতে প্রযোজ্য নহে বলিয়া লৌকিক বৈষম্যকে সমর্থন করিয়াছিলেন, ফলে মানবাত্মার অপাপবিদ্ধ মহিমার উপর জাতিগত জন্মগত অপবিত্রতা ও অধিকারভেদ আরোপ করিয়া বহু মানবকে, উচ্চবর্ণীয়েরা মানুষের সাধারণ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া পশুবৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন। সত্য সত্যই যাহা অভ্রান্ত, তাহার মধ্যে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদ নাই। কিন্তু এই ভেদবুদ্ধি বহু শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে সামাজিক ভয়াবহ বৈষম্যবাদ সৃষ্টি করিয়া ভারতের গভীর অধঃপতনের কারণ হইল। স্বামিজী জন্মগত, জাতিগত অধিকারবাদকে নির্ভয়ে অস্বীকার করিবার জন্য নব্য-ভারতকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"বেদান্তের এই সকল মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কর্মে পরিণত হইবে।" যে কোন বর্ণের, যে কোন বংশের, যে কোন সমাজের প্রত্যেক বালকবালিকাকে ঐভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি লোকশিক্ষার এক অভিনব আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন।

সমাজকে আচার্যদেব অখণ্ডভাবেই গ্রহণ করিতেন, সমগ্র লইয়া বিচার করিতেন। টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে উচ্চশ্রেণীর সুবিধার দিক হইতে কোন বিশেষ প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য বিগত শতাব্দীর ব্যর্থ চেষ্টার নিষ্ফল পুনরভিনয়ে শক্তিক্ষয় না করিয়া তিনি চাহিয়াছিলেন জাতির সমস্ত অঙ্গে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে। জীবদেহে যৌবন আসিলে যেমন তাহার সকল অঙ্গই পুষ্ট ও বিকশিত হইয়া উঠে, তেমনি জাতি যদি সুস্থ, সবল ও ক্রিয়াশীল হয়, তাহা হইলে যেখানে যে সংস্কার আবশ্যক, তাহা আপনা হইতেই সুসম্পন্ন হইবে। এই জন্যই তিনি বলিতেন, "আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।"

ভারতের জাতীয় জীবন পুনর্গঠনে স্বামিজীর এই আদর্শকে আমরা বৈদান্তিক সাম্যবাদ বলিতে পারি। যে তামসিক জড়বুদ্ধি মানুষের সহিত মানুষের ভেদ ও বৈষম্যকে চরম করিয়া তুলিয়াছে, যাহা কোটি কোটি নরনারীকে হীন, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ ভাবিতে শিখাইয়াছে, তাহার প্রতিরোধকল্পে মানবাত্মার মঙ্গলমহিমা সমাজের সর্বস্তরে প্রচার করিতে হইবে। কিন্তু আদর্শ প্রচার করিতে গেলে আদর্শ-চরিত্র মানুষ চাই। এই শ্রেণীর মানুষের অন্বেষণে স্বভাবতঃই চরিত্রবান ও স্বদেশপ্রেমিক শিক্ষিত যুবকদের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও দেখিয়াছিলেন, শিক্ষিত যুবকগণের বহু সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রণালীর দোষে তাহাদের চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে। যখন জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ অথবা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কেহ কল্পনাও করেন নাই, তখনই স্বামিজী বৈদেশিক কর্তৃত্ববিরহিত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছিলেন। লৌকিক শিক্ষাকে জাতীয় আদর্শের অনুকূল করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ভারতের নানা কেন্দ্রে কতকগুলি শিক্ষালয় স্থাপন করিবেন। এই শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষিত যুবকগণ নূতন করিয়া শিক্ষালাভ করিবেন। আচার্য, প্রচারক ও

লৌকিক বিদ্যাশিক্ষাদাতারূপে ইঁহারা সমাজের সর্বনিম্নস্তর হইতে শিক্ষাদান আরম্ভ করিবেন। "একদিকে ব্রাহ্মণ অপরদিকে চণ্ডাল—চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নই তাঁহাদের কার্যপ্রণালী" হইবে! "উচ্চবর্ণের শিক্ষা, সদাচার, যাহা লইয়া তাহাদের তেজ ও গৌরব সেই শিক্ষা যাহাতে নিম্নজাতীয়গণ অবাধে লাভ করিতে পারে," নূতন শিক্ষাপ্রণালীর তাহাই হইবে বৈশিষ্ট্য।

কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত আচার্যদেবের প্রত্যেকটি বক্তৃতা নবীন ভারতের উদ্বোধন মন্ত্র। আত্মপ্রত্যয়হীন জাতীয় ঐক্যবোধ-বর্জিত, বহু আঘাতে ম্রিয়মাণ ভারত-সন্তান শুনিল, "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া তোমরা কেবলমাত্র স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির আরাধনা কর; অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয় বর্ষ ভুলিলেও কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতা নিদ্রিত। একমাত্র দেবতা—তোমার স্বজাতি; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্রই তাঁহার জাগ্রত কর্ণ, সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছি, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না।* * * এই সব মানুষ, এই সব পশু, ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য।"

বহুকাল-নিস্তরঙ্গ ভারতের জনসমুদ্রে বিবেকানন্দ অকস্মাৎ আবির্ভূত ঝটিকার মত তরঙ্গ তুলিলেন। ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে সত্যের অমোঘ বীর্যপূর্ণ বাণী ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু কাজ কতটুকু হইল? ভগবান্ বিষ্ণু যেমন তৃতীয় অবতারে সাগরাম্বরা ধরিত্রীকে প্রলয়পয়োধি হইতে দুর্নিবার বলে টানিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি অশান্ত অধীরতা লইয়া ভারতবর্ষকে হীনতাপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য বিবেকানন্দ তাঁহার বরবাহু প্রসারিত করিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশ হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর যে উৎসাহ দেখা গেল, তাহা স্থায়ী হইল না। দুই বৎসর, তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়াও বিবেকানন্দ "মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সহস্র যুবক" পাইলেন না। বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া জীবন-সায়াহ্নে বিবেকানন্দ বিলাপ করিয়া বলিতেন, যাহাদের ডাকিলাম, তাহারা আসিল না। বহু শতাব্দীর সংস্কার, গতিহীন জীবনযাত্রার উপর গতানুগতিকতার পাষাণভার, এত অল্পে দূর হইবার নহে। বাণবিদ্ধ কেশরীর মত ক্ষুব্ধগর্জনে জনারণ্য প্রকম্পিত করিয়া নব্যভারতের মন্ত্রগুরু চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প অমর হইয়া রহিল। তাঁহার দেহত্যাগের তিন বৎসর পরেই বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে যুগান্তকারী অভাবনীয় পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের জাগ্রত বাঙ্গলা চিনিল, বিবেকানন্দকে। তাঁহার প্রাণপ্রদ জীবনপ্রদ বাণী নব্যবাঙ্গলা নূতন করিয়া অনুভব করিল। বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রথম সংঘাতে জাগ্রত ভারত, পরবর্তীকালে তিলক ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিশাল গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়া জাতীয় ঐক্য ও উন্নতির সন্ধান পাইল। ভারতে মানবমুক্তি-সাধনার আজ যে দুঃসাধ্য উদ্যম চলিয়াছে, দূরপ্রসারী ভবিষ্যদ্দৃষ্টিবলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াই বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

১৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার স্বামিজী মাদ্রাজ হইতে কলিকাতাগামী জাহাজে আরোহণ করিলেন। কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বক্তৃতা, কথোপকথন, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। লোকমান্য তিলক তাঁহাকে পুণা যাইবার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও স্বামিজী পুণা যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। কয়েকদিন বিশ্রামের আশায়

তিনি স্থলপথ বর্জন করিয়া জলপথে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই অভিনন্দন সভা আর বক্তৃতার পালা শেষ করিয়া কবে হিমালয়ের ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিব।

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রচারিত হইবার পর হইতেই বাঙ্গলাদেশ, বিশেষতঃ কলিকাতানগরী সাগ্রহে তাঁহার শুভাগমন প্রত্যাশা করিতেছিল। তাঁহার মাদ্রাজ হইতে সমুদ্রপথে কলিকাতা আগমনের সংবাদ পাইয়া, নাগরিকদের পক্ষ হইতে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতি যথোচিত আয়োজন উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

স্বামিজী শিষ্যবর্গসহ জাহাজ হইতে খিদিরপুরে অবতরণ করিয়া দেখিলেন. তাঁহাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য একখানি স্পেশ্যাল ট্রেন অপেক্ষা করিতেছে। ভোর ৭টা ৩০ মিনিটের সময় ট্রেন ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল। ট্রেন বংশীধ্বনি করিবামাত্র সহস্র সহস্র মিলিতকণ্ঠে "জয় রামকৃষ্ণদেব কী জয়" "জয় বিবেকানন্দ স্বামিজী কী জয়" রবে ষ্টেশন মুখরিত হইয়া উঠিল। স্বামিজী ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া সমবেত জনসংঘকে যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দ বহুকণ্ঠে জনতা ভেদ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বিবিধ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। সহস্র সহস্র সম্ভ্রমপূর্ণ উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিস্নাত হইয়া কীর্তিমান সন্ন্যাসী, মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার সমভিব্যাহারে চতুরাশ্ব-যোজিত শকটে আরোহণ করিলেন। যুবকগণ গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ি টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। পত্র-পুষ্প-পল্লব-পতাকা-পরিশোভিত তিনটি মনোহর তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া শকট রিপণ কলেজে উপনীত হইল। তথায় কিয়ৎকাল সমাগত সুধীবৃন্দকে সময়োচিত শিষ্টালাপে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বামিজী বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাগবাজারের পশুপতিনাথ বসুর আলয়ে সেদিন ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য তিনি গুরুভ্রাতাগণসহ ইতোপূর্বেই আহূত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকাল তথায় যাপন করিয়া অপরাহ্ণে তিনি সদলবলে কাশীপুরের গোপাললাল শীল মহাশয়ের বাগানবাটীতে গমন করিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্য ও শিষ্যাগণসহ বাস করিবার জন্য উহা অস্থায়ীভাবে অভ্যর্থনা সমিতির কর্তৃপক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দলে দলে নরনারীর ভীড়। কেহ তত্ত্বজিজ্ঞাসু, কেহ কৌতূহলী দর্শক। বিশ্রামের ব্যাঘাত সত্ত্বেও স্বামিজী বিরক্ত না হইয়া, সমাদর সহকারে সকলের সহিত সদালাপ করিতেন। রাত্রে আলমবাজার মঠে গিয়া গুরুভাইদের সহিত ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। ভারতের ও বাঙ্গলার নানাস্থান হইতে আগ্রহপূর্ণ আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল; কিন্তু স্বামিজী কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার আদর্শ প্রচার এবং প্রচারকার্যের অনুকূল সংঘ গঠনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তাহকাল পরে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারস্থ প্রাসাদের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে অভিনন্দন সভা আহূত হইল। বিশিষ্ট নাগরিকগণ, পণ্ডিতগণ, ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকগণ, বিশেষভাবে কলেজের ছাত্রগণ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সভায় উপস্থিত হইলেন। প্রায় পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। স্বামিজী সভাস্থলে প্রবেশ করিবামাত্র সমবেত জনতা সম্ভ্রমভরে দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শিষ্টাচার ও কুশল প্রশ্নাদির পর সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব

রৌপ্যাধারে অভিনন্দনপত্র স্বামিজীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। অভিনন্দনপত্রে পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত ও হিন্দু-সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রচারকারী সন্ন্যাসীকে ভারত তথা বাঙ্গলার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানরূপে ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছিল। স্বীয় জন্মভূমিতে সহস্র সহস্র স্বদেশবাসী, বিশেষতঃ যুবকগণ কর্তৃক অকৃত্রিমভাবে অভ্যর্থিত হইয়া আবেগের সহিত তিনি যে অপূর্ব বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সমগ্র জনতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শ্রবণ করিয়াছিল। এ যেন এক নূতন মানুষ নূতন সুরে কথা কহিতেছে। ভারতের শাশ্বত আত্মা যেন মূর্তিগ্রহণ করিয়া নবীন ভারতকে নূতন আশায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য অমৃতবাণী, অভয়বাণী উচ্চারণ করিতেছেন। ভারতবর্ষের পরম প্রয়োজনকে উপলব্ধি করিবার উগ্র তপস্যার মর্মকথা তাঁহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল :—

“মানুষ আপনার মুক্তির চেষ্টায় জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিতে চায়। মানুষ নিজ আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে, অতিদূরে পলাইয়া যায়। চেষ্টা করে দেহগত সকল সম্বন্ধ, পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমনকি, মানুষ নিজে যে সার্ধত্রিহস্ত পরিমিত দেহধারী মানব, ইহা ভুলিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সে সর্বদাই একটি মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পায়, তাহার কর্ণে সর্বদা একটি সুর বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কানে কানে বলিতে থাকে, ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।”

একদিকে ব্যক্তিগত মুক্তি-কামনা, অন্যদিকে জাতীয় জীবনে উন্নতিমুখী গতিবেগ সঞ্চার করিয়া সমষ্টি-মুক্তি, এই দুই আপাত বিপরীত আদর্শ-সংঘাত তাঁহার সাধক ও পরিব্রাজক জীবনে আমরা বারম্বার দেখিয়াছি। মুক্তির এই সুমহান প্রয়াসের সর্বশেষ চেষ্টায় সমাধিকামী সাধক কন্যাকুমারীতে ভারতবর্ষের সর্বশেষ শিলাসনে বসিয়া তনুত্যাগের সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য-চন্দ্র-তারাহীন মহাশূন্যে, দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া তাঁহার মন ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিল না, নামরূপহীন ব্রহ্ম-সমাধির পরিবর্তে তাঁহার ধ্যানে জননী জন্মভূমির রূপ ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে বলিয়াছিলেন, “জননি, আমি মুক্তি চাই না; তোমার সেবাই আমার জীবনের একমাত্র অবশিষ্ট কর্ম।”

এই সাধনালব্ধ স্বদেশপ্রেম-যজ্ঞের উদ্বোধনকল্পে মহাভাগ ঋত্বিক উদাত্ত-কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার প্রিয় যজমান ভারতীয় যুবকবৃন্দকে আহ্বান করিয়াছেন। সে অবিনশ্বর বাণীর পবিত্র কম্পনে ভারতের আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সে কম্পনে স্বদেশপ্রেমিক-সাধকের হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে নিত্যকাল বাজিতে থাকিবে, “আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলে দীন-দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর; বলি—জীবনবলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন, দরিদ্র, পতিত, উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ-কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর—যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।”

স্বীয় জন্মভূমিতে দাঁড়াইয়া বিবেকানন্দ ‘কল্পনাপ্রিয় ভাবুক’ বলিয়া উপহসিত বাঙ্গালী যুবকগণের নিকট মাতৃভূমির জন্য মহাবলি প্রার্থনা করিলেন। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, চরিত্রের তেজ ও বীর্যকে জাগ্রত করিয়া মহোৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হও; এমন কথা বাঙগালী যুবকগণের কর্ণে প্রথম প্রবেশ করিল। “এই কলিকাতা নগরীর রাজপথে এক নগণ্য বালকরূপে আমিও খেলা করিয়া বেড়াইতাম, ইচ্ছা হয় এই ধূলির উপর বসিয়া তোমাদিগকে মনের কথা খুলিয়া বলি;” এমনি অকপট আবেগের সহিত স্বামিজী যুবকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “আমার এই কার্যভার, হে বাঙগালী যুবকগণ, তোমরা গ্রহণ কর। এই কার্যের উন্নতি ও বিস্তার আমার কল্পনাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হউক। আমি সূচনামাত্র করিয়াছি, তোমরা সম্পূর্ণ কর। বর্তমান যুগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়া লও। আর কখনো কোন দেশের যুবকদের স্কন্ধে এত গুরুভার পড়ে নাই, আমি প্রায় অতীত দশবৎসর ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি, যাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বাঙ্গলার যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ পাইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবে।”

কেবল এই সকল কথা বলিয়াই স্বামিজী ক্ষান্ত হইলেন না। সম্মুখে একটা জীবন্ত সগুণ আদর্শ না থাকিলে চরিত্র গঠিত হয় না। “কোন মহান্ আদর্শ পুরুষে বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না। * * * রামকৃষ্ণ পরমহংসে আমরা এইরূপ এক ধর্মবীর, এইরূপ এক আদর্শ পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। এই কারণে আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য, কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। এই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণ ও দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন, যে মহা-যুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহায়তার জন্য তোমাদিগকে অপকট ও দৃঢ়ব্রত করুন।”

তাঁহার গুরু, তাঁহার আচার্য, তাঁহার জীবনের আদর্শ, তাঁহার ইষ্ট রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা ইতোপূর্বে কোন প্রকাশ্য সভায় তিনি এমন সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেন নাই। নিউইয়র্কে শিষ্যদের অনুরোধে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে ‘মদীয় আচার্যদেব’ শীর্ষক একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং মান্দ্রাজের বক্তৃতাগুলিতে স্থানে স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ভারতের পুনরুত্থানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এমন দৃঢ়ভাবে ইতোপূর্বে কোন ঘোষণা করেন নাই। এই প্রথম তিনি বাঙ্গলাদেশকে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, “তোমার আমার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, তাহার জন্য প্রভুর কার্য আটকাইয়া থাকে না। তিনি সামান্য ধূলি হইতেও তাঁহার কার্যের জন্য শত সহস্র কর্মী সৃজন করিতে পারেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়া কার্য করা তো আমাদের পক্ষে মহাসৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়!”

স্বামিজীর কলিকাতা আগমনের কয়েকদিন পরেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসবের শুভদিন সমাগত হইল। তখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতেই উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। নির্দিষ্ট দিবস প্রভাতে স্বামিজী

পাশ্চাত্য শিষ্য ও শিষ্যাগণসহ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন। বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সাধারণের সাগ্রহ অনুরোধে তিনি কয়েকবার বক্তৃতা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উৎসবের আনন্দকোলাহলের মধ্যে বক্তৃতা করা সম্ভব হইয়া উঠিল না। স্বামিজী বালকের ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল বদনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর উৎসবান্তে প্রসন্নচিত্তে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী যে কেবল অবিমিশ্র অভ্যর্থনা ও সম্বর্ধনাই লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পাশ্চাত্যদেশে যে সকল ভারতীয় ভদ্রমহোদয় খৃষ্টান পাদ্রীদের সহিত যোগ দিয়া স্বামিজীর বিরুদ্ধে নানা অলীক কুৎসা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বদেশেও নীরব রহিলেন না। নববিধানী ব্রাহ্ম বি. মজুমদার স্বামিজীর আচরণ ও চরিত্র লইয়া জঘন্য কুৎসাপূর্ণ কয়েকখানি পুস্তিকা লিখিয়া স্বীয় শোচনীয় মানসিক দৈন্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। খৃষ্টান পাদ্রী ও ব্রাহ্ম কোলাহলের সহিত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বাঙ্গলা-গালিমিশ্রিত দেবভাষায় বিবেকানন্দের নিন্দা প্রচার করিতে লাগিলেন। "যে ব্যক্তি কপর্দকশূন্য অবস্থায় বিদেশে শূন্য ডিগ্রীরও ২০ ডিগ্রী নীচের শীতে অনাবৃত স্থানে রাত্রি যাপন করিতে ভীত হন নাই, তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশে ভয় দেখান অতি সুকঠিন।" এই জঘন্য প্রচারকার্য দেখিয়া উৎকণ্ঠিত সহকর্মীদিগকে স্বামিজী কেবল বলিলেন—"ভাল বলুক আর মন্দ বলুক, তবু উহারা আমার সম্বন্ধে কিছু বলুক।"

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের কিছুদিন পর, স্বামিজী ষ্টার রঙ্গমঞ্চে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'সর্বাবয়ব বেদান্ত'। এই বক্তৃতায় তিনি 'বঙ্গবাসী'র আশ্রিত ভণ্ড ও বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কুযুক্তি ও কুতর্ক খণ্ডন করিলেন। স্বামিজী প্রথমে দেখাইলেন, বেদান্ত এক এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আচার্যগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করায় বহু বিরোধী দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ক্রমে অধ্যাত্মসাধনার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বেদান্ত দার্শনিক পণ্ডিতগণের উর্বর মস্তিষ্কের ব্যায়াম-ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে। কতকগুলি পুরাণ, কয়েকখানি আধুনিক স্মৃতিগ্রন্থ ও বিশেষভাবে লোকাচার ও দেশাচারই ধর্ম বলিয়া যাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রান্তবিশ্বাস দূর করিবার জন্য স্বামিজী দেখাইলেন, বেদান্ত দুর্বোধ্য দর্শনশাস্ত্র নহে, উহাই সনাতনধর্মের ভিত্তি। বেদান্তের আলোকবর্তিকা তুলিয়া স্বামিজী বর্তমান সামাজিক আচার ও ধর্মাচরণের শোচনীয় দুর্গতি দেখাইলেন। বাঙ্গলাদেশে তথাকথিত সনাতনীরা বর্ণাশ্রমধর্মের মহিমা কীর্তন ও খাদ্যের বিচার লইয়া তুমুল কলহ করিতেছেন, কিন্তু ধর্মকে কেবলমাত্র রান্নাঘরে ঢুকাইয়া রাখিলেই বর্ণাশ্রমাচার রক্ষা পাইবে, ইহা পাগলের কল্পনা। যে দেশে চাতুর্বর্ণ্য নাই, প্রাচীন বর্ণাশ্রম বহুদিন লুপ্ত হইয়া যেখানে কালক্রমে অদ্ভুত জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে সনাতনীরা ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য দুই অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করেন না, সেখানে যদি কেহ সত্যই বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, তাহা হইলে একই জাতির বিভিন্ন শাখাসমূহকে পুনরায় একত্র করিয়া বর্ণের অবান্তর বিভাগগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে। যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাঙ্গলাদেশে থাকে, তবে তাহাদিগকে যজ্ঞোপবীত প্রদান ও বেদ পাঠের অধিকার প্রদান করা উচিত। প্রসঙ্গত ধর্মসংস্কারের জন্য স্বামিজী বাঙ্গলাদেশের কুলগুরু প্রথা, মূর্খ শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের ধর্মব্যবসায় অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া ব্যাখ্যা

করিলেন এবং তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে যে জঘন্য ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহারও তীব্র সমালোচনা করিলেন। স্বামিজীর এই বক্তৃতায় তিনি তাঁহার মতবাদ ও কার্যপ্রণালী অতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া সর্বসাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির সহিত তিনি আপোষ করিবেন না। অদ্বৈত বেদান্তের অস্ত্রে বর্তমান প্রচলিত বৈষম্যকে বিনাশ করাই তাঁহার ব্রত।

ইহার পর স্বামিজী আর কলিকাতায় বক্তৃতা প্রদান করেন নাই। কলম্বো হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একঘেয়ে অভিনন্দন-পত্র ও বক্তৃতায় তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বক্তৃতায় একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী ব্যক্তিবিশেষকে উপদেশ প্রদান করা, চরিত্রগঠন করিতে সহায়তা করা ইত্যাদিতেই অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময় সকলেই যে স্বামিজীর নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে আগমন করিতেন তাহা নহে, কেহ বা তাঁহাকে কেবলমাত্র দেখিতে, কেহ বা কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিতেন।

বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ প্রচারক বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর খ্যাতি শুনিয়া একদিন কয়েকজন বেদ ও দর্শনশাস্ত্রবিদ্ গুজরাতী পণ্ডিত তাঁহার সহিত শাস্ত্র-বিচার করিতে আগমন করিলেন। “আগন্তুক পণ্ডিতগণের সকলেই সংস্কৃতভাষায় অনর্গল কথা-বার্তা বলিতে পারিতেন। তাঁহারা আসিয়াই মণ্ডলী পরিবেষ্টিত স্বামিজীকে সম্ভাষণ করিয়া সংস্কৃতভাষায় কথা-বার্তা আরম্ভ করিলেন, স্বামিজীও সংস্কৃতেই উত্তর দিতে লাগিলেন। * * * পণ্ডিতেরা প্রায় একসঙ্গে চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে স্বামিজীকে দার্শনিক কূটপ্রশ্নসমূহ করিতেছিলেন এবং স্বামিজী প্রশান্ত গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ক নিজ মীমাংসাদ্যোতক সিদ্ধান্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, স্বামিজীর সংস্কৃতভাষা পণ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুর ও সুললিত হইতেছিল। পণ্ডিতগণ পরে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। স্বামিজী বাদে সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতগণ পূর্বপক্ষবাদী হইয়াছিলেন। শিষ্যের মনে পড়ে স্বামিজী একস্থলে ‘স্বস্তি’ স্থলে ‘অস্তি’ প্রয়োগ করায় পণ্ডিতগণ হাসিয়া উঠেন, তাহাতে স্বামিজী তৎক্ষণাৎ বলেন, ‘পণ্ডিতানাং দাসোঽহংক্ষান্তব্যমেতৎ স্খলনং,—আমি পণ্ডিতগণের দাস, আমার এই ব্যাকরণ স্খলন ক্ষমা করুন।’ পণ্ডিতেরাও স্বামিজীর ঈদৃশ দৈন্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর পরিশেষে সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্যাপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। দুই চারিজন আগন্তুক ভদ্রলোক ঐ সময় তাঁহাদের পশ্চাৎগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মহাশয়গণ, স্বামিজীকে কিরূপ বোধ হইল?’ তদুত্তরে বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, ‘ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও স্বামিজী শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদ্রষ্টা, মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয় এবং স্বীয় প্রতিভাবলে বাদখণ্ডনে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন’।” (স্বামী-শিষ্য সংবাদ)

আলমবাজার মঠের রামকৃষ্ণ-শিষ্য সন্ন্যাসীবৃন্দ তাঁহাদিগের প্রিয়তম ‘নেতা নরেন্দ্রনাথ’কে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তৎপ্রচারিত সন্ন্যাস ও কর্মযোগের নবরূপান্তরিত আদর্শ কেহ কেহ সহসা স্বীকার করিতে পারিলেন না। ধ্যান তপস্যা ইত্যাদি সাধন সহায়ে মুক্তিলাভের চেষ্টাই সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ, এই চিরাচরিত প্রথাই তাঁহারা অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। জাগতিক সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি ইত্যাদিতে ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া ভূতপ্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া দেশকালাতীত সত্তাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টাকে স্বামিজী স্বার্থপরতা আখ্যা

দিয়া তাঁহাদিগকে ধর্মপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনেকেই স্বামিজীর উপদেশের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া চিরাভ্যস্ত রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী হটিবার পাত্র নহেন, তিনি দৃঢ়তার সহিত তাঁহাদিগকে স্বমতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশগুলি স্বামিজীর প্রতিভার আলোকে নবীনাকার ধারণ করিল। তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা যদি এই যুগধর্ম প্রচারকার্যে বদ্ধপরিকর না হন, তাহা হইলে ঠাকুরের আগমনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে। মন্দির ও প্রতিমার গণ্ডী হইতে ভগবানকে বাহিরে আনিয়া "যত্র জীব, তত্র শিব" মন্ত্রে 'বিরাটের' পূজায় অগ্রসর হইতে হইবে। প্রাচীনকালের সন্ন্যাসিগণের ন্যায় গিরিগুহায় বা কুটিরাভ্যন্তরে বসিয়া কেবলমাত্র আত্মসাক্ষাৎকারের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিলে চলিবে না। সংসারের কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মানবকে উচ্চকার্যে প্রেরণা দিতে হইবে, কোটি কোটি ভারতবাসীর অজ্ঞতা ও হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে হইবে। স্বামিজী তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে স্বীয় জীবনোদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, ভারতের কল্যাণকামনায় এমন এক অভিনব সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহারা মানবসেবাব্রতে স্ব স্ব মুক্তির কামনা তো পরিত্যাগ করিবেই, অধিকন্তু প্রয়োজন হইলে সানন্দে নরকে পর্যন্ত গমন করিতে প্রস্তুত হইবে। 'বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়' শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য হইয়া যদি আমরা পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে না পারি, তৎপ্রচারিত মহান্ যুগাদর্শকে উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই, তাহা হইলে সাধারণ ব্যক্তি ও আমাদের মধ্যে প্রভেদ কি?

ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁহার যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। ইহার প্রথম ফলস্বরূপ পুণ্যস্মৃতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, যিনি দ্বাদশবর্ষ কাল একদিনও শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, আরতি ও অর্চনা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন নাই, স্বামিজীর অনুরোধে বেদান্ত প্রচারকার্যে দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ও সারদানন্দজীর পাশ্চাত্যদেশে প্রচার-কার্যভার গ্রহণের কথা আমরা ইতোপূর্বেই যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। স্বামিজীর উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্মিশ্রেষ্ঠ স্বামী অখণ্ডানন্দজীও মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর সেবাকার্যে প্রস্থান করিলেন। গুরুভ্রাতাগণকে কর্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বামিজী আশাতীত আনন্দ লাভ করিলেন।

বহুবর্ষব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে স্বামিজীর বজ্রদৃঢ় দেহ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। শারীরিক অসুস্থতার প্রতি দৃক্পাত না করিয়া স্বামিজী মঠের ব্রহ্মচারী ও নবদীক্ষিত শিষ্যবৃন্দকে গীতা, উপনিষদ্ ইত্যাদি ভাষ্য সহকারে স্বয়ং পড়াইতে লাগিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য সর্বপ্রকার মানসিক শ্রম হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। স্বামিজী তাঁহাদের পরামর্শে দার্জিলিং যাত্রা স্থির করিলেন। তাঁহার সহিত মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মিঃ গুডউইন, ডাক্তার টার্ণবুল এবং তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্যত্রয়—আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি. জি. নরসিংহাচার্য ও সিঙ্গরাভেলু মুধলিয়র—দার্জিলিং যাত্রা করিলেন। বর্ধমানের মহারাজা স্বীয় 'রোজ-ব্যাঙ্ক' নামক ভবনের একাংশ তাঁহাদের বাসের জন্য প্রদান করিলেন। পরে দার্জিলিংয়ের মিঃ এম. এন. ব্যানার্জী স্বামিজী ও তাঁহার সঙ্গিগণকে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করাইলেন। প্রায় দুইমাস দার্জিলিংয়ে থাকিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইল না। এদিকে অলসভাবে দিন যাপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায়

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

স্বামিজী যখন বিদেশে তখন কয়েকজন যুবক আলমবাজার মঠে যোগদান করিয়া ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। স্বামিজী তাঁহাদিগের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু একজনের সম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিলেন। উক্ত ব্যক্তির পূর্বজীবন ভাল ছিল না, অতএব তাহাকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া মঠভুক্ত করিতে অনেকেই আপত্তি করিলেন। স্বামিজী তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগকে বলিলেন, “আমরা যদি পাপীকে আশ্রয় প্রদান করিতে সংকুচিত হই, তাহা হইলে ইহারা আর কোথায় আশ্রয় পাইবে? এ যখন উচ্চতর পবিত্র জীবন যাপন করিবার সংকল্প লইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছে, তখন ইহাকে সাহায্য করা আমাদিগের কর্তব্য। তোমরা যদি উচ্ছৃংখল ও অসৎচরিত্র ব্যক্তিগণের চরিত্র সংশোধন করিতে অপারগ হও, তাহা হইলে গৈরিক পরিধান করিয়া আচার্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ কেন?” পতিতপাবন স্বামিজীর ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ আর আপত্তি করিলেন না।

স্বামিজী বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন; শাস্ত্রমতে ঐ সকল ক্রিয়াকাণ্ড ঠিক ঠিক সম্পন্ন না হইলে মহাবিরক্ত হইতেন। আজকাল যেমন গেরুয়া পরিয়া বাহির হইলেই অনেকে সন্ন্যাস-দীক্ষা সম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করেন, স্বামিজী সেরূপ মনে করিতেন না। গুরুপরম্পরাগত আবহমানকাল প্রচলিত ব্রহ্মবিদ্যা সাধনোপযোগী সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাগনুষ্ঠেয় সংস্কারগুলি ব্রহ্মচারিগণের দ্বারা ঠিক ঠিক সাধন করাইয়া লইতেন।

কৃতশ্রাদ্ধ, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণেচ্ছু শিষ্যগণ যখন আসিয়া স্বামিজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন, তখন স্বামিজী তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, “তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছ; ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী। কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।”

অতঃপর সন্ন্যাসাশ্রমের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে করিতে স্বামিজীর বদনমণ্ডল স্বর্গীয় বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, “বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যাহারা এই ideal (উচ্চাদর্শ) ভুলে যায়—বৃথৈব তস্য জীবনং। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তি দান করতে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মংগল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।” পরে নিজ ভ্রাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—আমাদের জন্ম। কি কচ্ছিস্ সব বসে? ওঠ্—জাগ নিজে! নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্—নরজন্ম সার্থক করে দিয়ে চলে যা—‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত’।”*

স্বামিজী আলমবাজার মঠে ও বাগবাজার বলরাম বসুর ভবনে থাকিয়া উৎসাহের সহিত যুগধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই কার্যের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দকে সংঘবদ্ধ করিবার সংকল্প তাঁহার মনে বহুদিন ছিল। ১৮৯৭ সালের ১লা মে স্বামিজীর আহ্বানে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্ন্যাসিভক্তবৃন্দ অপরাহ্ণে বাগবাজার

---

* স্বামী-শিষ্য সংবাদ।

বলরাম ভবনে সমাগত হইলেন। স্বামিজী সমবেত ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হ'তে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈয়ার করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে যখন ইতর-সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত-ফতের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্রমতে সংঘের কার্য চলতে পারবে। সেইজন্য এই সঙ্ঘের একজন dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত নিয়ে কার্য করা হবে।

"আমরা যাঁহার নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁহাকে জীবনের আদর্শ কোরে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁহার দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস, আপনারা এ কার্যে সহায় হোন।"

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহিগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে রামকৃষ্ণ সংঘের ভাবী কার্যপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। সংঘের নাম রাখা হইল, রামকৃষ্ণ প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন। উহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি আমরা উহার মুদ্রিত বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

উদ্দেশ্য—মানবের হিতার্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।

ব্রত—জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অখণ্ড সনাতন ধর্মের রূপান্তর মাত্র জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনই এই 'প্রচারের' ব্রত।

কার্যপ্রণালী—মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ বর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব, রামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্য—ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যব্রত গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার আশ্রম স্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশ-দেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্যবিভাগ—ভারতবহির্ভূত প্রদেশসমূহে 'ব্রতধারী' প্রেরণ এবং তত্তৎ প্রদেশে স্থাপিত আশ্রম সকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি বর্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম সংস্থাপন।

"স্বামিজী উক্ত সমিতির সাধারণ সভাপতি হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি ও স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র (এটর্ণী) ইহার সম্পাদক, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও শরচ্চন্দ্র সরকার সহকারী সম্পাদক এবং শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্বাচিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মটিও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রতি রবিবার ৪টার পর বলরাম বাবুর বাড়িতে "রামকৃষ্ণ সমিতির অধিবেশন হইবে। পূর্বোক্ত সভার পরে তিন বৎসর পর্যন্ত

মিশন" সমিতির অধিবেশন প্রতি রবিবার বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়িতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, স্বামিজী যতদিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, ততদিন সুবিধামত সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কখনও উপদেশ দান এবং কখনও বা কিন্নরকণ্ঠে গান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিতেন।" (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হইবার পর কোন কোন রামকৃষ্ণ-ভক্ত স্বামিজী বৈদেশিকভাবে কার্য করিতেছেন বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা বলরাম বাবুর বাটীতে স্বামিজী গুরুভ্রাতাগণের সহিত রহস্যালাপ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার একজন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা সহসা প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করিতেছেন না এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার সহিত তৎপ্রচারিত আদর্শগুলির সামঞ্জস্য কোথায়? কারণ, একান্ত ভক্তির সহিত অনন্যচিত্ত হইয়া সাধন-ভজন সহায়ে কেবলমাত্র ঈশ্বরোপলব্ধির চেষ্টা করাই ঠাকুরের আদর্শ ছিল। অপরদিকে স্বামিজী সকলকেই কর্ম, রোগী ও দরিদ্রের সেবা, শিক্ষাবিস্তার, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি করিতে উপদেশ দিতেছেন। ঐ সকল কর্ম মনকে স্বতঃই বহির্মুখ করিয়া তোলে এবং সাধনের বিঘ্নকর। স্বামিজী যে জনহিতকল্পে মঠ, মিশন, বেদান্ত সমিতি, সেবাশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, স্বদেশপ্রেমের মধ্য দিয়া মানব-সেবাব্রত প্রচার করিতেছেন, এগুলি পাশ্চাত্য আদর্শ বলিয়া মনে হয়, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বত্যাগই মূলমন্ত্র ছিল।

বাহিরে লোকের নিকট বিশ্वবিখ্যাত বিবেকানন্দ যাহাই হউন না কেন, গুরুভ্রাতা ও অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীর নিকট চিরদিনই সেই হাস্যরসিক, ব্যঙ্গমুখর নরেন্দ্রনাথই ছিলেন। কৌতুকপ্রিয় স্বামিজী উক্ত গুরুভ্রাতাকে লইয়া প্রথমতঃ ব্যঙ্গ জুড়িয়া দিলেন। তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি বলতে চাও যে, লেখাপড়া, সাধারণে ধর্মপ্রচার, আর্ত, রোগী, অনাথ এদের সেবা করা—দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করলেই অমনি মায়ায় বন্ধ হয়ে যেতে হবে? 'ঈশ্বর অন্বেষণ কর, জগতের উপকার করতে যাওয়া অনধিকারচর্চা করা মাত্র', এ রকম কথা ঠাকুর ব্যক্তিবিশেষকে বলেছেন বলেই যদি ঐ সমস্ত কাজ মন্দ বলে মনে কর, তাহ'লে তুমি ঠাকুরের উদ্দেশ্য একবিন্দুও বোঝ নাই।" বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের ভাব অন্তর্হিত হইল। বেদান্তকেশরী দৃপ্তগর্জনে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি মনে কর যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে আমার চেয়েও ভাল বুঝেছো? তুমি কি মনে কর জ্ঞান শুষ্ক পাণ্ডিত্যমাত্র, যা হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির উচ্ছেদ সাধন করে এক ঊষর পন্থাবলম্বনে অর্জন করতে হয়? তুমি যে ভক্তিকে লক্ষ্য করছো, তা আহাম্মকের ভাবুকতা মাত্র, যা মানুষকে কাপুরুষ ও কর্মবিমুখ করে তোলে। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করার কথা বল্‌ছো? তুমি আমি তাঁর অনন্তভাবের কতটুকুর ইয়ত্তা করতে পেরেছি যে, জগৎকে বলতে যাব? সরে দাঁড়াও! কে তোমার শ্রীরামকৃষ্ণকে চায়, কে তোমার 'ভক্তি' 'মুক্তি' নিয়ে মাথা ঘামায়? শাস্ত্র কি বল্‌ছে না বল্‌ছে কে শোনে? যদি আমি আমার তমোহ্রদে মজ্জমান স্বদেশবাসীকে কর্মযোগের দ্বারা অনুপ্রাণিত করে প্রকৃত মানুষের মত নিজের পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারি, তা'হলে আমি আনন্দের সঙ্গে লাখ নরকে যাব। আমি তোমার রামকৃষ্ণ বা অপর কারও চেলা নই; যা'রা নিজেদের ভক্তি মুক্তির কামনা ত্যাগ করে দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে, আমি তাদের চেলা—ভৃত্য—ক্রীতদাস।" স্বামিজীর আবেগ-রক্তিম মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় করুণার ছবি ফুটিয়া উঠিল, পরাধীনতার পেষণে অপহৃত মনুষ্যত্ব ভারতবাসীর অসীম দুঃখের

দুঃসহ স্মৃতি তাঁহার হৃন্মর্ম মথিত করিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; সেই বিশাল বীরবক্ষ যেন বিদীর্ণ হইবে; এই আশঙ্কায় উভয় হস্তে বক্ষ চাপিয়া তিনি দ্রুতপদে স্বীয় বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দুই একজন ধীরপদে অগ্রসর হইয়া সন্তর্পণে গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিলেন আচার্যদেব ভূম্যাসনে ভাবসমাধিস্থ! ভয়ে ও বিস্ময়ে গুরুভ্রাতাগণ পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর যখন তিনি পুনরায় গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে আসিলেন, তখন ঝটিকাবসানে মথিত সমুদ্রের মত তাঁহার গম্ভীরমূর্তি দেখিয়া কাহারও বাক্যস্ফূর্তি হইল না। কিছুক্ষণ পর তিনি মৌনভঙ্গ করিয়া কহিলেন, “যার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হয়েছে, তার স্নায়ুগুলি এত কোমল হয়ে পড়ে যে সামান্য ফুলের ঘা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না; তোমরা জান, আমি আজকাল প্রেমভক্তি সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক পড়তে পারি না! শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বেশীক্ষণ কথা কইতে গেলেই ভাবে অভিভূত হয়ে যাই। অন্তর্নিহিত এই ভক্তি-প্রবাহের গতিরোধ করতে আমি ক্রমাগত চেষ্টা করছি; কর্মের কঠিন শৃঙ্খলে নিজেকে বেঁধে রেখেছি, কারণ এখনও জগতে আমার যে বার্তা বহন করবার আছে, তা’ শেষ হয়নি। তাই যদি দেখি, ভক্তির উদ্দাম প্রবাহ আমাকে ভাসিয়ে নিতে চায়, তখনই কঠোর জ্ঞানের রুদ্রদণ্ড তুলে আঘাত করে ঐ সব ভাব সংযত রাখি। হায়, মুক্তি নাই! এখনও আমাকে অনেক কর্ম করতে হবে। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রীতদাস, তিনি যে তাঁর কর্মভার আমার স্কন্ধে নিক্ষেপ করে গেছেন; যে পর্যন্ত না তা সমাপ্ত করতে পারি, সে পর্যন্ত তিনি তো বিশ্রাম করতে দেবেন না!”

এই বিষয় লইয়া আলোচনা-প্রসঙ্গে পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজী একদিন আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, যতদূর স্মরণ হয় তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম—“একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমরা সকলে বসিয়া আছি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। দয়া, পরোপকার ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবমুখে বলিতে লাগিলেন, ‘জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন। দয়া? কে কাকে দয়া করবে? দয়া নয়, দয়া নয়, সেবা—সেবা!’ কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন, ‘আজ ঠাকুর যা’ বল্লেন, কিছু বুঝলি?’ আমি বুঝিতে পারি নাই শুনিয়া তিনি বলিলেন, ‘বুদ্ধি থাকলে তো বুঝবি? ওঃ আজ কি নূতন light (আলোক) পেলুম! যদি বেঁচে থাকি, তাহলে দেখতে পাবি’।” তৎকালে ঠাকুরের এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশগুলির মধ্যে যে কি গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন নাই। এতদিন পরে স্বামিজীর নিকট ঐ সমস্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, অনন্তভাবময় ঠাকুরকে সর্বতোভাবে বুঝিয়া উঠা অতীব দুঃসাধ্য। ক্রমে স্বামিজীর কার্য-প্রণালী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া যাঁহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহারা নিঃসংশয়ে বুঝিলেন যে, স্বামিজী ঠাকুরের ভাবই প্রচার করিতেছেন। রহস্যচ্ছলে স্বামিজী তদীয় গুরুভ্রাতাকে যদিও প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “তুমি কি মনে কর যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে আমার চেয়েও ভাল বুঝেছ?” তথাপি আমিই শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বাপেক্ষা অধিক বুঝিয়াছি, এরূপ অহঙ্কার তাঁহার হৃদয়ে স্বপ্নেও উদয় হয় নাই; বরং প্রত্যেক কার্যে তিনি স্বীয় গুরুভ্রাতাগণের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন! ভক্তকুলচূড়ামণি সাধু নাগমহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই স্বামিজী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “দেখুন, এই সব মঠ, সেবাশ্রম ইত্যাদি করছি, এ কি ঠিক

ঠাকুরের উপদেশ মত কাজ হচ্ছে?" এই সমস্ত জনহিতকর অনুষ্ঠান যে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ মতই হইতেছে, নাগমহাশয় ইহা উৎসাহের সহিত সমর্থন করায় স্বামিজী অতীব আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, অতঃপর আর কোন গুরুভ্রাতা তাঁর প্রবর্তিত কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করেন নাই। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামিজী তিলমাত্র বিশ্রাম করিতে পাইতেন না। তিনি বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া প্রত্যহ দলে দলে শিক্ষিত যুবক তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালী যুবকগণের দৈহিক দুর্বলতা, জাতীয় শিক্ষা ও আদর্শে আস্থাহীনতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া তিনি গভীর ক্ষোভের সহিত ঐগুলির তীব্র সমালোচনা করিতেন এবং তাঁহাদিগকে বীর্যবান ও সবল হইবার উপদেশ দিতেন।

এই সময় স্বামিজীর অন্যতম শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার নিকট ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ঋগ্বেদের অধ্যাপনা চলিতেছে; আচার্যদেব সায়ন ভাষ্যসহ বেদ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় তথায় নাট্য-সম্রাট্ গিরিশ-বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরস্পর অভিবাদনান্তর গিরিশবাবু আসন পরিগ্রহ করিলে পর স্বামিজী কৌতুকোজ্জ্বল হাস্যে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "জি. সি., তুমি বোধ হয় এসব জিনিস পড়ার কোন দরকার বোধ কর না, চিরকাল কৃষ্ণ বিষ্ণু নিয়েই কাটিয়ে দিলে!"*

বিশ্বাসের জ্বলন্তমূর্তি গিরিশবাবু বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "বেদ পড়ে আমার আর কি হবে ভাই? বেদ বুঝবার মত আমার বুদ্ধিও নেই, অবসরও নেই। ও সমস্ত জিনিসকে দূর থেকে প্রণাম করে আমি ভগবান্ রামকৃষ্ণের কৃপায় ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে চলে যাব। তিনি তোমাকে দিয়ে লোক-শিক্ষা দেবেন, ধর্মপ্রচার করাবেন, তাই ও সমস্ত জিনিস পড়িয়েছেন।" তিনি প্রকাণ্ড ঋগ্বেদ গ্রন্থখানিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়।"

স্বামিজী যখনই সাধনার কোন বিশেষ পন্থা সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিতেন, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান অথবা ভক্তি, কর্মযোগ অথবা জাতীয় আদর্শ যাহাই হউক না কেন, তাঁহার ওজস্বী বাচনভঙ্গী ও প্রাণস্পর্শী বর্ণনায় মনে হইত, যেন উহাই মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। কৌতুকচ্ছলে স্বামিজীর কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ভক্ত ও শিষ্যগণের মনে ভক্তি-বিশ্বাস সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে মনে করিয়া, গিরিশবাবু তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা নরেন! বেদ-বেদান্ত তো অনেক পড়েছো! ক্ষুধিতের অন্নের জন্য হাহাকার, দরিদ্রের দুঃখ, লাম্পট্যাদি বীভৎস পাপ, আরও কতরকম অন্যায়, অবিচার ও দুঃখ, যাহা আমরা সচরাচর দেখতে পাই, তার কোন প্রতিবিধান তোমার বেদ-বেদান্ত লেখে কি? অমুক সংসারের গৃহিণী, যিনি প্রত্যহ পঞ্চাশজন লোককে অন্ন বিতরণ করতেন, আজ তিনদিন হয় তিনি অন্নাভাবে পুত্রকন্যাসহ অনাহারে আছেন। অমুক অমুক সংসারের মহিলাগণ বদমাইসের হস্তে লাঞ্ছিতা হয়েছেন, কেউ কেউ উৎপীড়িতা হয়ে অবশেষে প্রাণত্যাগ করেছেন। অমুক বাড়ির বালবিধবা কলঙ্কের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ভ্রূণহত্যা করতে গিয়ে আত্মহত্যা করে বসেছে! নরেন, বেদ-বেদান্তের মধ্যে এর কি কোন প্রতিকার পেয়েছো?" এইরূপে গিরিশবাবু মর্মস্পর্শী ভাষায় সংসারের যাবতীয় দুঃখ, অন্যায়, অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সে হৃদয়ভেদী করুণ-

কাহিনীসমূহ শ্রবণ করিয়া আচার্যদেবের আয়ত নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল। ভাবাবেগ দমন করিতে না পারিয়া তিনি বিচলিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

স্বামিজী প্রস্থান করিলে গিরিশবাবু শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখলে, তোমাদের গুরুর হৃদয় কি মহান্ অনুকম্পাপূর্ণ! আমি তাঁকে পণ্ডিত বা প্রতিভাশালী বলে সম্মান করি না, যা' মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনলে করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ে, সে অসীম উদার হৃদয়ের জন্যই শ্রদ্ধা করি। দেখলে তো, এই সব কথা শুনে, কিছুকাল পূর্বে বেদ-বেদান্তের যে-সব ব্যাখ্যা হচ্ছিল—সে পাণ্ডিত্য, বিচার বিশ্লেষণ কোথায় অন্তর্হিত হল। তোমাদের স্বামিজী একাধারে মহাজ্ঞানী ও মহাভক্ত, বুঝেছ?" কিয়ৎকাল পরে স্বামিজী ফিরিয়া আসিলেন। স্বামী সদানন্দকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামিজী তাঁহাকে রুগ্ন, আতুর, আর্তের সেবাকল্পে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার উপদেশ দিলেন। সদানন্দজী প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন বলিয়া গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন। স্বামিজী গিরিশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ জি. সি., জগতের দুঃখ কষ্ট দূর করবার জন্য, এমনকি একজনের বেদনা লাঘব করবার জন্য আমি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি! নিজের মুক্তি চাই না! আমি প্রত্যেককে মুক্ত হবার জন্য সাহায্য করতে চাই।"

এই সময় একদিন স্বামিজী, মাতাজী তপস্বিনী কর্তৃক আহূত হইয়া শিষ্য শরৎবাবুকে সঙ্গে লইয়া মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শনার্থে গমন করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-প্রণালী দেখিয়া স্বামিজী সন্তুষ্ট হইলেন। পরিদর্শনান্তে ফিরিবার সময় তিনি কথোপকথন-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, পুরুষগণের জন্য মঠ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একটি নারীমঠও স্থাপন করিবার ইচ্ছা আছে। তথায় ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনিগণ সুশিক্ষিতা হইয়া নারীজাতির উন্নতি ও শিক্ষাকল্পে চেষ্টা করিবেন। বিজাতীয় আদর্শে সংস্কারের চেষ্টা না করিয়া হিন্দুনারীগণকে জাতীয়ভাবে শিক্ষা প্রদান করা আশু কর্তব্য। তাঁহারা সুশিক্ষিতা হইলে নিজেদের ভালমন্দ নিজেরাই ঠিক করিয়া লইবেন। সেজন্য পুরুষদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কার্যক্ষেত্রে নারীর স্বাভাবিক দক্ষতা স্বাধীনভাবে জাতীয় উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইলে কল্যাণ হইবে।

মঠ, সেবাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বামিজী চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দৈহিক অবস্থা দেখিয়া শিষ্য ও গুরুভ্রাতাগণ শঙ্কিত হইলেন। ইতোমধ্যে ইংলণ্ড হইতে মিস্ মুলার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসকগণের পরামর্শে স্বামিজী অনিচ্ছাসত্ত্বেও বায়ুপরিবর্তনের জন্য আলমোড়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে ৬ই মে কতিপয় শিষ্য ও গুরুভ্রাতা সহকারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া আলমোড়া অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

স্বামিজীকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার জন্য আলমোড়ার হিন্দুসমাজ পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। স্বামিজীর আগমনবার্তা পাইবামাত্র তাঁহারা আলমোড়ার নিকটবর্তী লোদিয়া নামক স্থানে প্রত্যুদ্গমনপূর্বক স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। বিরাট শোভাযাত্রা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সুসজ্জিত অশ্বারোহণে স্বামিজী নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরনারীবৃন্দ বাতায়ন হইতে পুষ্প ও তণ্ডুল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র উৎসুক দর্শকের আনন্দ বর্ধন করিয়া স্বামিজী সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মণ্ডপে প্রায় পঞ্চসহস্র ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিল। পণ্ডিত জাওলাদত্ত যোশী মহাশয় অভিনন্দন

পত্র পাঠ করিলেন। লালা বদরী সাহার পক্ষ হইতে পণ্ডিত হরেরাম পাণ্ডে অপর একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলে পর স্বামিজী একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সার্বভৌমিক ধর্ম শিক্ষাদানকল্পে হিমালয়ে একটি মঠ স্থাপন করিবার সঙ্কল্প তাঁহার বহুদিন হইতে ছিল, এই সভায় তিনি উহা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিলেন।

স্থানীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী লালা বদরী সাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্বামিজী আলমোড়া হইতে বিশ মাইল দূরবর্তী এক বাগানবাড়িতে বাস করিতে লাগিলেন। হিমালয়ের গম্ভীর বৈরাগ্যোদ্দীপক মনোহর শ্রী তাঁহার কর্মশ্রান্ত মানসে বহুদিন পর অপূর্ব শান্তি আনয়ন করিল। এখানেও স্বামিজী বিশ্রামের অবকাশ খুব কমই পাইলেন, কারণ দিবাভাগের অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত ধর্মালোচনায় নিযুক্ত থাকিতে হইত। তথাপি দুই সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য অনেক উন্নত হইল। প্রভাত ও রজনীর অধিকাংশ সময়েই তিনি ধ্যানানন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতেন।

সর্বপ্রকার কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া হিমালয়ের জনবিরল অরণ্যানীর মধ্যে আত্মগোপন করিলেও স্বামিজী বহির্জগৎ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীনতা অবলম্বন করিতে পারিলেন না। তাঁহার ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, যশ, আদর, সম্মান দর্শনে কতিপয় মিশনরী আমেরিকায় তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভারতগমনের অব্যবহিত পরেই শিকাগো ধর্মসভার সভাপতি ডাক্তার ব্যারোজ সাহেব এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন; তিনিও স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া স্বামিজীর নিন্দা করিতে লাগিলেন। ফলে সমগ্র আমেরিকায় বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। কয়েকখানি সংবাদপত্রে তাঁহার বিষয়ে প্রতিকূল আলোচনা হইতে লাগিল। তিনি নাকি ভারতের নগরে নগরে আমেরিকান রমণীগণের আচার-ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। বিবেকানন্দের কার্যে ও বক্তৃতায় ভারতবাসিগণ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতে তাঁহার অভ্যর্থনার যে সমস্ত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতিরঞ্জিত এবং মিথ্যা। বিবেকানন্দ অতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, সমাজে তাঁহার কোন প্রতিষ্ঠা নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বদেশে ও বিদেশে স্বামিজীর ভক্ত এবং গুণানুরাগী অনেকেই এ সমস্ত কারণে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। প্রত্যহ স্বামিজীর নিকট রাশি রাশি খবরের কাগজ ও পত্র আসিতে লাগিল। তাঁহার বিরুদ্ধে এই ভয়ানক ষড়যন্ত্র দেখিয়া তিনি কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না; ভীত বা উৎকণ্ঠিত হওয়া তো দূরের কথা! নূতন তত্ত্ব, নূতন নীতি, নূতন ভাব প্রচারকারী কোন মহাপুরুষই একাল পর্যন্ত বাধা-বিপত্তি, নিন্দা-অপবাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। তথাপি তাঁহারা মানবজাতির কল্যাণকল্পে কার্য করিতে বিরত হন নাই। বিবেকানন্দও পূর্বগ আচার্যগণের পন্থানুসরণ করিয়া অনুকম্পামিশ্রিত উপেক্ষার সহিত ঐ সমস্ত নিন্দায় অবিচলিত থাকিয়া দৃঢ়ভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

এদিকে মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ নিবারণকল্পে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর অক্লান্ত চেষ্টার সংবাদ পাইয়া স্বামিজী সমধিক আনন্দ সহকারে স্বীয় শিষ্য স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দজীকে তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। স্বামিজী আলমোড়া হইতে উৎসাহ প্রদানপূর্বক পত্র লিখিতে লাগিলেন। এমনকি, স্বয়ং উক্ত স্থানে যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু চিকিৎসকগণ এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দ অমত করায় তাঁহার যাওয়া হইল না।

কলিকাতা "রামকৃষ্ণ মিশনের" কার্যও উত্তমরূপে চলিতেছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীও মাদ্রাজে প্রচারকার্যে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিতেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ও সারদানন্দজীর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকার্য উত্তমরূপে চলিতেছিল। এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া স্বামিজীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি পুনরায় নবীন উৎসাহে কার্য আরম্ভ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। তিনি সত্বরই আলমোড়া পরিত্যাগ করিতেছেন, এ সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন; স্বামিজী স্বীকৃত হইয়া স্থানীয় জিলা স্কুলে সুললিত হিন্দীতে বেদান্ত সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। স্বামিজীর খ্যাতির বিষয় অবগত হইয়া স্থানীয় ইংরেজ অধিবাসিবৃন্দও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তদনুসারে 'ইংলিশ ক্লাবে' গুর্খা সৈন্যদলের কর্ণেল পুলি (Col. Pulley) সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হইল; স্থানীয় ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলাবৃন্দ এবং কয়েকজন গণ্যমান্য দেশীয় ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজী আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি নাতিবৃহৎ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। মিস্ মুলার এই বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

" * * ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বামিজী আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ এবং উভয়ের স্বরূপতঃ একত্ব বিবৃত করিতে লাগিলেন। মুহূর্তের জন্য বোধ হইল, বক্তা, তাঁহার বক্তৃতা ও শ্রোতৃবৃন্দ যেন এক হইয়া গিয়াছে। যেন 'আমি' 'তুমি' 'উহা' কিছুই নাই। যে সকল বিভিন্ন ব্যক্তি তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন ক্ষণকালের জন্য সেই আচার্যদেবের দেহ হইতে মহাশক্তিতে নিঃসরণশীল আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মিশিয়া আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ রহিলেন। যাঁহারা বহুবার স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই জীবনে এইপ্রকার অনুভূতি হইয়াছে। ক্ষণকালের জন্য তিনি যেন আর অবহিত, দোষগুণ সমালোচক শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতাকারী বিবেকানন্দ থাকেন না। সে সময়ের জন্য যেন সব বিভিন্নতা ও ব্যক্তিত্ব অন্তর্হিত হয়, নামরূপ উড়িয়া যায়, কেবল এক কৈবল্য মাত্র বিরাজিত থাকে, যাহাতে বক্তা শ্রোতা ও বাক্য এক হইয়া যায়!"

আড়াই মাস কাল আলমোড়ায় যাপন করিয়া স্বামিজী পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থান হইতে আহূত হইয়া সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। ৯ই আগষ্ট বেরিলীতে আসিবামাত্র তাঁহার জ্বর হইল। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি পরদিন প্রভাতে আর্যসমাজের অনাথালয় পরিদর্শন করিলেন। স্থানীয় ছাত্রবৃন্দকে বেদান্তের আদর্শসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য উৎসাহ দিয়া একটি ছাত্র-সমিতি প্রতিষ্ঠা করাইলেন। ১২ই আগষ্ট মধ্যাহ্ন-ভোজের পর পুনরায় ভয়ানক জ্বর হইল। তথাপি সন্ধ্যার পূর্বে সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। রাত্রে বেরিলী ত্যাগ করিয়া আম্বালা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আম্বালায় তিনি এক সপ্তাহকাল ছিলেন। এখানে আসিয়া শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থবোধ হইল। প্রত্যহ মুসলমান, ব্রাহ্ম, আর্যসমাজী হিন্দু এই সকল বিভিন্ন মতাবলম্বীর সহিত বিবিধ বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। মিঃ সেভিয়ার স্বামিজীর সহিত মিলিত হইলেন। আম্বালা হইতে স্বামিজী অমৃতসরে কিছুদিন থাকিয়া রাওলপিণ্ডি, মারি ও বারমুলা হইয়া ৮ই সেপ্টেম্বর নৌকাযোগে শ্রীনগর যাত্রা করিলেন। শ্রীনগরের চিফ-জষ্টিস্ ঋষিবর মুখোপাধ্যায় স্বামিজীকে স্বালয়ে রাখিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।

কাশ্মীরের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জলবায়ুর গুণে স্বামিজী অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও প্রফুল্লচিত্ত হইলেন। স্থানীয় পণ্ডিতগণ বাঙ্গালী ও কাশ্মীরী ভদ্রলোকগণ প্রত্যহই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিধ সংচর্চা করিতেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা দুইটার সময় তিনি রাজভবনে গমন করিলেন। রাজা রামসিংহ স্বামিজীকে যথোচিত সমাদর করিলেন। তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া স্বয়ং কর্মচারিগণসহ নিম্নে আসন গ্রহণ করিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধর্ম ও ভারতীয় লোকসাধারণের উন্নতি সম্বন্ধে লৌকিক শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দিয়া স্বামিজী নানাবিধ আলোচনা করিলেন। স্বামিজীর উদার ভাব ও মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মহারাজা মুগ্ধ হইলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাজা অমরসিংহের উজীর সাহেব আসিয়া স্বামিজীর সহিত দেখা করিলেন। নৌ-ভ্রমণে স্বামিজীর স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে ভাবিয়া স্থানীয় ভক্তবৃন্দ তাঁহার জন্য হাউস বোটের সন্ধানে ছিলেন। উজীর সাহেব তাহা শুনিয়া বোটের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার সেক্রেটারী অপরাহ্ণে বোট লইয়া আসিলেন। স্বামিজী নৌ-ভ্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া কাশ্মীরের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ ও প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষগুলি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ১২ই অক্টোবর তিনি পুনরায় মারি পাহাড়ে উপনীত হইলেন। ১৪ই তারিখে স্থানীয় বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোকগণ স্বামিজীকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন। তিনি তদুত্তরে একটি সুন্দর বক্তৃতা দিয়া সাধারণের আনন্দবর্ধন করিলেন।

১৬ই অক্টোবর তিনি রাওলপিণ্ডিতে উপনীত হইলেন। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উকীল হংসরাজ মহাশয়ের আলয়ে লইয়া গেলেন। অপরাহ্ণে আর্যসমাজী স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া স্বামিজী অতীব প্রীতিলাভ করিলেন। এই আলোচনাকালে জজ নারায়ণ দাস, ব্যারিষ্টার ভক্তরাম প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। ১৭ই তিনি সর্বসাধারণের অনুরোধে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল সুললিত ইংরাজীতে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ১৯শে স্থানীয় কালীবাড়িতে আর একটি ক্ষুদ্র সভায় তিনি, কিসে স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়, তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন।

২০শে অক্টোবর তিনি কাশ্মীরের মহারাজ বাহাদুর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক আহূত হইয়া জম্মু অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জম্মুতে আসিবামাত্র রাজকর্মচারিগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট ভবনে লইয়া গেলেন। পরদিবস ভোজনান্তে স্বামিজী রাজপ্রাসাদে নীত হইলেন। মহারাজ, রাজভ্রাতৃদ্বয় ও কর্মচারিবৃন্দসহ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করাইলেন। মহারাজ প্রথমে সন্ন্যাসধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। স্বামিজী তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামিজী কতকগুলি অর্থহীন বহিরাচারের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ সমস্ত কুসংস্কারগুলিতে আবদ্ধ থাকাই ভারতের জাতীয় অবনতির মুখ্য কারণ। আশ্চর্যের বিষয় এই, যাহা যথার্থ পাপ, যাহা সকল অনর্থের মূল, যথা ব্যভিচার, পরস্বাপহরণ পরদারগমন ইত্যাদি, তাহাতে আজকাল সমাজচ্যুত হইতে হয় না, কেবল খাওয়া-দাওয়ার বেলাই খুঁটিনাটি লইয়া সমাজের যত আপত্তি। প্রসঙ্গত সমুদ্রযাত্রার কথা উঠিলে স্বামিজী বলিলেন, বিদেশগমন না করিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। সর্বশেষে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচারকার্যের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে

আলোচনা হইল। স্বামিজী ভারতে যেভাবে কার্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন। সুদীর্ঘ চারিঘণ্টাকাল মহারাজ মনোযোগের সহিত স্বামিজীর জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ মতামতসমূহ শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। পরদিন স্বামিজী একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া মহারাজ এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি স্বামিজীকে কিয়দ্দিবস তথায় থাকিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। আরও কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া অবশেষে ২৯শে অক্টোবর তিনি মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শিয়ালকোটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি দুইটি বক্তৃতা করেন। এই সময় অধিকাংশ বক্তৃতাই হিন্দীভাষায় প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া উহা সংগৃহীত হইতে পারে নাই। শিয়ালকোটে স্ত্রী-শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত নাই দেখিয়া স্বামিজী একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে স্বামিজীর ভক্ত, স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীল লালা মুলচাঁদ, একটি সমিতি স্থাপন করিয়া স্বয়ং উহার সেক্রেটারী হইলেন।

৫ই নভেম্বর শিয়ালকোট হইতে সঙ্গিগণসহ স্বামিজী লাহোরে উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় সনাতন সভার সভ্যবৃন্দ তাঁহাকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া 'রাজা ধ্যানসিংহের হাবেলী' নামক সুবৃহৎ প্রাসাদে লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ স্বামিজী সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন। প্রত্যহ দলে দলে লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিতে লাগিল। স্বামিজী লাহোরে যথাক্রমে 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ', 'ভক্তি' 'বেদান্ত' সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

পাঞ্জাবে, বিশেষতঃ লাহোরে আসিয়া বিবেকানন্দ উত্তর ভারতে আচার্য দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) প্রতিষ্ঠিত 'আর্যসমাজের' সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইলেন। বাঙ্গলার সংস্কারযুগ ও ব্রাহ্মসমাজের সমসাময়িক অথচ আদর্শে ও কর্মপদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পৃথক, অধিকতর শক্তিশালী ও বিস্তৃত আর্যসমাজ ও তাহার মহান্ প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। স্বামী দয়ানন্দ কেবল প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নহে, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিরুদ্ধে, পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের অনুকরণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্র ছিল বেদ। এই সুপণ্ডিত, বাগ্মী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মতই অশান্ত হৃদয় লইয়া স্বদেশের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে গুজরাত অর্ধ শতাব্দী পরে মহাত্মা গান্ধীকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে, সেই গুজরাতের মরভি রাজ্যে, এক ধনী সামবেদীয় ব্রাহ্মণবংশে দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কঠোর জীবন যাপন করিতেন। শিশুপুত্রকে তিনি ৮ বৎসর বয়সে উপনয়ন দিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাইয়া শাস্ত্রাদি পাঠ করাইতে লাগিলেন। কিন্তু বিনা বিচারে বিনা প্রশ্নে প্রচলিত পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া গতানুগতিক জীবনযাপনের জন্য দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন নাই। পিতার সযত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও এক অভাবনীয় ঘটনায় বালকের চিত্তে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল।

সেদিন শিবরাত্রি। উপবাসী চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক বালক পিতা ও আত্মীয়বর্গের সহিত অপরাহ্ণে শিবমন্দিরে পূজার জন্য উপস্থিত হইলেন। প্রহরে প্রহরে পূজা, দ্বিযাম নিশায় একে একে ক্লান্ত উপবাসক্লিষ্ট ভক্তগণ ঘুমাইয়া পড়িলেন, কেবল নিস্তব্ধ মন্দিরে শিবধ্যানে বিভোর বালক জাগিয়া। এমন সময় মন্দিরের

ফাটল হইতে একটি মূষিক বাহির হইয়া নিবেদিত তণ্ডুলকণা আহার করিয়া মহাদেবের লিঙ্গমূর্তির উপর দিয়া চলিয়া গেল। বালক স্তম্ভিত। এক মুহূর্তে মূর্তিপূজার উপর তিনি বিশ্বাস হারাইলেন। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ধ্যানাসন হইতে উত্থিত বালক কৃষ্ণাচতুর্দশীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে একক গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, জীবনে তিনি আর কখনো কোন পূজা উৎসবে যোগ দেন নাই। 'ধর্ম-বিদ্রোহী' পুত্রের সহিত ধর্মনিষ্ঠ পিতার আর মিলন হইল না। পিতা বলপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া ১৯ বৎসর বয়স্ক বালক মূলশঙ্কর (দয়ানন্দ) পলায়ন করিলেন; কিন্তু দেশীয় রাজ্যের পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া কারাগারে লইয়া গেল। যাহা হউক, তিনি পুনরায় পলায়ন করিলেন (১৮৪৫)। পিতাপুত্রে ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

তারপর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিতপালিত তরুণ যুবক গৈরিক ধারণ করিয়া পরিব্রাজক বেশে পঞ্চদশ বৎসর ভারতবর্ষের পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ, তরুতলে বাস। এ যেন পরিব্রাজক বিবেকানন্দের পূর্ববর্তী সংস্করণ। কত সাধু সন্ন্যাসী জ্ঞানী পণ্ডিত যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বেদ বেদান্ত দর্শন কত ধর্মগ্রন্থ তিনি আলোচনা করিলেন। দুঃখ বিপদ লাঞ্ছনা অপমান, এমনকি নির্যাতন সহ্য করিয়া আপনাতে-আপনি অটল সন্ন্যাসী একক সিংহের মত ভ্রমণ করিতেন। বিবেকানন্দ যেমন ভ্রমণকালে সর্বশ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন, দয়ানন্দের স্বভাব ছিল তাহার বিপরীত। তিনি জনসঙ্ঘ হইতে দূরে থাকিতেন। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা কহিতেন না। সত্যানুসন্ধিৎসু বিবেকানন্দ যদি তরুণ বয়সে, পরম দয়াল রামকৃষ্ণকে গুরুরূপে না পাইতেন, তাহা হইলে আমরা হয়তো তাঁহাকে দয়ানন্দের মতই বিদ্রোহী দেখিতাম। বিশাল ভারতবর্ষে ভাল কিছুই তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল না; তিনি যেখানেই যান, কেবল দেখেন অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শিথিল ধর্মবিশ্বাস ও গভীর অধঃপতনের মূলীভূত নির্বোধ লোকাচার এবং লক্ষ্যহীন অর্থহীন অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা। মহাশূন্যের অনন্ত বিস্তারে যেমন কঠিন প্রদীপ্ত উল্কাপিণ্ড-দ্বয়ের সংঘাত হয়, তেমনি একদিন (১৮৬০) ভারতের প্রাচীন, বিগতবৈভবা মথুরায় গুরুশিষ্য সাক্ষাৎ। বালক বয়সে অন্ধ, এগারো বৎসর বয়স হইতে স্বজন-বান্ধব-সঙ্গহীন কঠোর তপস্বী, বজ্রকঠোর, নির্মম সন্ন্যাসী স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতী। দয়ানন্দ দেখিলেন, এই বৃদ্ধ তাপস, স্বজাতির কুসংস্কার দুর্বলতা সমস্ত অন্তর দিয়া ঘৃণা করেন; প্রচলিত অর্থহীন বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ পূজা-উপাসনার বিরুদ্ধে তাঁহার চিত্ত দয়ানন্দ অপেক্ষাও তিক্ত। সমতলক্ষেত্রে তৃণগুল্মহীন ঊষর বালুকাস্তূপের মত নীরস, সর্বরিক্ত অথচ সমুন্নতশির এই নিঃসঙ্গ একক বিদ্রোহীর চরণতলে বিদ্রোহী যুবক আত্মসমর্পণ করিলেন। মূলশঙ্কর মরিল, আবির্ভূত হইল দয়ানন্দ সরস্বতী। অশান্ত উদ্ধত গুরুর সমস্ত কঠোর ব্যবহার অকাতরে সহ্য করিয়া আড়াই বৎসর কাল তিনি শিক্ষালাভ করিলেন। শিক্ষা শেষে গুরু কহিলেন, সঙ্কল্প গ্রহণ কর বৎস, তুমি দেশব্যাপী কুসংস্কার, বেদবিরোধী অনার্যাচার যাহা পুরাণসমূহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা উৎসাদন করিবে, প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগের বিশুদ্ধ আর্য ধর্ম প্রচার করিবে, বৈদিক সত্য হইবে তাহার ভিত্তি। শিষ্য কহিলেন, গুরুদেব, ব্রত অঙ্গীকার করিলাম।

সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বেদজ্ঞ দয়ানন্দের প্রচারকার্যে সমগ্র উত্তর ভারত চঞ্চল হইয়া উঠিল। 'আমার প্রচারিত বেদ-প্রতিপাদ্য ধর্মই একমাত্র সত্য, অন্য সমস্ত ধর্ম ও মতবাদ ভ্রান্ত কুসংস্কার মাত্র'—এই মতবাদের ভিত্তির উপর

দাঁড়াইয়া দয়ানন্দ প্রচারকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি একদেশদর্শী তার্কিক দয়ানন্দের সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠা কঠিন। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস পূজাপদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র ও তিক্ত মন্তব্যের ফলে প্রাচীন সনাতন সমাজ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার মতবাদ যতই সংকীর্ণ ও গোঁড়ামিপূর্ণ হউক না কেন, পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তিনি আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিলেন। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত যুবক তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। পক্ষান্তরে, এই পাঁচ বৎসরে চার পাঁচবার তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল। একদিন প্রকাশ্য সভায় একজন ধর্মান্ধ ব্যক্তি শিবনাম উচ্চারণ করিয়া একটি জীবন্ত বিষধর সর্প তাঁহার মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারে, কিন্তু তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত উহা ধরিয়া ফেলেন এবং পদতলে বিমর্দিত করেন। দয়ানন্দ যেখানেই যাইতেন সেখানেই ঝড় উঠিতে লাগিল। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরা বিহ্বল হইয়া কাশীর পণ্ডিতসমাজের দ্বারস্থ হইলেন। বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বাদে আহ্বান করিলেন। নির্ভীক দয়ানন্দ তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে এক বিখ্যাত তর্কযুদ্ধ হইল। একদিকে ভারতের নানা প্রান্তের তিনশত বিখ্যাত পন্ডিত, অন্যদিকে একক সন্ন্যাসী। দয়ানন্দ বলিলেন, বর্তমান প্রচলিত বেদান্ত বেদ-বিরোধী। তিনি আর্য ঋষিগণের বেদ-ধর্মই প্রচার করিতেছেন। কিন্তু ধীরভাবে বিচার করা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের স্বভাব নহে। তাঁহারা সহজেই অসহিষ্ণু হইয়া তর্কের বিষয় তুলিয়া কটূক্তি করিতে থাকেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। পণ্ডিতেরা তর্ক ছাড়িয়া সমস্বরে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই বিখ্যাত তর্কযুদ্ধে স্বামী দয়ানন্দের নাম সমস্ত ভারতে প্রচারিত হইল।

কলিকাতার ব্রাহ্মগণ, বিশেষভাবে কেশবচন্দ্র, তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ-বিরোধী সন্ন্যাসীকে তাঁহারা কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। দয়ানন্দ ১৮৭২-এর ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৮৭৩-এর ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত কলিকাতা সহরে ছিলেন। এইকালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মগণ ও কেশবচন্দ্র তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, দয়ানন্দকে রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিবেন; কিন্তু পাশ্চাত্য-গন্ধী ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের সহিত দয়ানন্দের মত ব্যক্তির আপোস করা কঠিন। যে ব্রাহ্মসমাজ ১৮৪৮ সালে অপৌরুষেয় বেদবাণীর প্রামাণ্য মর্যাদা অস্বীকার করিয়াছিল, তাহার সহিত দয়ানন্দ কেমন করিয়া একমত হইবেন? তিনি যে কেবল বেদের অভ্রান্ততা ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী তাহা নহেন, তিনি নিজে যে প্রকার ব্যাখ্যা করেন, তাহা ছাড়া আর কোন প্রকার ব্যাখ্যাই তাঁহার গ্রহণীয় নহে। ব্রাহ্মরা প্রমাদ গণিয়া দয়ানন্দের আশা ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিশিয়া দয়ানন্দ বুঝিলেন, লৌকিক ভাষায় প্রচার করিতে হইবে। ব্রাহ্মনেতাগণ অপেক্ষাও শক্তিমান গঠনমূলক প্রতিভা তাঁহার ছিল বলিয়া অল্পায়াসেই নূতন সম্প্রদায় তিনি গড়িয়া তুলিলেন। কেশব যখন নববিধান প্রচার করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে পুনরায় আত্মকলহের পথে লইয়া যাইতেছিলেন, ঠিক সেই ১৮৭৫ সালে বোম্বাইতে দয়ানন্দ আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। অতি আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষের যে সকল অঞ্চলে আর্যগণ প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই উত্তর ভারতই দয়ানন্দ-প্রচারিত আর্যধর্ম গ্রহণ করিল! ১৮৭৭ সালে লাহোরে আর্যসমাজের বিধিবদ্ধ প্রণালী ইত্যাদি নির্ণীত হইল এবং তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ মহোৎসাহে পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা,

গুজরাত ও রাজপুতনায় প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাঙলা ও মাদ্রাজে আর্যসমাজ তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সে যাহা হউক, প্রচারকার্যের প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নেই তাঁহার জীবনদীপ নিভিয়া যায়। কোন মহারাজার রক্ষিতা নারীকে চরিত্রহীনতার জন্য তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করেন; সেই পাপীয়সী তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে। ১৮৮৩-এর অক্টোবর মাসে আজমীঢ়ে তাঁহার দেহান্তর হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে প্রচারকার্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। ১৮৯১ সালে যে সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ছিল ৪০,০০০, ১৯২১-এ তাহার সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। অথচ ব্রাহ্মসমাজ শত বর্ষেও ৩।৪ সহস্রের অধিক ব্রাহ্ম করিতে পারে নাই। শিক্ষা প্রচারে ও সমাজ সংস্কারে আর্যসমাজ সমগ্র উত্তর ভারতে যে যুগান্তর আনিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ শক্তিমান নেতারা আর্যসমাজী ছিলেন। লোকহিতব্রতী আর্যসমাজ শিক্ষাপ্রচারে, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির উন্নতি বিধানে, বিধবাশ্রম ও অনাথালয় প্রতিষ্ঠায়, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ে সেবাকার্যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্বেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গত অর্ধ শতাব্দীতে আর্যসমাজের বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

লাহোরে বিবেকানন্দ সহজেই আর্যসমাজী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ এবং মূর্তিপূজা-বিরোধী আর্যসমাজীদের সহিত সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী বিবেকানন্দের প্রায়ই তর্ক হইত। আর্যসমাজী নেতাদের চরিত্র, ত্যাগ ও লোকহিতব্রতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে স্বামিজী কুণ্ঠিত হইতেন না, কিন্তু স্পষ্টভাবে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির প্রতিবাদ করিতেন।

দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ প্রমুখ আর্যসমাজীরা একদিন কথাপ্রসঙ্গে—“বেদের কেবল একপ্রকার অর্থই হইতে পারে” আর্যসমাজের এই মতটি সমর্থন করিতেছিলেন। স্বামিজী নানাবিধ যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া অধিকারী বিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ব্যাখ্যাবলম্বনে উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়াই যে শ্রেয়ঃ, ইহা বুঝাইতেছিলেন। হংসরাজ বিপরীত যুক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়া উহা খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছিলেন। অবশেষে স্বামিজী বলিয়া উঠিলেন, “লালাজী, আপনারা যে বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমরা Fanaticism বা গোঁড়ামি আখ্যা দিয়া থাকি। সম্প্রদায়ের সত্বর বিস্তৃতি-সাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়তা করে, তাহাও আমি জানি। আর শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা মানুষের (ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলিয়া তাঁহার আশ্রয় লইলেই মুক্তি, এইরূপ প্রচার) গোঁড়ামি দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে ও অতিশীঘ্র সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর আমার হস্তে সে শক্তিও আছে। আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতাররূপে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র আমিই ঐরূপ প্রচারের বিরোধী। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণানুযায়ী উন্নতি করিতে দিলে যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয়, কিন্তু উহা পাকা হইয়া থাকে।”*

আর একদিন স্বামিজী ‘শ্রাদ্ধ’ সম্বন্ধে আর্যসমাজীদের সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আর্যসমাজীরা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ বিশ্বাস করেন না, উহার উপযোগিতাও স্বীকার করেন না। হিন্দু-সমাজের পক্ষ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়াই

---

*ভারতে বিবেকানন্দ, ৪৮১ পৃঃ

স্বামিজী এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং সেদিন আর্যসমাজী পণ্ডিতবর্গ স্বামিজীর যুক্তি-তর্কের সম্মুখে নিস্তব্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বামিজী কথাপ্রসঙ্গে আর্যসমাজী প্রচারকগণের উৎকট গোঁড়ামি ও পরমত-অসহিষ্ণুতার তীব্র সমালোচনা করিলেও তাঁহারা কখনো অসন্তুষ্ট হন নাই। স্বমত সমর্থন অথবা অযৌক্তিক মত খণ্ডনকালে এই যোদ্ধৃ-সন্ন্যাসী যদিও দৃপ্ত তেজের সহিত প্রতিপক্ষের যুক্তি নির্মমভাবে খণ্ডন করিতেন, তথাপি তাঁহার প্রত্যেক কথার অসাম্প্রদায়িক উদার ভাবটুকু সর্বদাই ফুটিয়া উঠিত। স্বামিজীর এই অসাম্প্রদায়িক উদার ভাব দেখিয়া সনাতনপন্থী ও আর্যসমাজী উভয় দলই সমভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর্যসমাজী প্রচারকগণের প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের মস্তকে অবিরাম অভিশাপ বর্ষণের ফলে, উভয় দলে মনোমালিন্য ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল প্রচুর। স্বামিজী অনেকের চিত্ত হইতে গ্লানির বেদনা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর্যসমাজী, হিন্দু ও শিখদিগের মধ্যে প্রীতি-স্থাপনের জন্য স্বামিজী সকল সমাজের যুবকদিগকে লইয়া লাহোরে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলকেই ঔষধ, শুশ্রূষা, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষাদান ইত্যাদি দ্বারা সেবা করিবার জন্য যুবকগণকে উৎসাহ প্রদান করেন। 'সেবাধর্মের' উদার নৈতিক আদর্শ জীবনে পরিণত করিবার কর্মক্ষেত্র নির্দেশ করিয়া স্বামিজী সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

আর্যসমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক, স্বামিজীর বিশেষ ভক্ত স্বামী অচ্যুতানন্দ ভবিষ্যৎ জীবনচরিত-লেখকের সুবিধার জন্য আচার্যদেবের পাঞ্জাব ও কাশ্মীর ভ্রমণের যে সংক্ষিপ্ত ডায়েরী রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমরা স্বামিজীর মহান্ হৃদয়ের দুইটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। একদিন স্বামিজী তাঁহার সঙ্গিবৃন্দের সম্মুখে কোন ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন সঙ্গী বলিয়া উঠিলেন, "স্বামিজী! তিনি কিন্তু আপনাকে মানেন না।" স্বামিজী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ভাললোক হইতে হইলে যে আমাকে মানিতে হইবে, তাহার অর্থ কি?"

এই সময়ে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সাকার্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী মতিলাল ঘোষ কার্যপ্রয়োজনে নগেনবাবুর বাটীতে একদিন আসিয়াছিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন এবং নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় সরলভাবে কথা-বার্তা কহিতে লাগিলেন। বাল্যকালে ইঁহারা এক আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন। মতিবাবু তাঁহার বাল্যসঙ্গীর অপূর্ব তেজ, প্রতিভা ও শক্তিপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যেন ঝলসিয়া গেলেন; স্বামিজী যতই তাঁহার সহিত আপনার মত ব্যবহার ও তদনুরূপ কথাবার্তা কহিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিও যেন ততই সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছেন। শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ করিয়া মতিবাবু স্বামিজীকে দীনভাবে বলিলেন, "ভাই, তোমায় এখন কি বলে ডাকবো?" স্বামিজী অতিশয় স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ রে মতি, তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন, তুইও সেই মতি।" স্বামিজী এরূপভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, মতিবাবুর সমুদয় সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল।

স্বামিজী লাহোরে স্থানীয় কলেজের গণিতাধ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামীর সহিত পরিচিত হন। স্বামিজীর বক্তৃতা ও চরিত্রে অধ্যাপক মহাশয় স্বামিজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। একদিন অধ্যাপক স্বামিজীকে শিষ্যবৃন্দসহ স্বালয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য

আমন্ত্রণ করিলেন। উদ্দেশ্য, স্বামিজীর সহিত তাঁহার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা। যোগ্য অধিকারী দেখিয়া স্বামিজী 'বেদান্ত প্রচার' কার্যে তাঁহাকে প্রেরণা প্রদান করিলেন। স্বামিজী বিবেক-বৈরাগ্যবান কৃতবিদ্য বন্ধুকে স্বদেশে ও বিদেশে 'বেদান্ত প্রচারের' সুমহৎ কল্যাণ এমনভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, অধ্যাপকের জীবনে এক আমূল পরিবর্তন আসিল। তিনি বেদান্ত প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তীর্থরাম, স্বামিজীকে তাঁহার প্রিয় বহুমূল্য সোনার ঘড়িটি উপহার দিয়াছিলেন। স্বামিজী তাহা পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং পরক্ষণেই আদর করিয়া অধ্যাপকের পকেটে ঘড়িটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বন্ধু, এ ঘড়িটি আমি এই পকেটে রাখিয়াই ব্যবহার করিব।" রহস্যময় হাস্যে তীর্থরামের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে মৌন ইঙ্গিত তিনি সমগ্র হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিলেন এবং অল্পকাল পরে কর্ম ত্যাগ করিয়া ইনি স্বামিজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রচারকার্যে আত্মোৎসর্গ করেন। এই প্রচারক সন্ন্যাসী সর্বসাধারণে স্বামী রামতীর্থ নামে সুপরিচিত। প্রতিভাশালী স্বামী রামতীর্থ আমেরিকা, মিশর দেশ ও স্বদেশে বেদান্ত প্রচারকার্যে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ অতি স্বল্পকাল মধ্যেই কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন। আর্যসমাজী স্বামী অচ্যুতানন্দ, প্রকাশানন্দ এবং আরও কয়েকজন প্রচারক সন্ন্যাসী স্বামিজীর জ্বলন্ত উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া বেদান্ত প্রচারকার্যে বদ্ধপরিকর হইলেন। আর্যসমাজের উপর স্বামিজী এইকালে এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই নেতারূপে উক্ত সমাজ পরিচালন করিবার ভার গ্রহণ করিবেন, এইরূপ একটা কথা উঠিয়াছিল।

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্বামিজী কয়েকদিন দেরাদুনে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তিনি বিশ্রাম করিবার অবসর পাইলেন না। সমাগত ব্যক্তিবর্গের সহিত ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্যাসমূহের আলোচনা ব্যতীত প্রত্যহ নিয়মিতরূপে শিষ্যবৃন্দকে আচার্য রামানুজের ভাষ্যসহ বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। দেরাদুনে তিনি খেতরি হইতে ক্রমাগত আহ্বানসূচক পত্র পাইতে লাগিলেন। তদনুসারে রাজপুতানায় যাইবার জন্য দেরাদুন হইতে সাহারাণপুর হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। দিল্লীতে চার পাঁচদিন যাপন করিয়া স্বামিজী সদলবলে আলোয়ার যাত্রা করিলেন।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, কয়েক বৎসর পূর্বে স্বামিজী পরিব্রাজক বেশে এই নগরে নিতান্ত অপরিচিতভাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্বামিজী ষ্টেশনে অবতরণ করিবামাত্র স্থানীয় ভক্তবৃন্দ তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত স্বামিজী কথোপকথনরত, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, কিয়দ্দূরে তাঁহার একজন দরিদ্র শিষ্য মলিন বেশে দণ্ডায়মান হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। শিষ্য আনন্দসহকারে আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে স্বামিজী তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; এদিকে যে তাঁহার জন্য ভদ্রলোকগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব যেন ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার পূর্বপরিচিত বন্ধুবান্ধব এবং ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন যে, জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা, যশ ও সম্মান লাভ করিয়াও তিনি সেই উদার, স্নেহপরায়ণ, বন্ধুবৎসল, উদাসীন সন্ন্যাসীই আছেন। তাঁহার দরিদ্র শিষ্য ও ভক্তগণের আলয়ে গমনপূর্বক পূর্বের ন্যায়

সরলভাবে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরিব্রাজক জীবনে স্বামিজী জনৈকা দরিদ্রা ভক্তিমতী বিধবা মহিলার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। বহুবর্ষের কথা হইলেও তিনি তাহা ভুলিয়া যান নাই। একদিন তিনি উক্ত মহিলাকে সংবাদ দিলেন যে, অদ্য তিনি শিষ্যবৃন্দসহ তাঁহার আলয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। তিনি যেন পূর্বের মত 'চাপাটী' (নিকৃষ্ট রুটী বিশেষ) প্রস্তুত করিয়া রাখেন। এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সাধ্যমত অতিথিসেবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী শিষ্যবৃন্দসহ আহারে উপবেশন করিলে তিনি গলদশ্রুলোচনে চাপাটী পরিবেশন করিতে করিতে আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আমি গরীব, ইচ্ছা থাকিলেও তোমাকে দিবার মত মিষ্টি সামগ্রী কোথায় পাইব বাবা?" স্বামিজী আনন্দসহকারে সেই চাপাটী ভক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "মা, তোমার এই চাপাটীর মত মধুর খাদ্যদ্রব্য আমি আর আহার করি নাই।" শিষ্যবৃন্দকে বলিলেন, "দেখিলে, কি ভক্তিমতী মহিলা! এরূপ সাত্ত্বিক আহার আমার ভাগ্যে অনেকদিন লাভ হয় নাই।" স্বামিজী তাঁহাদের সাংসারিক শোচনীয় দুরবস্থার বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন। সেইজন্য মহিলাটির অজ্ঞাতসারে বাটীস্থ জনৈক পুরুষের হস্তে একশত টাকার একখানি নোট প্রদান করিলেন। তাঁহারা উহা লইতে যথেষ্ট আপত্তি প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু স্বামিজী তাহা শুনিলেন না।

আলোয়ার হইতে স্বামিজী জয়পুরে উপস্থিত হইলেন; তথা হইতে খেতরির রাজা বাহাদুরের বন্দোবস্তানুযায়ী খেতরি যাত্রা করিলেন। জয়পুর হইতে খেতরি ৯০ মাইল ব্যবধান। কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে, কেহ বা রথারোহণে অগ্রসর হইলেন। রাজা বাহাদুর খেতরি হইতে ১২ মাইল অগ্রসর হইয়া স্বামিজীকে রাজোচিত সমারোহ-সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। নগরে স্বামিজীর আগমন উপলক্ষে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। রাত্রিতে অগ্নিক্রীড়া হইল। দরিদ্র-নারায়ণগণকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইল।

অভ্যর্থনাসভায় স্বামিজী উপবেশন করিলে রাজকর্মচারিবৃন্দ ও সর্দার এবং উপস্থিত সম্ভ্রান্ত নগরবাসিগণ একে একে স্বামিজীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং রাজদরবারের প্রথানুযায়ী তাঁহাকে প্রত্যেকে দুই টাকা করিয়া নজর দিলেন। রাজা বাহাদুর স্বয়ং তিন সহস্র মুদ্রা প্রণামী দিলেন। এই ব্যাপার মিটিতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিল। তৎপর অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল। রাজা বাহাদুর স্বামিজীর উপদেশানুযায়ী শিক্ষা-বিস্তারকল্পে চেষ্টা করিতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামিজী আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, "শিশুগণকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে; বিশ্বাস করিতে হইবে, প্রত্যেক শিশুই ঈশ্বরীয় শক্তির আধার। শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় আমাদিগকে আর একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এইভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবন-সংগ্রামে নিজেদের সমস্যা পূরণে সমর্থ হইবে।"

২০শে ডিসেম্বর স্বামিজী শিষ্যবৃন্দের সঙ্গে যে বাংলোয় ছিলেন, তথায় একটি সভা হইল। স্থানীয় সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি এবং কতিপয় ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলা তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীকে সভামধ্যে পরিচিত করিয়া দিবার পর স্বামিজী

প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল ব্যাপী একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বর্তমান ভারতে ধর্মজগতের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত বলিলেন, “আমরা হিন্দুও নহি, বৈদান্তিকও নহি—আমরা ছুঁৎমার্গীর দল! রান্নাঘর হইল আমাদের মন্দির, ভাতের হাঁড়ি উপাস্য দেবতা, আর ছুঁয়োনা—মন্ত্র। সমাজের এই অন্ধ কুসংস্কার সত্বর দূর করিতে হইবে। একমাত্র উপনিষদের উদার মতসমূহ প্রচার দ্বারাই উহা সাধিত হইবে।”

কয়েকদিন আনন্দের সহিত রাজ-শিষ্যের আলয়ে যাপন করিয়া স্বামিজী বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি ক্রমাগত বক্তৃতা ও প্রচারকার্যে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি সাগ্রহ আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কোনপ্রকারে কিষেণগড়, আজমীঢ়, যোধপুর, ইন্দোর হইয়া খাণ্ডোয়ায় উপনীত হইলেন। খাণ্ডোয়ায় আসিয়া স্বামিজীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। বরোদা, গুজরাত ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে সাগ্রহ আহ্বান-সূচক পত্র ও তার আসিতে লাগিল। একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও স্বামিজী আপাততঃ ভ্রমণ স্থগিত রাখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতানায় প্রদত্ত স্বামিজীর প্রসিদ্ধ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে তাঁহার উদারভাব, ধর্মের সার্বভৌমিক আদর্শ ও শিক্ষাদান-প্রণালীর মৌলিকত্বে চমৎকৃত হইতে হয়। একদিকে তিনি যেমন আধুনিক সংস্কার-সম্প্রদায়সমূহের বৈদেশিক ভাববহুল কার্যপ্রণালীর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, অপরদিকে উন্নতির পরিপন্থী সঙ্কীর্ণচেতা প্রাচীন কুসংস্কারগুলিকে অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার হাস্যোদ্দীপক চেষ্টাকেও বাতুলতা বলিয়া উপহাস করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বেদান্তের মহান্ সত্যসমূহকে উপেক্ষা করিয়াই ভারতের বর্তমান দুরবস্থা। একই বেদান্তদর্শন অবলম্বনে বিভিন্ন প্রকার বিরোধী বাদসমূহের উদ্ভব হওয়ায় কালক্রমে উহা দার্শনিক পণ্ডিতগণের উর্বর মস্তিষ্কের প্রশস্ত ব্যায়াম-ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। পুরাণসমূহ, কয়েকখানি আধুনিক স্মৃতিশাস্ত্র, বিশেষভাবে দেশাচার, লোকাচারই ধর্মজগতে বেদান্তের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে; এমনকি, বেদান্ত বলিলেই সাধারণ লোকে এখন বুঝে, দুর্বোধ্য দর্শনশাস্ত্র, যাহার সহিত প্রচলিত ধর্ম-কর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদনের জন্য যুগ-প্রবর্তক আচার্যদেব অদ্বৈতানুভূতির অভ্রভেদী শিখর-দেশে দণ্ডায়মান হইয়া সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল দরিদ্র দুঃখী পদদলিতগণকে বজ্রনির্ঘোষে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। যদি ভারত এখনও তাঁহার উপদেশের মর্ম না বুঝিয়া থাকে, তৎপ্রচারিত আদর্শগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস অন্ধকারময়।

১৮৯৮ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে স্বামিজী তাঁহার গৌরবময় উত্তরভারত ভ্রমণ পরিসমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বহুদিন হইতে ভাগীরথীতীরে একটি স্থায়ী মঠ নির্মাণ করিবার সঙ্কল্প তাঁহার ছিল। পাশ্চাত্যদেশ হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি উক্ত সংকল্পের কথা তাঁহার গুরুভ্রাতাদের নিকট ব্যক্ত করেন। তদনুসারে তাঁহারা উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধানে ছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বেলুড় গ্রামে উপযুক্ত স্থানের সন্ধান পাইবামাত্র স্বামিজীর ভক্ত মিস্ হেনরিয়েটা মুলারের প্রচুর অর্থে উক্ত ভূমি ক্রীত হইল। উক্ত স্থানটি পূর্বে নৌকার আড্ডারূপে ব্যবহৃত হইত। উহা

সমতল করিয়া মঠ নির্মাণ করিতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। মঠের জমি সমতল করিতে এবং প্রাচীন একতলা বাড়িটির সংস্কার করিয়া দ্বিতলে পরিবর্তিত করিতে যে অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহা স্বামিজীর লণ্ডনস্থ শিষ্যবৃন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। স্বামিজীর অন্যতমা আমেরিকান শিষ্যা মিসেস্ ওলি বুল বর্তমান ঠাকুরঘরটি নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন এবং মঠের খরচপত্র চলিবার জন্য বেলুড় মঠের পরিচালকগণের হস্তে লক্ষাধিক মুদ্রা প্রদান করিলেন। এইরূপে বিদেশী শিষ্য ও শিষ্যাদের অর্থানুকূল্যে স্বামিজীর জীবনের একটি মহৎ সংকল্প পূর্ণ হইল। ওদিকে হিমালয়ে মঠ স্থাপনের জন্য সেভিয়ার-দম্পতি উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধানে রত ছিলেন। বেলুড় মঠ নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আলমবাজার হইতে মঠ বেলুড় গ্রামের নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে উঠিয়া আসিল। উক্ত বাগানবাটী সন্ন্যাসীদিগের জন্য অস্থায়ী ভাবে ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। স্বামিজী শিষ্য ও গুরুভ্রাতাগণের সহিত তথায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে স্বামী সারদানন্দজী আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকার্যে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়া কার্যপ্রয়োজনে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামী শিবানন্দজীও প্রায় বৎসরাধিক কাল হইতে সিংহলে প্রচারকার্যে ছিলেন, তিনিও মঠে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়া সেবা ও সাহায্যদানকল্পে তথায় গমন করিয়াছিলেন। উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্বামিজীর অনুপস্থিত-কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী "রামকৃষ্ণ মিশনের" -কার্য উত্তমরূপে নির্বাহ করিতেছিলেন এবং স্বামী তুরিয়ানন্দজী মঠে অবস্থান করিয়া নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দকে শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। গুরুভ্রাতৃগণের সেবাধর্মে অনুরাগ দর্শনে স্বামিজী অতীব আনন্দিত হইলেন। ইঁহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শিবরাত্রির দিন অপরাহ্ণে একটি ক্ষুদ্র সভা আহূত হইল। স্বামিজী সভাপতি হইলেন। তাঁহার আদেশে প্রথমতঃ অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণ বক্তৃতা করিলেন। অতঃপর স্বামিজী প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দকে "উপস্থিত কর্তব্য ও তাঁহাদের আদর্শ কি হওয়া উচিত" তৎসম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি সমাগত হইল। মহোৎসবের বন্দোবস্তের ভার স্বামিজী স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। উক্ত দিবস প্রভাতে স্বামিজী ঘোষণা করিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণেতর শিষ্যবৃন্দকে উপবীত প্রদান করিবেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর উপর উপনয়ন ও গায়ত্রীমন্ত্র প্রদান করিবার ভার অর্পিত হইল। স্বামিজী বলিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ। বেদ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকেরই উপনয়ন সংস্কারে অধিকার আছে। সংস্কার অভাবে ইহারা বর্তমানে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি, এই পুণ্যদিবসে ইহারা স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব গ্রহণ করুক। কালে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিতে হইবে।" স্বামিজীর আদেশে প্রায় পঞ্চাশজন ভক্ত গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির সম্মুখে উপবীত ও গায়ত্রীমন্ত্র গ্রহণ করিলেন। স্বামিজী গৃহীত-উপবীত ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া প্রয়োজনীয় উপদেশাদি প্রদান করিলেন এবং প্রত্যহ গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিবার আদেশ দিলেন।

সামাজিক চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে স্বামিজীর এই অসমসাহসিক কার্য

সেদিন গোঁড়া হিন্দুসমাজের নিকট যে বিরূপ তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। যদিও সামাজিক কতকগুলি প্রথা ও আচার-ব্যবহার হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতীয় বিশিষ্ট সভ্যতার বিরোধী বলিয়া তাঁহার অনুমতি হইয়াছিল, তথাপি কোন নবীন সংস্কার দ্বারা অকস্মাৎ সমাজকে আঘাত করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু এই উপনয়ন-সংস্কার সেরূপ নহে। ইহার আসল উদ্দেশ্য ছিল, বহুদিন প্রসুপ্ত হিন্দুজাতিকে একটা আত্মসম্বিৎ দান করা। বহুদিন ধরিয়া নানা শাখা, উপশাখায় বিভক্ত হিন্দু বলিয়া পরিচয়প্রদানকারী শ্রেণীগুলিকে প্রথমতঃ শাস্ত্রানুশাসনানুযায়ী চারিটি মূলবর্ণে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করিতেন এবং এই চেষ্টা দ্বারাই জাতিভেদ প্রথার আবর্জনাগুলি দূরে পরিহার করা সম্ভবপর হইবে, একথা বিশ্বাস করিতেন। সমাজে শূদ্র বলিয়া কথিত যে সমস্ত ব্যক্তি এই সময় উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সমাজে অনেক বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু বেলুড় মঠের এই ক্ষুদ্র অথচ নির্ভীক অনুষ্ঠানটি পরবর্তীকালে বাঙ্গালী সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কারণ স্বামিজী জীবিত থাকিতেই বাঙ্গলার কয়েকটি প্রবল শ্রেণী ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের দাবী লইয়া আন্দোলন উপস্থিত করেন। বর্তমানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রাচীনদলের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহারা অনেকাংশে সফলকাম হইয়াছেন। অবশ্য সত্যের খাতিরে একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, কোন কোন জাতির ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যোচিত সংস্কারলাভের মধ্যে অতীতের আবর্জনা পরিহারের চেষ্টা অপেক্ষা কৃত্রিম আভিজাত্য লাভ করিবার চেষ্টাই অধিক প্রকটিত হইতেছে। তথাপি এই সকল চেষ্টার দোষ ও ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করিয়া ইহার মূল ভাবটির সহিত চিন্তাশীল স্বজাতি-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই সহানুভূতি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। নিজেকে জানিবার, নিজেকে বুঝিবার, সমাজ-জীবনে যথাযোগ্য স্থান ও দায়িত্ব গ্রহণ করিবার এই চেষ্টা যে আত্মচেতনা জাগ্রত করিবে, তাহা পরিণামে সুফলই প্রসব করিবে। কালপুরুষের ইঙ্গিত, বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণীগুলি পতিত-পর্যায়ভুক্ত থাকিবেন না। স্ববর্ণোচিত শিক্ষা-দীক্ষা আয়ত্ত করিবার উৎসাহোচ্ছল উদ্যম তাঁহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহা যুগধর্মের প্রেরণা, বাধাপ্রদান করিতে যাওয়া মূঢ়তা মাত্র। অর্থহীন প্রথার জীর্ণকন্থা দিয়া নবজাগরণকে আবৃত রাখা অসম্ভব, অসাধ্য। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। জাতির শক্তিবৃদ্ধির জন্য স্বামিজী প্রথমতঃ একই জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একদিকে কন্যাদায়, অন্যদিকে বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব, এই দুই বিপরীত অবস্থার প্রবল পেষণে পিষ্ট হইয়াও আজ পর্যন্ত কেহ এ বিষয়ে তেমন আন্দোলন উপস্থিত করেন নাই। তথাপি আমাদের আশা আছে, উদীয়মান, উন্নতিকামী নব্য যুবকগণ এ বিষয়ে আর অধিকদিন উদাসীন থাকিবেন না।

১৮৯৮ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্যন্ত কয়েকমাস কাল স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা ও সঙ্ঘের গঠনমূলক কার্যপ্রণালীর শৃঙ্খলাবিধান এবং শিষ্য ও শিষ্যাদের শিক্ষাদান কার্যেই প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে উত্তর ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া তিনি খাণ্ডেয়া হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে কয়েকদিন পরেই, মিস্ মূলারের সহিত মিস্ মার্গারেট নোবল পাশ্চাত্য সমাজের সকল বন্ধন কাটাইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে মিসেস ওলি বুল ও মিস্

ম্যাকলিয়ড আমেরিকা হইতে শ্রীগুরুর জন্মভূমি পরিদর্শন এবং ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ ও নবীন সঙ্ঘের কার্যে সহায়তা করিবার জন্য এতদ্দেশে আগমন করিলেন। সহৃদয়া মিস্ মূলার, মিসেস্ বুল প্রভৃতির অর্থসাহায্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড় গ্রামে মঠবাটী নির্মাণের জন্য একখণ্ড ভূমি, একখানি পুরাতন বাড়িসহ ক্রয় করা হইল। তাহার পার্শ্বেই নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া করা হইল। আলমবাজার মঠ হইতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা এই নূতন বাটীতে উঠিয়া আসিলেন। পাশ্চাত্য শিষ্যরা নবক্রীত পুরাতন বাটীতে, কেহ বা কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামিজী অবসরমত ইঁহাদের কুটীরে আসিয়া ভারতীয় আচার-ব্যবহার, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি আলোচনা করিতেন। মিস্ মার্গারেট নোবল পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। স্বামিজীর আদেশে সুপণ্ডিত স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মিস্ নোবল সঙ্ঘের সহিত সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হইবার জন্য গুরুর অনুমতি চাহিলেন। শিষ্যার অভিপ্রায় ও ঐকান্তিকতা দেখিয়া স্বামিজী তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করিলেন। মিস্ নোবল যখন ভারতবর্ষে আসিবার জন্য স্বামিজীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন স্বামিজী উত্তর দিয়াছিলেন, "দারিদ্র্য, অধঃপতন, আবর্জনা, ছিন্নমলিন-বসন পরিহিত নরনারী যদি দেখিতে সাধ থাকে, তবে চলিয়া আইস, অন্যকিছু প্রত্যাশা করিয়া আসিও না। আমরা তোমাদের হৃদয়হীন সমালোচনা সহ্য করিতে পারি না।" ভারতের দরিদ্র ও অধঃপতিত জনসমষ্টির আচার-ব্যবহার লইয়া পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তিদের হৃদয়হীন ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বিবেকানন্দের হৃদয় আহত সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিত। একজন ইংরেজ মহিলা একদিন একজন অদ্ভুত বেশভূষাধারী কুৎসিত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিলেন, "স্তব্ধ হও, ইহাদের জন্য তোমরা কি করিয়াছ?" স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি বিবেকানন্দের সুগভীর প্রেম, মিস্ নোবল উত্তমরূপেই জানিতেন। তিনি আরও জানিতেন, বিবেকানন্দকে অনুসরণ করিতে হইলে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। স্বীয় ব্রতের দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে অনুভব করিয়াই মিস্ নোবল ব্রহ্মচারিণী হইলেন। মিস্ নোবলের মৃত্যু হইল; বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতা নামে ভূষিতা হইলেন।

নবদীক্ষিতা শিষ্যাকে আশীর্বাদ করিয়া মহান্ গুরু কহিলেন, "যাও বৎসে, তুমি তাঁহার অনুসরণ কর, যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পূর্বে পাঁচ শত বার লোক-কল্যাণব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

মঠনির্মাণসংক্রান্ত কার্য ও শিক্ষাদানে উৎসাহের সহিত আত্মনিয়োগ করিলেও শারীরিক অসুস্থতা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে বায়ুপরিবর্তন ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অগত্যা কার্যভার গুরুভাই ও শিষ্যদের দিয়া স্বামিজী ৩০শে মার্চ দার্জিলিং চলিয়া গেলেন। দার্জিলিংয়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছিল বটে, কিন্তু সহসা সংবাদ আসিল কলিকাতায় প্লেগ ভীষণমূর্তি ধারণ করিয়াছে। শত শত লোক প্রত্যহ মৃত্যুকবলিত হইতেছে, এমন সংবাদ শুনিয়া মহাপ্রাণ বিবেকানন্দ কি স্থির থাকিতে পারেন? ৩রা মে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সেইদিনই প্লেগরোগে সতর্কতা ও আবশ্যক প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জনসাধারণকে উপদেশ দিয়া বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষায় দুইখানি প্রচারপত্র

রচনা করিয়া ছাপাইতে দিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতা ও অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের লইয়া সেবাকার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। কলিকাতায় সেদিন যে ভীতি ও আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অদ্যকার দিনে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। ভীতিবিহ্বল নরনারী প্রাণভয়ে পলায়মান। প্লেগ রোগ এবং সরকারী প্লেগ রেগুলেশান দুই-ই কঠোর। সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণের এবং রেগুলেশান মানিতে জনসাধারণকে বাধ্য করিবার জন্য সরকারী ফৌজ মোতায়েন হইয়া অসহায় ও নিরুপায় নরনারীকে অধিকতর বিহ্বল করিয়া তুলিল। এই আপৎকালে অভয় ও সেবা লইয়া বিবেকানন্দচালিত শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণ কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই কার্যের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা কোথা হইতে আসিবে চিন্তা করিয়া জনৈক গুরুভ্রাতা প্রশ্ন করিলেন, "স্বামিজী! টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে?" স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কেন? যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে মঠের জন্য নবক্রীত ভূমি বিক্রয় করিব। সহস্র সহস্র ব্যক্তি আমাদের চোখের সম্মুখে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে, আর আমরা মঠে বাস করিব? আমরা সন্ন্যাসী, না হয় পূর্বের ন্যায় আবার তরুতলে বাস করিব, ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করিব!"

সুখের বিষয়, মঠবাটী আর বিক্রয় করিতে হইল না। চারিদিক হইতে অর্থ-সাহায্য আসিতে লাগিল। কলিকাতায় একটি প্রশস্ত ভূমিখণ্ড ভাড়া লইয়া তদুপরি কুটীরসমূহ নির্মিত হইল। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে অসহায় প্লেগ-রোগগ্রস্ত নরনারীকে তথায় রাখিয়া উৎসাহী কর্মিবৃন্দ সেবাকার্যে রত হইলেন। স্বামিজী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যে পল্লীতে ইঁহারা কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, উক্ত পল্লীর আবর্জনা দূর করা এবং প্রতিষেধক ঔষধাদি দ্বারা স্থান শুদ্ধ করার জন্য প্রত্যহ কর্মিবৃন্দকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। দরিদ্রনারায়ণগণের সেবায় তাঁহার অসীম উৎসাহ ও আত্মত্যাগ দেখিয়া অনেক বিরুদ্ধবাদী, নিন্দুক এবং যাঁহারা কুৎসা শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিকৃত মত পোষণ করিতেন,—বুঝিতে পারিলেন যে, বিবেকানন্দ কেবল মুখেই বেদান্ত প্রচার করেন নাই, কার্যেও তিনি বৈদান্তিক! "যত্র জীব, তত্র শিব" মন্ত্রের ঋষি বিবেকানন্দ মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বদেশবাসীকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া "নারায়ণ" জ্ঞানে সেবা করিতে হয়!

বেদান্তের মহান্ আদর্শ নিজ কর্মজীবনে পরিণত করিয়া তদাদর্শে জীবন-গঠন করিবার জন্য আচার্যদেব স্বীয় স্বদেশবাসীকে উচ্চরবে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। যে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, মুচি, মেথর ইত্যাদিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তথাকথিত জাত্যভিমানিগণ 'চলমান শ্মশান' বলিয়া ঘৃণায় দূরে পরিহার করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি তাহাদিগকে "আমার ভাই, আমার রক্ত" বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। ভারতের কল্যাণকামী কর্মিবৃন্দকে তমোহ্রদে প্রায়-নিমজ্জমান কোটী কোটী অজ্ঞান নরনারীকে জ্ঞানালোক দ্বারা উদ্ধার সাধনের ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আকুলভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। তাহাদের দুঃখ দৈন্য অজ্ঞতা ঘুচাইবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা; রুগ্ন আতুর আর্ত অনাথাকে, ঔষধ পথ্য ও আহার দান, ইহাই অশেষ কল্যাণকর বর্তমান যুগোপযোগী মুক্তির প্রশস্ত রাজপথ—সেবা-ধর্ম। বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শনই হিন্দুজীবনের চরম লক্ষ্য বুঝিয়া আচার্যদেব অদ্বৈতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর শত শত সেবাধর্মের মঙ্গলময় প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন, যাহার অভ্রংলিহ শিখরমালায় ত্যাগের গৈরিক পতাকা স্বমহিমায় উড্ডীন থাকিয়া বিশ্বের

বিস্মিতদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। অক্লান্ত জনহিতৈষণার মধ্য দিয়া স্বধর্ম-পরায়ণ জাতির ত্যাগ ও তিতিক্ষার মহিমময় দৃশ্য বর্তমান যুগে উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেবাধর্ম উপলক্ষ করিয়া জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ত্রি-ধারার বহুদিন পরে বিবেকানন্দের হৃদয়প্রয়াগে আনন্দ সম্মিলন! আজ নবযুগের এই পবিত্র ত্রিবেণী তীর্থের পবিত্র প্রেমসলিলে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিহীন অথচ ভিন্ন ভিন্ন ভাবসহায় সাধকগণ আনন্দে অবগাহনরত।

স্বামিজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে লইয়া হিমালয় ভ্রমণে বহির্গত হইবেন ইহা পূর্বেই স্থির হইয়াছিল। প্লেগের প্রকোপ কমিয়া গেলে এবং সরকারী রেগুলেশান শিথিল হইলে স্বামিজী মিঃ সেভিয়ারের আহ্বানানুযায়ী আলমোড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে স্বামী তুরিয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ, স্বরূপানন্দ ইত্যাদি ও তাঁহার চারিজন পাশ্চাত্য শিষ্যা। নাইনীতালে উপস্থিত হইয়া স্বামিজী সদলবলে কয়েকদিন বিশ্রাম করিলেন। খেতরির মহারাজা পূর্ব হইতেই গুরুদেবের দর্শন-কামনায় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামীজির শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যাগণের সহিত পরিচিত হইয়া মহারাজা আনন্দিত হইলেন। এই কালের ভ্রমণকাহিনী ও স্বামিজীর অমূল্য কথোপকথনসমূহ সিস্টার নিবেদিতা তাঁহার "স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে" নামক পুস্তকে সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইকালে স্বামিজী তাঁহার শিষ্যগণের নিকট ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিকযুগের জীবন্তবিগ্রহস্বরূপ প্রতিভাত হইতেন। ভারতের অতীত ইতিহাসের পুণ্য-কাহিনী সকল বর্ণনা করিতে করিতে সময় সময় তিনি ভাবাবেগে বর্তমান বিস্মৃত হইতেন।

স্বামিজীর বাল্যবন্ধু যোগেশচন্দ্র দত্ত একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে যোগেশবাবু স্বামিজীকে বলিলেন যে, তিনি যদি ভারতীয় শিক্ষিত যুবকগণকে ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিস পড়িবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সাহায্য করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত যুবক কৃতকার্য হইয়া মাতৃভূমির কল্যাণে অনেককিছু করিতে সমর্থ হইবে। স্বামিজী বিষণ্ণ হইয়া উত্তর করিলেন, "তুমি মস্ত একটা ভুল করিতেছ। ঐ সমস্ত যুবক স্বদেশে আসিয়া ইউরোপীয় সমাজে মিশিবার চেষ্টা করিবে, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। তাহারা পদে পদে সাহেবদের খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার নকল করিবে, স্বদেশ বা জাতীয় আদর্শের কথা ভ্রমেও চিন্তা করিবে না।" বলিতে বলিতে স্বামিজী ভারতবর্ষের নিশ্চেষ্ট জড়ত্ব, সাংসারিক জীবনের দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার চেষ্টায় একান্ত উদাসীনতা, উদ্যমহীনতা ইত্যাদি জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দেশের দুর্দশার বিষয় বলিতে বলিতে তাঁহার বিশাল লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। সেদিন যোগেশবাবুর বন্ধু রামপুর ষ্টেট্ কলেজের প্রধান শিক্ষক বাবু ব্রহ্মানন্দ সিংহ মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া শ্রদ্ধামুগ্ধ হৃদয়ে লিখিয়াছেন—

"সে দৃশ্য আমি জীবনে ভুলিব না। তিনি (স্বামিজী) সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তথাপি ভারতবর্ষ তাঁহার হৃদয়ের সবখানি জুড়িয়া ছিল। তাঁহার সমস্ত ভালবাসা ছিল ভারতের প্রতি, ভারতকে তিনি প্রাণ দিয়া অনুভব করিতেন, ভারতের জন্য অশ্রু বিসর্জন করিতেন এবং ভারতের সেবাতেই তিনি তনুত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার শিরা-উপশিরায় ভারতবর্ষ স্পন্দিত হইত। এককথায়, ভারতবর্ষ তাঁহার জীবনের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।"

আলমোড়ায় আসিয়া স্বামিজী তাঁহার গুরুভ্রাতা ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণসহ মিঃ সেভিয়ার সাহেবের বাংলোয় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ নিকটবর্তী আর একটি বাড়িতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামিজী তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সহিত প্রাতর্ভ্রমণান্তে তাঁহাদের আবাসে উপস্থিত হইয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেন। শিষ্য ও শিষ্যাগণ ভক্তিবিনম্র চিত্তে তন্ময় হইয়া স্বামিজীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভারতীয় আদর্শসমূহের অফুরন্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। যে সমস্ত সমালোচক ভারতকে জীর্ণ, স্থবির ও ক্রমাগত অধঃপতনের পথে নামিয়া যাইতেছে বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহাদিগের বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা-প্রণোদিত সমালোচনাগুলিকে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তিনি তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণকে বুঝাইয়া দিতেন যে, ভারত এক গৌরবময় বিকাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া স্বনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতেছে। অতএব এই নবযুগের প্রারম্ভে স্বদেশসেবায় অগ্রসর হইতে হইলে কতখানি বিশ্বাস ও গভীর ভালবাসা ও সদাজাগ্রত সহানুভূতি লইয়া কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে, তাহা শিষ্যগণকে বুঝাইতে বুঝাইতে তিনি একদিন যেন একরকম অজ্ঞাতসারেই বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "আমি নিজকে বহু শতাব্দীর পর আবির্ভূত পুরুষ বলিয়া অনুভব করিতেছি। আমি দেখিতেছি যে, **ভারত যুবাবস্থ**।"

স্বামিজী শিক্ষাদানে ও আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সমস্ত অভিমত ব্যক্ত করিতেন, তাহার অধিকাংশ সিস্টার নিবেদিতা সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। নিবেদিতাকে ভারতীয় ভাবে গঠিত করিতে গিয়া অনেক সময় স্বামিজী বাধ্য হইয়া তাঁহার চিরপোষিত রীতি, নীতি ও আদর্শগুলিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেন। দৃঢ়হৃদয়া নিবেদিতা স্বীয় স্বাতন্ত্র্যকে সরাইয়া রাখিয়া সব সময় গুরুর সহিত একমত হইতে পারিতেন না। গুরু ও শিষ্যের এই মানসিক বিরোধ সিস্টারের ভারত আগমনের পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। সিস্টার স্বয়ং লিখিয়াছেন, "এই সময় আমার সমস্ত যত্নপোষিত ধারণাগুলির উপর যে নিত্য আক্রমণ ও তিরস্কার বর্ষিত হইতে লাগিল, আমি তাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। অনেক সময় অকারণে দুঃখভোগ করিতে হয়। আমি লক্ষ্য করিলাম, অনুকূলভাবাপন্ন প্রিয় আচার্যের স্বপ্ন অন্তর্হিত হইয়া তৎস্থানে এমন এক ব্যক্তির চিত্র উদয় হইল, যিনি অন্ততঃ উদাসীন এবং সম্ভবতঃ প্রতিকূলভাবাপন্ন হইবেন এবং এই কালে আমি যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তাহা যুক্তি দ্বারা বিচার করিবার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা মাত্র।"

এই ভাবসংঘাত নির্বেদিতার জীবনে অতি মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহার পরিণত ইংরেজ মন, স্বীয় রুচিগত বৈশিষ্ট্য সযত্ন-চেষ্টায় রক্ষা করিয়া চলিতে গিয়া ভারতবর্ষের আদর্শকে ইংরেজের দৃষ্টি দ্বারা বিচার করিত। একজন ইংরেজ মহিলার পক্ষে পরিণত বয়সে ভারতীয় ভাবে ভারতের সাধনা ও আদর্শকে গ্রহণ ও হৃদয়ংগম করা অতি কঠিন কাজ, আর এই সুকঠিন কাজের জন্য স্বামিজীর প্রবল প্রেরণাই জাতীয় আভিজাত্যপ্রিয় স্বাতন্ত্র্যাভিমানী নিবেদিতার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি এমন ভাবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভাঙিগয়া গড়িবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, পথও খুঁজিয়া পাইতে-ছিলেন না। অবশেষে একদিন রজনীতে সহসা এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রখণ্ডের প্রতি চাহিয়া স্বামিজী নিবেদিতাকে বলিলেন, "মুসলমানেরা নূতন চন্দ্রকে সমাদর করিয়া থাকেন। এসো, আমরা নূতন জীবন আরম্ভ করি।" স্বামিজীর কল্যাণহস্ত ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদের

ন্যায় পদতলে উপবিষ্ট নিবেদিতার মস্তক স্পর্শ করিল! দিব্যস্পর্শে জন্মগত সংস্কার মুহূর্তে মিলাইয়া গেল। সিস্টার লিখিয়াছেন, "বহুপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, এমন দিন আসিবে, যখন 'নরেন্দ্র' স্পর্শমাত্র অপরের মধ্যে জ্ঞানসঞ্চার করিয়া দিবে। আলমোড়ায় সেই সন্ধ্যাবেলা এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।"

অনেকের মনে এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, হয়ত নিবেদিতা মৃদু-স্বভাবা দুর্বলা রমণী ছিলেন, সেই কারণেই অমিত-তেজস্বী বিবকোনন্দ তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধা করিয়া মনোমতভাবে গড়িয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ ধারণা যে অমূলক, তাহা কবি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার পরলোকগমনের পর নিবেদিতার স্মৃতিতর্পণ করিতে গিয়া তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"নানাদিক দিয়া তাঁহার পরিচয়লাভের অবসর ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম, তাঁহার চলিবার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল, সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্তবেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব, সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্ততঃ আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি, তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় আমি অন্তরের মধ্যে গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা, তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

"আজ এই কথা আমি অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি; তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি, এমন কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে, যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর ফল পাইয়াছি।

"নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে কোনপ্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব ইউরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগ স্বীকারের অভাব—কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ চিৎরূপ যে কি, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে, সে-ই দেখিয়াছে; মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া. কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।"

আলমোড়ায় আসিবার পর হইতেই স্বামিজী নির্জনতাপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রায় প্রত্যহ দশ ঘণ্টাকাল গভীর অরণ্যে একাকী ধ্যান-ধারণায় যাপন করিতেন। ক্রমাগত দর্শনার্থিগণের সহিত আধ্যাত্মিক আলোচনায় তিনি যেন

বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এমনকি, সময়ে সময়ে অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের সহিত কোন বিষয়ের আলোচনা করাও যেন অসহ্য বোধ হইত। লোকশিক্ষা ও ধর্মপ্রচারের জন্য পরিব্রাজক সন্ন্যাসী একাল পর্যন্ত যেভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা অভিনেতার পরিচ্ছদের মত সরাইয়া রাখিয়া তিনি উদাসীন যোগীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অতীত জীবনের তীব্র তপোভাব ও বহির্জগতের উপর একটা প্রবল বিতৃষ্ণা সময় সময় তাঁহার হাবভাব ভঙ্গীতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি প্রায়ই গভীর অরণ্যে একাকী যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে একবার প্রায় এক সপ্তাহ পর ৫ই জুন সন্ধ্যাকালে তিনি দুইটি নিদারুণ সংবাদ শুনিবার জন্য আলমোড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। স্বামিজীর অনুপস্থিত কালে তাঁহার শিষ্যগণ সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, গাজীপুরের বিখ্যাত সাধু পওহারীবাবা দেহরক্ষা করিয়াছেন এবং সাঙ্কেতিক লিপিবিদ্ মিঃ গুডউইনও ২রা জুন জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া উতকামন্দে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালে মিসেস বুলের বাংলোয় স্বামিজীকে উক্ত সংবাদ প্রদান করা হইল। তিনি ধীরভাবে উহা শ্রবণ করিলেন, কোন প্রকার অভিমত প্রকাশ করিলেন না। পূর্বের ন্যায় গম্ভীরভাবে ত্যাগ ও ভক্তির মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যের বিয়োগে যে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিলেন। প্রাণাধিক শিষ্যের বিয়োগে তিনি কাতর হন নাই, ভারতমাতা যে একজন উদীয়মান কর্মীকে অকালে হারাইলেন, এই দুঃখই তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল।

কিছুদিন হইল মাদ্রাজের ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকার সম্পাদক ইহলোক হইতে অপসারিত হওয়ায়, উক্ত পত্রখানি আলমোড়া হইতে প্রকাশিত হইবার বন্দোবস্ত হইল। তদনুসারে স্বামী স্বরূপানন্দ উহার সম্পাদক এবং মিঃ সেভিয়ার পরিচালকরূপে নির্দিষ্ট হইলেন। এই পত্রিকাখানির প্রতি স্বামিজীর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, এক্ষণে সুযোগ্য ব্যক্তিগণ ইহার ভার গ্রহণ করিলেন দেখিয়া তিনি অতীব আনন্দিত হইলেন। অতঃপর কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শিষ্যগণ সহ মিসেস্ বুলের অতিথিরূপে কাশ্মীর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

রাওলপিণ্ডি হইতে টোঙ্গাযোগে তাঁহারা মারীতে উপনীত হইলেন। তথায় তিন দিন বিশ্রাম করিয়া শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঝিলাম উপত্যকার মনোরম দৃশ্যসমূহ দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা বারমূলায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে তিনখানি হাউস্‌বোট্ ভাড়া করিয়া নদীবক্ষে জলপথে তাঁহারা শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। স্বামিজী প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের ভ্রমণকাহিনীসমূহ সঙ্গিগণকে শুনাইতেন এবং সময় সময় কাশ্মীরের অতীত ইতিহাস, কণিষ্কের কাহিনী, অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার, শিব উপাসনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় এত আত্মমগ্ন হইয়া যাইতেন যে আহার করিবার কথা পর্যন্ত বিস্মৃত হইতেন। ২৫শে জুন তাঁহারা শ্রীনগরে উপনীত হইলেন।

কিন্তু সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। হাস্যপ্রফুল্ল বিবেকানন্দ গম্ভীর হইলেন। প্রায়ই তিনি শিষ্যগণের অজ্ঞাতসারে স্বীয় নৌকাসহ অন্যত্র প্রস্থান করিতেন। একাকী নির্জনে যাপন করিবার একটা ব্যাকুল আগ্রহে বিবেকানন্দ অধীর হইয়া উঠিলেন।

৪ঠা জুলাই নিকটবর্তী দেখিয়া স্বামিজী তাঁহার আমেরিকান শিষ্যগণকে তাঁহাদের ‘স্বাধীনতা দিবস’ উপলক্ষ্যে একটু বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য

গোপনে আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে পত্র-পুষ্প-পল্লবশোভিত তরণীশীর্ষে আমেরিকার জাতীয় পতাকা স্থাপিত হইল। তাঁহার বিস্মিত আমেরিকান শিষ্যাগণ আনন্দের সহিত প্রাতর্ভোজনে যোগদান করিলেন। এই ক্ষুদ্র উৎসব-সভার অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য স্বামিজী ও নিবেদিতা উপযুক্ত আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। স্বামিজী আনন্দের সহিত "To the Fourth of July" শীর্ষক স্বরচিত একটি ইংরেজী কবিতা পাঠ করিয়া শিষ্যাগণকে শুনাইলেন। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত উহা আমি অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"৪ঠা জুলাইর প্রতি"

হের বিগলিত, নিবিড় কৃষ্ণ বারিদ-পুঞ্জ গগনে,
সারা নিশা ধরি ধরণী আবরি' ঘন ঘোর আবরণে,
ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে তোমার জাগিয়া উঠিল ধরা,
বিহগ মুখর কুঞ্জকানন বন্দনা-গীতি ভরা।
তারকা নিন্দি' শুভ্র-শিশির-কিরীট পরিয়া শিরে,
তব আবাহনে পুলকে আকুল ফুলকুল কাঁপে ধীরে।
পূজাসম্ভার প্রেমপূরিত বক্ষে সাজায়ে রাখি,
সরসী মেলিল তোমারে হেরিতে অযুত কমল আঁখি।
বিশ্ব তোমারে বরিয়া লইল, সে দিন এসেছে আজ,
নব আবাহন করগো গ্রহণ আলোকের অধিরাজ।
আজি হে অরুণ করুণায় তব মুগ্ধ জগৎবাসী,
মুক্তি ছড়ায়ে হাসিল তোমার কান্ত কিরণ রাশি।
ভাবি দেখ তুমি, নিখিল বিশ্ব তোমার দরশ তরে,
ভরি যুগচয়, খুঁজিল তোমায়, কত না প্রদেশ 'পরে।
ছাড়ি কতজন, গৃহ পরিজন, ছিঁড়িয়া প্রণয়-ডোর,
লভিতে তোমায় লঙ্ঘি' সাগর, পশিল কাননে ঘোর।
—প্রতি পদে দলি শতেক বন্ধ পরাণ শঙ্কাহীন,
তবে তো পূর্ণ করিয়া চেষ্টা উদিল পুণ্যদিন।
সফল হইল সাধনা ও প্রেম—সার্থক বলিদান,
সকল বেদনা ধন্য করিয়া সিদ্ধি লভিল স্থান।
তারপর তুমি, মঙ্গলালয় জাগিয়া উঠিলে ধীরে,
মুক্তি-কিরণ বরষি হরষে বিশ্ব-মানব-শিরে।
চল অবিরাম বাধাহীন পথে—জগৎ করিতে তৃপ্ত,
—গগন কেন্দ্রে হে দেব ছড়ায়ে মুক্তি-কিরণ দীপ্ত!
প্রতি প্রদেশের প্রতি নরনারী উন্নত শির তুলি,
হেরুক আনন্দে বন্ধন পাশ নিঃশেষে গেছে খুলি।
প্রফুল্ল নবীন জীবন লভিয়া হউক সফল প্রাণ,
মুক্তির দিন! আজিকে সবারে স্বাধীনতা কর দান।

এই কবিতাটি লিখিবার ঠিক চার বৎসর পর ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই স্বামিজী স্ব স্বরূপ সম্বরণ করেন। ইহা কি তাহারই ভবিষ্যদ্বাণী? অথবা

আমেরিকার স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিতে গিয়া সমগ্র জগতের পরপদদলিত জাতিসমূহের পুনরুত্থানের একটা গৌরবময় চিত্র তাঁহার মানসপটে উদিত হইয়াছিল?

৬ জুলাই মিসেস্ বুল ও মিস্ ম্যাক্লিয়ড্ শ্রীনগর হইতে বিশেষ কার্যে গুলমার্গ গমন করিলেন। ১০ই তারিখে তাঁহারা অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে, স্বামিজী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানে তাঁহারা অবগত হইলেন যে, তিনি সোনামার্গের রাস্তায় অমরনাথ যাত্রা করিয়াছেন। গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ বরফ গলিয়া সোনামার্গের রাস্তা বন্ধ হওয়ায় স্বামিজী বিফলমনোরথ হইয়া ১৫ই জুলাই পুনরায় শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

১৮ই জুলাই তাঁহারা ইস্লামাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং ইস্লামাবাদের নিকটবর্তী কয়েকটি প্রাচীন দেবমন্দির ও অবন্তিপুরের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করিয়া আচ্ছাবল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই সময় প্রত্যহ প্রভাতে স্বামিজী শিষ্যগণ সহ ঝিলাম নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে হিন্দুধর্ম, খৃষ্টধর্ম ও মুসলমানধর্মের নানাপ্রকার ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনা করিতেন; কখনও বা তাঁহাদিগকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহিমায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেন। আচ্ছাবলে একদিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় স্বামিজী তাঁহার অমরনাথ গমনের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন এবং সিস্টার নিবেদিতাকে সঙ্গে যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণ, যতদিন স্বামিজী ফিরিয়া না আসেন, ততদিন পহেলগামে অপেক্ষা করিবেন স্থির হইল।

যাত্রার অন্যান্য বন্দোবস্ত এবং বস্ত্রাবাস ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য স্বামিজী পুনরায় ইস্লামাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। তথা হইতে সিস্টার নিবেদিতাসহ যাত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া পদব্রজে অমরনাথ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তীর্থযাত্রিগণ রজনী যাপন করিবার জন্য প্রান্তরমধ্যে স্ব স্ব বস্ত্রাবাস স্থাপন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী ও নিবেদিতাকে তাঁহাদের মধ্যেই বস্ত্রাবাস স্থাপন করিতে দেখিয়া সন্ন্যাসিবৃন্দ ইংরেজ মহিলার তাঁহাদের সহিত একত্র অবস্থান সম্বন্ধে বিষম আপত্তি উত্থাপন করিলেন। স্বামিজী কিছুতেই পৃথকস্থানে বস্ত্রাবাস তুলিয়া লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি তীব্র ভর্ৎসনা সহকারে সন্ন্যাসিবৃন্দের অজ্ঞতামূলক আপত্তির প্রতিবাদ করিতেছেন, এমন সময় জনৈক নাগাসন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "স্বামিজী! আপনার শক্তি আছে সত্য—কিন্তু তাহা প্রকাশ করা উচিত নহে।" স্বামিজী তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হইলেন। আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন সেই সন্ন্যাসিবৃন্দ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্বামিজী ও নিবেদিতার বস্ত্রাবাস সর্বাগ্রভাগে স্থাপন করিলেন। স্বামিজীর প্রভাব যেন সন্ন্যাসিবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য করিল। সন্ধ্যার পর প্রজ্বলিত ধুনির পার্শ্বে শত শত সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত ধর্মালোচনায় যোগদান করিতে লাগিলেন। অভিজ্ঞ সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বুঝিতে পারিয়া শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। সিস্টার নিবেদিতা ভিন্নদেশীয় রমণী বলিয়া তাঁহারা সঙ্কোচ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, আনন্দের সহিত নানাপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

বাওয়ানের পবিত্র নির্ঝরিণীতে অবগাহন করিয়া একাদশী পালন করিবার জন্য স্বামিজী যাত্রিগণসহ এক দিবস পহেলগামে বিশ্রাম করিলেন। বলা বাহুল্য, তুষারাবৃত দুর্গম ও দুরারোহ পথক্লেশ সত্ত্বেও স্বামিজী তীর্থযাত্রীর চিরাচরিত কর্তব্যগুলি অন্যান্য সাধুদের ন্যায় পালন করিতেন। ধ্যান, জপ,

শাস্ত্রালোচনা ও একবার সামান্য আহার—ইহাই ছিল দৈনন্দিন কর্তব্য। সমতল হইতে ১৮ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে, তুষারমৌলী গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া পাঁচটি গিরিনির্ঝরের সঙ্গমস্থল পঞ্চতরণীতে যাত্রিগণের বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইল। এই পাঁচটি গিরিতটিনীতে একটির পর অপরটিতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া যাত্রিগণের স্নান করা বিধি। স্বামিজী দীর্ঘ পথভ্রমণে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিবেদিতা ও তাঁহার সঙ্গিগণ নিষেধ করিতে পারেন এই আশঙ্কায় অপরের অলক্ষ্যে স্বামিজী এই কঠিন নিয়মটিও অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

২রা আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রি দুই ঘটিকার সময় চন্দ্রালোকিত হিমগিরির অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে যাত্রা আরম্ভ হইল। ক্রমে এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় আসিবার পর, অতি কঠিন চড়াই শুরু হইল। তখন সূর্য উঠিয়াছে। ক্রমে দুর্গম পথের শেষ হইল। অমরনাথের পবিত্র গুহা দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র যাত্রিবৃন্দ মহাদেবের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া বিগলিত তুষারধারায় অবগাহন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী ক্লান্ত হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন, কিছু বিলম্বে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন। গম্ভীর প্রশান্তভাবে উৎকণ্ঠিত শিষ্যাকে কিছু না বলিয়া শুধু "স্নান করিতে যাইতেছি" বলিয়া পিছনে আসিতে বলিলেন। অবগাহনান্তে নাগাসন্ন্যাসীদের সহিত বিভূতিলেপিত কলেবরে কেবলমাত্র কৌপীনধারী বিবেকানন্দ ভক্তিকণ্টকিত দেহে বিশাল গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। এ-ই বহুপ্রার্থিত বহুঈপ্সিত শ্রীশ্রীঅমরনাথ। সম্মুখে সুবৃহৎ চিরতুষারগঠিত ভগবান মহাদেবের অনাদি শিবলিঙ্গ বিরাজমান—যেন রজতশুভ্রকান্তি মহাদেব স্বীয় অটল মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ। সেই মহান্ প্রতীকমূর্তির সম্মুখে ভক্তিভরে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া স্বামিজী যেন প্রসারিত দুই হস্তে ভগবান্ শঙ্করের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন। তারপর কয়েক মিনিট ধ্যানাসনে কাটাইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বলা বাহুল্য, ভগিনী নিবেদিতার গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিতে কেহ আপত্তি করেন নাই। স্বামিজী গুহা হইতে নির্গত হইয়া উড্ডীয়মান শ্বেত পারাবতশ্রেণী দর্শন করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান ও সিদ্ধসঙ্কল্প জ্ঞান করিলেন। অর্ধঘণ্টা পরে নদীতীরে শিলাসনে বসিয়া এক সহৃদয় নাগাসন্ন্যাসী ও নিবেদিতার সহিত জলযোগ করিতে করিতে বালকের ন্যায় আনন্দোচ্ছ্বাসে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার আজ সাক্ষাৎ শিব দর্শন হইল। এখানে যাত্রীর বিত্তহরণ করিবার জন্য প্রসারিতহস্ত পাণ্ডা নাই, ধর্মের ব্যবসায় নাই, চিত্তবিক্ষেপকর কোন কিছুই নাই—এ এক নিরবচ্ছিন্ন পূজা আরাধনার ভাব! আর কোন তীর্থস্থানেই আমি এত আনন্দ পাই নাই!" পরে তিনি নিবেদিতাকে গভীর বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন, "দেবাদিদেব অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করিয়াছেন।"

কিন্তু অমরনাথের অপূর্ব অনুভূতি ও ক্লেশসাধ্য অনুষ্ঠানগুলি তাঁহার দেহ ও স্নায়ুপুঞ্জকে এমনভাবে মুহ্যমান করিয়াছিল যে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন (পরে বলিয়াছিলেন) এই আশঙ্কায় নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বাম নয়নে রক্ত জমিয়া দাগ হইয়াছিল এবং কয়েকদিন পর জনৈক চিকিৎসক তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্তে উহা চিরদিনের মত বর্ধিতায়তন (dilated) হইয়া গিয়াছিল।

প্রত্যাবর্তনের পথে পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বামিজী পহেলগামে আসিয়া

তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যদের সহিত মিলিত হইলেন। এইকালে তাঁহার প্রাণমন যেন শিবময় হইয়া গিয়াছিল। শিবমহিমা কীর্তন করিতে করিতে তাঁহারা ৮ই আগষ্ট শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলেন। ৮ই আগষ্ট হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁহারা শ্রীনগরে ছিলেন। এই সময় স্বামিজী নির্জনতাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং প্রায়ই স্বীয় নৌকাখানি অন্যান্য তরণী হইতে দূরে লইয়া যাইতেন। তাঁহার চিত্ত যদিও অধিকাংশ সময় অন্তর্মুখী হইয়া থাকিত, তথাপি মাঝে মাঝে তিনি ভারতের পুনরুত্থানের জন্য তাঁহার ব্রত ও আদর্শের কথা আলোচনা করিতেন। এই আলোচনাকালে কেবল তাঁহার শিষ্যরাই উপস্থিত থাকিতেন না, মাঝে মাঝে কাশ্মীর দরবারের পদস্থ কর্মচারীরাও যোগ দিতেন। বর্তমান সামাজিক দুর্গতি মোচন করিবার জন্য, হিন্দুধর্মকে ছুৎমার্গবর্জিত ও প্রচারশীল করিতে হইবে, তাহার আদর্শ থাকিবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন; এ বিষয়ে উৎসাহের সহিত যুক্তি প্রদর্শন করিতে তিনি কখনো বিরত হইতেন না। জাতীয় দৌর্বল্য ও অপ্রতিকারে অত্যাচার সহ্য করিয়া হীন হইতে হীনতর জীবনযাপনের গ্লানি হইতে দুর্ভাগা জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ কি গভীর ছিল, তাহা নিম্নের কয়েকটি কথা হইতেই বুঝা যাইবে। এইকালে একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, যখন দেখি, প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করিতেছে, তখন আমরা কি করিব?" স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কি করিবে? নিশ্চয়ই বাহুবল প্রয়োগ করিয়া প্রবলকে নিরস্ত করিতে হইবে।" অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী অন্যত্র বলিয়াছিলেন, "যেখানে দুর্বলতা ও জড়ত্ব, সেখানে ক্ষমার কোন মূল্য নাই, যুদ্ধই শ্রেয়ঃ। যখন তুমি বুঝিবে সহজেই জয়লাভ করা তোমার করায়ত্ত, তখনই ক্ষমা করিয়ো। জগৎ যুদ্ধক্ষেত্র, সংগ্রাম করিয়া নিজের পথ করিয়া লও।" আবার প্রশ্ন, "সত্য অধিকার রক্ষার জন্য একজন প্রাণবিসর্জন করিবে, না প্রতিবিধান না করিতে শিক্ষা করিবে?" স্বামিজী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "সন্ন্যাসীর পক্ষে অপ্রতিরোধই ধর্ম, কিন্তু গৃহস্থের আত্মরক্ষা করা কর্তব্য।"

বৌদ্ধ ও জৈন অহিংসা ও অপ্রতিরোধের আদর্শের বিকৃতি; গার্হস্থ্য-জীবনে মোক্ষমার্গী সন্ন্যাসীর নিষ্ক্রিয়তার ব্যর্থ অনুকরণের ফলেই হিন্দুজাতির জীবনে তামসিক জড়ত্ব দেখা দিয়াছে, একথা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তারস্বরে ঘোষণা করিয়া বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন,—"অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা। কথা তো বেশ, তবে শাস্ত্র বল্‌ছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তবে তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনং উদ্যন্তং' ইত্যাদি। হত্যা করতে এসেছে, এমন ব্রাহ্মণ বধেও পাপ নেই, মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোল্‌বার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা. বীর্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর; তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন কর্‌লে ইহকালেও নরকভোগ পরকালেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য; সত্য, পরম সত্য, স্বধর্ম করহে বাপু। অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে, অর্থোপার্জন করে, স্ত্রী-পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে তুমি কিসের মানুষ?"

কাশ্মীরে একটি সংস্কৃত কলেজ ও মঠ স্থাপনের জন্য কাশ্মীরের মহারাজা

স্বামিজীকে আবশ্যকমত ভূমি প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ঝিলাম নদীর তীরে স্বামিজী একটি স্থান মনঃপূত করিলে মহারাজ উহা তাঁহাকে দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বামিজীর শিষ্যগণ তথায় বস্ত্রাবাস স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে তাঁহাকে সরকারীভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, উক্ত ভূমি তিনি পাইবেন না। সংকল্প ভঙ্গে স্বামিজী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তদানীন্তন রেসিডেণ্ট মিঃ এডালবার্টের (Adalbert) প্রতিকূলতায় উক্ত প্রস্তাবটি কাউন্সিলে আলোচিত পর্যন্ত হইতে পারে নাই। সাময়িক নৈরাশ্যে বিমর্ষ হইলেও এই ঘটনায় স্বামিজী বুঝিতে পারিলেন, দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা বৃটিশ ভারতই তাঁহার উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র। ২০শে সেপ্টেম্বর স্বামিজী আমেরিকার কনসাল জেনারেলের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ডালহ্রদে গমন করিলেন। তথায় দুই দিবস থাকিয়া পুনরায় শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর স্বামিজী সহসা ক্ষীর-ভবানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং কোন শিষ্য্য যাহাতে তাঁহার পশ্চাদনুগমন না করেন, তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিলেন।

ক্ষীর-ভবানীর পবিত্র প্রস্রবণতটে উপনীত হইয়া স্বামিজী উগ্র তপস্যায় ব্রতী হইলেন। প্রত্যহ প্রভাতে একমণ দুগ্ধের ক্ষীর, আতপান্ন ও বাদাম ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। স্থানীয় জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুমারী কন্যাকে প্রত্যহ শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী পূজা করিতেন। একদিন প্রজ্বলিত হোমাগ্নির সম্মুখে যোগাসনে উপবিষ্ট বিবেকানন্দ মহামায়ার ধ্যানে নিমগ্ন হইবেন, এমন সময়ে সম্মুখস্থ ভগ্নমন্দির দর্শনে তাঁহার মনে হইল, যখন এ মন্দির মুসলমানগণ ভগ্ন করিয়াছিল; তখন হিন্দুগণ কি বাহুবলে তাহাদিগের গতিরোধ করিতে পারে নাই? আমি যদি তখন উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে প্রাণপণ করিয়াও জননীর মন্দির রক্ষা করিতাম, কিছুতেই পবিত্র মন্দির ধ্বংস হইতে দিতাম না।

সহসা একি দৈববাণী! বিস্ময়-বিমূঢ় বিবেকানন্দ উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, জগজ্জননী সস্নেহে ভর্ৎসনার সহিত বলিতেছেন, "যদিও বা মুসলমানগণ আমার মন্দির ধ্বংস করিয়া প্রতিমা অপবিত্র করিয়া থাকে, তাহাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস্, না আমি তোকে রক্ষা করি?"

একি অপ্রত্যাশিত ঘটনা! স্বামিজী সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরদিবস তিনি পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। আমি ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিব এবং জীর্ণমন্দির সংস্কার করিব। এ কার্যে অগ্রসর হইলে আমি কৃতকার্য হইব সন্দেহ নাই। সহসা পুনরায় দৈববাণী! জননী বলিতেছেন, "যদি আমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কি আমি সপ্ততল সুবর্ণমন্দির এই মুহূর্তেই গঠন করিতে পারি না? আমার ইচ্ছাতেই এই মন্দির ভগ্ন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে।"

কর্মযোগীর বিদ্যার অহঙ্কার চূর্ণ হইল! রজোগুণের অভ্রভেদী সমুন্নত গরিমা সহসা অবনত হইয়া জগজ্জননীর পদতলে লুণ্ঠিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলিতেন, "নরেন্দ্রের হৃদয়ে একটা অজ্ঞানের পাতলা আবরণ মা-ই রাখিয়া দিয়াছেন, উহার দ্বারা অনেক কর্ম করাইয়া লইবেন বলিয়া", তাহা যেন ক্ষণকালের জন্য সরিয়া গেল! তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন, মহামায়ার বিরাট ইচ্ছায় তিনি যন্ত্রের মত চালিত হইতেছেন। এ অভিনব অনুভূতি তাঁহার মনোরাজ্যে বিচিত্র

পরিবর্তন আনিয়া দিল। প্রাণে অপূর্ব শান্তি, অদ্ভুত নিস্তব্ধতা লইয়া স্বামিজী শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বামিজীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শিষ্যগণ বিস্মিত হইলেন। সেই অদ্ভুতকর্মা, উৎসাহোদ্দীপ্ত বিবেকানন্দ গম্ভীরভাবে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার কর্মের স্পৃহা স্বদেশপ্রেম সমস্ত অন্তর্হিত হইয়াছে! হরি ওঁ! আমি ভুল করিয়াছিলাম, আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী! মা—মা—তিনিই সব, তিনিই কর্তা—আমি কে?—তাঁহার অজ্ঞান সন্তান মাত্র।" পুনরায় কয়েকদিন নির্জনে গভীর সাধনায় রত থাকিয়া মুণ্ডিতমস্তক বিবেকানন্দ সামান্যবেশে তাঁহাদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ক্ষীর-ভবানী যাত্রার পূর্বে তিনি "Kali the Mother" শীর্ষক যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, উহা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ু-বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরান বহির্গত বন্দীশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার,—মৃত্যুর কালিমামাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে,
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তারি কাছে আছে।

জননীর এই ধ্বংসমূর্তির উপাসনা বিবেকানন্দ শিক্ষা করিয়াছিলেন স্বীয় গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট। দীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা তিনি ধীরে ধীরে অনুভব করিয়াছিলেন, দুঃখ দৈন্য ব্যাধি মড়ক পরাজয় ব্যর্থতার সহিত বীরের মত সংগ্রাম করাই, প্রয়োজন হইলে নির্ভীক দৃঢ়তায় মৃত্যুকে বীরের মত আলিঙ্গন করাই, বর্তমানযুগের শক্তিসাধনা। "রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী!" সেইজন্যই আজ ত্রিশ কোটীর মনুষ্যত্ব নির্বীর্য ও অলস! তাই গুরুবলে বলীয়ান সাধক নবযুগের প্রারম্ভে ভারতবাসীকে ভীষণের পূজায় মৃত্যুর উপাসনায় গভীর আরাবে আহ্বান করিয়াছিলেন। এসো! নবযুগের শক্তিসাধক, আশা আনন্দ উল্লাস ও অতীত-গৌরবের কঙ্কালপরিপ্লুত এই ভারত মহাশ্মশানে, নৈরাশ্য উদ্বেগ আশঙ্কার এই ঘোর অমানিশার শুভলগ্নে—অভীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শক্তি-সাধনায় অগ্রসর হও, ক্ষুধিতের কাতর ক্রন্দন, ব্যাধিপীড়িতের অসহায় হাহাকার, পদদলিতের অক্ষম কাতরতা

দেখিয়া শিহরিয়া উঠিও না, এ ভীষণা তোমার উপাস্যা ইষ্টদেবী! যাও, যেখানে দুর্ভিক্ষ ব্যাধি মড়ক, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া যাও সেখানে, ছুটিয়া যাও! তাণ্ডব-নৃত্য-পরায়ণা মৃত্যুরূপা মাতার চরণে হৃদয়ের উষ্ণশোণিত উৎসর্গ কর। প্রেতের অট্টহাসি, শিবার চীৎকার শুনিয়া রমণীর অঞ্চলতলে ভীরুর মত আত্মগোপন করা আর তোমার শোভা পায় না। শিয়রে মহাসর্বনাশ নিষ্পলক নেত্রে তীব্রদৃষ্টিতে তোমার দিকে চাহিয়া, প্রেমের স্বপ্ন দেখিবার অবসর তোমার আছে কি? এসো, "দূর কর নারীমায়া"; ভোগ-বিলাসের কামনা হৃদয় হইতে নির্মম হইয়া দূর করিয়া দাও! রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া এসো, এই অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়! ভয়? ভয় কী? কিসের নৈরাশ্য? সিংহিনী যখন করিকুম্ভ বিদারণপূর্বক রক্তপান করে, যখন ভীষণ গর্জনে বনানী প্রকম্পিত করিয়া তোলে, তখন পার্শ্বে দণ্ডায়মান সিংহশিশু কি ভীত হয়? সম্মুখে ঐ রুদ্ধিরাক্ত-রসনা, করালদংষ্ট্রা সিংহী যতই ভীষণা হউক, সে যে তাহার জননী! এসো, যুগযুগান্তের নিরাশা ও জড়ত্বপাশ জীর্ণবস্ত্রের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া, কোটীকণ্ঠে একবার এই ভীষণাকে "মা" "মা" বলিয়া ডাক দেখি—সেই দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর চরণতলে বসিয়া পাগল পূজারী যে ভাবে, যে নগ্ন সরলতা লইয়া ডাকিয়াছিলেন—ডাক দেখি একবার! মৃত্যুরূপা মাতা প্রসন্না হইবেন, সাধনায় সিদ্ধি মিলিবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের দুর্দশাও ঘুচিবে।

কাশ্মীর ভ্রমণ পরিসমাপ্ত হইল। প্রকৃতির রম্য লীলানিকেতন পশ্চাতে রাখিয়া স্বামিজী শিষ্যাগণসহ ১৩ই অক্টোবর লাহোরে অবতরণ করিলেন। শিষ্যাগণ ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত নগরী পরিদর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্বামিজী আলমোড়া হইতে আগত শিষ্য সদানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া ১৮ই অক্টোবর বেলুড় ফিরিয়া আসিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামিজীকে পাইয়া মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ উদ্বেল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই স্বামিজীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তাঁহাদিগকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। তাঁহার পাংশুবর্ণ মুখমণ্ডল, বাম নয়নে জমাট রক্ত প্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়া মঠের সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ অবিলম্বে চিকিৎসার বন্দোবস্তের জন্য চেষ্টিত হইলেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর. এল. দত্ত ও দুই একজন কবিরাজ তাঁহার দৈহিক অবস্থা বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া সমধিক সতর্কতা অবলম্বন করিবার উপদেশ দিলেন। মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ যাঁহার জন্য ব্যস্ত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি নির্বিকার ও উদাসীন, কোনপ্রকার বাহ্য বিষয়ে যেন অনুরাগ নাই। কার্যবিশেষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে গম্ভীর ঔদাস্যে উত্তর দেন, "আমি কি জানি, মার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে!" অনেকে কৌতুককর গল্প করিয়া তাঁহার মনকে উচ্চ ভাবরাজ্য হইতে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু আত্মমগ্ন বিবেকানন্দ অসংলগ্ন উত্তর দিয়া লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে চলিয়া যান। ইতিমধ্যে একদিন শিষ্য শরৎবাবু গুরুদর্শনে উপস্থিত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন যে, অমরনাথ ও ক্ষীর-ভবানীতে কঠোর তপশ্চর্যায় তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইলেও উহা কিছুই নহে। ক্রমে শিষ্যের সাগ্রহ অনুরোধে অমরনাথ ও ক্ষীর-ভবানীর অলৌকিক দর্শন ও অনুভূতি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলেন, "অমরনাথ থেকে ফেরবার সময় শিব আমার মাথায় ঢুকেছেন, কিছুতেই নাব্‌ছেন না।"

স্বামিজীকে চিকিৎসার জন্য মঠ হইতে কলিকাতা বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে আনিয়া রাখা হইল। ধীরে ধীরে স্বামিজীর মন উচ্চতম ভাব-

রাজ্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিল। পূর্বের ন্যায় উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত না হইলেও, দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দের সহিত কথোপকথন ও ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে মধ্যে মধ্যে মঠে উপস্থিত হইয়া কার্য-প্রণালী লক্ষ্য করিতেন। স্বামী তুরিয়ানন্দজী জ্বলন্ত উৎসাহ লইয়া আলমোড়া হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। মঠে শাস্ত্রালোচনা, ধ্যান, তপস্যা বিরামহীনভাবে চলিতে লাগিল। স্বামিজীও এক একদিন উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের চর্চায় নবীন ব্রহ্মচারিগণকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইতোমধ্যে সিস্টার নিবেদিতা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীগুরুর চরণে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারকল্পে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন। হিন্দুনারীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিতা হইবার জন্য তিনি বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আবাসভবনে বাস করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের অন্যান্য স্ত্রীভক্তগণ সাদরে দ্বিধাহীন চিত্তে নিবেদিতাকে আপনাদের মধ্যে স্থানদান করিলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই বাগবাজারে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল।

১২ই নভেম্বর শ্রীশ্রীমা কতিপয় স্ত্রীভক্ত সমভিব্যাহারে বেলুড় মঠে শুভ পদার্পণ করিলেন। সেদিন শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা। পূজা ও ভোগের বিধিমত আয়োজন করিতে সন্ন্যাসিগণ ত্রুটি করেন নাই। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পূজা সমাপন করিয়া সন্ন্যাসিবৃন্দকে আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার আশীর্বাদে মঠের শুভ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে ভাবিয়া সকলেই আনন্দিত ও কৃতার্থ হইলেন। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, ও সারদানন্দজী সহ বাগবাজারে নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামিজীর প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিশেষ পূজা সমাপন করিয়া জগজ্জননীর চরণে প্রার্থনা করিলেন, যেন তাঁহার আশীর্বাদে বিদ্যালয় হইতে আদর্শ বালিকাগণ শিক্ষিতা হইয়া সমাজের কল্যাণদায়িনী হয়। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ লাভ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা আনন্দে নিজেকে সিদ্ধসঙ্কল্প বলিয়া অনুভব করিলেন।

৯ই ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিবস। নীলাম্বর বাবুর বাগানবাটীতে, ব্রাহ্ম মুহূর্তে, স্বামিজী গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবৃন্দসহ ভাগীরথীসলিলে অবগাহন করিয়া নব গৈরিক বাস পরিধান করিলেন। অদ্যকার বিশেষ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বিবেকানন্দ স্বয়ং। ধ্যান উপাসনা পূজা যথাবিধি সমাধা করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ রক্ষিত পবিত্র তাম্রাধার স্বামিজী দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করিয়া বেলুড় মঠের দিকে অগ্রসর হইলেন; তাঁহার পশ্চাতে শঙ্খঘণ্টা কাঁসর ধ্বনিতে দিক মুখরিত করিয়া গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবৃন্দ। সেই পুণ্য প্রভাতে ভাগীরথীতীরে মুষ্টিমেয় বিশ্বাসী ভক্তের কণ্ঠ-সমুৎসারিত শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি এক অপূর্ব আনন্দলোক সৃষ্টি করিল। পথে চলিতে চলিতে স্বামিজী পার্শ্ববর্তী শিষ্যকে কহিলেন, "ঠাকুর একবার আমায় বলছিলেন, 'তুই কাঁধে ক'রে আমায় যেখানে খুসী নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই থাকবো, তা' সে কুঁড়ে ঘরই হোক, আর গাছতলাই হোক।' পরম দয়ালের সেই আশীর্বাদ ভরসা করেই আমি তাঁকে আমাদের ভবিষ্যৎ মঠে নিয়ে চলেছি। বৎস, স্থির জেনো, যতদিন তাঁর নামে তাঁর অনুগামীরা পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা, সর্বমানবে সমপ্রীতির আদর্শ রক্ষা করতে পারবে, ততদিন ঠাকুর

এই মঠকে তাঁর দিব্য উপস্থিতি দ্বারা ধন্য করে রাখবেন।”

মঠ-প্রাঙ্গণে সযত্নরচিত বেদীর উপর পবিত্র আধার স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ সহ স্বামিজী ভক্তিভরে ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া সর্বধর্ম সমন্বয়াচার্য মহান্ গুরুর উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম নিবেদন করিলেন। তারপর স্বামিজী যথারীতি পূজা সমাপনান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। যুগ-প্রবর্তক আচার্যের কণ্ঠে বেদমন্ত্র বহুযুগ-বিস্মৃত পুরাতন সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে বিরজাহোম সমাপ্ত করিয়া স্বহস্তে পায়সান্ন রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিয়া আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, “ভ্রাতৃবৃন্দ আইস, আমরা কায়মনোপ্রাণে লোক-কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন বহুকাল ধরিয়া এই পবিত্র স্থানে বাস করেন। তাঁহার আশীর্বাদ ও সূক্ষ্ম আবির্ভাবে ইহা পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হউক, এই কর্মকেন্দ্র হইতে বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়, সর্বসম্প্রদায়, সর্বধর্মের ভেদদ্বন্দ্ব নিরসনের ভাবধারা প্রচারিত ও আচরিত হইবে।”

মঠের ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একদিন শিষ্য শরৎ-বাবুকে বলিলেন, “এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হ’বে। সাধন, ভজন, জ্ঞান-চর্চার এই মঠ প্রধান কেন্দ্র-স্থান হ’বে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, তাতে জগৎ ছেয়ে ফেলবে, মানুষের জীবন-গতি ফিরিয়ে দেবে। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে ideals (মানব-হিতকর-উচ্চাদর্শ সকল) বেরোবে, এই মঠভুক্ত পুরুষদিগের ইঙ্গিতে কালে দিগদিগন্তে প্রাণের সঞ্চার হবে, যথার্থ ধর্মানুরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে—মনে ঐরূপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে এক-খানি বাঙলা পত্রিকা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন স্বামিজী বহুদিন হইতেই অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। তদনুসারে পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাব সকলে অনুমোদন করায় স্বামিজীর অভিমতে স্বামী ত্রিগুণাতীতজী উক্ত পত্রের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। ইহা লইয়া অক্লান্তকর্মা স্বামী ত্রিগুণাতীতজী অসাধারণ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। স্বামিজী তাহা দেখিয়া আনন্দের সহিত আশীর্বাদ ও উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। স্বামিজী উহা “উদ্বোধন” নাম মনোনীত করেন এবং স্বয়ং উহার প্রস্তাবনা লিখিয়া দিয়াছিলেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যগণকে স্বামিজী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্মমত জনসাধারণে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

মঠে প্রতিনিয়ত শাস্ত্রালোচনা এবং দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দকে উপদেশাদি প্রদান হেতু কঠোর মানসিক পরিশ্রমে স্বামিজীর শরীর দিন দিন অত্যধিকরূপে অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিল। আগামী গ্রীষ্মকালে তাঁহাকে পাশ্চাত্যদেশে যাইতে হইবে, অতএব কিয়দ্দিবস বিশ্রাম করিবার একান্ত প্রয়োজন অনুভব করিলেন। কলিকাতা ও বেলুড় মঠে থাকিয়া বিশ্রাম লাভ করিবার আশা একান্ত অসম্ভব বলিয়া স্বামিজী ১৯শে ডিসেম্বর প্রিয়নাথ মুখুজ্যের অতিথিরূপে বৈদ্যনাথে প্রস্থান করিলেন। বৈদ্যনাথ স্বাস্থ্যকর স্থান হইলেও স্বামিজী হাঁপানি রোগে প্রথম প্রথম ভয়ানক কষ্ট পাইতে লাগিলেন। একদিন হাঁপানির বেগ এত বৃদ্ধি পাইল যে, সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, বোধ হয় তাঁহার দেহত্যাগ

হইয়া যাইবে। সুখের বিষয় অত্যল্পকাল মধ্যে স্বামিজী সুস্থ হইয়া উঠিলেন। দেওঘরে কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু জনতার ভীড় ছিল না, প্রাতে অপরাহ্ণে তিনি দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিবার সুবিধা পাইতেন। দৈহিক ব্যায়াম ছাড়াও চিঠিপত্র লেখা ও গ্রন্থাদি পাঠে অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিতেন। স্বামিজীর অনুপস্থিতিকালে ১৮৯৯-এর ২রা জানুয়ারী নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি হইতে বেলুড়ের নব-নির্মিত ভবনে মঠ স্থানান্তরিত হইল। মঠের কার্যপ্রণালী ও নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিভাবে কাজ হইতেছে, তাহা প্রায় প্রত্যহ স্বামিজীকে জানাইতে হইত। বৈদ্যনাথের নিঃসঙ্গ নির্জনতা তাঁহাকে বিশ্রাম দিতে পারিল না। আরব্ধ কর্মভার তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। জ্বলন্ত চুল্লীর উপর স্থাপিত ফুটন্ত জলপাত্রকে স্তব্ধ হইবার আদেশ দেওয়ার মতই, চিকিৎসকগণের গুরুতর মানসিক শ্রম অথবা গভীর চিন্তা হইতে বিরত হইবার উপদেশও ব্যর্থ হইল।

৩রা ফেব্রুয়ারী স্বামিজী বৈদ্যনাথ হইতে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। মঠের কার্যপ্রণালী সুচারুরূপে চলিতেছে দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রশ্নোত্তর সভা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদান ইত্যাদি স্বামী তুরিয়ানন্দজীর নেতৃত্বে সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতেছিল। অপরদিকে ধ্যান, তপস্যা ইত্যাদিরও বিরাম ছিল না। স্বামিজী মঠে আসিয়া সেইদিনই তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ সহ একটি ক্ষুদ্র সভা আহ্বান করিলেন। মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সমগ্র ভারতে প্রচার করিবার জন্য তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবৃন্দকে উপদেশ প্রদান করিলেন। স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দজী পূর্ববঙ্গে, ঢাকা অঞ্চলে প্রচারকার্যে গমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। বিরজানন্দজী বিনীতভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “স্বামিজী! আমি কিছুই জানি না, লোককে বলিব কি?” স্বামিজী তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, “যাও, বল গিয়া যে আমি কিছুই জানি না, উহাই এক মহত্তম বার্তা।” বিরজানন্দজী প্রচারকার্যের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই হউক, আর অন্তরের তীব্র বৈরাগ্যের বাণীর অনুসরণ করিয়াই হউক, শ্রীগুরুচরণে নিবেদন করিলেন যে, অগ্রে সাধনাবলে আত্মসাক্ষাৎকার না করিয়া তিনি কেমন করিয়া লোক-শিক্ষায় অগ্রসর হইবেন? অতএব, তাঁহাকে আরও কিছুদিন সাধন করিবার আদেশ প্রদান করা হউক।

মানবমিত্র বিবেকানন্দ শিষ্যের এই মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাকে ধিক্কার দিয়া গর্জিয়া উঠিলেন—“স্বার্থপরের মত নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিলে তুমি নরকে যাইবে! যদি তুমি সেই পূর্ণব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে চাও, তাহা হইলে অন্যের মুক্তির জন্য সাহায্য কর: নিজের মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে বিনাশ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।” স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণ স্ব স্ব পারলৌকিক কল্যাণলাভের আশায় জগতের হিতচিন্তায় বিমুখ থাকিবে, এ চিন্তা পর্যন্ত তাঁহার নিকট কি মর্মান্তিক ক্লেশদায়ক ছিল! মুক্তিলাভের চেষ্টায় সংসার, লোকালয় ত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্য বা গিরিগুহা-বাসী সন্ন্যাসীর অভাব তো ভারতে কোনোদিন হয় নাই। পরকল্যাণ কামনায় স্বীয় সাধন, ভজন, মুক্তির চেষ্টা উৎসর্গ করিয়া কর্মের পথে দাঁড়াইবে, এইরূপ নির্ভীক কর্মযোগী সন্ন্যাসী গঠন করিবার জন্যই ত আদর্শ মঠ প্রতিষ্ঠা। আচার্যদেব মৌন শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, “বৎস! ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া জগদ্ধিতায় কর্মে অগ্রসর হও। যদি পরমকল্যাণ কামনায় কর্মে অগ্রসর হইয়া

নরকেও যাইতে হয়, তাহাতেই বা কি আসে যায়?” অতঃপর তিনি শিষ্যদ্বয় সমভিব্যাহারে মঠের ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। বহুক্ষণ গভীর ধ্যানান্তে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, “আমি আমার শক্তি তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিব। শ্রীভগবান্ সর্বদা তোমাদের পশ্চাতে থাকিবেন, কোন চিন্তা নাই।”

সেদিন স্বামিজী শিষ্যদ্বয়কে প্রচারকার্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন এবং কেহ দীক্ষা প্রার্থনা করিলে কি মন্ত্রে, কেমনভাবে দীক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তাহাও শিখাইয়া দিলেন। নবশক্তিবলে বলীয়ান শিষ্যদ্বয় পরদিবসই শ্রীগুরুর পবিত্র পদধূলি শিরে ধারণ করিয়া প্রচারোদ্দেশ্যে ঢাকা যাত্রা করিলেন। স্বামিজী ৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামী তুরিয়ানন্দ ও সদানন্দজীকেও প্রচারকার্যে গুজরাটে প্রেরণ করিলেন।

স্বামিজী বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া বহু কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষিত যুবক তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী স্বীয় দৈহিক অসুস্থতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগকে লইয়া ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। যাহাতে এই যুবকগণ, দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই বর্তমানে জাতীয়-জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত—ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া সেইভাবে জীবন গঠন করিয়া তোলে, তাহার জন্য তিনি ওজস্বিনী ভাষায় সেবাধর্মের মহিমা শতমুখে কীর্তন করিতেন। দেশের দুর্দশা আলোচনা করিতে গিয়া সময় সময় ভাবের আতিশয্যে অশ্রুবিসর্জন করিতেন, কখনও বা গম্ভীরভাবে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। অধিকাংশ যুবকের শারীরিক দৌর্বল্য, নৈতিক চরিত্রহীনতা ও আধুনিক কুশিক্ষায় মস্তিষ্ক-বিকৃতি লক্ষ্য করিয়া সময় সময় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। “দুই সহস্র বীরহৃদয় বিশ্বাসী চরিত্রবান ও মেধাবী যুবক এবং ত্রিশকোটী টাকা হইলে আমি ভারতকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিতে পারি।” একথা তিনি প্রায়ই বলিতেন এবং উহার অভাবে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইতেছে, এমন একটা নিরাশাও সময় সময় তাঁহাকে আচ্ছন্ন ও ব্যাকুল করিয়া তুলিত। কিন্তু পর্বতপ্রমাণ বাধা বিঘ্ন এবং নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারের মধ্য দিয়াও পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। তাঁহার নিঃস্বার্থ আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে কয়জন জগদ্ধিতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই মুষ্টিমেয় নরনারীকেই “অগ্রগামী নিরাশ সৈন্যদল” রূপে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাতে তাঁহার উৎসাহের অভাব ছিল না। অপরাহ্ণে যখন আচার্যদেব ধীর পদবিক্ষেপে ভাগীরথীতীরে মঠপ্রাঙ্গণে পরিভ্রমণ করিতেন, তখন তাঁহার গভীর চিন্তার দুই একটি ক্ষুদ্র অংশ সময় সময় বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া আসিত। একদিন পরিভ্রমণকালীন সম্মুখে কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, “শোনো বৎসগণ! শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, জগতের কল্যাণকামনায় দেহ বিসর্জন করে গেছেন। আমি তুমি—প্রত্যেককেই জগতের কল্যাণের জন্য দেহ বিসর্জন কর্‌তে হবে। বিশ্বাস কর, আমাদের হৃদয়মোক্ষিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু হ’তে ভবিষ্যতে মহা মহা কর্মবীরগণ উদ্ভূত হ’য়ে জগৎ আলোড়িত করে দেবে।” কল্পনাপ্রিয় ভাবুক সন্ন্যাসী ইহা বিশ্বাস করিতেন এবং সেই কারণেই বক্তৃতা, কথাবার্তায় প্রায়ই বলিতেন— “I want to preach a man-making religion—আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করতে চাই, যাহাতে মানুষ

তৈরী হয়।” এই কারণে স্বামিজী বক্তৃতা প্রদান পরিত্যাগ করিয়া অক্লান্ত চেষ্টায় মঠের মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই প্রাণপণ করিয়াছিলেন। একদিন জনৈক শিষ্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, “স্বামিজী! আপনি অসাধারণ বাগ্মিতাবলে ইউরোপ, আমেরিকা মাতাইয়া আসিয়া নিজ জন্মভূমিতে চুপ করিয়া আছেন, ইহার কারণ কি?” উত্তরে আচার্যদেব বলিয়াছিলেন, “এদেশে আগে Ground (জমি) তৈরী কর্‌তে হ'বে। পাশ্চাত্যের মাটি খুব উর্বরা। অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ, ক্ষীণমন, রোগশোক পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেক্‌চার দিয়ে কি হ'বে? প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যাঁরা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্‌তে প্রস্তুত হ'বে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে ঐরূপে তৈরী করছি। শিক্ষা শেষ হ'লে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাঁদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে বুঝিয়ে বলবে। ঐ অবস্থার উন্নতি কিরূপে হ'তে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান্ সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মত পরিষ্কার করে তাঁদের বুঝিয়ে দেবে। দেখছিস্ না, পূর্বাকাশে অরুণোদয় হ'য়েছে, সূর্য উঠ্‌বার আর বিলম্ব নাই। তোরা এই সময় কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার ফংসার করে কি হ'বে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে, দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাক্‌লে চলছে না; শিক্ষাহীন, ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাঁদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে—'ভাইসব উঠ, জাগ, কতদিন আর ঘুমুবে?' আর বেদান্তের মহান্ সত্যগুলি সরল করে তাঁদের বুঝিয়ে দে গে। এতদিন এ দেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্মটা একচেটে করে বসেছিল। কালের স্রোতে তা' যখন আর টিকলো না, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোক যাতে পায়, তা'র ব্যবস্থা করগে। **সকলকে বুঝাগে, ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাদেরও ধর্মে সমানাধিকার**। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্। আর সোজা কথায় তাদের কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি গৃহস্থজীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দে গে! নতুবা তোদের লেখাপড়াকে ধিক্—আর তোদের বেদ-বেদান্ত পড়াকে ধিক্! লেগে যা—কয়দিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস্, তখন একটা দাগ রেখে যা। নতুবা গাছ-পাথর তো হচ্ছে, মর্‌ছে—ওরকম জন্মাতে মর্‌তে মানুষের কখনও ইচ্ছা হয় কি? আমায় কাজে দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে এই কথা শোনাগে—'তোমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি জাগিয়ে তোল।' নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তি কামনাও তো মহা-স্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান—ফেলে দে মুক্তি ফুক্তি—আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা। তোরা ঐরূপে আগে জমি তৈরী কর্‌গে, আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা কর্‌তে নরলোকে শরীর ধারণ কর্‌বে—তার ভাবনা নেই। এই দেখ্‌না যারা আগে ভাব্‌তো আমাদের কোন শক্তি নেই—তা'রাই এখন সেবাশ্রম, অনাথাশ্রম, দুর্ভিক্ষফণ্ড কত কি খুল্‌ছে! দেখ্‌ছিস্ না—নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হ'য়েও তোদের সেবা কর্‌তে শিখেছে? আর তোরা নিজের দেশের লোকের জন্য তা' করতে পারবিনি? যেখানে মহামারী হ'য়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হ'য়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে—চলে যা সেই দিকে। নয় মরেই যাবি। তোর আমার মত কীট হচ্ছে—মর্‌ছে, তা'তে জগতের কি আস্‌ছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা' ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হ'বে। তোরাই দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা—লেগে যা।

দেরী করিস্ নি—মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে! আর পরে করবি বলে বসে থাকিস নি—তা' হ'লে কিছু হ'বে না।"*

কলিকাতার তো কথাই নাই; নানা স্থান হইতে অনেকেই স্বামিজীর শ্রীচরণ-দর্শনাভিলাষে বেলুড় মঠে উপস্থিত হইতেন। তিনি কাহারও ধর্ম সম্বন্ধীয় সমস্যা ভঞ্জন করিয়া দিতেন, কোন ভাগ্যবানকে শিষ্যপদে বৃত করিয়া কৃতার্থ করিতেন। মানবের মধ্যে সর্বশক্তিমান আত্মার সুপ্ত মহিমাকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার আগ্রহে মহাপুরুষ যেন সর্বদাই প্রস্তুত! পাত্রাপাত্র বিচার নাই, ধনী দরিদ্র ভেদ নাই, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই তাঁহার নিকট তুল্য আদর ও যত্ন প্রাপ্ত হইতেন। কখনও প্রশ্নকর্তার জটিল দার্শনিক সমস্যার মীমাংসা করিতেছেন, কখনও বা ভারতের আর্থিক ও লৌকিক উন্নতি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, তাহা শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দিতেছেন। আবার কখনও বা ব্রহ্মচারিবৃন্দকে সংযম-সাধনায় উৎসাহিত করিতেছেন, নিয়মের সামান্য ত্রুটিকেও ক্ষমা না করিয়া তীব্র ভর্ৎসনা করিতেছেন, আবার পরমুহূর্তেই হয়ত সকলের সহিত আনন্দে মঠের জঙ্গল সাফ করিতে চলিয়াছেন। ধর্মোপদেশ প্রদান হইতে সম্মার্জনী হস্তে আবর্জনা পরিষ্কার পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান, সবই প্রভুর কাজ!

একদিন বিবেকানন্দ সুর-গুরু বৃহস্পতির ন্যায় শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া শাস্ত্রব্যাখ্যায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময় শুক্লকর্মা সাধু নাগমহাশয় তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া মঠে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দুইটি শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির বহুদিনের পর আনন্দ-সম্মিলন! এক সন্ন্যাসের চরমাদর্শ, অপর মূর্তিমান গার্হস্থ্যধর্ম!! স্বামিজী প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছেন তো?" নাগমহাশয় বলিলেন, "আপনাকে দর্শন কর্তে আইলাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিবদর্শন হ'ল।"

স্বামিজী কুশল-প্রশ্ন করিতেছেন, কিন্তু উত্তর দিবে কে? জোড়করে দণ্ডায়মান ভাবমুগ্ধ মহাপুরুষ যে অতৃপ্ত নয়নে সাক্ষাৎ শঙ্করদর্শন করিতেছেন! দেহজ্ঞান থাকিলে তো বলিবেন যে, ভাল আছি! 'ছাই হাড়মাসের কথা' কি তাঁহার আর মনে আছে! তাঁহার মন যে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-হ্রদের পূর্ণ প্রস্ফুটিত 'সহস্র-দল-পদ্মের' অপূর্ব মাধুরী নয়নময় হইয়া পান করিতেছে!! উত্তর দিবার অবসর কোথায়?

আচার্যদেব, স্বামী প্রেমানন্দজীকে প্রসাদ আনিয়া নাগমহাশয়কে দিতে বলিলেন। নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামিজীর প্রতি করযোড়ে) আপনার দর্শনে আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে!***"

স্বামিজী। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ্ছিস্! নাগমহাশয়কে দেখ্, ইনি গেরস্ত, কিন্তু জগৎ আছে কি নাই এঁর সে জ্ঞান নাই, সর্বদা তন্ময় হ'য়ে আছেন। (নাগমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ব্রহ্মচারী ও আমাদিগকে ঠাকুরের কথা কিছু শোনান।

নাগমহাশয়। ওকি বলেন! ওকি বলেন! আমি কি বলবো? আমি আপনাকে দেখ্তে এসেছি, ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি! ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝ্বে! জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!!

স্বামিজী। আপনিই যথার্থ রামকৃষ্ণদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরে মরলুম!

---

* স্বামী-শিষ্য সংবাদ

নাগমঃ। ছিঃ, ও কথা কি বল্‌ছেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া—এ পিঠ্ আর ও পিঠ্, যা'র চোখ আছে, সে দেখুক।

স্বামিজী। এ সব যে মঠ ফট হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে?

নাগমঃ। আমি ক্ষুদ্র, কি বুঝি? আপনি যা' করেন, নিশ্চয় জানি, তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে!

* * * *

স্বামিজী। আমি একবার আপনার দেশে যাব।

নাগমহাশয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন, "এমন দিন কি হবে? দেশ কাশী হ'য়ে যা'বে। সে অদৃষ্ট আমার হ'বে কি?"

স্বামিজী। আমার তো ইচ্ছে আছে। মা নিয়ে গেলে হয়।

নাগমঃ। আপনাকে কে বুঝ্‌বে,—কে বুঝ্‌বে? দিব্যদৃষ্টি না খুল্‌লে চিনবার যো নেই! একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন। আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কেউ বুঝ্‌তে পারে নি।

স্বামিজী। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই—শব্দ নেই! সনাতন-ধর্মভাবে একে কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝ্‌বো, ঠাকুর ও আমাদের আসা সার্থক হ'ল। কেবল ঐ ইচ্ছেটা আছে—মুক্তি ফুক্তি সব তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন কৃতকার্য হওয়া যায়।

নাগমঃ। ঠাকুরের আশীর্বাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন কাহাকেও দেখি না, যা' ইচ্ছে কর্‌বেন—তাই হবে।

স্বামিজী। কই কিছুই হয় না—তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না।

নাগমঃ। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হ'য়ে গেছে; আপনার যা' ইচ্ছা, তা' ঠাকুরের ইচ্ছা। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

* * * *

স্বামিজী। নাগমহাশয়! কি যে কর্‌ছি, কি না কর্‌ছি, কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেইমত কাজ করে যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে, কিছু বুঝতে পার্‌ছি না।

নাগমঃ। ঠাকুর যে বলেছিলেন—"চাবি দেওয়া রইল।" তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না! বুঝামাত্রই লীলা ফুরা'য়ে যা'বে।

নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া স্বামিজী চিন্তামগ্ন হইলেন। আমরাও এই অবসরে একটু চিন্তা করিয়া দেখি, দেখি একবার কল্পনানেত্র নির্নিমেষে মেলিয়া, বেলুড়ের পুণ্য মঠমন্দিরে পরস্পর সম্মুখীন দুইটি মহাপুরুষ মূর্তি। বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ দীনভাবে ততোধিক দীন গৃহস্থোত্তমের নিকট আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন! যে বিবেকানন্দ জাতি, বর্ণ, নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেককে সমভাবে সনাতনধর্ম-সাগর-মথিত অদ্বৈতামৃত পরিবেশন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তিনি তাঁহার কর্ম ভাল কি মন্দ তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া বলিতেছেন, 'কিছু বুঝিতে পারিতেছি না'! এই বীর সন্ন্যাসীকে অন্তর্নিহিত প্রবলতম আত্মশক্তির প্রেরণায় গর্বোদ্দৃপ্ত শির তুলিয়া সিংহের মত সংযত শৌর্যে বক্রগ্রীব হইয়া দাঁড়াইতে আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি; আর আজ, মহিমাময় মনুষ্যত্বের সম্মুখে মহানম্রতায় শির নত করিয়া কেমন করিয়া হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন,

তাহাও দেখিলাম। দেখিলাম, মহাশক্তি ও মহানম্রতা ঐ মহাপুরুষের বিশাল হৃদয়ে কি অপরূপ মাধুর্যে একত্র মিলিত হইয়াছে! আর নাগমহাশয়! তাঁহার কথা আর কি বলিব! যাঁহার সম্বন্ধে স্বামিজী বলিয়াছেন, “সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের মত সাধু আর একজনও দেখিলাম না!” পূর্ববঙ্গের হীরকখনির এই উজ্জ্বল কোহিনূর, পুরুষোত্তম নাগমহাশয়ের সহিত স্বামিজীর তুলনা করিতে গিয়া ভক্ত-চূড়ামণি নাট্য-সম্রাট গিরিশবাবু বলিয়াছেন, “মহামায়া দুজনের নিকট হার মেনেছেন। স্বামিজীকে মহামায়া যতই বাঁধিতে যান, স্বামিজী ততই এত বড় হন যে, মায়ার দড়িতে কুলোয় না, আর নাগমহাশয় এত ছোট্ হয়ে যান যে, ফস্‌কে যায়।”

একদিন ‘হিতবাদী’-সম্পাদক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর দুইজন বন্ধুসহ মঠে স্বামিজীর দর্শনে আসিলেন। এই দুইজনের একজন পাঞ্জাবী জানিতে পারিয়া স্বামিজী তাঁহার সহিত পাঞ্জাবের সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যাগুলির আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ভারতের লোকসাধারণের কথা উঠিল। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, আচার নিয়মের আনুষ্ঠানিক কঠোরতার শাসনে পঙ্গু জীবনের গ্লানি কি ভাবে ভারতের জনজীবনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, তাহা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া স্বামিজী উচ্চবর্ণীয় ও শিক্ষিতদের হৃদয়হীন ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করিলেন। প্রাচীন বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের অভ্যাস অপেক্ষাও ইংরেজী শিক্ষিত অংশের স্বজাতির প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা অধিকতর প্রবল ও পীড়াদায়ক। সমাজের স্তরে স্তরে এই ভেদ ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান সমস্যা। স্বামিজী পণ্ডিতজীকে বলিলেন, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি শিক্ষিত ভদ্রসমাজের অভাব-অভিযোগের মধ্যে যতদিন সীমাবদ্ধ থাকিবে ততদিন কাহারো কল্যাণ নাই। আমি তাই একদল প্রচারক সন্ন্যাসী তৈয়ারী করিতেছি যাহারা আধুনিক যুগের মুক্তি ও উন্নয়নের বাণী গ্রামে গ্রামে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অদ্বৈতবেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর গভীর স্বদেশপ্রেম এবং অবজ্ঞাত জনসমষ্টির প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখিয়া পণ্ডিতজী চমৎকৃত হইলেন। বহুক্ষণ আলোচনার পর বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইল। এমন সময় পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি স্বামিজীকে বলিলেন,—“স্বামিজী, আপনার নিকট ধর্মের কথা, সাধন ভজনের কথা শুনিবার জন্য আমরা অনেক আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অতি সাধারণ বিষয় লইয়া আলোচনা হইল, আজিকার দিনটা বৃথাই গেল।”

স্বামিজীর ক্লান্ত মুখমণ্ডল ব্যথিত করুণায় গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি ধীরভাবে বলিলেন, “মহাশয়, যতদিন আমার জন্মভূমির একটি কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকিবে ততদিন তাহাকে আহার প্রদানই ধর্ম। ইহা ছাড়া আর যা কিছু—অধর্ম।”

স্বামিজীর দেহত্যাগের কিছুকাল পর পণ্ডিত দেউস্কর তাঁহার সাক্ষাৎকারের কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, স্বামিজীর ঐ গভীর সমবেদনাময় উক্তি তাঁহার মর্মে চিরন্তন ভাবে জাগ্রত রহিয়াছে। সেইদিন হইতে তিনি বুঝিয়াছেন যে প্রকৃত স্বদেশপ্রেম কাহাকে বলে। পণ্ডিতজীর পরবর্তীকালে রচিত স্বদেশী-যুগের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘দেশের কথা’ (যাহা ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল) এই প্রেরণা হইতেই লিখিত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা কঠিন নহে।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রচার ও গঠনমূলক কাজ স্বামিজীর উৎসাহে ক্রমে বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্তি স্বামী সারদানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী প্রচারকদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্বামী অভেদানন্দের বেদান্ত প্রচারকার্য ভালই চলিতেছিল। মাদ্রাজ,

কলিকাতা এবং আলমোড়ার মায়াবতী মঠ হইতে কর্ম-পরিণত বেদান্তের ও ধর্মের সার্বভৌমিক আদর্শের, নর-নারায়ণ সেবার বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল। যে উৎসাহ ও বিশ্বাস লাভ করিলে শক্তিহীন দুর্বলও মহৎ কর্ম করিতে পারে, তাহার অক্ষয় ভাণ্ডারস্বরূপ বিবেকানন্দ সত্যই পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনের সামর্থ্য দিতে পারিতেন। তিনি জানিতেন, এই প্রচারশীল হিন্দুধর্মের নব অভ্যুদয়কে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল সমাজের উগ্র প্রতিকূলতা হইতে রক্ষা করিতে হইলে, কুসংস্কার ও লোকাচারের সহিত সংগ্রামের পথই বাছিয়া লইতে হইবে এবং তাহার জন্য শক্তিমান আত্মবিশ্বাসী কর্মীর আবশ্যক। গুরুভ্রাতাগণসহ তিনি নবীন সন্ন্যাসীদিগকে সংগ্রামকুশল সৈনিকরূপেই গঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ যাহাতে দেশাচার লোকাচারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, অকপটে সত্য প্রচার করেন, সামাজিক কুরীতিগুলির সহিত আপোষ না করেন, সেদিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। একদিন জন্মগত অধিকারবাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামিজী ঐ শ্রেণীর অযৌক্তিক মতবাদের তীব্র নিন্দা করিয়া দেখাইলেন, কি ভাবে উহা দ্বারা বর্তমান সমাজের দুর্গতি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক কিংবা দার্শনিক ব্যাখ্যা দ্বারা বৈষম্য ও ভেদবাদের কদাচারগুলি সমর্থনের তিনি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধতা করিয়া কহিলেন,—"না, আপোষ নহে, চূনকাম নহে, গলিত শবদেহকে ফুল দিয়া ঢাকিয়ো না। * * অতি নিন্দার্হ কাপুরুষতা হইতে আপোষ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। সাহস অবলম্বন কর। হে আমার প্রিয় সন্তানগণ, সর্বোপরি তোমরা সাহসী হও। কোন কারণেই আপোষ করিতে যাইয়ো না। চরম সত্য প্রচার কর। লোকসমাজের শ্রদ্ধালাভ করিবে না, অথবা অবাঞ্ছনীয় কলহের কারণ ঘটিবে বলিয়া ভীত হইয়ো না। সত্য গোপন না করিয়া যদি তুমি সর্বান্তঃকরণে সত্যের সেবা কর, তাহা হইলে তুমি এমন ঐশী শক্তি লাভ করিবে, যে শক্তির সম্মুখে, তুমি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর না, এমন কথা বলিতে লোকে কম্পিত হইবে। চতুর্দশ বর্ষ কায়-মন-প্রাণে সত্যের সেবা করিলে, লোকে তোমার কথা বিশ্বাস করিবে। কেবল এই উপায়েই তুমি জনসাধারণের কল্যাণ করিতে পার, তাহাদের বন্ধন মোচন করিতে পার এবং সমগ্র জাতিকে উন্নত করিতে পার।"

ইতোপূর্বে ১৬ই ডিসেম্বর স্বামিজী দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ও আমেরিকা গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে গ্রীষ্মাগমে সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে আশা করিয়া বন্ধুবর্গ ও চিকিৎসকগণ একবাক্যে তাঁহাকে যাত্রার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ২০শে জুন স্বামিজীর ইংলণ্ড যাত্রার দিন নির্ধারিত হইল। স্বামী তুরিয়ানন্দ, স্বামিজীর সাগ্রহ অনুরোধে তাঁহার সঙ্গী হইতে প্রস্তুত হইলেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের আবশ্যক কার্যে সিস্টার নিবেদিতাও ইংলণ্ড গমনের সংকল্প প্রকাশ করিলেন।

বাল্যকাল হইতে কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রতাবলম্বী সংযতমনা যোগী স্বামী তুরিয়ানন্দ, সাধারণে ধর্মপ্রচাররূপে বক্তৃতা প্রদান করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু বিবেকানন্দের সর্বজয়ী প্রীতির নিকট তাঁহার সমস্ত প্রকার আপত্তি ভাসিয়া গেল। স্বামী তুরিয়ানন্দজীর আমেরিকাগমনের কথা ঠিক হইয়া গেলে, তিনি প্রচারকার্যের সুবিধা হইবে বিবেচনায়, বেদান্তদর্শন সম্বন্ধীয় কয়েকখানি সংস্কৃত পুঁথি সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। আচার্যদেব সস্নেহহাস্যে কহিলেন, "শাস্ত্রজ্ঞান ও পুঁথি তা'রা অনেক দেখেছে! তা'রা ক্ষত্রিয়শক্তি যথেষ্ট প্রত্যক্ষ করেছে, আমি তা'দের যথার্থ ব্রাহ্মণ দেখাতে চাই!" অর্থাৎ তর্ক, যুক্তি, নির্ভীক বাদানুবাদ, বক্তৃতা ইত্যাদি

রজঃশক্তির বিকাশ পাশ্চাত্যজগৎ স্বামিজীর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছে। এক্ষণে তিনি সত্ত্বগুণাত্মক ধ্যান, তপস্যা, সাধনা ইত্যাদির সমবায়ে গঠিত প্রকৃত ব্রাহ্মণের পবিত্র জীবন তাঁহাদিগের সম্মুখে আদর্শরূপে স্থাপন করিতে চান।

১৯শে জুন স্বামিজী ও স্বামী তুরিয়ানন্দকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য বেলুড় মঠে একটি ক্ষুদ্র সভার অনুষ্ঠান হইল। স্বামিজী 'সন্ন্যাসীর আদর্শ ও তাহার সাধন' সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করিলেন। অতিমাত্রায় উচ্চ আদর্শ জাতিকে হীন ও দুর্বল করিয়া ফেলে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসংস্কারকগণের অনুবর্তী প্রবল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়সমূহের উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া স্বামিজী উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তাই তিনি নবযুগের সন্ন্যাসিবৃন্দকে আদর্শ বুঝাইতে গিয়া বলিলেন—

(১) সাধারণ লোক বাঁচিতে ভালবাসে, তোমাদিগকে মৃত্যুকে ভালবাসিতে হইবে। মৃত্যুকে ভালবাসা অর্থ, পরকল্যাণ কামনায় সতত আত্মবিসর্জন করিতে প্রস্তুত থাকা।

(২) গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করা রূপ প্রাচীন আদর্শের বর্তমান কালে আর প্রয়োজন নাই। শ্রেয়ঃপন্থায় দণ্ডয়মান হইয়া প্রত্যেক মানবভ্রাতাকেই মুক্তির জন্য সাহায্য করিতে হইবে।

(৩) গভীর ভাবপরায়ণতা ও প্রবল কর্মশীলতার সমবায়ে জীবন গঠন করিতে হইবে। তোমরা সতত গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, আবার পর মুহূর্তেই মঠসংলগ্ন ভূমি কর্ষণ করিতেও দ্বিধাবোধ করিবে না। শাস্ত্রের কঠিন সমস্যাগুলির মীমাংসাও করিবে, আবার মঠের জমিতে উৎপন্ন শস্য বাজারে বিক্রয় করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিবে।

(৪) তোমাদিগের প্রত্যেককেই স্মরণ রাখিতে হইবে, এই মঠের উদ্দেশ্য—মানুষ প্রস্তুত করা! রমণীসুলভ, কোমলহৃদয়, অথচ শক্তিমান ও বলীয়ান, সর্বতোমুখী স্বাধীনতাপ্রিয়, অথচ বিনীত আজ্ঞাবহ—ইহাই মানুষের লক্ষণ! পরের দুঃখে অশ্রুবিসর্জন করিতে হইবে, অথচ দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে।

হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও উচ্ছৃঙ্খল অবাধ্যতাই ব্যক্তিবিশেষকে গণ্ডিবদ্ধ সম্প্রদায় গঠনে উৎসাহ প্রদান করে। ইহা বুঝিয়া স্বামিজী নবপ্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসিসংঘকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, "এখানে অবাধ্যগণের স্থান নাই। যদি কেহ অবাধ্য হয়, তাহাকে মমতারহিত হইয়া দূর করিয়া দাও, বিশ্বাসঘাতক কেহ না থাকে! বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও অবাধগতি হও, অথচ এই লতা ও কুক্কুরের ন্যায় নম্র ও আজ্ঞাবহ হও।"

সপ্তম অধ্যায়

মানবমিত্র বিবেকানন্দ

> “যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টানদের অনন্ত নরক ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি।”
>
> —বিবেকানন্দ

১৮৯৯ সালের ২০শে জুন। প্রভাতে বেলুড় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া স্বামিজী গুরুভাইদের সহিত বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার আলয়ে আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তজননী সন্ন্যাসী সন্তানদিগকে পরিতোষ সহকারে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া সুখী হইলেন। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমার পদধূলি ও আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া, ভক্ত ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া স্বামিজী ভাগীরথীতীরে ‘প্রিন্‌সেপ ঘাটে’ উপস্থিত হইলেন। বন্ধু শিষ্য ও জনমণ্ডলীর বিদায়াভিনন্দন হাস্যমুখে গ্রহণ করিয়া স্বামিজী ‘গোলকুণ্ডা’ জাহাজে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনে সুপণ্ডিত, মহাযোগী স্বামী তুরিয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা।

ছয় বৎসর পূর্বে যে বলিষ্ঠদেহ বিবেকানন্দ অকুতোভয় দুঃসাহসে অপরিচিত পাশ্চাত্যভূমিতে যাত্রা করিয়াছিলেন, আজিকার বিবেকানন্দ তাহা হইতে কত পৃথক। দুই বৎসরের অতিরিক্ত শ্রম ও রোগে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; তিনি বুঝিতেছেন, দেহপাতের আর বিলম্ব নাই। দেহ জীর্ণ, কিন্তু শীর্ণ কোষের মধ্যে, উজ্জ্বল প্রভাতময় নির্মল তরবারির মত আত্মা আপন ঋজু মহিমায় তীক্ষ্ণ! মনুষ্যত্ব ও মাতৃভূমির সেবক যাত্রার পূর্বে বলিলেন, “* * * জীবন-সংগ্রাম! রণক্ষেত্রেই আমার মৃত্যু হউক। দুই বৎসরের শারীরিক রোগযন্ত্রণা আমার বিশ বৎসর পরমায়ু হরণ করিয়াছে, কিন্তু আত্মা অপরিবর্তিত, অম্লান।”

দেহ দুর্বল, উৎসাহের অন্ত নাই। রামকৃষ্ণ মিশনের নবপ্রতিষ্ঠিত মুখপত্র ‘উদ্বোধনে’র জন্য পরিব্রাজকের রোজনামচা লিখিতেছেন। ভ্রমণকাহিনীর সহিত মানব-সভ্যতা বিবর্তনের ইতিহাস! ‘গোলকুণ্ডা’ চোরাবালু এড়াইয়া সন্তর্পণে চলিয়াছে, আর স্বদেশপ্রেমিক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী গঙ্গার দুই তীরে বাঙ্গলার রূপ দুই চক্ষু ভরিয়া পান করিতেছেন। ভাবে বিভোর হইয়া লিখিতেছেন,—“আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাই বোন ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্তশষ্পশ্যামলা সহস্র স্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গলাদেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ কিছু আছে মালয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে।

“জলে কি আর রূপ নেই? জলে জলময়; মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ। এতে কি রূপ নেই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের

মুখ দিয়ে গঙ্গায় না প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ সোনালী কিনারদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌চে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি-ঢালা আম লিচু জাম কাঁঠাল,—পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না।

"আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্‌চে দুল্‌চে, আর সকলের নীচে, যার কাছে, ইয়ারকান্দী, ইরাণী, তুর্কীস্থানী গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়,—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছেঁটে ঠিক করে রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস। গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্ছে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি? যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?

"হুঁ, বলি এইবার গঙ্গামার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠ্‌বেন ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি খেলা কর্‌ছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধা বোট। আর ঐ তাল তমাল আম লিচুর রঙ, নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে, পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিম্‌নি!!!"

জাহাজ ক্রমে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিল। "কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীল জল তরঙ্গায়িত ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচছে। পিছনে আমাদের গঙ্গাজল; সেই বিভূতিভূষণা, সেই 'গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।' * * এবার খালি নীলাম্বু; সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গশোভা, নীল পট্টবাস পরিধান।"

২৪শে জুন জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরে উপনীত হইল। স্বামিজীর কলিকাতা পরিত্যাগের সংবাদ যথাসময়ে মাদ্রাজের ভক্তগণকে তারযোগে জানান হইয়াছিল। কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ তখন প্রশমিত হইলেও "plague regulation"-এর নিয়মানুযায়ী কলিকাতা হইতে আগত কোন ভারতীয় যাত্রীর মাদ্রাজে অবতরণ নিষিদ্ধই ছিল। ঐ আইনের বলে রাজকর্মচারিগণ স্বামিজীর মাদ্রাজে শুভপদার্পণে বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন আশঙ্কায় মাদ্রাজ সহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ মিলিত হইয়া মাননীয় পি. আনন্দ চার্লুর নেতৃত্বে এক বিরাট সভা আহ্বান করিলেন। সভার পক্ষ হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধপত্র প্রেরিত হইল। সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, কয়েক ঘণ্টার জন্য স্বামিজীকে মাদ্রাজ সহরে প্রবেশ করিতে দিতে কর্তৃপক্ষ আপত্তি করিবেন না; কিন্তু ফলে দেখা গেল, বহু বিলম্বে স্বাস্থ্য-বিভাগের বড়কর্তা আদেশ দিলেন যে, স্বামিজীকে অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে না। বিবেকানন্দের প্রতি ভারতীয় শাসনকর্তারা মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কাশ্মীরে মঠ নির্মাণে বাধা দিয়া তত্রত্য ইংরেজ

রেসিডেণ্ট মিঃ ট্যাবট্ যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষের মনোভাবও তাহার অনুরূপ। স্বামী বিবেকানন্দ তাহাদের নিকট পরাধীন 'কালা আদমী' ছাড়া বিশেষ কিছুই নহেন!

রবিবার দিন প্রভাতে 'গোলকুণ্ডা' আসিয়া মাদ্রাজ বন্দরে নোঙ্গর করিল। সহস্র সহস্র উৎসুক দর্শক জেটিতে সমবেত হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন তাঁহারা সুনিশ্চিতরূপে বুঝিলেন যে, স্বামিজীকে কিছুতেই বন্দরে অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে না, তখন অনেকেই বিরক্তি-বিকৃত-চিত্তে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিলেন, কেহ কেহ প্রবল আগ্রহবশে নৌকা ভাড়া করিয়া জাহাজের সমীপস্থ হইয়া স্বামিজীর পুণ্যদর্শন লাভ করিলেন। স্বামিজী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া হাস্যোজ্জ্বল বদনে প্রত্যেককেই আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন ভক্তের প্রদত্ত নারিকেল ইত্যাদি ফল আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। মাদ্রাজে অবতরণ করিতে না পারিয়া স্বামিজীও অন্যান্যের মত দুঃখিত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

এই ঘটনা লইয়া, বৃটিশ আমলের কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি ব্যবহার এবং ফেরঙ্গ ভাবাপন্ন ভারতবাসীদের বিকৃত রুচি সম্পর্কে স্বামিজী যে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়াছিলেন, তাহা 'পরিব্রাজক' হইতে উদ্ধৃত করিলাম, "এবার আমরা যখন আসি, তখন জাহাজ কোম্পানী প্লেগের ভয়ে কালা আদমী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে যে, কোন কালা আদমী এমিগ্রাণ্ট আপিসের সার্টিফিকেট ছাড়া বাইরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্ছি, কেউ আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও বেচবার জন্য বা কুলি করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে না, এইটি তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় নিলে। এই আইন এতদিন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এখন প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে, অর্থাৎ যে কেউ 'নেটিভ' বাইরে যাচ্ছে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমাদের দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত, অমুক ছোট জাত। সরকারের কাছে সব নেটিভ্। মহারাজা রাজা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সব একজাত—'নেটিভ্'। কুলির যে আইন, কুলির যে পরীক্ষা, তা সকল 'নেটিভের' জন্য—ধন্য ইংরেজ সরকার! এক ক্ষণের জন্যও তোমার কৃপায় সব 'নেটিভের' সঙ্গে সমত্ব বোধ করলাম।

"* * * সব 'নেটিভ', সরকার বলছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁছ কম বেশী বোঝা যায় না; সরকার বলছেন, ওসব নেটিভ্। সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বল? ও টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ হিন্দুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁসে দাঁড়াতে গেলে, লাথি ঝাঁটার চোট্‌টা বেশী বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরেজ রাজ! তোমার ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ তো হয়েছেই, আরো হোক, আরো হোক। কপ্‌নি, ধুতির টুকরো পরে বাঁচি। তোমার কৃপায়, শুধু পায়ে, শুধু মাথায় হিল্লি দিল্লী যাই, তোমার দয়ায় হাত-চুবড়ে সপাসপ ডালভাত খাই। দিশী সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশী কাপড় ছাড়লেই, দিশী ধর্ম ছাড়লেই, দিশী চালচলন ছাড়লেই, ইংরেজ রাজা মাথায় কোরে নাকি নাচবে শুনেছিলুম। কতেই যাই আর কি, এমন সময় গোরা-পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ,—পালা পালা, সাহেবীতে কাম নেই, নেটিভ কবলা! 'সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।' ধন্য ইংরেজ সরকার, তোমার তকং তাজ অটল রাজধানী হউক'।"

‘ব্রহ্মবাদিন্’ পত্রিকা পরিচালনা সম্বন্ধে স্বামিজীর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য এবং শ্রীগুরুর পুণ্যসঙ্গে কয়েকদিন অতিবাহিত করিবার আগ্রহে কর্মযোগী আলাসিঙ্গা পেরুমল মাদ্রাজ হইতে কলম্বো যাত্রার জন্য ষ্টিমারে আরোহণ করিলেন। ষ্টিমার মাদ্রাজ বন্দর পরিত্যাগ করিয়া চার দিবস পরে কলম্বোতে উপনীত হইল।

জয়ধ্বনি-মুখরিত সমুদ্রতীরে অবতরণ করিবামাত্র স্বামিজী সহস্র সহস্র উৎসুক নরনারী কর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। সুখের কথা, কলম্বোর কর্তারা আর প্লেগ আইনের জবরদস্তী দেখাইয়া নীচ মনের পরিচয় দেন নাই। স্যার কুমারস্বামী ও মিঃ অরুণাচলমকে জনতার মধ্যে উপস্থিত দেখিয়া স্বামিজী সমধিক হৃষ্ট হইলেন। পুরাতন বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলীর সহিত সময়োচিত আলাপ ও সাদরসম্ভাষণান্তে স্বামিজী স্থানীয় মিসেস্ হিগিন্স প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ-বালিকা-বিদ্যালয়ের বোর্ডিং ও তাঁহার পূর্ব পরিচিত কাউণ্টেস্ ক্যানোভারার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ও মঠ পরিদর্শন করিলেন।

২৮শে জুন প্রভাতে জাহাজ কলম্বো পরিত্যাগ করিয়া এডেন অভিমুখে যাত্রা করিল। শ্রীগুরুর সহিত দীর্ঘ ছয় সপ্তাহকালব্যাপী সমুদ্রযাত্রাটি ভগিনী নিবেদিতা পরম শিক্ষার দিক হইতে আনন্দে বরণ করিয়া লইলেন। ভারতীয় রীতিনীতি ধর্ম দর্শন সাহিত্য ইতিহাস ইত্যাদি আলোচনার মধ্য দিয়া নিবেদিতা তাঁহার জগদেকারাধ্য গুরুদেবের জীবনোদ্দেশ্য ও তৎপ্রচারিত সত্যসমূহকে সর্বদাই শ্রদ্ধামুগ্ধহৃদয় লইয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন। এইকালের কতকগুলি অমূল্য কথোপকথন তিনি তাঁহার ‘My Master As I Saw Him’ নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গুরুদেবের সহিত ‘অর্ধ পৃথিবী অতিক্রমের’ গৌরবময় অধিকারলাভকে তিনি তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও এইকালে গম্ভীর ও উদাসীন বিবেকানন্দ বাহ্যজগতের ঘটনা-বৈচিত্র্য হইতে একরূপ অবসর গ্রহণ করিয়া আত্মস্থ যোগীর ন্যায় ভাবানন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতেই অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তথাপি তাঁহার সহিত মিশিবার ক্ষুদ্রতম সুযোগটি কোনদিন নিবেদিতা উপেক্ষা করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, “এই সমুদ্রযাত্রার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নানাবিধ ভাব ও গল্পের অবিরাম স্রোত চলিয়াছিল। কেহই জানিত না, কোন্ মুহূর্তে সহসা স্বামিজীর উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং জ্বলন্ত ভাষায় নূতন নূতন সত্যের বার্তা আমরা শুনিতে পাইব। সমুদ্রযাত্রার প্রারম্ভে প্রথমদিন অপরাহ্নে আমরা ভাগীরথী-বক্ষে জাহাজে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় স্বামিজী সহসা বলিয়া উঠিলেন, ‘দেখ, যতই দিন যাইতেছে, ততই আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি, মনুষ্যত্বলাভই (manliness) জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এই অভিনব বার্তাই আমি জগতে প্রচার করিতেছি! যদি অন্যায়কর্ম করিতে হয়, তবে তাহাও মানুষের মত কর। যদি দুষ্টই হইতে হয়, তবে একটা বড় রকমের দুষ্ট হও’।”

আচার্যদেব যদিও অধিকাংশ সময় মৌনভাবে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, তথাপি সময় সময় একরূপ অজ্ঞাতসারেই স্বীয় শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও অনুভূতিগুলি ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন; এমন দুই একটি কথাও বলিয়া ফেলিতেন, যাহার লৌকিক যুক্তিপূর্ণ কোন হেতু খুঁজিয়া বাহির করা অতীব দুরূহ ব্যাপার।

একদিন স্বামিজী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া সূর্যাস্ত দেখিতেছেন। পার্শ্বে নিবেদিতা। তখনও সূর্যদেব অস্তমিত হন নাই, পীতাভ-রক্তিম-রশ্মিমালা

লঘুমেঘখণ্ডগুলির উপর সোনালী স্বপনের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিম্নে বিশাল জলধির বক্ষে তাহার মনোরম প্রতিচ্ছবিখানি মৃদুতরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া কাঁপিতেছে। অদূরে এট্‌না আগ্নেয়গিরিশিখর হইতে অল্প অল্প ধূম নির্গত হইতেছে। ক্রমে জাহাজ মেসিনা প্রণালীতে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রোদয় হইল। স্বামিজী ডেকের উপর পাদচারণা করিতে করিতে সিস্টারকে সৌন্দর্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন। বহির্জগতে সৌন্দর্যের যে বিকাশ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, তাহা যে আমাদের মনের মধ্যেই বর্তমান, বাহিরে উহার কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা বুঝাইতে বুঝাইতে আত্মমগ্ন আচার্যদেব নীরব হইলেন। ইতালীর উপকূলের ধূসরবর্ণ পাহাড়গুলি উপেক্ষাবিমিশ্র ভ্রূকুটীভঙ্গে গর্বোন্নত শির তুলিয়া দণ্ডায়মান। অপর পার্শ্বে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকস্নাতা হাস্যময়ী সিসিলি দ্বীপ, এ অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে স্বামিজী সহসা বলিয়া উঠিলেন, "মেসিনা আমাকে ধন্যবাদ দিবে, কারণ আমিই তাহাকে এই অতুল সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছি।" পরক্ষণেই স্বামিজী তাঁহার বাল্যজীবনের ভগবল্লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা ও কঠোর সাধনার কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পূর্বেই উচ্চতম-অনুভূতিপ্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অজ্ঞাতসারে তিনি যে কথাটি সহসা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, যেন তাহা শিষ্যকে ভুলাইয়া দিবার জন্যই জ্ঞাতসারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক সময় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ভাবমুখে এইরূপ অনেক কথা বাহির হইয়া পড়িত, যাহার জন্য পরমুহূর্তেই তিনি অপ্রস্তুত হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিতেন।

আর একদিন প্রভাতে জাহাজ যখন জিব্রালটার প্রণালীর মধ্য দিয়া চলিতেছিল, স্বামিজী ডেকের উপর আত্মমগ্ন হইয়া মূর্তির মত দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় নিবেদিতা তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আচার্যদেব তীরভূমি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি তাহাদের দেখ নাই? তুমি কি তাহাদের দেখ নাই, তীরে অবতরণ করিয়া তাহারা 'দীন্ দীন্' (বিশ্বাস, বিশ্বাস) ধ্বনিতে দিক্ মুখরিত করিতেছে!" এই কথা বলিয়া স্বামিজী ভাবাবেগে অর্ধঘণ্টা কাল ধরিয়া ইসলাম পতাকাবাহী আরব বীরগণের স্পেন-বিজয় কাহিনী বর্ণনা করিলেন।

নিবেদিতা যত্নসহকারে আচার্যদেবের অমূল্য উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেই ক্ষীর-ভবানীর মন্দিরের দৈববাণী, জগন্মাতার স্নেহকরুণ মৃদু ভর্ৎসনা তাঁহার চরিত্রে বিচিত্র পরিবর্তন আনিয়া দিলেও, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভারতের কল্যাণচিন্তা হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিরত হন নাই। ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীগুলির আলোচনা আরম্ভ হইলেই তাঁহার ভাবমুগ্ধ হৃদয় বর্তমান শোচনীয় অধঃপতনের নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃশ্যগুলি যেন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইত। গভীর শ্রদ্ধার সহিত তিনি একটা মহিমাসমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে জীবন্ত বাস্তবরূপে চিত্রিত করিয়া তুলিতেন; আর এইখানেই আমরা তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাব অধিকতর সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকি। ভারতের উত্থান-পতনের ইতিহাস ও জগদ্ধিতায় আবির্ভূত মহাপুরুষগণের জীবন ও বাণীর মধ্যে তিনি জাতীয়-জীবনের মূল উদ্দেশ্যের একটা ঘাত-প্রতিঘাতময় বিকাশ সর্বদাই উপলব্ধি করিতেন। তিনি বলিতেন, ইদানীং "বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে! এই স্বল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন-চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তিসংগ্রহরূপ প্রমাণবাহন শতসূর্য-

CC0. In Public Domain. Shri Shri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

জ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি-প্রতিঘাতী প্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষী উদ্ঘাটিত যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলপ্রদ, আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্ম-কাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়; তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিতেছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুলের নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটা-বল্কল, কাষায়-কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে।"

"একদিকে মিশনারী, অন্যদিকে ব্রাহ্ম কোলাহল;" "একদিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্যদিকে অস্থির ধৈর্যহীন, অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক;" এই ভাববিপ্লবসমুখ অ-ভাবের মধ্যে কেবল পশ্চিমের দিকে অহোরাত্র হাত পাতিয়া থাকিবার জন্য কি পৃথিবীর পূর্বদিকে আমাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল? এই সমস্যা দ্বারাই বিবেকানন্দের জীবন অন্তরে ও বাহিরে প্রবল ঝড়ে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ন্যায় আলোড়িত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের ঝড় পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সমুদ্রেই তরঙ্গ তুলিয়াছে। তথাপি কটিদেশ কৌপীনে আবৃত করিয়া এই চক্ষুষ্মান্ সন্ন্যাসী সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় তাঁহার দেশের মাটীর উপরই পূর্বাস্য হইয়া দণ্ডয়মান হইয়াছিলেন। জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি বিদ্রোহ করিয়া পরের নকল করিয়া যে একটি জাতির অভ্যুদয় হইতে পারে না, ইহা বিবেকানন্দই অতি দুঃসাহসের সহিত প্রথম আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন। জাতির স্বভাবধর্ম হইতে, স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ফেরঙ্গ শিক্ষা-দীক্ষার অসংযত আস্ফালন, ইহা কি অভিব্যক্তি? ইহা অনুকরণ, ইহা আত্মবিস্মরণ, ইহা জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে অতি জঘন্য ব্যভিচার। আর এই ব্যভিচারের প্রতিকার নির্দেশ করিতে গিয়া আচার্যদেব সময় সময় তাঁহার জীবনের মহান্ উদ্দেশ্যের বিষয় উৎসাহোদ্দীপ্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতেন। সিস্টার নিবেদিতা তন্ময় হইয়া সেই সুযোগে স্বীয় গুরুর ধারণা, আশা ও আকাঙ্ক্ষাগুলি শ্রবণ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, অদূর ভবিষ্যতে যে অসংখ মহাপ্রাণ জ্ঞানী ও কর্মী জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেকানন্দের স্বপ্নগুলি কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিবে, তাহাদিগের ও স্বামিজীর মধ্যে তিনি 'বার্তাবাহী (Transmitter) বা সেতু' রূপে নিত্যকাল বিরাজমান থাকিবার গৌরবময় অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই দূরপ্রসারী দায়িত্ববোধের প্রেরণায় একদিন নিবেদিতা স্বামিজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভারতের কল্যাণকল্পে তিনি যে সকল উপায় নির্ধারণ করেন, তাহার সহিত অপরাপর ভারতহিতৈষিগণের প্রচারিত আদর্শের প্রত্যক্ষভাবে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিবেদিতা জানিতেন যে, এইপ্রকার সোজাসুজি প্রশ্ন করিয়া বিবেকানন্দের মনের কথা টানিয়া বাহির করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী যখন ভিন্নমতাবলম্বী নেতাগণের কার্যপ্রণালীর প্রতিকূল সমালোচনা করা দূরে থাক্, বরং তাঁহাদের চরিত্র ও উদ্যমের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাই করিতে লাগিলেন, তখন বিস্মিতা নিবেদিতা আর ঐ বিষয়ে স্বামিজীর মতামত জানিবার জন্য তাঁহাকে বিরক্ত করা সংগত মনে করিলেন না। সহসা

সন্ধ্যার সময় স্বামিজী ঐ প্রসঙ্গ পুনরুত্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন, “যাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত কুসংস্কারগুলি আমার স্বদেশবাসীর মধ্যে চালাইয়া দিতে চাহে, আমি সর্বান্তঃকরণে তাহাদিগের তীব্র প্রতিবাদ করি। মিশরদেশের পুরাতত্ত্বালোচনাকারিগণের মিশরদেশের প্রতি অনুরাগের ন্যায়, কাহারও কাহারও ভারতের প্রতি একটা স্বার্থজড়িত অনুরাগ থাকা বিচিত্র নহে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব শিক্ষা, কল্পনা ও পুস্তক-নিবন্ধ-ধারণার অনুকূলভাবে ভারতকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহে। আমার ইচ্ছা প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু গৌরবময়, তাহার সহিত বর্তমানযুগের ভাল জিনিসগুলি স্বাভাবিকভাবে একত্রীভূত হইয়া নবীন ভারত গড়িয়া উঠুক। আর এই উন্নতিমূলক গঠনব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে সর্বপ্রকার বহিঃশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া হওয়াই বাঞ্ছনীয়।”

প্রাচীন ও আধুনিকের এইরূপ সম্মিলন যে একটা অসম্ভব কাল্পনিক ব্যাপার নহে, তাহা নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তিনিই উহার পন্থাস্বরূপ—অদ্ভুত অহংজ্ঞানরহিত পন্থা!” বলিতে বলিতে স্বামিজী দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “তিনিই সেই অসাধারণ জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহার ব্যাখ্যাকার মাত্র।”

৩১শে জুলাই আচার্যদেব লন্ডনে পৌঁছিলেন। টিলবেরী ডকে অবতরণ করিয়া তিনি ইংরেজ শিষ্য ও শিষ্যাগণের মধ্যে দুইজন আমেরিকান শিষ্যাকে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। ইঁহারা সংবাদপত্রে স্বামিজীর ইংলন্ড আগমনের সংবাদ অবগত হইয়া গুরুদর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ডিট্রয়েট হইতে লন্ডনে আগমন করিয়াছিলেন। স্বামিজী লন্ডন হইতে কিয়দ্দূরে উইম্বলডন নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এবার স্বামিজী দর্শনার্থী জিজ্ঞাসুগণের সহিত ধর্মালোচনা করা ব্যতীত প্রকাশ্যভাবে কোন বক্তৃতা প্রদান করিলেন না। অবশেষে আমেরিকা হইতে পুনঃ পুনঃ আহূত হইয়া ১৬ই আগষ্ট গুরুভ্রাতা তুরিয়ানন্দ ও আমেরিকান শিষ্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন। এই সমুদ্র-যাত্রা প্রসঙ্গে স্বামিজীর শিষ্যা মিসেস্ ফাঙ্ক লিখিয়াছেন, “সমুদ্রবক্ষে এই দশটি দিনের স্মৃতি কখনও ভুলিবার নহে। প্রত্যহ প্রভাতে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত এবং কখনও সংস্কৃত কবিতা ও কাহিনীর আবৃত্তি ও অনুবাদ শ্রবণ করিতাম, কখনও বা প্রাচীন বৈদিক প্রার্থনা-মন্ত্রসমূহ পাঠ হইত। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, মনোহর চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি। একদিন গুরুদেব ডেকের উপর পাদচারণা করিতে করিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইতেছেন। শুভ্রজ্যোৎস্নাবিধৌত তাঁহার দীর্ঘ বরবপুখানি অতি মনোহর দেখাইতেছিল। এমন সময় সহসা দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘মায়ার রাজ্যের দৃশ্যাবলীই যদি এত সুন্দর হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, ইহার পশ্চাতে অবস্থিত সেই সত্যস্বরূপ কত সুন্দর!!’

“আর একদিন জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় তিনি নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী রজনীর উজ্জ্বল রূপরাশি, ঊর্ধ্বে স্বর্ণবর্ণ পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিল, তন্ময় হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন, ‘কবিতার সার সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে—কবিতা আবৃত্তি করিবার প্রয়োজন কি’?”

নিউইয়র্কে আচার্যদেব লিগেট্-দম্পতির অতিথি হইলেন। তাঁহাদের ভবনে কিয়ৎকাল যাপন করিয়া সেইদিন অপরাহ্নেই লিগেট-দম্পতির অনুরোধে গুরুভ্রাতা

তুরিয়ানন্দ সমভিব্যাহারে নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল দূরবর্তী তাঁহাদিগের পল্লীভবন ‘রিজ্‌লেম্যানর’ নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। স্বামিজীর দৈহিক অবস্থা দর্শনে সহৃদয় লিগেট-দম্পতি সহসা তাঁহাকে প্রচারকার্য আরম্ভ করিতে দিলেন না। ভগ্নদেহ কঠোর পরিশ্রমের ভার সহ্য করিতে পারিবে না আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা স্বামিজীর সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। একমাস পর নিবেদিতা ইংলণ্ড হইতে আসিলেন। এদিকে স্বামী অভেদানন্দজী প্রচারকার্যের জন্য অন্যত্র ছিলেন, কাজেই নিউইয়র্কে স্বামিজীর সহিত যথাসময়ে দেখা করিতে পারেন নাই, কয়েকদিন পর তিনিও তথায় আগমন করিলেন। স্বামিজী তাঁহার নিকট বেদান্ত-প্রচারকার্যের সাফল্যের সংবাদ ও নিউইয়র্কে ‘বেদান্ত-সমিতির’ একটি স্থায়ী বাটীর বন্দোবস্ত হইতেছে শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং গুরুভ্রাতার নিঃস্বার্থ উদ্যমের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। অভেদানন্দজী একদিবস পরেই বেদান্ত-সমিতিসংক্রান্ত কাজে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ১৫ই অক্টোবর বেদান্ত-সমিতির নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন করিয়া ২২শে তারিখ হইতে রীতিমত বক্তৃতা প্রদান ও প্রশ্নোত্তর-ক্লাসের কাজ চালাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, স্বামিজীর ভারতে অবস্থানকালীন স্বামী অভেদানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত প্রচারকার্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এদিকে স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে আসিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ৫ই নভেম্বর অতিথি-বৎসল লিগেট্‌-দম্পতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিবেদিতা ও স্বামী তুরিয়ানন্দজী সহ নিউইয়র্কে উপনীত হইলেন।

৮ই নভেম্বর বেদান্ত-সমিতি গৃহে আহূত প্রশ্নোত্তর-সভায় স্বামী বিবেকানন্দ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। স্বামী অভেদানন্দজী বেদান্ত-সমিতির নূতন সভ্যগণের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। শত শত উৎসুক নরনারীর আগ্রহপূর্ণ আবেদনে স্বামিজী স্বয়ং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। ১০ই নভেম্বর স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হইল। আচার্যদেব পুরাতন বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া আনন্দের সহিত উক্ত অভিনন্দন পত্রের সময়োচিত উত্তর প্রদান করিলেন।

স্বামী তুরিয়ানন্দজী অভেদানন্দজীর সহিত মিলিত হইয়া বেদান্ত-সমিতির কার্যভার গ্রহণ করিলেন। স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহার উদার ও সমুন্নত চরিত্রের প্রভাব জনসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিল। কয়েক সপ্তাহ পরেই তিনি আহূত হইয়া নিউইয়র্কের নিকটবর্তী মণ্ট ক্লেয়ার নামক স্থানে গমন করিলেন। ডিসেম্বর মাসে কেম্ব্রিজে বেদান্ত-প্রচারকার্যে তিনি সমধিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। ১০ই ডিসেম্বর কেম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্সের বন্দোবস্তানুযায়ী তিনি “শঙ্করাচার্য” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ও অন্যান্য বহু দার্শনিক ও ধর্মযাজক মনোযোগের সহিত নবাগত স্বামীর প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্বামী তুরিয়ানন্দও হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন আমেরিকান নরনারীগণ কর্তৃক অন্যতম আচার্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

বহু শিক্ষিত নরনারী, যাঁহারা বিবেকানন্দের পুস্তক ও বক্তৃতাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তিনি আমেরিকায় আগমন করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া দর্শনার্থী হইয়া তাঁহারা দলে দলে নিউইয়র্কে আগমন করিতে

লাগিলেন। স্বামিজীও নির্বিচারে ব্যক্তিমাত্রকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের উপদেশ দিতে কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। পুরাতন বন্ধুবান্ধব ও শিষ্য-শিষ্যাগণের সাগ্রহ আহ্বানে তিনি নিউইয়র্কের কাছাকাছি বোষ্টন, ডিট্রয়েট, ব্রুক্‌লীন প্রভৃতি সহর ঘুরিয়া আসিলেন। অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধুমণ্ডলীর সহিত দুই সপ্তাহকাল আনন্দের সহিত যাপন করিয়া স্বামিজী কালিফোর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রচারকার্যের দায়িত্ব তিনি পূর্ব হইতেই সুযোগ্য গুরুভ্রাতাদিগের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এইকালে সন্ন্যাসীর সর্বতোমুখী স্বাধীনতা তাঁহার আচার-ব্যবহারের মধ্যে এমন সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিত যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন তিনি বাহ্যজগতের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কালিফোর্ণিয়ার পথে স্বামিজীকে বাধ্য হইয়া শিকাগোয় অবতরণ করিতে হইল। বন্ধু ও ভক্তমণ্ডলীর শ্রদ্ধাপূর্ণ আকিঞ্চন তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। স্বামিজীর অভ্যর্থনার আয়োজনের কোন ত্রুটি হয় নাই। স্বামিজী কয়েকদিন শিকাগোয় অবস্থান করিয়া নূতন ও পুরাতন ভক্তমণ্ডলীর মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। অবশেষে তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কালিফোর্ণিয়ায় উপনীত হইলেন। ১৯০০ সালের জুন মাস হইতে ক্রমাগত সাতমাস কাল তিনি উক্ত প্রদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন।

স্বামিজী কালিফোর্ণিয়ার প্রধান নগরী লস্ এঞ্জেল্‌সে পদার্পণ করিবামাত্র মিসেস্ ব্লডগেট তাঁহাকে স্বালয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহার বন্ধু মিস্ ম্যাক্‌লিয়ডও তথায় পূর্ব হইতে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামিজীর আগমনের কয়েকদিন পরেই প্রত্যহ দলে দলে নরনারী তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। অনেকেই তাঁহার পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বিবেকানন্দ লস্ এঞ্জেল্‌সে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া দূর দূরান্তর হইতে তাঁহার নিকট সমাগত হইতে লাগিলেন। কালিফোর্ণিয়ার অন্যান্য নগরসমূহ হইতে প্রত্যহ সাগ্রহ আহ্বান আসিতে লাগিল। প্রত্যহ প্রভাতে ও অপরাহ্নে প্রশ্নোত্তরসভার অনুষ্ঠান বিরামহীনভাবে চলিতে লাগিল। অবশেষে সর্বসাধারণের একান্ত অনুরোধে তিনি পুনরায় বক্তৃতা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। ৮ই ডিসেম্বর 'ব্লাঙ্কার্ড হল' নামক সুপ্রশস্ত ভবনে সহস্রাধিক শ্রোতার সম্মুখে 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এইরূপে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত লস্ এঞ্জেল্‌সের বিভিন্নস্থানে তিনি ক্রমাগত কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এককথায় বলিতে গেলে প্রতিদিনই তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে স্থানীয় জলবায়ু স্বামিজীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূলই ছিল। অত্যধিক কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও তিনি পূর্বের ন্যায় শ্রান্ত হইয়া পড়িতেন না। বক্তৃতা ও কথোপকথন ব্যতীত প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কতিপয় অনুরাগী শিষ্য ও ছাত্রকে রাজযোগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। স্থানীয় "হোম অফ্ ট্রুথের" মেম্বরগণ স্বামিজীর প্রতি এত অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহারা স্বামিজীকে তাঁহাদের ভবনে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার দৈহিক অভাব ইত্যাদি পূরণের ভার গ্রহণ করিলেন। উক্ত সমিতির সভ্যবৃন্দের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া স্বামিজী আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামিজী দুইমাসের মধ্যেই কালিফোর্ণিয়ার প্রচারকার্যে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিলেন। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও নিঃস্বার্থ প্রচারকার্যের বার্তা প্রকাশিত হইতে লাগিল।

ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামিজী ওক্‌ল্যাণ্ডের সর্বপ্রধান ইউনিটেরিয়ান চার্চের ধর্মযাজক রেভারেণ্ড ডাক্তার বেঞ্জামিন ফে মিলসের আহ্বানে তথায় গমন করিলেন। উক্ত চার্চে স্বামিজী ক্রমাগত আটটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। প্রত্যহ প্রায় দুই সহস্র শ্রোতা আগ্রহের সহিত তাঁহার উদার ধর্মমত শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হইতেন। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ ও উদ্দেশ্য ইত্যাদির বিষয় প্রত্যহ আলোচিত হইতে লাগিল। এই সময় ডাক্তার মিলস্ কর্তৃক একটি ধর্মসভা (Congress of Religions) আহূত হইয়াছিল। কালিফোর্ণিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত শত শত মিশনরী ও ধর্মযাজক উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই আচার্যদেবের উদার ধর্মমত ও ধর্মসমন্বয়ের অপূর্ব বার্তা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বেঞ্জামিন স্বামিজীর উন্নত পবিত্র চরিত্রের মাধুর্যে ও অসীম আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, একদিন শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে স্বামিজীর পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

> "A man of gigantic intellect, indeed, one to whom our greatest university professors were as mere children."

মিসেস্ আনি বেশান্তের ভাষায় "এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্য-প্রচারকের অতুলনীয় আধ্যাত্মিক বার্তার মহিমার" কথা কালিফোর্ণিয়া প্রদেশের প্রতি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আলোচিত হইতে লাগিল। ওক্‌ল্যাণ্ড হইতে স্বামিজী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে সান্‌ফ্রান্সিস্কোয় পদার্পণ করিলেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ সমাগত দর্শনার্থিগণের সুবিধার জন্য টার্ক ষ্ট্রীটে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা তাঁহার আবাসস্থলরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কয়েকদিন পরেই স্বামিজী স্থানীয় 'গোল্ডেন গেট্ হলে' সহস্র সহস্র শ্রোতার সম্মুখে তাঁহার প্রথম ও সুপ্রসিদ্ধ "সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ" নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ জনতা একাগ্র আগ্রহে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত অমৃতমধুর সত্যের বাণী শ্রবণ করিল। বক্তৃতান্তে স্বামিজী আসন পরিগ্রহ করিলে সম্মিলিত জনতা উচ্চকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। সেই মুহূর্তে সকলেই যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, এই জগৎকল্যাণৈকসর্বস্ব মহাপুরুষ সত্য সত্যই ঈশ্বরের দূতরূপে মুক্তির অভিনব বার্তা বহন করিবার জন্যই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

মার্চ মাসে স্বামিজী কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণের আগ্রহে তাঁহাকে প্রায়ই "রাজযোগ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে হইত। স্বামিজীর এইকালে প্রদত্ত অমূল্য বক্তৃতাবলীর অধিকাংশই লিখিত হয় নাই। যদি গুরুভক্ত মিঃ গুডউইন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে স্বামিজীর শ্রীমুখোচ্চারিত সামান্য কথাটিও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ থাকিত।

প্রভাতে যোগশিক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষাপ্রদান, অপরাহ্ণে বক্তৃতা—স্বামিজীর বিশ্রামের অবকাশ অল্পই ছিল। কিন্তু কর্মের এই উচ্ছল কোলাহলের মধ্যেও সময় সময় তাঁহার অনাসক্ত মন এক 'অজ্ঞাত' 'অব্যক্ত' ভাবরাজ্যে ডুবিয়া যাইত। এইরূপ উচ্চভাবে অভিভূত হইয়া স্বামিজী তাঁহার বন্ধু মিস্ ম্যাক্‌লিয়ডকে ১৯০০ সালের ১৮ই এপ্রিল লিখিয়াছিলেন—"কর্ম করা সব সময়েই কঠিন।

আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা বন্ধ হ'য়ে যায়, আর আমার সমুদয় মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হ'য়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

"আমি ভাল আছি, মানসিক খুব ভাল আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি-স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী অনুভব কর্‌ছি। লড়াইয়ে হার-জিত দুই-ই হ'ল, পুট্‌লী-পাঁট্‌লা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় বসে আছি। 'অব শিব পার কর মেরে নাইয়া'—হে শিব, হে শিব! আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু!

"যতই যা' হোক্, জো, আমি এখন পূর্বের সেই বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক্ হ'য়ে শুন্‌তো আর বিভোর হ'য়ে যেতো। ঐ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি, আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা' কিছু করা গেছে, তা' ঐ প্রকৃতির উপরে কিছু-কালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র! আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুন্‌তে পাচ্ছি, সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! যা'তে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুল্‌ছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! যাই প্রভু যাই! ঐ তিনি বল্‌ছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক্‌গে, তুই ও সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছু পিছু চলে আয়!' যাই প্রভু যাই!

"হ্যাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি! আমার সামনে নির্বাণসমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময় সময় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তিসমুদ্র! মায়ার এতটুকু বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যা'র শান্তিভঙ্গ কর্‌ছে না!

"আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুসী আছি; এত যে দুঃখ ভুগেছি, তাতেও খুসী; জীবনে কখনও কখনও বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুসী। আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুসী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না, অথবা এমন বন্ধন আমিও কারও কাছ থেকে নিয়েও যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমাকে মুক্তি দিক্, অথবা দেহ থাক্‌তে থাক্‌তেই মুক্ত হই; সেই পুরানো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে, আর ফিরছে না। শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য চলে গেছে, পড়ে আছে কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!

"অনেক দিন হ'ল নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিয়েছি। কোন বিষয়েই 'এইটে আমার ইচ্ছা' বলবার আর অধিকার নেই। তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণরূপে গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার তাতেই গা ভাসান দিয়েছি। উপরে দিবাকর নির্মল কিরণ বিস্তার কর্‌ছেন, পৃথিবী চারদিকে শস্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিবসের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই এখন নিস্তব্ধ, স্থির শান্ত! আর আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর স্থির ভাবে নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিনীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি। এতটুকু হাত-পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙ্গতে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছে না, পাছে প্রাণের এ অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙ্গে যায়! প্রাণের এই শান্ত নিস্তব্ধতাটাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। পূর্বে আমার কর্মের

ভিতর মান-যশের ভাবও উঠত, আমার ভালবাসার মধ্যে ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বের স্পৃহা আসত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে, আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হ'য়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি! যাই মা, যাই মা, যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে, যেখানে তুমি নিয়ে যেতে চাচ্ছ, সেই 'অশব্দ অস্পর্শ' অজ্ঞাত অদ্ভুত রাজ্যে, অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই।”

পত্রখানি পাঠ করিলে পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষে কর্মযোগ প্রচারকারী বিবেকানন্দের পরিবর্তে ষোড়শ বৎসর পূর্বের শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে উপবিষ্ট বালক নরেন্দ্রনাথের কথাই আমাদের স্মৃতিপটে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে! মনে পড়ে সেই আকুল সমাধিতৃষ্ণা, সেই তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় 'জগদ্ধিতায়' কর্মে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা, শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনা, মৌন মিনতি, অসীম অনুকম্পা! এই মহাপুরুষের পবিত্র জীবনকাহিনী আলোচনা করিতে গিয়া আমরা বহুবার আচার্য, শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা বিবেকানন্দের অভ্যন্তরে এক মুক্তিকামী সন্ন্যাসীকে বারম্বার দেখিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, কর্মের উদ্দাম প্রেরণা. জগদ্ব্যাপী খ্যাতি সম্মান প্রতিপত্তির মধ্যে তাঁহার অনাসক্ত অন্তরপুরুষ এক নিরুদ্বিগ্ন প্রশান্তির মধ্যে আত্মস্থ হইয়া আছেন। কিন্তু এই পত্রের ভাষা স্বতন্ত্র—ইহা কর্মময় জীবনের পরম পরিণতির পূর্বাভাস!

এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে স্বামিজীর উৎসাহশীল শিষ্যগণ কালিফোর্ণিয়ার স্থানে স্থানে 'বেদান্ত-সমিতি' ও প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বেদান্ত প্রচার করিতে লাগিলেন। লস্ এঞ্জেল্স্ হইতে আহ্বান আসিল, কিন্তু সানফ্রান্সিস্কো ও তৎসান্নিধ্যবর্তী স্থানসমূহের আরব্ধকার্য সহসা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া স্বামিজীর মনঃপূত হইল না। অন্যতমা শিষ্যা মিসেস্ হেন্স্বরো দৃঢ় উদ্যমের সহিত লস্ এঞ্জেল্সে নিয়মিতরূপে বেদান্তক্লাসগুলি চালাইতে লাগিলেন। এদিকে সানফ্রান্সিস্কোর নবপ্রতিষ্ঠিত বেদান্তসমিতির প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার এম. এইচ. লোগান ও স্বামিজীর অন্যান্য কতিপয় শিষ্য-শিষ্যা বুঝিতে পারিলেন যে, শীঘ্রই তিনি অন্যত্র চলিয়া যাইবেন; অতএব এই সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী আচার্যের প্রয়োজন। তদনুসারে তাঁহারা স্বামিজীকে অনুরোধ করায় তিনি স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বামী তুরিয়ানন্দকে কালিফোর্ণিয়ায় আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত-সমিতির ভার তুরিয়ানন্দজীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দজী যুক্তরাজ্যের স্থানে স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন; কাজেই তিনি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তুরিয়ানন্দজী সানফ্রান্সিস্কো আসিতে পারিলেন না।

স্বামিজীর কালিফোর্ণিয়া ত্যাগের কিয়দ্দিবস পূর্বে মিস্ মিন্নি সি. বুক (Miss Minnie C. Boock) নাম্নী তাঁহার জনৈক ভক্তিমতি শিষ্যা একটি স্থায়ী মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ১৬০ একর পরিমিত এক সুবৃহৎ ভূমিখণ্ড প্রদান করিলেন। স্বামিজী আনন্দের সহিত এ দান গ্রহণ করিয়াছিলেন. পরে স্বামী তুরিয়ানন্দ গিয়া তথায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও স্বামিজীর জীবনকালেই এই 'শান্তি আশ্রম' প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু উহা তিনি পরিদর্শন করিতে পারেন নাই।

বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে স্বামিজী প্রচারকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 'ক্যাম্প টেইলর' নামক পল্লীতে বিশ্রামের জন্য গমন করিলেন। তিন সপ্তাহ পরে যদিও

তিনি সানফ্রান্সিস্কোতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া শিষ্যগণ তাঁহাকে বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন না। স্বামিজীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন চিকিৎসক ডাক্তার উইলিয়ম ফর্ষ্টার সর্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। অত্যধিক শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মে মাসের শেষভাগে স্বামিজী শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে ক্রমাগত চারিটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। নিয়মিত বক্তৃতাপ্রদান পরিত্যাগ করিলেও প্রত্যহ লোক-সমাগমের বিরাম ছিল না। বালকের মত পরিহাসপ্রিয় চপল চটুলবাক্যবিন্যাস-পটু বিবেকানন্দের মধুর চরিত্রে আকৃষ্ট না হইয়া থাকা সত্যই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। বন্ধুবৎসল, সরল, উদার, মহাজ্ঞানী বিবেকানন্দের চরিত্র-সমালোচনা প্রত্যহই স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে অবিশ্রান্ত প্রকাশিত হইত। সেগুলি একত্র করিলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। এস্থলে কেবলমাত্র 'প্যাসিফিক বেদান্তিন্' স্বামিজী সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব :—

"স্বামিজী সুগভীর ভাবদ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে স্পন্দিত করিয়াছেন, তাঁহার এই ভাবরাশি প্রলয়কাল পর্যন্ত সততই প্রতিধ্বনিত হইবে। তাঁহার সঙ্গে কি শিশু, কি ভিক্ষুক, রাজা কিংবা ক্রীতদাস অথবা বেশ্যা সকলেই সমান অধিকারের সহিত আলাপ করিতে পারে। তিনি বলেন, ইহারা সকলেই এক পরিবারের অন্তর্গত। আমি তাহাদের সকলের মধ্যে আমার আমিত্ব দেখিতে পাই এবং আমার মধ্যেও আমি তাহাদের স্বরূপ অনুভব করি। এই পৃথিবী এক পরিবারসদৃশ্য, যুগান্তপূর্ব ব্যাপিয়া সত্যস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রই বিরাজমান।"

মে মাসের শেষভাগে স্বামিজী লণ্ডন হইতে লিগেট-দম্পতির পত্র পাইলেন। তাঁহারা জুলাই মাসে প্যারিসে যাইবেন, স্বামিজীও যেন তথায় গিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হন। এদিকে প্যারী-প্রদর্শনীর ধর্মেতিহাস-সভার বৈদেশিক প্রতিনিধিগণের জন্য গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে স্বামিজী বক্তৃতা-প্রদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র পাইলেন। এই দুই কারণে তিনি কালিফোর্ণিয়ার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিউইয়র্কে উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে অবশ্য তাঁহাকে পুরাতন বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শিকাগো ও ডিট্রয়েটে অবতরণ করিতে হইয়াছিল।

নিউইয়র্কে আসিয়া তিনি 'বেদান্ত-সমিতি'র স্থায়ী ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। বক্তৃতাপ্রদান ও লোকশিক্ষা ইত্যাদি কার্যে তাঁহার আগ্রহ দেখা গেল না। তিনি সর্বদাই ব্যগ্রভাবে প্রাচীন বন্ধু, শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বেদান্ত-সমিতির কার্য উত্তমরূপে চলিতেছিল। বেদান্ত-সমিতির সর্বপ্রথম সভাপতি মিঃ লিগেট্ নানা কারণে পদ-ত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে সর্বসম্মতিক্রমে কলম্বিয়া কলেজের ডাক্তার হার্শেল পারকার নির্বাচিত হইলেন। স্বামী তুরিয়ানন্দ এপ্রিল মাস হইতে নিয়মিতরূপে বক্তৃতা প্রদান ও যোগশিক্ষা দান করিতেছিলেন। স্বামিজীও প্রত্যেক রবিবার গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন এবং স্বামী তুরিয়ানন্দজীকে সত্বর কালিফোর্ণিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

ইতোমধ্যে নিবেদিতা নিউইয়র্কে উপনীত হইলেন। বেদান্ত-সমিতির সভ্যগণের আগ্রহে তিনি শনিবার ও রবিবার অপরাহ্নে নিয়মিতরূপে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে

কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ১৭ই জুন তিনি ‘হিন্দুরমণীর জীবনাদর্শ” সম্বন্ধে একটি বিবিধ তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সেদিন সমিতির বক্তৃতা-কক্ষ নিউইয়র্কের শিক্ষিতা নারীবৃন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। সকলেই আগ্রহের সহিত ভারত-রমণীগণের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালী শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে সকলে কৌতূহলী হইয়া বহুক্ষণ যাবৎ সিস্টারকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পরবর্তী রবিবার সিস্টার ‘প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা’ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা করিলেন।

৩রা জুলাই স্বামিজী নিউইয়র্ক হইতে ডিট্রয়েটে গমন করিলেন। স্বামী তুরিয়ানন্দজীও তাঁহার ইচ্ছা ও সম্মতিক্রমে কালিফোর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। স্বামিজী গুরুভ্রাতাকে আশ্রম প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত উপদেশাদি প্রদান করিয়া বিদায়কালে গভীর-স্বরে বলিলেন, “যাও বীর! কালিফোর্ণিয়ায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর, বেদান্তের পতাকা উড্ডীন কর! অদ্য হইতে ভারতের চিন্তা স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিয়া দাও। আদর্শ জীবন যাপন কর, জগজ্জননীর কৃপায় কৃতকার্য হইবে।”

প্রায় সপ্তাহকাল অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে যাপন করিয়া স্বামিজী ১০ই জুলাই নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া ২০শে জুলাই তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্যারীতে স্বামিজী লিগেট্-দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই সময় মিসেস্ ওলি বুল, বৃটানি প্রদেশের লানিও নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন; তাঁহার সাগ্রহ আহ্বানে স্বামিজী অল্প কয়দিনের জন্য তথায় আগমন করিলেন। মিসেস্ বুলের আলয়ে, ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও লেখক মঁসিয়ে জুল বোওয়ার সহিত পরিচয় হইল। ইঁহার সহিত দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া স্বামিজী হৃষ্ট হইয়াছিলেন।

লিগেট-দম্পতি তাঁহাদের পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন অতিথির সর্ববিধ স্বচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ খ্যাতনামা দার্শনিক, সাহিত্যিক, চিত্রকর, ভাস্কর, ধর্মযাজক, বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের আলয়ে নিমন্ত্রিত হইতেন। প্যারীর বিরাট প্রদর্শনী ও ধর্মেতিহাসসভা উপলক্ষে বহু পণ্ডিত জগতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে সমবেত হইয়াছিলেন।

স্বামিজী লিখিয়াছেন, “কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ সমাবেশ, মিস্টার লিগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্বত-নির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত-ভাববিকাশ, মোহিনী-সঙ্গীত, মনীষী-মনঃ-সঙ্ঘর্ষমুত্থিত-চিন্তা-মন্থ-প্রবাহ, সকলকে দেশ কাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখ্তো!” (পরিব্রাজক)

উদার, পরমতসহিষ্ণু বন্ধুবৎসল বিবেকানন্দ সকলের সহিতই সমভাবে মিশিতেন এবং পরস্পরের সহিত ভাব ও চিন্তারাশি বিনিময় করিবার সঙ্গে সঙ্গে জগতের নিকট যে বার্তা বহন করিবার জন্য তিনি শ্রীগুরু কর্তৃক নিয়োজিত তাহা অসঙ্কোচে প্রচার করিতেন। জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ, দার্শনিক, কবি ও সাহিত্যিকগণকে অল্পবিস্তর বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত দেখিয়া স্বামিজী আনন্দিত হইলেন। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া অসমসাহসিক উদ্যমের সহিত তিনি বেদান্তপ্রচারে যে বিস্ময়াবহ পরিশ্রম করিয়াছেন, ইতোমধ্যেই তাহা ধীরে ধীরে প্রতিভাশালী মস্তিষ্কগুলিকে অভিভূত করিয়াছে ও করিতেছে। বিবেকানন্দ দেখিলেন, দুই একজন স্বীয় মৌলিকত্ব বজায় রাখিবার জন্য বেদান্তের

প্রভাব অস্বীকার করিলেও অধিকাংশ পণ্ডিতমণ্ডলীই পাশ্চাত্যজগতের আধুনিক সাহিত্য ও দর্শন যে ক্রমে ক্রমে বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন।

শিকাগো মহামেলার অনুকরণে প্যারী প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ধর্মমহাসভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল, কিন্তু রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রবলতম আপত্তিতে উহা হইতে পারে নাই। শিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায় অত্যন্ত উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ও ধারণা ছিল যে খৃষ্টানধর্ম জগতের নিকট শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে। এই বিশ্বাসে তাঁহারা ক্যাথলিকধর্মের মহিমা উচ্চকণ্ঠে জগতে ঘোষণা করিবার জন্য ধর্মমহাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু ফল অন্যরূপ হওয়ায় তাঁহারা সর্বজনীন ধর্মসভা আহ্বান বিষয়ে একান্ত উৎসাহহীন ও প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। গোঁড়া খৃষ্টানজগতে বিবেকানন্দ ও বেদান্তভীতি এত প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে ধর্মসভার প্রস্তাবে সকলে সমস্বরে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সের অধিকাংশ অধিবাসীই ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত এবং জনসাধারণের উপর পাদ্রীগণের প্রভাব নিতান্ত কম নহে! ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া ধর্মসভা আহ্বান করিতে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ সাহসী হইলেন না। অবশেষে ধর্মেতিহাস-সভা আহ্বান করাই স্থির হইল। “উক্ত সভায় অধ্যাত্মবিষয়ক এবং মতামত সম্বন্ধীয় কোন চর্চার স্থান ছিল না, কেবলমাত্র বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস অর্থাৎ তদঙ্গসর্কলের তথ্যানুসন্ধানই উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে, এই সভায় বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির একান্ত অভাব। এ সভায় জনকয়েক পণ্ডিত, যাঁহারা ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক চর্চা করেন, তাঁহারাই উপস্থিত ছিলেন।” (ভাববার কথা)

স্বামিজী উক্ত সভায় যথোচিত সম্মান সহকারে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতাদি প্রদান ও সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বয়ং লিখিয়া ‘উদ্বোধনে’ প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন। আমরা উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

“বৈদিকধর্ম—অগ্নি, সূর্যাদি প্রাকৃতিক বিস্ময়াবহ জড়বস্তুর আরাধনাসমুদ্ভূত, এইটি অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞের মত।

“স্বামী বিবেকানন্দ, উক্ত মত খন্ডন করিবার জন্য, প্যারী ধর্মেতিহাস-সভা কর্তৃক আহূত হইয়াছিলেন এবং তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতারয় তাঁহার প্রবন্ধ লেখা ঘটিয়া উঠে নাই, কোনোমতে সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন মাত্র। উপস্থিত হইলে ইউরোপ অঞ্চলের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, উঁহারা ইতোপূর্বেই স্বামিজীর রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

“সে সময় উক্ত সভায় ওপর্ট নামক একজন জর্মান পণ্ডিত শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি শালগ্রামের উৎপত্তি ‘যোনি চিহ্ন’ বলিয়া নির্ধারিত করেন। তাঁহার মতে শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিহ্ন এবং তদ্বৎ শালগ্রাম শিলা স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন। শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম উভয়ই লিঙ্গ-যোনি পূজার অঙ্গ।

“স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত মতদ্বয়ের খন্ডন করিয়া বলেন যে, শিবলিঙ্গের নরলিঙ্গতা-সম্বন্ধে অবিবেক মত প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু শালগ্রাম-সম্বন্ধে এ নবীন মত অতি আকস্মিক। স্বামিজী বলেন যে, শিবলিঙ্গ-পূজার উৎপত্তি অথর্ববেদ-সংহিতার যূপ-স্তম্ভের স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা

স্কম্ভের বর্ণনা আছে এবং উক্ত স্কম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে প্রকার যজ্ঞের অগ্নি, শিখা, ধূম, ভস্ম, সোমলতা ও যজ্ঞকাষ্ঠের বাহক বৃষ, মহাদেবের পিঙ্গলজটা, নীলকণ্ঠ, অঙ্গাকান্তি ও বাহনাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপস্কম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে। অথর্ববেদসংহিতায় তদ্বৎ যজ্ঞোচ্ছিষ্টেরও ব্রহ্মত্বমহিমা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"লিঙ্গাদি পুরাণে উক্ত স্তবকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা করিয়া মহাস্তম্ভের মহিমা ও মহাদেবের প্রাধান্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

*　　　　　*　　　　　*

"বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। স্তূপমধ্যস্থ শিলাকরণ্ডমধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের ভস্মাদি রক্ষিত হইত। তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রাম শিলা উক্ত অস্থিভস্মাদি রক্ষণশিলার প্রাকৃতিক প্রতিস্বরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধপূজিত হইয়া বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ করিয়াছে। অপিচ নর্মদাকূলে ও নেপালে বৌদ্ধপ্রাবল্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল। প্রাকৃতিক নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও নেপাল-প্রসূত শালগ্রামই যে বিশেষ সমাদৃত, ইহাও বিবেচ্য।

"শালগ্রাম সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা অতি অশ্রুতপূর্ব এবং প্রথম হইতেই অপ্রাসঙ্গিক; শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে অতি অর্বাচীন এবং উহা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ঘোর অবনতির সময়ে সংঘটিত হয়। ঐ সময়ের ঘোর বৌদ্ধতন্ত্রসকল এখনও নেপালে ও তিব্বতে খুব প্রচলিত।"

দ্বিতীয় বক্তৃতায় স্বামিজী ভারতীয় ধর্মমতের বিস্তার বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা করেন। বিশেষভাবে ভারতীয় সভ্যতা সাহিত্য দর্শন জ্যোতিষ ইত্যাদিতে গ্রীক্-প্রভাবের প্রতিবাদ করেন। কয়েকজন পণ্ডিত ভারতীয় সভ্যতার উপর গ্রীক্-প্রভাবের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন; স্বামিজী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপসংহারে বলিলেন যে, তাঁহারা যেন ধীরভাবে সংস্কৃত প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, উহাতে আদৌ গ্রীক্-প্রভাবের ছায়া নাই, বরং ইহা অনেকাংশে সত্য যে গ্রীক্গণই হিন্দুগণের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন।

প্যারী-প্রদর্শনী উপলক্ষে সমাগত বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহিত স্বামিজী পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বামিজীর বিশেষ বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মঁসিয়ে জুল্ বোওয়া, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর প্যাট্রিক গেডিস্, বিখ্যাত ক্যাথলিক পাদ্রী পেয়র্ ইয়াস্যাঁৎ, বিখ্যাত কামাননির্মাতা মিঃ হিরম্ ম্যাক্সিম্, ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা ম্যাডাম ক্যাল্‌ভে, সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রীকুল-সম্রাজ্ঞী সারা বার্ণহার্ড, প্রিন্সেস ডেমিডফ্ ও তাঁহার স্বদেশবাসী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশ বসু মহাশয়ের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য।

ডাক্তার বসুর সম্বন্ধে স্বামিজী গর্বের সহিত তাঁহার 'পরিব্রাজক' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"আজ ২৩শে অক্টোবর ও কাল সন্ধ্যার সময় প্যারী হ'তে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারী সভ্য-জগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিক্‌দেশ-সমাগত সজ্জন-সঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন, আজ এ প্যারীতে। মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে

সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জর্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করিলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! এক যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করিলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতীসাধ্বী, সর্বগুণসম্পন্না গেহিণী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!"

তিন মাস প্যারীতে যাপন করিয়া স্বামিজী সঙ্গিগণ সহ ২৪শে অক্টোবর পূর্ব-ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র প্যারী; গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দীক্ষাগুরু ফরাসী জাতির রাজধানী। এই নগরীর মনীষীদের চিন্তাধারায় সমগ্র ইউরোপে নবজীবনের সঞ্চার। এই মহাকেন্দ্রে স্বামিজী দেখিলেন, ঐশ্বর্যবিলাস, শিল্পকলা ও জ্ঞানের সাধনায় দ্রুত-অগ্রসর পাশ্চাত্যের আসল রূপ, সাম্রাজ্যবাদী হিংস্র লোভ। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আবরণে পাশ্চাত্য জাতি ও রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীতে অধিকার বিস্তারের প্রতিযোগিতায় পরস্পরকে পরাহত করিবার জন্য কি নিষ্ঠুর বিদ্বেষে উন্মত্ত! ইহাদের সামাজিক শৃঙ্খলা, সঙ্ঘবদ্ধ জীবন শক্তির উৎস, কিন্তু "রক্তপিপাসু নেকড়ে বাঘের ঐক্যের মধ্যে সৌন্দর্য কোথায়!"

ফ্রান্স ও জর্মনী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ফ্রাঙ্কো-জর্মন যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতিহিংসায় ফ্রান্স অধীর, অন্যদিকে ফ্রান্স ও গ্রেট্‌বৃটেনের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের আধিপত্য খর্ব করিবার জন্য কেন্দ্রীভূত নূতন মহাবল জর্মনীর সামরিক শক্তির বিস্ময়কর বিকাশ। সমগ্র ইউরোপ সশস্ত্র হইয়া মহা-সংঘর্ষের প্রতীক্ষা করিতেছে। রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের এই বিরোধিতায় পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রা 'নরকে' পরিণত হইয়াছে। বাহ্য সম্পদের চাকচিক্য দেখিয়া স্বামিজী প্রতারিত হইলেন না। তাঁহার সম্যক্‌ দৃষ্টির সম্মুখে, পাশ্চাত্যের শক্তির নিদারুণ অপচয়ের বিয়োগান্তক দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইল। তিনি একদিন নিবেদিতাকে বলিলেন, "পাশ্চাত্যের সামাজিক জীবন বাহিরে মধুর হাস্যের মত মনোহর, কিন্তু তলদেশ হাহাকারে ভরা, যাহা ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কৌতুক ও লঘু চাপল্যের অন্তরালে কি গভীর বেদনার অনুভূতি!" পাশ্চাত্য জগতের বহু মনীষী যখন উচ্চরবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রমোন্নতির বার্তা প্রচার করিতেন, ঠিক সেই সময় বিবেকানন্দ তাঁহার পরমাশ্চর্য দূরদৃষ্টিবলে, আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধ ও বিপ্লবের আভাস পাইয়াছিলেন। এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচ্যের প্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্যার আদানপ্রদান ব্যতীত এক আসন্ন ধ্বংস হইতে ইউরোপের পরিত্রাণের অন্য পথ নাই।

প্যারী হইতে যাত্রার প্রাক্কালে স্বামিজী লিখিতেছেন, "সঙ্গের সঙ্গী তিনজন: দুজন ফরাসী একজন আমেরিক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস্ ম্যাক্‌লাউড। ফরাসী পুরুষবন্ধু মঁসিয়ে জুল্‌ বোওয়া, ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্য-লেখক। আর ফরাসিনী বন্ধু, জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল কাল্‌ভে। ইনি আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা, অপেরা

গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব হ'তে। * * আমি যাচ্ছি এঁর অতিথি হয়ে। ক্যাল্ভে যে শুধু সঙ্গীতচর্চা করেন, তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়। ক্রমে নিজ প্রতিভাবলে বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে, এখন প্রভূত ধন! রাজা বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী।

“ফ্রান্সে আরও বিখ্যাত গায়ক আছেন, যাঁরা সকলেই দু'তিন লাখ টাকা বাৎসরিক উপার্জন করেন। কিন্তু ক্যাল্ভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা। অসাধারণ রূপ যৌবন প্রতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ; এ সব একত্র সংযোগে ক্যাল্ভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে। কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই। শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র্য দুঃখ কষ্ট, যার সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ কোরে ক্যাল্ভের এই বিষয়লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে।”

সন্ধ্যায় প্যারী হইতে ট্রেণ ছাড়িল। সারাদিন জর্মনীর মধ্য দিয়া চলিয়া ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় ট্রেণ অস্ত্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে পৌঁছিল। কিন্তু প্যারী ছাড়িবার পর পূর্ব-ইউরোপের কোন নগরেই স্বামিজী কোন বৈশিষ্ট্য দেখিলেন না। “ভিয়েনা সহর, প্যারীর নকলে ছোট সহর।” পূর্বগৌরবভ্রষ্ট অস্ত্রিয়া দেখিয়া স্বামিজী লিখিয়াছেন, “সে মান, সে গৌরবের ইচ্ছা, সম্পূর্ণ অস্ত্রিয়ার রয়েছে; নাই শক্তি। তুর্ককে ইউরোপে ‘আতুর বৃদ্ধপুরুষ’ বলে; অস্ত্রিয়াকে ‘আতুর বৃদ্ধা স্ত্রী’ বলা উচিত।”

২৮শে অক্টোবর ভিয়েনা হইতে যাত্রা করিয়া হাঙ্গেরী, সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া স্বামিজী ৩০শে অক্টোবর তুর্কীর রাজধানী ইস্তাম্বুল বা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কনষ্টাণ্টিনোপলে আসিয়া পৌঁছিলেন। পূর্ব-ইউরোপের তুর্কী-সাম্রাজ্যের কবলমুক্ত ছোট ছোট নবীন রাষ্ট্রগুলির দুর্দশা অবর্ণনীয়। ছিন্ন মলিনবসন কুটিরবাসী অশিক্ষিত কৃষক একদিকে, অন্যদিকে তাহাদের রুধির শোষণ করিয়া ফরাসী ও ইংরেজের নকলে সামরিকবল গঠন। অশিক্ষা, কুসংস্কার, বর্বরতা সত্ত্বেও ইহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ইহাতেই স্বামিজী আনন্দিত হইয়া লিখিয়াছেন, “তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামী আর এক; পরে যদি জোর করে করায় তো অতি ভাল কাজও করতে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাক্‌লে কেউ কোন বড় কাজ কর্তে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামীর চেয়ে এক-পেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই। ইউরোপের লোকেরা ঐ সার্বিয়া বুলগার প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্ব করার পর কি একদিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে বৈকি! দু'শবার করবে; করে শিখবে, শিখে ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি দুর্বল সবল হয়—অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়!”

কামান-নির্মাতা ম্যাক্‌সিম সাহেবের প্রদত্ত পরিচয়-পত্র সহায়ে স্বামিজী স্থানীয় অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। স্বামিজীর সঙ্গী অন্যতম প্রসিদ্ধ বক্তা পাদ্রী লয়সন বক্তৃতা করিবার অধিকার পাইলেন না, স্বামিজীও কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা করিবার অধিকার পান নাই। কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের বৈঠকখানায় স্বামিজীর জন্য প্রশ্নোত্তর-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন এবং আগ্রহের সহিত বেদান্তালোচনায় যোগদান করিয়া-

ছিলেন। এগারদিন আনন্দের সহিত অতিবাহিত করিয়া স্বামিজী প্রাচীন গ্রীক্-সভ্যতার সমাধিভূমি এথেন্সে উপনীত হইলেন। এথেন্স নগরী পরিদর্শন করিয়া তিনি সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে মিশর দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কায়রো নগরীতে উপস্থিত হইয়া স্বামিজী মিউজিয়মে রক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যসামগ্রী দর্শনে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গিগণকে মিশরের অতীত ইতিহাস হইতে অদ্ভুতকর্মা ফারাও রাজবংশের বিবরণ শুনাইতে লাগিলেন। 'পিরামিড', 'স্ফিন্‌ক্স' প্রভৃতি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র স্বামিজী ঐগুলির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাহা কিছু, তৎসমুদয় সঙ্গিগণের নিকট অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, স্বামিজী প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে এত অধিক অবগত আছেন যে, তিনি যেন সারাজীবন ধরিয়া মিশরের প্রত্নতত্ত্বই আলোচনা করিয়াছেন।

প্যারী, ভিয়েনা, কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল, এথেন্স, কায়রো প্রভৃতি নগরের ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, বিলাস প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া স্বামিজী যেন অন্তরে অন্তরে বিরক্তিতিক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পার্থিব সম্পদ্‌গর্বিত পাশ্চাত্ত্যে উদ্ধত অহঙ্কার নিরন্তর তাঁহার চিত্তকে পীড়া দিত। ইন্দ্রিয়সুখৈকলক্ষ্য বহির্মুখ জাতির প্রতিনিয়ত নব নব ভোগ্যবস্তু আবিষ্কারের উন্মত্ত চেষ্টা, লোভের তাড়নায় প্রতিপদক্ষেপে ন্যায়, নীতি, ধর্মের মস্তকে ভ্রূক্ষেপহীন পদাঘাত, ইহা ইউরোপের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী দ্রষ্টা বা সাক্ষীর ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করিতেন। মিশরে পদার্পণ করিবার পর হইতেই ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য তাঁহার মন নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। হঠাৎ সংবাদ আসিল, মায়াবতী মঠের সংস্থাপক মিঃ সেভিয়ার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ পাইবামাত্র স্বামিজী ভারতে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

মঁসিয়ে বোওয়া, ম্যাডাম্ ক্যাল্‌ভে, মিস্ ম্যাক্‌লাউড একান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে স্বামিজীকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। জাহাজ হইতে ভারতের উপকূল দৃষ্ট হইবামাত্র স্বামিজীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অভিনন্দন, বক্তৃতা, লোকশিক্ষা, প্রচারকার্য ইত্যাদিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই একান্ত গুপ্তভাবে এবং সাবধানতার সহিত ট্রেণে আরোহণ করিলেন।

স্বামিজীর পূর্ব-ইউরোপ ভ্রমণের অন্যতমা সঙ্গিনী, ইউরোপের বিশ্ববিশ্রুত গায়িকা ম্যাডাম্ ক্যাল্‌ভে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মজীবনচরিত নিউইয়র্কের 'সাটারডে ইভিনিং পোষ্ট' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া অবশেষে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা হইতে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় অংশটি নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম :

"ইহা আমার অত্যন্ত আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমি একজন 'ঈশ্বর-জ্ঞানিত ব্যক্তি'র সহিত পরিচিত হইবার গৌরবলাভ করিয়াছিলাম। তিনি উন্নত ও উদারচেতা, সাধুপুরুষ, দার্শনিক এবং একজন বিশ্বস্ত বন্ধু। আমার ধর্ম-জীবনের উপর তাঁহার প্রভাব অতি সুগভীর। তিনি আমাকে এক নূতন ভাবরাজ্যের সন্ধান দিয়াছেন, আমার জীবনের ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা ও আদর্শকে নবপ্রেরণায় সঞ্জীবিত করিয়াছেন এবং সত্য উপলব্ধি করিবার এক মহনীয় উপায়ের সন্ধান দিয়াছেন। আমার আত্মা চিরদিন তাঁহার নিকট অনন্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। এই অসাধারণ পুরুষ একজন বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী। সাধারণে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ এই নামে সুপরিচিত।

ধর্মপ্রচারকরূপে আমেরিকার সর্বত্র তাঁহার যশ সুপ্রতিষ্ঠিত। যে বৎসর তিনি শিকাগোতে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন আমি তথায় ছিলাম এবং নানাকারণে আমি মানসিক অবসাদগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সঙ্কল্প স্থির করিলাম। কৌতূহল হইল, একবার দেখিয়া আসি, কি শক্তিবলে তিনি আমার কয়েকজন বন্ধুর হৃদয়ে শান্তিদান করিয়াছেন।

"পূর্ব হইতে দেখা করিবার সময় স্থির করা হইল। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহার আবাসস্থলে আমি উপনীত হইলাম। তখনি আমাকে তাঁহার পড়িবার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। যাইবার পূর্বে আমাকে বলা হইল, স্বামিজী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইলে আমি যেন কোন কথা না বলি। অতএব আমি নীরবে কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি মেঝের উপর ভারতীয় প্রথায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার উজ্জ্বল গৈরিক বসন মাটিতে লুটাইতেছিল। মস্তকের গৈরিক উষ্ণীষটি সম্মুখের দিকে ঈষৎ অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি নত দৃষ্টিতে স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন। ক্ষণকাল পরে, তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'বৎসে! তোমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও চঞ্চল! শান্ত হও! মানসিক প্রশান্তিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।'

"তাহার পর শান্ত গম্ভীর স্বরে, উদাসভাবে তিনি (আমার নাম পর্যন্ত যিনি জানেন না) আমার জীবনের সমস্ত গুপ্ত অভিপ্রায় এবং আমার অশান্তির কারণ সহজভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, যাহার বিন্দুবিসর্গ আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও অবগত নহেন। ইহা আমার নিকট রহস্যময় অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হইল। আমি বলিয়া উঠিলাম, আপনি এ সব কেমন করিয়া জানিলেন? আপনাকে আমার বিষয় কে বলিয়াছে?

"তিনি সকরুণহাস্যে আমার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন আমি সরল অজ্ঞ শিশুর মত প্রশ্ন করিতেছি। পরে ধীরভাবে বলিলেন, তোমার বিষয় কেহ আমাকে বলে নাই। কাহারও নিকট শুনিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে? আমি তোমার হৃদয় পুস্তকের ন্যায় পাঠ করিলাম!

"বিদায় লইবার সময় তিনি গাত্রোত্থান করিতে করিতে বলিলেন, 'তুমি গত বিষয় ভুলিতে চেষ্টা কর। বিমর্ষভাব দূর করিয়া চিত্তকে সর্বদা উৎফুল্ল রাখিও। সর্বপ্রযত্নে স্বাস্থ্যরক্ষা কর। নীরবে তোমার দুঃখের কারণগুলি বক্ষে বহন করিও না। তোমার অবরুদ্ধ ভাবাবেগ অন্যপথে বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেল। ধর্মজীবনের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতার জন্য ইহাই সর্বাগ্রে আবশ্যক। তুমি সঙ্গীত-কলা-কুশলা, সঙ্গীতের জন্যও ইহা প্রয়োজন।'

"আমি তাঁহার বাক্য ও প্রখর ব্যক্তিত্বের অসামান্য প্রভাবে অভিভূত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। আমি অনুভব করিলাম, যে জটিল সমস্যাগুলি অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আমার মস্তিষ্ককে ক্লান্ত ও পীড়িত করিতেছিল, তাহার পরিবর্তে, তাঁহার সরল, শান্ত ভাবরাশি তথায় বিদ্যমান।

"আমি পুনরায় নবভাবে সঞ্জীবিত ও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। ইহা তাঁহারই অসীম ইচ্ছাশক্তির ফল। তিনি তথাকথিত সম্মোহনবিদ্যা বা তদনুরূপ কোন প্রক্রিয়া আমার উপর প্রয়োগ করেন নাই। ইহা তাঁহার সুদৃঢ় চরিত্রবল, তাঁহার পবিত্র ও অদম্য সুসঙ্কল্প—যাহা আমার হৃদয়ে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়াছিল। পরে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর দেখিয়াছি, তিনি সহজেই উত্তেজিত ও চিন্তাকুল ভাব দূর করিয়া শ্রোতাকে শান্ত করিতেন, যাহাতে তাঁহার কথাগুলি সে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ ও ধারণ করিতে পারে।

"স্বামিজী আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ছোট গল্প, কবিতা ইত্যাদির সাহায্যে তাঁহার

ক্তব্য বিষয়কে সহজবোধ্য ও মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিতেন। আমরা একদিন মুক্তি ও ক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি তাঁহার ধর্মমতের একটি বিশেষ ত,—পুনর্জন্মবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছিলেন। এমন সময় আমি সহসা বলিলাম, না, এ আমি চিন্তা করিতে পারি না। আমার 'আমিত্ব' আমি চাই। এক অনন্তের ধ্যে চিরবিলয় লাভ আমি প্রার্থনা করি না। ঐ চিন্তা পর্যন্ত আমাকে আতঙ্কে ভিভূত করিয়া ফেলে।

"স্বামিজী উত্তর করিলেন, একদিন এক ফোঁটা জল সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া তোমার তই কাঁদিতে লাগিল এবং ঠিক তোমার মতই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ভাবিয়া কুল হইল। মহাসমুদ্র তাহার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, তুমি কাঁদিতেছ কেন? মি তো কারণ খুঁজিয়া পাই না। আমার সহিত মিলিত হইয়া তুমি তোমার ইবোনদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছ—ইহাদের সমষ্টিই তো আমি। তুমি তো এখন জেই সমুদ্র। যদি তুমি আমা হইতে স্বতন্ত্র হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে র্যরশ্মি সহায়ে ঊর্ধ্বে উঠিয়া মেঘের আশ্রয় লইতে হইবে। সেখান হইতে তুমি ল্যাণাশিসরূপে পৃথিবীর তৃষিত বক্ষে নামিয়া আসিতে পার।

"স্বামিজীর কয়েকজন শিষ্য ও বন্ধু সহকারে তাঁহাকে লইয়া আমরা তুরস্ক, ীস ও মিশর দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। আমাদের দলে ফাদার ইয়াস্যাং লয়সন এবং তাঁহার স্ত্রী, স্বামিজীর অনুরাগিণী ও শিষ্যা শিকাগোর মিস্ ম্যাক্‌লাউড—ইনি ত্যন্ত মধুরস্বভাবা, সদা উৎসাহী ছিলেন, আর আমি ছিলাম এই দলের গায়িকা ক্ষণী! কি সুন্দর এই তীর্থযাত্রা! বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসের মধ্যে যেন স্বামিজীর জ্ঞাত কিছুই নাই। আমি সর্বদা শ্রবণময় হইয়া তাঁহার জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী শ্রবণ রিতাম, কিন্তু তাঁহাদের তর্কে যোগ দিতাম না। কেবল গান গাহিবার সময় আমি র্বদা হাজির থাকিতাম। স্বামিজী ধার্মিক ও পণ্ডিত ফাদার লয়সনের সহিত নাবিষয়ে আলোচনা করিতেন। খৃষ্টধর্মের ইতিহাস লইয়া তর্কের সময় স্বামিজী একখানি প্রাচীন দলিল অবিকল মুখস্থ বলিলেন এবং একটি চার্চ কাউন্সিলের রিখ বলিলেন, যাহার কথা ফাদার লয়সনও নির্দিষ্টরূপে বলিতে পারিলেন না।

"আমরা গ্রীসে ইউলিসিস্ দর্শন করিলাম। স্বামিজী ইহার রহস্য ব্যাখ্যা করিলেন, মাদিগকে বেদী ও মন্দিরগুলি দেখাইলেন, কোন্‌খানে কি হইত বুঝাইয়া দিলেন, রোহিতগণের উপাসনা ও পূজার বিশেষ প্রণালী ব্যাখ্যা করিলেন এবং প্রাচীন মন্ত্র ও গাথা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন।

"আবার একদিন মিশর দেশে—এক চিরস্মরণীয় রজনীতে তিনি আমাদিগকে দূর অতীতে লইয়া গেলেন, স্ফিন্‌ক্সের ছায়ায় বসিয়া রহস্যময় ভাষায় কত ইতিবৃত্ত লিতে লাগিলেন।

"স্বামিজী সর্বদাই আমাদের কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া রাখিতেন; এমনকি, তিনি যখন সহজ কথাবার্তা বলিতেন তখনও তাঁহাকে ভাল লাগিত। তাঁহার কণ্ঠস্বরে হিনীশক্তি ছিল, যাহা শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিত। ষ্টেশনের বিশ্রাম-গৃহে আমরা মিজীকে ঘেরিয়া বসিয়া অপূর্ব উপদেশসমূহ শ্রবণ করিতে করিতে কতবার যে ট্রেণ ফেল করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই; এমনকি, দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধীর স্থির স্ ম্যাকলাউড পর্যন্ত আত্মহারা হইয়া যাইতেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনিই আমাদের তর্ক করিয়া দিবেন কথা থাকিত, কিন্তু তাঁহারও মধ্যে মধ্যে ভুল হইত, ফলে আমরা সময়ে অস্থানে পড়িয়া নানা অসুবিধা ভোগ করিতাম।

"একদিন আমরা কায়রোতে রাস্তা হারাইয়া ফেলিলাম। বোধ হয় সেদিন আমরা তি আত্মমগ্ন হইয়া আলাপ করিতেছিলাম। একটি অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় গলিতে

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কতকগুলি অর্ধনগ্না নারী জানালায় ঝুঁকিয়া আছে, কেহ কেহ বা দরজার সম্মুখে জটলা করিতেছে। স্বামিজী প্রথমে কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। একটি ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট কয়েকটি নারী উচ্চহাস্যে তাঁহাকে আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর স্বামিজীর দৃষ্টি পতিত হইল। আমাদের দলের একজন মহিলা সত্বর সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য উন্মুখ হইলেন, স্বামিজী সহসা আমাদিগের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই নারিগণের সম্মুখীন হইলেন।

“স্বামিজী বলিলেন, হায় হতভাগ্য সন্তানগণ! বেচারীরা তাহাদের রূপের উপাসনায় ভগবান্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে! আহা, ইহাদের দিকে চাহিয়া দেখ। পতিতা নারীর সম্মুখে দণ্ডায়মান যীশুখৃষ্টের মতই স্বামিজীর চক্ষু বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, তাহারা নির্বাক ও লজ্জিত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিল! একজন নারী অগ্রসর হইয়া তাঁহার পরিচ্ছদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে স্পেনীয় ভাষায় বলিতে লাগিল—‘Hombre de Dios—Hombre de Dios’— (ঈশ্বর-জানিত লোক)। অপর একটি নারী সহসা বিস্মিত সম্ভ্রমে উভয় হস্তে মুখ ঢাকিল, যেন তাহার সঙ্কুচিত আত্মা স্বামিজীর পবিত্র দৃষ্টি সহিতে পারিতেছিল না।

“এই অপূর্ব ভ্রমণই স্বামিজীর সহিত আমার শেষ দেখা। কয়েকদিন পরেই তিনি স্বদেশে ফিরিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তিনি মহাপ্রস্থানের সময় নিকটবর্তী জানিয়া স্বীয় স্বদেশী শিষ্য ও গুরুভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইতে চাহিলেন।

“এক বৎসর পর আমরা শুনিলাম, তিনি এক অপূর্ব জীবন-কাহিনী রচনা করিয়া তাহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে অমর কাহিনী লিপিবন্ধ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। তিনি হিন্দু যোগশাস্ত্রোক্ত সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং দেহত্যাগের পূর্বেই নির্দিষ্ট দিনের কথা বলিয়াছিলেন।

“কয়েক বৎসর পরে আমি যখন ভারতবর্ষে গিয়াছিলাম, আমার ইচ্ছা হইল, স্বামিজী যে মঠে তাঁহার শেষের দিন কয়েকটি যাপন করিয়াছেন, তাহা একবার দেখিয়া আসি। আমি স্বামিজীর জননীর সহিত তথায় গিয়াছিলাম। স্বামিজীর আমেরিকান বন্ধু (স্বামিজীকে যিনি সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন এবং স্বামিজী যাঁহাকে ‘জননী’ সম্বোধন করিতেন) মিসেস্ লিগেট তাঁহার চিতাশয্যার উপর যে মর্মর সমাধি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা দর্শন করিলাম। আমি দেখিলাম যে, সমাধির উপর স্বামিজীর কোন নাম খোদিত নাই। স্বামিজীর জনৈক সন্ন্যাসী ভ্রাতাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিলেন এবং সম্ভ্রম-উদ্দীপক মনোহর ভঙ্গী সহকারে বলিলেন, (যাহা আজ পর্যন্ত স্মৃতিতে জাগ্রত রহিয়াছে)—তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। (স্বামিজী এখন নামরূপের অতীত)—ইহাই বোধ হয় সন্ন্যাসীর বক্তব্য ছিল।

“বেদান্তের মধ্যেই হিন্দুধর্মের সমস্ত সার মৌলিক আকারে বিদ্যমান। বৈদান্তিকগণের কোন বিশেষ মন্দির নাই। তাঁহারা সাধারণ গৃহেই উপাসনা করিতে পারেন, সেখানে ধর্মভাব-উদ্দীপক কোন চিত্র বা অন্য কিছুরও আবশ্যক করে না। তাঁহারা কেবল সেই অব্যক্ত, অনির্বচনীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে থাকেন।

“স্বামিজী আমাকে প্রাণায়াম করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঐশ্বরিক শক্তি সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইতে তেজ, বীর্য আহরণ করিতে হইবে।

“বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা অনাড়ম্বরে এবং সরলভাবে আমাদিগকে আতিথ্যে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৃক্ষতলে টেবিলের উপর কাপড় বিছাইয়া আমাদিগকে

ফলমূল খাইতে দিয়াছিলেন এবং পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিয়াছিলেন। আমাদের সম্মুখে নিম্নে ভাগীরথী বহিয়া যাইতেছিল। সন্ন্যাসীরা আমার অপরিচিত যন্ত্রে অভিনব সুরে সঙ্গীত গাহিতেছিলেন, যদিও আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি উহা আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। একটি তরুণ কবি করুণ সুরে স্বামিজীর পরলোক-গমন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন। সে দিনের অপরাহ্ণ আমি শান্ত-গম্ভীরভাবে এক অপূর্ব প্রশান্তির মধ্যে কাটাইয়াছিলাম।

"সেই সমস্ত শান্ত-ধীর-প্রকৃতি সন্ন্যাসিগণের সহিত যে কয়ঘণ্টা কাটাইয়াছিলাম, এই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও তাহা আমি ভুলিতে পারি নাই। ঐ মানুষগুলি যেন এ জগতের নহেন, যেন তাঁহারা এক উচ্চতর জ্ঞানের রাজ্যে বাস করিতেছেন।"

১৯০০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রাত্রিতে স্বামিজী অপ্রত্যাশিতভাবে বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি হইয়াছে, মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় বাগানের মালী দ্রুতপদে আসিয়া সংবাদ দিল, একজন সাহেব আসিয়াছেন, গেট খুলিবার জন্য চাবির প্রয়োজন। গেট খোলা হইলে দেখা গেল যে, গাড়ি খালি, সাহেব তন্মধ্যে নাই। এদিকে সাহেব মাথার টুপিটা একটু টানিয়া দিয়া ভোজনগৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্বামী প্রেমানন্দজী দীপহস্তে দেখিলেন, সাহেব আর কেহ নহেন, তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীবিবেকানন্দ। স্বামিজী বালকের মত উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "বাইরে থেকে খাবার ঘণ্টা শুনে ভাবলুম যে, যদি তাড়াতাড়ি না যাই, তা'হলে রাত্রে আর খেতে পাব না। তাই পাঁচিল টপ্‌কে এসে পড়লুম। বড় খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দাও।" স্বামিজীর কথা শুনিয়া এবং তাঁহাকে পাইয়া রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের মধ্যে একটা প্রীতি-উচ্ছল আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল। স্বামিজী আগ্রহ ও আনন্দের সহিত বহুদিন পর খিচুড়ি খাইতে খাইতে নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলেন। সেদিন রাত্রে মঠে যে আনন্দ ও উৎসাহে সকলের চিত্ত নৃত্য করিতে লাগিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বেলুড় মঠে পেঁীছিয়াই স্বামিজী মায়াবতী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মায়াবতী মঠের প্রেসিডেণ্ট মিঃ সেভিয়ারের অভাবে আশ্রমের কার্য কিরূপ চলিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা এবং মিসেস্ সেভিয়ারকে সান্ত্বনা প্রদান করাই স্বামিজীর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে মায়াবতী যাত্রা করিলেন। কাঠগুদাম হইতে মায়াবতীর পথে প্রবল শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাত হওয়ায় স্বামিজীর খুব কষ্ট হইয়াছিল। একে অসুস্থ দেহ, তাহার উপর শ্রম-ক্লান্তি, শিষ্যগণ অতীব যত্নের সহিত স্বামিজীর সেবা করিতে লাগিলেন। ১৯০১ সালের ৩রা জানুয়ারী তিনি মায়াবতী মঠে আসিয়া মিসেস্ সেভিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বামিজী একদিন কথা-প্রসঙ্গে মিসেস্ সেভিয়ারকে বলিলেন, "সত্যই কি আমার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে? কিন্তু আমার মস্তিষ্ক এখনও পূর্বের ন্যায় সবল ও কার্যক্ষম।"

শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দজীর সহিত স্বামিজী আশ্রম, প্রচারকার্য এবং "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকা পরিচালন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিলেন। স্বামী স্বরূপানন্দ শ্রীগুরুর আশীর্বাদে ইতোমধ্যেই আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়া স্বরূপানন্দজী পরহিতায় কর্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনারূপে একান্ত-ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া প্রচারকার্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করা আর স্বামিজীর পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি প্রত্যেক শিষ্যকেই মহা উৎসাহে সেবাব্রত ও কর্মযোগ প্রচারের জন্য উপদেশ প্রদান

করিতে লাগিলেন। হিমালয় বক্ষের স্তব্ধ জনবিরল মঠের উদ্বেগহীন জীবন স্বামিজীর বড় শান্তিপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। একদিন শিষ্যগণের সহিত ভ্রমণ-করিতে করিতে তিনি বলিলেন, “সমস্তপ্রকার কর্ম ত্যাগ করিয়া আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ এই মঠে যাপন করিব। নিশ্চিন্তে অধ্যয়ন ও পুস্তকাদি লিখিব। বালকের মত মুক্ত হইয়া মনের আনন্দে হ্রদতীরে পরিভ্রমণ করিব।” কিন্তু কার্যতঃ তিনি বহু কষ্টে পনর দিনের বেশীকাল মায়াবতী মঠে থাকিতে পারিলেন না। দুরন্ত হাঁপানি রোগের শ্বাসকষ্ট তাঁহাকে এত দুর্বল করিয়া ফেলিল যে, সামান্য শারীরিক শ্রমও তাঁহাকে ক্লান্তিতে অবসন্ন করিয়া ফেলিত। ১৩ই জানুয়ারী তাঁহার শিষ্যগণ স্বামিজীর অষ্টাত্রিংশ জন্মদিনের অনুষ্ঠান করিলেন। স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন, “আমার দেহের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।”

আশ্রমের কয়েকজন সন্ন্যাসী মিলিয়া একটি কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তথায় নিত্য পূজা ও ভোগরাগাদি হইত। দৈবাৎ একদিন উহা স্বামিজীর চোখে পড়িল, তিনি এই বাহ্যপূজার ব্যাপার দেখিয়া ভালমন্দ কোন কথাই বলিলেন না; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যখন অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে সকলে একত্র হইলেন, তখন তিনি জ্বলন্তভাষায় বাহ্যপূজার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ‘অদ্বৈত-আশ্রমে’ কোনপ্রকার বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান না থাকে, এ অভিপ্রায় তিনি বহুদিন পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অদ্য তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়া স্বামিজী ব্যথিত হইলেন। তিনি অদ্বৈত-আশ্রমে বাহ্যপূজার অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে তীব্রভাষায় অনেক কথা বলিলেন বটে, কিন্তু সহসা ঠাকুর-ঘরটি উঠাইয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন না। ক্ষমতার ব্যবহার, অথবা কাহারও প্রাণে আঘাত দেওয়া তিনি সমীচীন মনে করিলেন না। যাঁহারা ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই স্বামিজীর মনোগত অভিপ্রায় ছিল। স্বামী স্বরূপানন্দ ও মিসেস্ সেভিয়ার স্বামিজীর উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, অদ্বৈত-আশ্রমের নিয়মানুযায়ী ঠাকুরপূজা বন্ধ করিয়া দিলেন। যাঁহারা দ্বৈতভাবে সাকার উপাসনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে ‘অদ্বৈত-আশ্রম’ উপযুক্ত স্থান নহে; এই সত্যটি প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিয়া কোনপ্রকার আপত্তি প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু একজনের তবু কিছু সন্দেহ রহিয়া গেল। তিনি সুযোগমত পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট এই ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। শ্রীশ্রীমা উত্তর করিলেন, “শ্রীগুরুদেব অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং অদ্বৈত-সাধনা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ প্রত্যেকেই অদ্বৈতবাদী।” শ্রীশ্রীমার মীমাংসা শুনিয়া তাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইল। স্বামিজী বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া, এই ঘটনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “আমার ইচ্ছা ছিল যে, অন্ততঃ আমাদের একটি মঠও থাকিবে, যেখানে কোনপ্রকার বাহ্যপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি ইত্যাদি থাকিবে না; কিন্তু মায়াবতী গিয়া দেখি, সেই বৃদ্ধ সেখানেও আসন গাড়িয়া বসিয়াছেন, ভাল—ভাল!”

মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব বিচার করিতে হইলে বড় বড় কাজগুলি না দেখিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। স্বামিজীর মায়াবতী অবস্থানকালে প্রত্যহই এমন সব ঘটনা ঘটিত, যাহাতে তাঁহার হৃদয়ের নগ্নসরলতা গভীর মানব-প্রীতি ও অসীম শিষ্য-স্নেহের পরিচয় পাওয়া যাইত। একদিন মধ্যাহ্নভোজনের বিলম্ব দেখিয়া স্বামিজী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং অসহিষ্ণুভাবে প্রত্যেককেই ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বামী

বিরজানন্দকে শাসন করিবার জন্য। স্বয়ং রান্নাঘরে চলিলেন। এদিকে স্বামী বিরজানন্দ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, ভিজে কাঠ ভাল জ্বলিতেছে না, সমস্ত রান্নাঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার। স্বামিজী, বিরজানন্দের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আর কিছু বলিলেন না, নীরবে স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। বহুক্ষণ পর যখন তাঁহার সমীপে আহার্য আনীত হইল, তখন তিনি বালকের ন্যায় অভিমানভরে বলিলেন, “এসব এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি খাব না।” গুরুর প্রকৃতি সম্বন্ধে শিষ্যের অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি স্বামিজীর সম্মুখে আহার্য পাত্র স্থাপন করিয়া নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী অভিমানী বালকের মত ভাবভঙ্গী-সহকারে ধীরে ধীরে উপবেশন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। খাদ্যদ্রব্য মুখে দিবামাত্র তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে অভিমানের গাম্ভীর্য অন্তর্হিত হইল। কিছুক্ষণ পর তিনি শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্লহাস্যে বলিলেন, “আমি কেন চটেছিলুম জানিস্? খুব খিদে পেয়েছিল কি না, তাই!”

মায়াবতী মঠে স্বামিজী অলসভাবে কালযাপন করিতেন না। প্রত্যহ তাঁহাকে ভূরি ভূরি পত্রোত্তর প্রদান করিতে হইত। ইহার উপর শাস্ত্রালোচনা তো প্রায় সর্বক্ষণ লাগিয়াই থাকিত। ইহার মধ্যেও তিনি “প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার জন্য, ‘আর্য ও তামিল’, ‘সামাজিক সভায় মিঃ রাণাডের অভিভাষণের সমালোচনা’ ও ‘থিয়সফি সম্বন্ধে মন্তব্য’ এই তিনটি সুচিন্তিত প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন।

১৯০০ সালের লাহোর কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে জষ্টিস্ মিঃ রাণাডে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, উহা স্বামিজীর আপত্তিজনক মনে হওয়ায় তিনি উহার নির্ভীক প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার ব্রাহ্মসংস্কারকগণের মতই মিঃ রাণাডে সন্ন্যাসাশ্রমের বিরোধী ছিলেন এবং সময় সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই সন্ন্যাসিগণের উপর কটাক্ষপাত করিতেন। বক্তৃতাটির প্রথমেই মিঃ রাণাডে বলিয়াছিলেন যে, বৈদিকযুগে জাতিভেদ-প্রথা ছিল না। বিবাহিত ঋষিগণ সমাজের নেতা ও ধর্মাচার্য ছিলেন, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ছিল না, নরনারী সকলেই সমভাবে সর্বতোমুখী স্বাধীনতা (?) উপভোগ করিত এবং “Asceticism had not overshadowed the land, and life and its sweets were enjoyed in a spirit of joyous satisfaction.” অর্থাৎ কঠোর সংযমের ভাব (যাহা যোগিগণ ধর্মসাধনার অঙ্গ বলিয়া মনে করেন) ছিল না, অতএব মানবজীবনের মাধুর্য সকলেই পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতে পারিত। রাণাডের মতে—

(১) প্রাচীন যুগে জাতিভেদ ছিল না এবং ঋষিগণ বিবাহিত ছিলেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি ক্ষত্রিয়রাজ-নন্দিনীর সহিত ঋষিগণের বিবাহ অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহের একটি সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন।

(২) শিখধর্মের প্রবর্তক গুরুগণও বিবাহিত ছিলেন। অতএব আমাদিগকে একদল বিবাহিত আচার্য গঠন করিতে হইবে। অসম্পূর্ণজীবন সন্ন্যাসী আচার্য বৈদিকযুগে ছিল না, এখনও থাকা উচিত নহে।*

স্বামিজী মিঃ রাণাডের প্রতিবাদস্বরূপ লিখিয়াছেন—

---

* “A movement which has been recently started in the Punjab may be accepted as a sign that you have begun to realize the full significance of the need of creating a class of teachers who may be well trusted to take the place of the Gurus of the old.”

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন, সেইজন্যই রাণাডে মহোদয়

(১) সন্ন্যাসিগুরু ও গৃহস্থগুরু, কুমার ব্রহ্মচারী ও বিবাহিত ধর্মাচার্য উভয় প্রকার আচার্য, বেদ যত প্রাচীন, তত প্রাচীন। অতএব তথাকথিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সূক্ষ্ম কল্পনার সাহায্য না লইয়া স্বাধীনভাবে এই সমস্যার মীমাংসা করার প্রয়োজন। সন্ন্যাসী আচার্যগণ গৃহস্থগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পূর্ণব্রহ্মচর্যরূপ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা উপনিষদ্বক্তা, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী।

(ক) "একদিকে বিবাহিত গৃহস্থ ঋষি—কতকগুলি অর্থহীন কিম্ভূতকিমাকার—শুধু তাই নয়, ভয়ানক অনুষ্ঠান নিয়ে রয়েছেন—খুব কম করে বল্‌লেও বল্‌তে হয়, তাঁদের নীতিজ্ঞানটাও একটু ঘোলাটে ধরনের; আর অন্যদিকে অবিবাহিত ব্রহ্মচর্যপরায়ণ-সন্ন্যাসি-ঋষিগণ, যাঁরা মানবোচিত অভিজ্ঞতার অভাব সত্ত্বেও এমন উচ্চ ধর্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রস্রবণ খুলে দিয়ে গেছেন, যা'র অমৃতবারি সন্ন্যাসের বিশেষ পক্ষপাতী জৈন ও বৌদ্ধরা এবং পরে শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য পর্যন্ত প্রাণভরে পান ক'রে তাঁদের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্কারসমূহ চালাবার শক্তিলাভ করেছিলেন এবং যা' পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে তিনচার হাত ঘুরে এসে আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণকে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করবার শক্তি পর্যন্ত দান কর্‌ছে।"

(খ) "হিন্দুজাতি অনাদি কাল হইতে জড়ের পরিবর্তে চৈতন্য, ভোগের পরিবর্তে ত্যাগকেই শান্তিপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অতএব যতদিন সমগ্র হিন্দুজাতির মনের ভাব এরূপ চল্‌বে—আর আমরা ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, চিরকালের জন্য এই ভাব চলুক—ততদিন আমাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্বদেশবাসিবৃন্দ ভারতীয় নরনারীর 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সর্বত্যাগ করবার প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার কি আশা কর্‌তে পারেন?"

(গ) "আর সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে সেই মান্ধাতার আমলের পচা মড়ার মত আপত্তিটা ইউরোপে প্রোটেষ্টাণ্ট-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, পরে বাঙ্গালী সংস্কারকগণ তাঁদের থেকে ঐটি ধার করে নিয়েছেন, আর এখন আবার আমাদের

প্রকারান্তরে উক্ত সমাজকে সন্ন্যাসী আচার্য অপেক্ষা গৃহস্থ আচার্য গঠনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন; কারণ তাঁহার মতে—

—"Our teachers must enable their pupils to realize the dignity of man as man, and to apply the necessary correctives to tendencies towards exclusiveness, which have grown in us with the growth of ages. . . . We must at the same time be careful that this class of teachers does not form a new order of monks. Much good, I am free to admit, has been done in the past and is being done in these days, in this as well as other countries by those who take the vow of life-long celibacy and who consecrate their lives to the service of man and the greatest glory of our Maker. But it may be doubted how far such men are able to realize life, all its fulness and all its varied relations, and I think our best examples in this respect are furnished by Agastya with his wife Lopamudra. Atri with his wife Anusua, and Vasistha with his wife Arundhati among the ancient Rishis, and in our own times by men like Dr. Bhandarker on our side, Diwan Bahadur Raghunath Row in Madras, Maharshi Debendra Nath Tagore, the late Keshab Chandra Sen, Babu Pratap Chandra Mazumdar, Pandit Shibnath Shastri in Bengal and Lala Hansa Raj and Lala Munshi Ram in your own province. A race that can ensure a continuance of such teachers can in my opinion never fail, and with the teachings of such men to guide and instruct and inspire us. I, for one, am confident that the time will be hastened when we may be vouchsafed sight of the Promised Land."

বোম্বাইবাসী ভ্রাতৃগণ উহা আঁকড়ে ধরেছেন, সন্ন্যাসীরা অবিবাহিত থাকার দরুণ জীবনটাকে পূর্ণভাবে এবং উহার নানারকমের সমুদয় অভিজ্ঞতার সহিত সম্ভোগ কর্‌তে বঞ্চিত। * * তারপর অবশ্য সন্ন্যাস-আশ্রমের বিরুদ্ধবাদীদের মুখে এ কথা তো লেগেই আছে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক বৃত্তি দিয়েছেন, কোন না কোন ব্যবহারের জন্য; সুতরাং সন্ন্যাসী যখন বংশবৃদ্ধি কর্‌ছেন না, তিনি অন্যায় কাজ কর্‌ছেন, তিনি পাপী। বেশ, তা' হলে তো কাম, ক্রোধ, চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা, প্রভৃতি সকল বৃত্তিই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, আর ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সামাজিক জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক। এগুলির বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের কি বক্তব্য? জীবনে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই, এই মত অবলম্বন করে কি ঐগুলিও পুরাদমে চালাতে হ'বে না কি? অবশ্য সমাজসংস্কারকদলের সঙ্গে যখন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁরা যখন তাঁর কি কি ইচ্ছা, তা'ও ভালরকম অবগত আছেন, তখন তাঁদের এ প্রশ্নের হ্যাঁ জবাব দিতেই হবে।"

(২) স্মরণাতীত কাল হইতে জগতের প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণ সমাজের শীর্ষে অবস্থান করিয়া জাতিকে উন্নতির পথে চালিত করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর সুকঠোর সংযত জীবন, ভোগবিতৃষ্ণা, যুগে যুগে কত মানবকে উচ্ছৃঙ্খল লালসা সংযত করিতে শিখাইয়াছে। এই ভারতে যাহা কিছু উদারভাব, প্রাণপ্রদ, বীর্যপ্রদ, উচ্চচিন্তা, তাহার অধিকাংশই সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য-পুষ্ট মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত। সমাজ-তরণীর কর্ণধারের আসনে ভারত প্রাচীনকাল হইতেই সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীকে স্থাপন করিয়াছে, আর সন্ন্যাসিগণ আজও জাতির জীবন-তরণীর হাল ধরিয়া বসিয়া আছেন বলিয়াই সহস্র ঝঞ্ঝাবর্তও ইহাকে ধ্বংস করিতে পারে নাই। ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সন্ন্যাসীর এই নিঃস্বার্থ চেষ্টার মহিমময় কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। সমাজের উপর, জাতির উপর তাহার অমোঘ প্রভাব মিঃ রাণাডে অস্বীকার করিতে পারেন নাই; অথচ তথাপি তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের আচার্যগণ যেন নূতন কোন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা না করেন। কারণ তাঁহারা জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতার রসাস্বাদ করিতে অক্ষম।" ভবিষ্যৎ ভারত গঠনকল্পে তিনি সন্ন্যাসীর প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি আশা করিয়াছেন যে, ভারত যখন আচার্যরূপে—প্রাচীন কালের অগস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের ন্যায়—বর্তমানকালেও "ডাঃ ভাণ্ডারকর, দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, লালা হংসরাজ, লালা মুন্সীরাম প্রভৃতি ঋষিগণকে লাভ করিয়াছে, তখন ইঁহাদের উপদেশ ও আদর্শজীবন অনুকরণ করিয়া চলিলে ভারতের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।"

(ক) অন্যদিকে স্বামিজী কিন্তু এই সমস্ত আধুনিক পাশ্চাত্যভাব-রসপুষ্ট ঋষিগণের দ্বারা ভারতের কোন স্থায়ী উন্নতি হইয়াছে বা হইবে, ইহা আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। সেইজন্য তিনি অন্ততঃ একসহস্র শক্তিমান, চরিত্রবান্ ও বুদ্ধিমান সন্ন্যাসী-প্রচারক গঠন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, এইরূপে আচার্যগণ সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া মুক্তি, সেবা, সামাজিক জীবনের উন্নততর আদর্শ ও সাম্যের বার্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবেন, লৌকিক ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষাদান করিবেন। তাঁহার মতে সন্ন্যাসী আচার্যকুলের অবনতির সহিত ভারতের দুর্দশার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, অতএব ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধনকল্পে

প্রথমেই সমাজের নিয়ন্তা, জাতির চালকরূপে একদল শক্তিমান আচার্যের প্রয়োজন, এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইবেন।

(৩) সন্ন্যাসের উচ্চতম আদর্শকে ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া কেহ কেহ ত্যাগপূত গৈরিক কলুষিত করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুর্বল ও অসৎপ্রকৃতির সন্ন্যাসিগণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সংস্কারকগণ সমস্ত সন্ন্যাসী ও এমনকি, সন্ন্যাসাশ্রমকেও অযথা আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। সন্ন্যাসের ক্ষুরধার দুর্গম পথে চলিতে গিয়া যদি কাহারও পদস্খলন হয়, তবুও সে একজন সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। কারণ, চলতি কথাই আছে যে, "ভালবেসে না পাওয়া ভাল-না-বাসা অপেক্ষা ভাল।" যে কখনও উন্নত জীবন লাভের চেষ্টাই করে নাই, সে কাপুরুষের সঙ্গে তুলনায় সে তো বীর!

"আমাদের সংস্কারকদলের ভিতরের ব্যাপারের যদি ভাল করে খবর নেওয়া যায়, তবে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের ভিতর ভ্রষ্টের সংখ্যা শতকরা কত, তা দেবতাদের ভাল করে গুনতে হয়; আর আমাদের সমুদয় কাজ-কর্মের এ রকম সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব যে দেবতা রাখছেন, তিনি তো আমাদের নিজেদের হৃদয় মধ্যেই! কিন্তু এদিকে দেখ, এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, কারো কিছু সাহায্য চাচ্ছে না, জীবনে শত ঝড়ঝাপ্‌টা আস্‌ছে, বুক পেতে সব নিচ্ছে, কাজ কচ্ছে, কোন পুরস্কারের আশা নেই, এমনকি, কর্তব্য বলে লম্বা নামে সাধারণ পরিচিত সেই পচা বিট্‌কেল ভাবটাও নেই। সারাজীবন কাজ চল্‌ছে, আনন্দের সহিত স্বাধীনভাবে কাজ চল্‌ছে। কারণ, ক্রীতদাসের মত জুতোর ঠোক্কর মেরে কাজ করাতে হচ্ছে না, অথবা মিছে মানবীয় প্রেম বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও সে কার্যের মূলে নেই।"

"এ কেবল সন্ন্যাসীতেই হ'তে পারে। ধর্মের কথা কি বলব? উহা থাকা উচিত, না একেবারে অন্তর্হিত হ'বে? ধর্ম যদি থাকে, তবে ধর্মসাধনে বিশেষাভিজ্ঞ একদল লোকের আবশ্যক, ধর্মযুদ্ধের জন্য যোদ্ধার প্রয়োজন। সন্ন্যাসীই ধর্মের বিশেষাভিজ্ঞ ব্যক্তি, কারণ তিনি ধর্মকেই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য করেছেন। তিনিই ঈশ্বরের সৈনিকস্বরূপ। যতদিন একদল সন্ন্যাসী সম্প্রদায় থাকে, ততদিন কোন্ ধর্মের বিনাশাশঙ্কা?"

"প্রোটেষ্টান্ট ইংলন্ড ও আমেরিকা, ক্যাথলিক সন্ন্যাসিগণের প্রবল প্লাবনে কম্পিত হচ্ছেন কেন?"

"বেঁচে থাকুন রাণাডে ও সমাজসংস্কারক দল! কিন্তু হে ভারত, হে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত ভারত! ভুলো না বৎস, এই সমাজে এমন সব সমস্যা রয়েছে, এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্য গুরু যার মানেই বুঝ্‌তে পারছো না, মীমাংসা করা তো দূরের কথা।"

প্রবল তুষারপাত আরম্ভ হইল; স্বামিজী ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে পারিতেন না। হিমালয়ের প্রখর শীত তাঁহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯০১ সালের ২৪শে জানুয়ারী তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। মঠের কার্য-প্রণালী যথানিয়মে চলিতেছিল। প্রত্যহ ব্রহ্মচারিগণ ব্যায়াম, বিবিধ শাস্ত্রালোচনা, ধ্যান, সাধনাদি নিয়মিতরূপে করিতেছিলেন। স্বামিজীর আগমনে তাঁহাদের কর্মোৎসাহ যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। তিনি নবীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, উৎসাহ ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। কখনও কখনও অবসর মত আলোচনা সভায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষাদানের

সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক অভিমত ব্যক্ত করিতেন। ইতোমধ্যে ঢাকা হইতে স্বামিজীর নিকট প্রত্যহ আহ্বানসূচক পত্র আসিতে লাগিল। স্বামিজীর মাতা-ঠাকুরাণী পূর্ব হইতেই পূর্ববঙ্গ ও আসামের তীর্থগুলি দর্শন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা স্মরণ করিয়া জননী ও তাঁহার সঙ্গিনিগণসহ স্বামিজী ঢাকা গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্বামিজীর দৈহিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছিল; কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই ১৮ই মার্চ কতিপয় সন্ন্যাসী-শিষ্য সঙ্গে লইয়া তিনি ঢাকা যাত্রা করিলেন। ষ্টীমার গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিবামাত্র, ঢাকা অভ্যর্থনা-সমিতির কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অবশেষে অপরাহ্ণে যখন ট্রেণ ষ্টেশনে প্রবেশ করিল, তখন স্থানীয় বিখ্যাত উকীল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিবেকানন্দের দর্শনকামনায় ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বামিজীর দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র "জয় রামকৃষ্ণ" ধ্বনিতে ষ্টেশন মুখরিত করিয়া তুলিলেন। অশ্বশকটে আরোহণ করাইয়া, বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে স্বামিজীকে স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদার মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের ভবনে লইয়া যাওয়া হইল।

কয়েকদিন পর বুধাষ্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র স্নানের জন্য স্বামিজী ঢাকা হইতে নৌকাযোগে লাঙ্গলবন্দ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ২৫শে মার্চ জননী ও অন্যান্য মহিলাবৃন্দ নারায়ণগঞ্জে আসিয়া স্বামিজীর সহিত যোগদান করিলেন। সদলবলে লাঙ্গলবন্দে উপনীত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া স্বামিজী আনন্দিত হইলেন। রাত্রিতে স্বামিজীর একটু জ্বর হইল। যাহা হউক, তিনি নির্বিঘ্নে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন।

ঢাকায় অবস্থানকালে প্রত্যহ বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট আশীর্বাদ ও উপদেশপ্রার্থী হইয়া আগমন করিতেন। স্বামিজী প্রায় সর্বদাই তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া শিষ্টালাপে পরিতুষ্ট করিতেন। অপরাহ্ণে প্রায় দুই তিন ঘণ্টাকাল ত্যাগ, বৈরাগ্য, কর্মযোগ, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচনা করিতেন। স্বামিজীর মধুর ব্যবহার, বিনম্র বচনে সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

স্থানীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আগ্রহে ও অনুরোধে স্বামিজী ঢাকায় দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩০শে মার্চ স্থানীয় উকীল রমাকান্ত নন্দীর সভাপতিত্বে জগন্নাথ কলেজে একটি সভা আহূত হয়। স্বামিজী প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সম্মুখে ইংরেজী ভাষায় 'আমি কি শিখিয়াছি?' এই বিষয়ে একঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিলেন। তৎপর দিবস পোগজ স্কুলের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সম্মুখে 'আমার জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম' সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃগণ স্বামিজীর বক্তৃতার সম্মোহিনী শক্তিতে যেন আবিষ্ট হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্তব্ধ ছিলেন। উভয় বক্তৃতাতেই স্বামিজী ব্রাহ্মসংস্কারকগণের অবলম্বিত কার্যপ্রণালীর তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই সংস্কারকসম্প্রদায় যে আমাদের ধর্মের মধ্যে খৃষ্টানী ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী এবং মূর্তিপূজাকে একান্ত দোষাবহ বলিয়া মনে করেন, তাহার কারণ উঁহারা মূর্তিপূজার ভালমন্দ কোনদিনই উত্তমরূপে অনুসন্ধান না করিয়া একেবারে হিন্দুধর্মকেই একটা ভ্রম-প্রমাদের সমষ্টি বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। মূর্তিপূজা সমর্থনকল্পে স্বামিজী তাঁহার বহু বক্তৃতায় দার্শনিক সূক্ষ্মযুক্তি দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই, ধর্মজীবনের অবস্থাবিশেষে উহার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে তিনি যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন; কিন্তু শেষোক্ত বক্তৃতাটির উপসংহারে তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা

হিন্দু ও ব্রাহ্ম সকলেরই বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার বিষয়। স্বামিজী বলিয়াছেন, "এই মূর্তিপূজার ভিতরে নানাবিধ কুৎসিতভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমি উহার নিন্দা করি না। যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম! যে সকল সংস্কারক মূর্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি বলি, "ভাই, তুমি যদি নিরাকার উপাসনার যোগ্য হইয়া থাক, তাহা কর, কিন্তু অপরকে গালি দাও কেন? সংস্কার কেবল পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কার মাত্র। জীর্ণসংস্কার হইয়া গেলে আর উহার প্রয়োজন কি? সংস্কারক-দল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মস্তকে ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক; কিন্তু তোমরা আপনাদিগকে পৃথক করিতে চাও কেন? হিন্দু নাম লইতে লজ্জিত হও কেন?"

বাঙ্গলার সংস্কারকগণের স্বজাতি ও স্বধর্ম বিদ্বেষ দেখিয়া বিশ্বপ্রেমিক সন্ন্যাসী কতবারই না ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলিয়াছেন, "আমরা তো উহাদিগকে ক্রোড়ে লইবার জন্য বাহু বিস্তার করিয়া আছি, উহারাই যে আসিবে না, তাহার আমরা কি করিব?" কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আসা দূরে থাক্, বরং কোন কোন ব্রাহ্মনেতা তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে প্রতিহত হইয়া ঈর্ষাবিষতিক্তচিত্তে শুক্র-কর্মা সন্ন্যাসীর অমল-ধবল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতেও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হন নাই। যাঁহারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ করিয়া এক অতি জঘন্য লজ্জাকর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি যে তাঁহারা অসূয়া-পরবশ হইবেন, ইহা তো স্বাভাবিক; কিন্তু যাহা স্বাভাবিক, তাহাই সঙ্গত নয়, অথচ ঈর্ষা প্রকাশ ভিন্ন অক্ষম আর কি-ই অধিক করিতে পারে?

অপরদিকে স্বামিজী, যে সমস্ত ব্যক্তি আমাদের প্রত্যেকটি কুসংস্কার ও গ্রাম্য আচার ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া ঐগুলি সমর্থন করিতে চেষ্টিত হন, তাঁহাদিগের সহিতও একমত হইতে পারেন নাই। স্বামিজী বলেন, "ইঁহাদের অতিরিক্ত দল প্রাচীন সম্প্রদায়, যাঁহারা বলেন, আমি তোমার অত শত বুঝি না, বুঝিতে চাহিও না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে, চাই জগৎকে ছাড়িয়া সুখ-দুঃখকে ছাড়িয়া উহার অতীত প্রদেশে যাইতে। যাঁহারা বলেন, বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়; যাঁহারা বলেন, শিব, রাম প্রভৃতি যাঁহার প্রতিই হউক না কেন, ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, আমি সেই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত।"

তাঁহার ঢাকায় অবস্থানকালীন একদিন জনৈকা বারবনিতা, বিবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া তাহার মাতার সহিত স্বামিজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আগমন করিয়াছিল। তাহারা অশ্ব-শকট হইতে অবতরণ করিয়া দর্শন কামনা করিলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ অনেকেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। স্বামিজী এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তাঁহার নিকট আসিবার আদেশ দিলেন। তাহারা স্বামিজীকে প্রণামান্তে দণ্ডায়মানা হইলে স্বামিজী স্নেহপূর্ণস্বরে তাহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। দু'একটি কথার পর নর্তকীর জননী, তাহার কন্যা হাঁপানি রোগগ্রস্তা বলিয়া স্বামিজীর নিকট কিছু ঔষধ ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিল। স্বামিজী সহানুভূতিমিশ্রিত ব্যথিত-করুণার্দ্রস্বরে বলিলেন, "মা, দেখ আমি নিজেই হাঁপানি রোগে ভুগিতেছি, নিজের ব্যাধিই আরোগ্য করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা হয়, তোমার ব্যাধি আরোগ্য হউক, যদি ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে করিতাম।" স্বামিজীর বালকের ন্যায় সরল স্নেহপূর্ণ বচনে রমণী-দ্বয় ও উপস্থিত দর্শকবৃন্দ মোহিত হইলেন। তাহারা অবশেষে স্বামিজীর

আশীর্বাদ গ্রহণে ধন্যা হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

স্বামিজী ছুঁৎমার্গের বিরোধী ছিলেন এবং সকলের হস্ত হইতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেন বলিয়া ঢাকার অনেক গোঁড়া হিন্দু আপত্তি প্রকাশ করিতেন। স্বামিজী একদিন একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবু! আমি ফকীর সন্ন্যাসী, আমার আবার জাতিবিচার ও আচার-নিয়ম কি? শাস্ত্র বলিতেছেন, সন্ন্যাসী মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিবে, এমনকি, ভিন্নধর্মাবলম্বীর গৃহ হইতে খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিতে সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষেধ নাই।"

ঢাকা হইতে স্বামিজী সাধু নাগমহাশয়ের জন্মভূমি দেওভোগ দর্শনার্থে গমন করেন। নাগমহাশয় ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে স্বামিজী দেওভোগে আগমন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন, এতদিনে তাঁহার সে সঙ্কল্প পূর্ণ হইল; কিন্তু আজ আর নাগমহাশয় নাই! যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার কত আনন্দ হইত! দেওভোগে উপস্থিত হইয়া স্বামিজীর সেই তপস্বী জনকতুল্য সাধুর কত পুণ্যস্মৃতিই না মনে পড়িল!! পুণ্যচরিত ঋষির সাধনকুটীরে উপনীত হইয়া বিবেকানন্দের হৃদয় শ্রদ্ধাসম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিল। আর সতী সাধ্বী নাগমহাশয়ের সহধর্মিণী, আজ তাঁহার আনন্দের পরিসীমা নাই! তাঁহার ইষ্টদেবের দ্বিতীয়-বিগ্রহ-স্বরূপ স্বামিজী তাঁহার কুটীরে অতিথি! কেমন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন, কি দিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিবেন যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয়তম পার্ষদদের সেবার জন্য ভক্তি ও উল্লাসে গদ্‌গদ হইয়া বিবিধ প্রকার অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে স্বামিজী সদলবলে পুষ্করিণীতে স্নান করিতে চলিলেন, বালকের ন্যায় ঝম্প প্রদান করিয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন, জল ছিটাইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতে লাগিলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া কে মনে করিবে যে, ইনি সেই বেদান্তদুন্দুভিনাদে জগৎকম্পনকারী কীর্তিমান সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, এ যে সেই শ্রীরামকৃষ্ণের বড় আদরের কিশোরবয়স্ক চপল বালক! স্নানান্তে স্বামিজী নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রা—গভীর নিদ্রা; বহুদিন পর পল্লীর নিভৃত কোলে আসিয়া আজ বিবেকানন্দ সুষুপ্তিলাভ করিলেন! অনেকদিন তাঁহার সুনিদ্রা হয় নাই। কেমন করিয়া হইবে? দিবসের কর্ম-কোলাহলের অবসানে যখন তিনি শয্যায় যাইতেন, তখনই কত চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিত। সমগ্র ভারতের দুঃখ, দৈন্য, অধঃপতনের শোচনীয় চিত্রগুলি একে একে তাঁহার মানসপটে উদিত হইত। বিশ্বজোড়া বিশ্রামের সেই শান্তস্তব্ধক্ষণে তাঁহার ব্যথিত চিত্তে কি বেদনাবহ আলোড়ন! বিনিদ্র নয়নে বিবেকানন্দ ভাবিতেন, "তোমার দুঃখ মোচনের জন্য কি করিব মা! হায়, ভারতসন্তান আত্মবিস্মৃত, এত ডাকিয়াও যে সাড়া পাই না মা! পাঞ্জাব, বাঙলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যেদিকে তাকাই, সেইদিকেই যে জরাজীর্ণ স্থবির অবস্থা। জাতির এই জড়ত্ব ভাঙিব, এই চেষ্টায় প্রাণ দিব, সকলকে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত অভয়বাণী শুনাইব, নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারের মধ্যেও আশার আলোক আনিতে চেষ্টা করিব; চেষ্টা উদ্যম ব্যর্থ হউক, শতবার বিফল হউক, উদ্দেশ্য ছাড়িব না।" এ চিন্তাভার যাঁহার মস্তিষ্কে, তাঁহার কেমন করিয়া সুনিদ্রা হইবে?

বেলা আড়াইটার সময় সুপ্তোত্থিত বিবেকানন্দ জাগ্রত হইয়াই আহারের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সমস্তই প্রস্তুত, কেবল তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়, সেইজন্যই সকলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বহুদিন পর তাঁহার সুনিদ্রালাভ হইয়াছে বলিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে করিতে বিবেকানন্দ আহারে বসিলেন। ক্ষুধিত বালকের ন্যায় আগ্রহসহকারে ভোজন করিয়া তিনি পরম তৃপ্তি লাভ

করিলেন। অতঃপর নাগমহাশয়ের সহধর্মিণী কর্তৃক প্রদত্ত বস্ত্রখানি বহু মানসহকারে মস্তকে জড়াইয়া আনন্দ করিতে করিতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী বহুবার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে দেওভোগের গল্প শুনাইয়া আনন্দানুভব করিতেন।

একদিন ধর্মোন্মত্ততা সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়িতে একদিন একটি ছেলে একখানা কার ফটো এনে আমায় দেখালে ও বল্‌লে, 'মহাশয়, বলুন ইনি কে? অবতার কি না?' আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে বল্‌লুম, 'তা বাবা আমি কি জানি।' তিন চারবার বল্‌লেও সে ছেলেটি দেখ্‌লুম, কিছুতেই তার জেদ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হ'য়ে বল্‌তে হ'ল, 'বাবা এখন থেকে ভাল করে খেও দেও, তা'হলে মস্তিষ্কের বিকাশ হ'বে, পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে।' একথা শুনে বোধ হয় ছেলেটির অসন্তোষ হ'য়ে থাক্‌বে! তা' কি কর্‌ব বাবা, ছেলেদের এরূপ না বল্‌লে তা'রা যে ক্রমে পাগল হ'য়ে দাঁড়াবে। গুরুকে লোকে অবতার বল্‌তে পারে, যা' ইচ্ছে তাই বলে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু ভগবানের অবতার যখন তখন যেখানে সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুন্‌লাম, তিন চার্‌টি অবতার দাঁড়িয়েছে।"

ঢাকা হইতে স্বামিজী কামাখ্যা পীঠ ও চন্দ্রনাথ দর্শনে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গোয়ালপাড়া ও গৌহাটীতে কয়েকদিন বিশ্রাম করিতে হইল। গৌহাটীতে স্বামিজী তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যোগ্য ব্যক্তির অভাবে উহার কোন অনুলিপি লওয়া হয় নাই।

ঢাকাতেও স্বামিজীর শরীর ভাল ছিল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চন্দ্রনাথ হইতে স্বামিজী যখন গৌহাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা এত মন্দ যে, সঙ্গীয় ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী সমধিক চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শিলংয়ের আবহাওয়া স্বামিজীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হইবে বিবেচনা করিয়া সকলেই তাঁহাকে শিলং যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী স্বীকৃত হইয়া সদলবলে গৌহাটী হইতে শিলং অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আসামের তদানীন্তন চীফ্ কমিশনার ভারতহিতৈষী স্যার হেনরী কটন, স্বামিজীর আগমন সংবাদে তাঁহার দর্শন কামনায় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কটন সাহেবের অনুরোধে স্বামিজী একদিন একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। স্থানীয় ইউরোপীয়গণ সকলেই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন ও দেশীয় শিক্ষিত সমাজের প্রত্যেকেই আগ্রহসহকারে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে কটন সাহেব স্বামিজীকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সাহেবগণ একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার এমন সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা তাঁহারা কুত্রাপি শ্রবণ করেন নাই।

স্যার হেনরী কটন পূর্ব হইতেই স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানিতেন এবং স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। একদিন তিনি স্বামিজীর আবাসস্থলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে কথাপ্রসঙ্গে কটন সাহেব বলিলেন, "স্বামিজী! ইউরোপ-আমেরিকার প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া অবশেষে আপনি এই জঙ্গলে কি দেখিতে আসিয়াছেন?" স্বামিজী উচ্চহাস্য সহকারে তাঁহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আপনার মত ঋষি যেখানে বাস করে, তাহা তীর্থস্থান, আমি তীর্থদর্শনে আসিয়াছি।" স্বামিজী ও কটন সাহেবের হাস্য-পরিহাস

সহকারে, সরলভাবে কথোপকথন শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে, উভয়ের সহিত কতকালের পরিচয়, সঙ্কোচ বা সম্ভ্রমের কোন ভাব নাই, যেন দুইটি বাল্যবন্ধু বহুকাল পর একত্র হইয়াছেন। স্বামিজীর দৈহিক অবস্থা দেখিয়া কটন সাহেব স্থানীয় সিভিল সার্জন সাহেবকে তাঁহার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করিলেন। তিনি প্রত্যহ দুইবেলা স্বামিজীর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

শিলং স্বাস্থ্যকর স্থান হইলেও স্বামিজীর স্বাস্থ্যোন্নতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বরং উত্তরোত্তর অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। একদিন রাত্রিতে এত বেশী শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল যে, তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ভগ্নহৃদয়ে প্রতিমুহূর্তে দেহত্যাগের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। স্বামিজীও যেন জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া অতিকষ্টে বালিশের উপর ভর দিয়া শেষ শ্বাস পতনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন, "যদি দেহত্যাগই হয়, তাহাতেই বা কি? আমি জগৎকে বহুবর্ষ চিন্তা করিবার মত উপকরণ দিয়াছি।"

ক্রমে রাত্রি—গভীর রাত্রি, যন্ত্রণার কিছুমাত্র উপশম হইল না। জনৈক বালব্রহ্মচারী উভয়হস্তে তাঁহার মস্তক সরলভাবে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মহাপুরুষের এই রোগযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল, কি করিলে এ যন্ত্রণার উপশম হয়! সরল, ভক্তিমান বালক কাতরভাবে শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, "হে ভগবান্, দয়া করিয়া এই রোগভার আমাকে অর্পণ কর, স্বামিজী সুস্থ হইয়া উঠুন!" সহসা স্বামিজীর পদ্মপলাশলোচনদ্বয় উন্মীলিত হইল। করুণার্দ্র দৃষ্টিতে বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বৎস আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করিবার জন্যই দেহধারণ করিয়াছি, অধীর হইও না।" প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন, শ্বাসকষ্ট অন্তর্হিত হইল। উৎকণ্ঠিত শিষ্যগণ সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া স্বামিজী বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। বহুমূত্ররোগে স্বামিজী পূর্ব হইতে ভুগিতেছিলেন; এক্ষণে তাহার ফলস্বরূপ শোথ দেখা দিল। শঙ্কিত গুরুভ্রাতাগণ সত্বর সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন এবং সর্বপ্রকার কার্য হইতে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে স্বামিজী প্রচারকার্য পরিত্যাগ করিয়া মঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন, কবিরাজী চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কবিরাজী ঔষধ-সেবনে কিছু কিছু উপকার হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সামান্য জড়দেহের জন্য চিকিৎসকের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করা তাঁহার পক্ষে অতীব কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। কেহ তাঁহাকে ঔষধে রোগের উপশম হইতেছে কিনা প্রশ্ন করিলে, উত্তর করিতেন, "উপকার অপকার জানি না। গুরুভাইদের আজ্ঞা পালন করে যাচ্ছি!" তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার জন্য সকলেই বিমর্ষ, এ দৃশ্য দেখিয়া স্বামিজী সময় সময় বিচলিত হইতেন। হাস্য-কৌতুকালাপে সর্বদাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন যে, তাঁহার ব্যাধি সকলে যেরূপ ভাবিতেছেন, সেরূপ সাংঘাতিক নহে। তাঁহার জন্য অপরে কষ্টানুভব করিবে, ইহা তাঁহার একান্ত অনভিপ্রেত ছিল।

এই সময় বহুব্যক্তি তাঁহার দর্শনার্থী ও আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া মঠে আগমন করিতেন। স্বামিজী প্রত্যেকের সহিত আলাপ করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন, দেশের কল্যাণ কামনায় সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য যুবকবৃন্দকে উৎসাহিত

করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আসিলে তো কথাই নাই, স্বামিজী প্রবল আগ্রহের সহিত তাঁহাদিগের সম্মুখে ওজস্বিনী ভাষায় শক্তিসাধনার মহিমা কীর্তন করিতেন; সবল, শক্তিমান, জিতেন্দ্রিয় হইবার জন্য প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে উপদেশ প্রদান করিতেন। কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি দেশের দুর্দশা ও তাহার প্রতিকারোপায় সম্বন্ধে শিক্ষিত যুবকবৃন্দের সহিত আলোচনা করিতেন। এইরূপ আলোচনা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর জানিয়া অনেক সময়ে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ উহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইতেন; কোনদিন স্বামিজী তাঁহাদের অনুরোধে নিরস্ত হইতেন, আবার কখনও বা বিরক্তির সহিত বলিতেন, "রেখে দে তোর নিয়ম ফিয়ম! এদের মধ্যে যদি একজনও ঠিক ঠিক আদর্শ জীবন যাপন করবার জন্য প্রস্তুত হয়, তা'হলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক! পরকল্যাণে হ'লই বা দেহপাত, তাতে কি আসে যায়! চুপ করে ঘরের দোর বন্ধ করে বেঁচে থেকেই বা ফল কি? এরা কত দূর থেকে কত কষ্ট করে আমার দু'টো কথা শুনবার জন্য এসেছে, আর অমনি অমনি ফিরে যাবে? তোরা যা' পারিস্ কর, আমি জড়ের মত চুপ করে বসে থাক্‌তে পারবো না।" এখনও এই সমস্ত সৌভাগ্যবান্ যুবকগণের অনেকেই স্বামিজীর অপার দয়া, সস্নেহ ব্যবহারের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। পতিত, অধম, দুর্বল বলিয়া স্বামিজী কাহাকেও উপহাস বা অবজ্ঞা করিতেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে কেহই অনধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইত না। কেহ কেহ অতীতের অনাচার ব্যক্ত করিয়া অনুতাপ করিলে স্বামিজী ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেন, "ছিঃ, তুমি আপনাকে দুর্বল বা দোষযুক্ত মনে করিতেছ কেন? যাহা করিয়াছ ভালই করিয়াছ, এক্ষণে আরও ভাল হও।" যাঁহারা জীবনে অন্ততঃ একবারও এই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছেন, ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত আশা ও ভরসার বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককেই আমরা বহুবার বলিতে শুনিয়াছি, "কত বড় বড় পণ্ডিত, বক্তা, সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলাম, কিন্তু বিবেকানন্দের ন্যায় সহৃদয় ব্যথার ব্যথী, দরিদ্র পতিত কাঙ্গালের বন্ধু আর একজনও এ পর্যন্ত চোখে পড়িল না।"

বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিকে সর্বপ্রকার পরিশ্রম হইতে বিরত রাখা বাস্তবিকই অসাধ্য ব্যাপার ছিল। অন্য কোন কথা দূরে থাক, এইকালে তিনি একমাত্র পুস্তক অধ্যয়ন-কল্পে যে কি কঠোর পরিশ্রম করিতেন, তাহা ভাবিতে গেলেও অবাক হইতে হয়। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' সঙ্কলয়িতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী উক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন, "কবিরাজী ঔষধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে গিয়া, স্বামিজীর এখন আহার নিদ্রা নাই এবং নিদ্রাদেবী তাঁহাকে বহুকাল হইল একরূপ ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু এই অনাহার অনিদ্রাতেও স্বামিজীর শ্রমের বিরাম নাই। কয়েকদিন হইল মঠে নূতন 'Encyclopaedia Britannica' কেনা হইয়াছে। নূতন ঝক্‌ঝকে বইগুলি দেখিয়া শিষ্য স্বামিজীকে বলিল, 'এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।' শিষ্য তখনও জানে না যে, স্বামিজী ঐ বইগুলির দশখণ্ড ইতিমধ্যে পড়িয়া শেষ করিয়া একাদশ-খণ্ডখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্বামিজী। কি বল্‌ছিস্? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, সব বলে দেব।

শিষ্য অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন?'

স্বামিজী। না পড়্‌লে কি আর বল্‌ছি?

অনন্তর স্বামিজীর আদেশ পাইয়া শিষ্য ঐ সকল পুস্তক হইতে বাছিয়া বাছিয়া কঠিন কঠিন বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয়,

স্বামিজী ঐ বিষয়গুলির পুস্তকনিবদ্ধ মর্ম তো বলিলেনই, তাহার উপর স্থানে স্থানে ঐ পুস্তকের ভাষা পর্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শিষ্য ঐ বৃহৎ দশখণ্ড পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই দুই একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিল এবং স্বামিজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অবাক হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল, 'ইহা মানুষের শক্তি নয়।'

স্বামিজী। দেখ্‌লি, একমাত্র ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক ঠিক কর্‌তে পার্‌লে, সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে গেল।"

ক্রমে জুলাই ও আগষ্ট মাস অতিবাহিত হইল। স্বামিজীর স্বাস্থ্য এই কালে পূর্বাপেক্ষা কিছুটা উন্নত হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় মঠ হইতে বড় রাস্তায় ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। এইরূপ ভ্রমণকালে কখনও কখনও তাঁহার গুরুভ্রাতা বা শিষ্যগণ সংগী হইতেন, স্বামিজী তাঁহাদের সহিত নানাপ্রকার আলোচনা করিতেন, কখনও বা গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া সংগীদিগের সহিত উদাসীনবৎ ব্যবহার করিতেন। মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে স্বামিজীর নিরন্তর উপস্থিতিই একাধারে প্রচুর শিক্ষালাভ ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের বিষয় ছিল। তিনি কখনও বা মঠের গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় কোন কোন কর্ম স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, জমি কোপাইয়া ফলফুলের বীজ রোপণ করিতেন, আবার অনেক সময় উৎসাহের সহিত রন্ধন করিয়া সন্ন্যাসীবৃন্দকে ভোজন করাইয়া আনন্দানুভব করিতেন। মঠে স্বামিজীর আড়ম্বরহীন জীবনযাপন প্রণালী ও এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যানুষ্ঠান, তরুণ সন্ন্যাসিগণ পরমশিক্ষার দিক দিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন!

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে হিন্দুসমাজের দৃষ্টিও এই প্রতিষ্ঠানটির উপর পতিত হইল। সন্ন্যাসিগণের উদারভাব, দেশাচার ও লোকাচার-সম্মত কতকগুলি আচার-নিয়মের প্রতি ঔদাসীন্য, বিশেষতঃ আহার সম্বন্ধে জন্মগত ও জাতিগত ভেদবুদ্ধি এককালে পরিবর্জন, এই সমস্ত বিষয় লইয়া নানাস্থানে আলোচনা চলিতে লাগিল। বিলাত-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ ও তৎসঙ্গিগণের কার্যকলাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলীক কাহিনীসকল রচিত হইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত কুৎসায় বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ, আচারসর্বস্ব অনেকে স্বামিজীর মহান্ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া অযথা নিন্দাবাদ করিত। "চল্‌তি নৌকোর আরোহিগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টাতামাসা করিত, এমনকি; সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসার অবতারণা করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামিজীর অমল-ধবল চরিত্র আলোচনাতেও কুণ্ঠিত হইত না।" ভক্তগণ অনেকেই মঠে আগমনকালে এই সমস্ত সমালোচনা শ্রবণ করিতেন। কেহ কেহ ব্যথিত হৃদয়ে উহা স্বামিজীর নিকট ব্যক্ত করিতেন। স্বামিজী উপেক্ষার সহিত উত্তর করিতেন, "হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভূঁখে হাজার। সাধুওঁকো দুর্ভাব নহী, যব্ নিন্দে সংসার।" কখনও বলিতেন, "দেশে কোন নূতন ভাব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীন পন্থাবলম্বিগণের অভ্যুত্থান প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্মসংস্থাপক মাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে. Persecution (অন্যায় অত্যাচার) না হইলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।" সুতরাং ইতরসাধারণের তীব্র সমালোচনা ও কুৎসা রটনায় স্বামিজী বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না এবং ঐগুলিকে তিনি তাঁহার নবভাব প্রচারের সহায়ক বলিয়া উহার বিরুদ্ধে কোন-

প্রকার প্রতিবাদ পর্যন্ত করিতেন না; এমনকি, তাঁহার পদাশ্রিত সন্ন্যাসী ও গৃহিগণকে পর্যন্ত কোনপ্রকার প্রতিবাদ করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি কেবল বলিতেন, "ফলাভিসন্ধিহীন হ'য়ে কাজ করে যা, একদিন উহার ফল নিশ্চয়ই ফল্‌বে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

স্বামিজীর দেহাবসানের পূর্বেই গোঁড়া হিন্দুদের এই ভ্রম অনেকাংশে অন্তর্হিত হয় এবং এই বৎসর স্বামিজী মঠে শাস্ত্রমতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করায় অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি স্ব স্ব ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

স্বামিজী বর্তমান সমাজের সংকীর্ণতাপ্রসূত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কতকগুলি আচার-নিয়মের তীব্র সমালোচনা করিতেন এবং ঐ সমস্ত আচার-নিয়মের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া উদার ও প্রশস্ততর ভিত্তির উপর সামাজিক জীবনকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিতেন। অর্থহীন 'ছুঁৎমার্গের' উপর তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি উদার-মতাবলম্বী হইলেও, ধর্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানগুলি শাস্ত্রনির্দেশানুযায়ী যাহাতে অনুষ্ঠিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ১৯০১ সালে স্বামিজীর অভিপ্রায়ে মঠে দুর্গোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় অধিকাংশ পূজাগুলিই অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামিজীর সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ তাঁহার গুরুভ্রাতা এবং শিষ্যবৃন্দ মহোৎসাহে পূজোপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর কোনপ্রকার পূজা বা ক্রিয়া 'সংকল্প' করিয়া করিবার অধিকার নাই, অতএব স্বামিজী শ্রীশ্রীমার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহার নামেই সংকল্প হইবে বলিয়া অনুমতি প্রদান করিলে পর স্বামিজীর আনন্দের সীমা রহিল না। যথাসময়ে কুমারটুলি হইতে প্রতিমা মঠে আনীত হইল। পূজার পূর্বদিন শ্রীশ্রীমা তাঁহার বাগবাজারের আবাসবাটী হইতে মঠে আগমন করিলেন। তাঁহার অনুমতি লইয়া ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ সপ্তমীর দিনে পূজকের আসনে উপবেশন করিলেন। কৌলাগ্রণী তন্ত্রমন্ত্রকোবিদ্ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ও শ্রীশ্রীমার আদেশে সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করিলেন। যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্বাহিত হইল, কেবল শ্রীশ্রীমার অনভিমত বলিয়া মঠে পশুবলিদান হইল না। বলির অনুকল্পে চিনির নৈবেদ্য ও স্তূপীকৃত মিষ্টান্নের রাশি প্রতিমার উভয় পার্শ্বে শোভা পাইতে লাগিল।

"গরীব, দুঃখী, কাঙ্গালগণকে দেহধারী ঈশ্বর-জ্ঞানে পরিতোষ করিয়া ভোজন করান এই পূজার প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বেলুড় বালী ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও সকলে আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। তদবধি মঠের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া ধারণা জন্মে যে, মঠের সন্ন্যাসীরা যথার্থ হিন্দু-সন্ন্যাসী।"*

দুর্গোৎসবের পর স্বামিজীর অভিপ্রায়ানুযায়ী মঠে প্রতিমা সহযোগে লক্ষ্মীপূজা ও শ্যামাপূজাও যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইল। শ্যামাপূজার পর স্বামিজী স্বীয় জননীর সহিত কালীঘাটে গমন করেন। বাল্যকালে স্বামিজীর একবার কঠিন পীড়া হয়, তখন তাঁহার জননী 'মানত' করেন যে, পুত্র আরোগ্য হইলে কালীঘাটে

---

* স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

বিশেষ পূজা নিবেদন ও শ্রীমন্দিরে তাঁহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইয়া আনিবেন; পরে ঐ কথা আর তাঁহার স্মরণ ছিল না, ইদানীং স্বামিজীর অসুস্থতার কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ঐ কথা জানাইয়া পুত্রকে সংবাদ দিলেন। জননীর আদেশানুযায়ী স্বামিজী কালীঘাটের আদি গঙ্গায় অবগাহন করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভক্তিভরে শ্রীশ্রীকালীমাতার পাপপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দিলেন। অতঃপর সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করিয়া তিনি নাট-মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে উপবিষ্ট হইয়া হোম আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। হোম-কুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রদানরত কন্দর্পকান্তি সন্ন্যাসী যেন দ্বিতীয় ব্রহ্মাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। বহু লোক স্বামিজীকে ঘিরিয়া তাঁহার যজ্ঞসম্পাদন দর্শন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী মঠে ফিরিয়া আসিয়া আনন্দের সহিত বলিলেন, “কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখ্‌লুম। আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত ‘বিবেকানন্দ’ বলে জেনেও পূজারীরা মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধাই দেন নাই, বরং পরম সমাদরে মন্দির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছা পূজা করতে সাহায্য করেছিলেন।”

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হইয়াও স্বামিজী এইরূপে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পন্থানুযায়ী মূর্তিপূজা ও দেবদেবীর আরাধনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহার মধ্যেও গভীর সত্য নিহিত আছে। হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্মকে কাটিয়া ছাঁটিয়া জোড়াতালি দিয়া মনোমত করিয়া গড়িবার চেষ্টা তিনি কখনও করেন নাই, বরং তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, “আমি শাস্ত্রমর্যাদা নষ্ট করিতে আসি নাই, পূর্ণ করিতেই আসিয়াছি”—“I have come to fulfil, not to destroy.”

অক্টোবর মাসে পুনরায় ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল, স্বামিজী শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কলিকাতার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ডাক্তার মিঃ স্যাণ্ডার্স চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সর্বপ্রকার মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ হইল। যাহাতে স্বামিজী কোন গভীর ও জটিল তত্ত্বের আলোচনা না করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে মঠের সন্ন্যাসিগণ সাবধান হইলেন। কিছুদিন পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেও স্বামিজী, পদে পদে গুরুভ্রাতাগণের বাধায় ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা আগন্তুক ভদ্রলোকগণের সহিত স্বামিজীকে অধিকক্ষণ বাক্যালাপ ইত্যাদি করিতে দিতেন না। স্বামিজীর দেহ থাকিলে উত্তরকালে জগতের প্রভূত কল্যাণ হইবে, এই বিশ্বাসেই তাঁহারা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিবেকানন্দ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার লোক নহেন, অবসর ও সুবিধা পাইলেই মঠের গৃহস্থালির ছোট ছোট কাজগুলি স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া আনন্দ বোধ করিতেন। কখনও বা মধুরকণ্ঠে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম উদ্দীপিত করিতেন। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় গম্ভীরস্বরে অতীত-যুগের ঋষিগণের ন্যায় পবিত্র বেদমন্ত্র সকল আবৃত্তি করিতেন, কখনও বা বালকের ন্যায় চপলতার সহিত হাস্যকৌতুকে রত হইতেন, আবার কখনও বা বহুক্ষণ যাবৎ পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন।

শারীরিক অসুস্থতায় পূর্ণ উদ্যমে নবযুগের বার্তা প্রচার করিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি সময় সময় গভীর ক্ষোভের সহিত বিমনায়মান হইয়া বসিয়া থাকিতেন। তিনি চাহিতেন—A band of young Bengal. একদল জোয়ান বাঙ্গালী ছেলে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, কয়েকটি চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, পরার্থে সর্বত্যাগী ও আজ্ঞানুবর্তী যুবক পাইলে তিনি দেশের চিন্তা ও চেষ্টাকে নূতন পথে চালনা করিয়া দিতে পারেন। মুখভাব তমোপূর্ণ, হৃদয় উদ্যমশূন্য, শরীর

অপটু যুবকদের অবস্থা দেখিয়া তিনি আক্ষেপের সহিত কত কথাই না বলিতেন। বিশেষ, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে যুবকগণের উর্বর মস্তিষ্কগুলি এমনভাবে গঠিত হইয়া ওঠে যে, উচ্চ উচ্চ ভাব ধারণের পক্ষে সেগুলি একান্ত অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ উচ্চভাবসকল ধারণা করিতে সক্ষম হইলেও মজ্জাগত দুর্বলতার জন্য কার্যক্ষেত্রে উহার বিকাশ করিতে পারেন না। "বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতার আদর্শ" দেশের যুবকবৃন্দের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদিগকে নবীনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে; অত্যধিক কল্পনাপ্রিয়, বিলাসলোলুপ, বিকৃত-বুদ্ধি-সম্পন্ন, দুর্বল মস্তিষ্ক-গুলিকে সতেজ সবল করিয়া তুলিতে হইবে। ব্যায়ামাদি শারীরিক পরিশ্রম সহায়ে দেহকে সবল, সুস্থ, লৌহপেশীবিশিষ্ট করিতে হইবে। পুরুষ পুরুষের মতই হইবে, চেষ্টা করিয়া স্ত্রীলোক হইবে কেন? মর্মান্তিক দুঃখের সহিত বিবেকানন্দ ইহাই ভাবিতেন। বীরভাব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বাঙ্গলাদেশে মহাবীর হনুমানের পূজা চালাইতে চাহিয়াছিলেন। স্বামিজী বলিতেন, "মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ কর্‌তে হবে। দেখ্‌না রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেল! জীবনে-মরণে দৃক্‌পাত নাই, মহা জিতেন্দ্রিয়, মহা বুদ্ধিমান! দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠিত কর্‌তে হবে। ঐরূপ হ'লেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা-আপনি হ'য়ে যাবে, দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রহ্মচর্য রক্ষা, এই হচ্ছে Secret of success (কৃতী হ'বার একমাত্র গূঢ়োপায়). নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (অবলম্বন করবার দ্বিতীয় পথ নাই)। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব, অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোক-সন্ত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না! রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশ পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত! ঐরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই! খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্ফ করে দেশটা উচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। একে তো এই dyspeptic (পেটরোগা) রোগীর দল, তাতে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখবি খোল করতালই বাজছে! ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরী ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানুষী বাজনা শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হ'য়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? কবিকল্পনাও এ ছবি আঁক্‌তে হার মেনে যায়! ডমরু, শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্‌ ব্যোম্‌' শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত কর্‌তে হ'বে। যে সব music-এ (গীতবাদ্য) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখ্‌তে হবে। খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণ সঞ্চার কর্‌তে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আন্‌তে হবে।"

১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলিকাতায় জাতীয়-মহাসমিতির অধিবেশন হয়। তদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধিবর্গ তথায় আগমন করিয়াছিলেন। স্বামিজী বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া প্রত্যহ তাঁহারা দলে দলে মঠে আগমন করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গের অনেকেই তাঁহাকে নব্যভারতের অন্যতম নেতা বলিয়া

CC0. In Public Domain. Shri Shri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

শ্রদ্ধা করিতেন।* এই সমস্ত নেতৃগণের সহিত স্বামিজী ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন। দেশের বর্তমান দুরবস্থা ও অভাবের প্রতিকারোপায় সম্বন্ধে স্বামিজীর সিদ্ধান্তগুলি অনেকেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। সকলেই জানেন, তৎকালীন আবেদন নিবেদনমূলক রাজনৈতিক আন্দোলনে শক্তির অপচয় ব্যতীত বিশেষ কিছু লাভ হইবে না, ইহা স্বামিজী মুক্তকণ্ঠে বলিতেন। বলিতেন, বৃটিশ-শাসনতন্ত্র একটা যন্ত্র; যন্ত্রের হৃদয় নাই। ইহার নিকট সুবিধার প্রার্থনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই সময়ে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামিজী! কংগ্রেস সম্বন্ধে আপনার মত কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, যাহাতে সমগ্র ভারতে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়, এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান মন্দ নহে।"

স্বামিজী দেহরক্ষা করার পর এই সময়ের কথা আলোচনা করিয়া লক্ষ্ণৌর 'অ্যাড্‌ভোকেট' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

"গত কংগ্রেসের সময় সর্বশেষবার তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম। বিশুদ্ধ ও সাধু হিন্দীভাষায় তিনি অনর্গল আলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথিত হিন্দীভাষা যে-কোনা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসীকে গৌরবান্বিত করিতে পারিত। তিনি যখন ভারতের পুনরুত্থানকল্পে তাঁহার সংকল্পগুলির কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল।"

স্বামিজী কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের সহিত একটি বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে প্রাচীন আর্যগণের আদর্শানুযায়ী আচার্য ও প্রচারক সন্ন্যাসী গঠন করিয়া তোলা হইবে, সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, বেদ, উপনিষদ্ ইত্যাদি শিক্ষাপ্রদান করা হইবে। স্বামিজীর প্রস্তাবিত বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সহিত অনেকেই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সাধ্যমত সাহায্য করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আর একজন কংগ্রেসের প্রতিনিধি লিখিয়াছেন—

"কলিকাতায় একটি বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার তাঁহার (স্বামিজীর) শেষ আশাটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার দেহাবসানের কয়েকমাস পূর্বে খৃষ্টমাস-পর্বদিনে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে প্রতিনিধিবর্গ, সংস্কারকগণ, অধ্যাপকবৃন্দ ও বিভিন্ন বিভাগের মহস্ব্যক্তিগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। অনেকেই কলিকাতায় অবস্থানকালীন, স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনকল্পে প্রত্যহ অপরাহ্ণে বেলুড় মঠে গমন করিতেন। স্বামিজী সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রচুর শিক্ষাদান করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সভাগুলি একটি কংগ্রেসের আকারই ধারণ করিত, এমনকি, আদর্শের দিক দিয়া তদপেক্ষাও উন্নত এবং হিতকর হইত। কলিকাতায় বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাবে উপস্থিত প্রত্যেকেই যথাশক্তি সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সংকল্প কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।"

একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিবার সংকল্প তাঁহার বহুদিন হইতেই ছিল। প্রচুর অর্থ এবং কয়েকজন চরিত্রবান্, ধার্মিক ও বেদজ্ঞ অধ্যাপকের প্রয়োজন, ইহা

---

* এই সময় একদিন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আগত মহাত্মা গান্ধী স্বামিজীর সহিত দেখা করিবার জন্য বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন। সেদিন অপরাহ্ণে স্বামিজী বাগবাজারে ছিলেন বলিয়া সাক্ষাৎ হয় নাই। এই কথাটি গান্ধীজী স্বয়ং আমাকে বলিয়াছিলেন।—গ্রন্থকার।

বুঝিয়া স্বামিজী সহসা এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন নাই; কিন্তু জীবনের শেষভাগে এই বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ অতীব বর্ধিত হইয়াছিল। তিনি গুরুভ্রাতাগণের সহিত যুক্তি করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া মঠেই ক্ষুদ্রভাবে একজন উপযুক্ত পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে একটি শিক্ষালয় স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, এমনকি, স্বামী ত্রিগুণাতীতকে 'উদ্বোধন প্রেস' বিক্রয় করিবার উপদেশ দিলেন। প্রেস বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা উক্ত বিদ্যালয় স্থাপনকল্পে জমা রাখা হইল। দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেই এই সংকল্প লইয়া তিনি সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন: কিন্তু কয়েকমাস পরেই তাঁহার দেহত্যাগ হওয়ায় সমস্ত ব্যবস্থা ওলটপালট হইয়া গেল। যাহা হউক, কয়েক বৎসর হইল (১৯১৫-১৬) বেলুড় মঠের ভূতপূর্ব সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজীর চেষ্টা ও যত্নে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে মঠবাটীতে রাখা হইয়াছে। উঁহার নিকট ব্রহ্মচারিগণ নিয়মিতরূপে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। স্বামিজীর সংকল্পের সহিত তুলনায় এ অনুষ্ঠানটি ক্ষুদ্র হইলেও তুচ্ছ নহে।

এই বৎসরের শেষভাগে জাপান হইতে দুইজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত বেলুড় মঠে আগমন করেন। জাপানে একটি ধর্মমহাসভা আহবান করিবার সংকল্প লইয়া ইঁহারা বিশেষভাবে স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আগমন করিয়াছিলেন। জাপানের একটি বৌদ্ধ মঠের অন্যতম নায়ক রেভাঃ ওডা, স্বামিজীকে বলিলেন, "আপনার মত খ্যাতনামা ব্যক্তি যদি সহায় হন, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হইবে। জাপানে ধর্মসংস্কার বর্তমান সময়ে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আপনার মত শক্তিমান আচার্য ব্যতীত উহা আর কাহার দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে?" রেভাঃ ওডার আহবানের মধ্যে তিনি যেন প্রাচ্যের পুনরভ্যুত্থানের বার্তা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গী ডাঃ ওকাকুরার পাণ্ডিত্য ও জাপানের সহিত ভারতের ভাববিনিময়ের আগ্রহ দর্শনে স্বামিজী আনন্দে অধীর হইলেন। একই ভাবের ভাবুক, দুইজন আত্মার আত্মীয়। তিনি প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার পথে, জাপানের উন্নতি ও আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে বলবীর্যলাভ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, ভারতীয় যুবকদের সম্মুখে জাপানকে আদর্শরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন। ডাঃ ওকাকুরা স্বামিজীকে যন্ত্রবিজ্ঞানের দিক দিয়া সমুন্নত জাপানে আধ্যাত্মিকতার অভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা করিয়া, উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। স্বামিজী অপ্রত্যাশিতভাবে ডাঃ ওকাকুরাকে পাইয়া মিস্ ম্যাক্লাউডকে বলিলেন, "পৃথিবীর দুই প্রান্ত হইতে আমরা দুইটি ভ্রাতা যেন পুনরায় মিলিত হইয়াছি।"

স্বামিজীর পাণ্ডিত্য ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া ইঁহারা মঠেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামিজী প্রত্যহ ভগবান্ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে ইঁহাদের সহিত আলোচনা করিতেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বৌদ্ধদর্শনকে হিন্দুদর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া যে মন্তব্যগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, স্বামিজী সেগুলি খণ্ডন করিয়া দেখাইতেন যে, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান হইলেও বুদ্ধদেবের উপদেশগুলির অধিকাংশের সহিতই উপনিষদের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। ফলতঃ উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডের উপরই বৌদ্ধদর্শনের ভিত্তি। জাপানী পণ্ডিতগণ স্বামিজীর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, এই সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় অধিকাংশ গ্রন্থই যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা স্বামিজীকে বৌদ্ধ-

শ্রমণ বলিবেন, না হিন্দুসন্ন্যাসী বলিবেন, সময় সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না।

কিছুদিন পর ১৯০২-এর জানুয়ারী মাসে স্বামিজী ডাঃ ওকাকুরার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত বুদ্ধগয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তথা হইতে কাশীধামে গিয়া উভয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করিবেন, ইহাও স্থির হইল। স্বামিজীর পরিব্রাজক জীবনের ইহাই সর্বশেষ ভ্রমণ।

বহুদিন পর তাঁহার ৩৯তম জন্মদিবসে বিবেকানন্দ আজ আবার সেই পবিত্র বোধিদ্রুমমূলে পদ্মাসনে ধ্যানস্থ! তীব্র বৈরাগ্যের তাড়নায় বালক শ্রীনরেন্দ্রনাথ একদিন এই বোধিদ্রুমমূলে সত্যলাভের কামনায় ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সে সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, উন্মাদের ন্যায় ছুটাছুটি করিলে কিছু হইবে না। যে মহাপুরুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তিনি এতদূরে ছুটিয়া আসিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার বিশ্বশোষী পিপাসার অমৃতবারি একমাত্র সেইখানেই আছে। সে একদিন, যেদিন তাঁহার জীবনের প্রথম উষার উদ্ভিন্ন আলোকে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আজ এই শান্ত স্তব্ধ মহিমময় জীবন-সন্ধ্যায় তাহা কি তাঁহার মনে পড়ে নাই? তাঁহার জীবনের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা তো প্রাণপণে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তবু আজও তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারেন নাই কেন? পাঠক, একবার কল্পনানেত্রে ভগবান্ বুদ্ধদেবের পবিত্র সাধন-পীঠে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর করুণা-কাতর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত কর। বুঝিতে পারিবে, এ ধ্যান, এ সাধন নিজের মুক্তি-কামনায় নহে। একটা উৎপীড়িত, উপেক্ষিত, দরিদ্র, পতিত জাতির প্রতিনিধিরূপে ত্রিশকোটি মানবের কাতর আর্তনাদের অসীম প্রতিধ্বনি বক্ষে ধারণ করিয়া তিনি বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানাসীন! এই সিদ্ধাসনে বহুদিন পূর্বে আর এক মহাপুরুষ নিখিলের দুঃখ-দূরীকরণ মানসে ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন, ভারতের অতীত ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন! আর একদিন আসিবে, যেদিন ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাঁহাদের মহিমাসমুজ্জ্বল অতীত ইতিহাসে এই দিনটিকেও স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবেন।

বুদ্ধগয়া মঠের মোহান্ত মহারাজ স্বামিজীর খ্যাতির কথা বহুদিন হইতে শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে অতিথিরূপে লাভ করিয়া মোহান্তজীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। যাহাতে স্বামিজীর কোন অসুবিধা না হয়, তদ্বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। স্বামিজী কয়েকদিন ধ্যানানন্দে অতিবাহিত করিয়া জাপানী বন্ধুদ্বয়ের সহিত বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

স্বামিজীর জ্বলন্ত উপদেশ ও শিক্ষায়, উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়া কয়েকজন বাঙ্গালী যুবক একত্র হইয়া অনাথ, রোগগ্রস্ত, সম্বলহীন তীর্থযাত্রিগণের সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। একটি ছোটবাড়ি ভাড়া লইয়া তাঁহারা রাজপথ ও গঙ্গার ঘাট হইতে স্থবির, রুগ্ন নরনারিগণকে বহন করিয়া তথায় লইয়া যাইতেন এবং সাধ্যমত ঔষধ, পথ্য, সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহাদের কষ্ট লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত নারায়ণজ্ঞানে দরিদ্রের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী যুবকবৃন্দের অবিচলিত দৃঢ়তা দেখিয়া স্বামিজী আনন্দিত হইলেন। বেলুড় মঠে বসিয়া তাঁহার আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে এ পর্যন্ত কেহ আসিতেছে না বলিয়া সময়ে সময়ে যে দুঃখ প্রকাশ করিতেন, আজ এই মুষ্টিমেয় যুবকের সেবা দেখিয়া তাঁহার সে দুঃখ অনেকাংশে দূর হইল! তিনি গর্ব ও আনন্দের

সহিত তাঁহার মানসপুত্রগণের নরনারায়ণ-সেবা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "বৎসগণ! তোমরা প্রকৃত পন্থা বুঝিয়াছ! আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ সর্বদা তোমাদের কল্যাণ করুক্! সাহসের সহিত অগ্রসর হও! তোমরা দরিদ্র বলিয়া হতাশ হইও না, অর্থ আসিবে। তোমাদের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের ভিত্তির উপর ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা তোমাদের এই বর্তমান প্রিয়তম কল্পনাগুলিকেও ছাড়াইয়া যাইবে।" স্বামিজী এই অভিনব 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের' প্রথম রিপোর্টসহ সাধারণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদনপত্র লিখিয়া দিলেন। স্বামিজীর নিকট উৎসাহ ও আশীর্বাদ লাভ করিয়া যুবকগণের উৎসাহ শতগুণে বর্ধিত হইল। কাশীধামে সেবাধর্মের স্বর্ণ-সৌধের ভিত্তি চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল! তারপর কত বাধাবিপত্তি অসুবিধার সহিত যুদ্ধ করিয়া সেবাশ্রম বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, বহু সেবাব্রতীর আত্মোৎসর্গের সে সুদীর্ঘ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার ইহা উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে। স্বামিজীর ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইয়াছে! তারপর ভারতের নানাস্থানে 'সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! ত্যাগী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণ নীরবে নারায়ণজ্ঞানে রোগীর সেবা করিয়া নিজে ধন্য হইতেছেন, দেশকে ধন্য করিতেছেন! কাশী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম চারুচন্দ্র দাস, যিনি আজীবন সমান উৎসাহে এই প্রতিষ্ঠানটির সেবা করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন, সেই বিবেকানন্দগত-প্রাণ, খ্যাতিলোভহীন স্বদেশ-সেবক নীরবকর্মী, বাঙ্গালী বলিয়া আমরা কি আজ গর্ব অনুভব করিব না?

নবপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠের যে সমস্ত সন্ন্যাসী সেবাব্রতকে মুক্তির অন্যতম পন্থা জানিয়া 'নারায়ণ' সেবায় প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন, কেবলমাত্র স্বামিজীর ওজস্বী উপদেশ হইতেই তাঁহারা জাতির কল্যাণকল্পে আত্মোৎসর্গ করিবার দিব্যপ্রেরণা লাভ করেন নাই। তাঁহারা আদর্শরূপে পাইয়াছিলেন বিবেকানন্দের জীবন, যাঁহার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মগুলির মধ্যেও এই সেবার ভাব ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত থাকিত! কেমন করিয়া দরিদ্র, পতিত, কাঙ্গালের হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া দিয়া তাহাদের দুঃখ-দৈন্য-ব্যথা অনুভব করিতে হয়, তারপর কৃতজ্ঞ-চিত্তে অসীম নিষ্ঠার সহিত তাহার প্রতিকারোপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বহুবার স্বামিজীর জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

১৯০১ সালের শেষভাগে, স্বামিজীর বুদ্ধগয়া যাত্রার কিছুদিন পূর্বে বেলুড় মঠে একটি মর্মস্পর্শী ঘটনায় দীন-দরিদ্রের প্রতি তাঁহার অপার করুণার স্মৃতি সেবাব্রতী কর্মীদের হৃদয়ে চিরজাগ্রত থাকিবে।

মঠের জমি সাফ করিতে প্রতিবর্ষেই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামিজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন! একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। স্বামিজী তামাক খাইতে খাইতে সেদিন সাঁওতালদের সঙ্গে এমন গল্প জুড়িয়াছেন যে স্বামী সুবোধানন্দ আসিয়া তাঁহাকে ঐ সকল ব্যক্তির আগমন সংবাদ দিলে বলিলেন, 'আমি এখন দেখা করিতে পারিব না, এদের নিয়ে বেশ আছি'। বাস্তবিকই সেদিন স্বামিজী ঐ সকল দীন-দুঃখী সাঁওতালদের ছাড়িয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন না। সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কেষ্টা। স্বামিজী কেষ্টাকে বড়ই ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখনও কখনও স্বামিজীকে বলিত, 'ওরে স্বামী বাপ, তুই আমাদের

কাজের বেলায় এখানকে আসিস না, তোর সঙ্গে কথা বল্‌লে আমাদের কাজ বন্ধ হ'য়ে যায়; আর বুড়ো বাবা এসে বকে।' কথা শুনিয়া স্বামিজীর চোখ ছল ছল করিত এবং বলিতেন, 'না—না বুড়ো বাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বকবে না, তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল'—বলিয়া তাহাদের সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামিজী কেষ্টাকে বলিলেন, "ওরে তোরা আমাদের এখানে খাবি?" কেষ্টা বলিল, "আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন খাই না, এখন যে বিয়ে হ'য়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে যে জাত যাবে রে বাপ্।" স্বামিজী বলিলেন, "নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবে, তা' হলে তো খাবি?" কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামিজীর আদেশে মঠে সেই সকল সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারী, মিঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদির জোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদিগকে বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল, "হাঁরে স্বামী বাপ্—তোরা এমন জিনিসটা কোথায় পেলি, হামরা এমনটা কখনো খাইনি।" স্বামিজী তাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, "তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হ'ল।" স্বামিজী যে নারায়ণ-সেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওতালেরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামিজী শিষ্যকে বলিলেন, "এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরলচিত্ত—এমন অকপট, অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি।" অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ্ এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর কর্‌তে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হ'ল? পরহিতায় সর্বস্ব সমর্পণ, এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিস কখনও কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছে হয়, মঠ-ফঠ সব বিক্রী করে দেই এই সব গরীব দুঃখী, দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে বিলিয়ে। আমরা তো গাছতলা সার করেছি। আহা, দেশের লোক খেতে পর্‌তে পাচ্ছে না—আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুল্‌ছি? * * * দেশের লোক দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না দেখে, এক এক সময় মনে হয়, ফেলে দেই তোর শাঁখ বাজান, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দেই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হ'বার চেষ্টা, সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে, কড়ি পাতি জোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

"আহা দেশের গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর, মুদ্দফরাস, একদিন কাজ বন্ধ করলে সহরে হাহাকার উঠে যায়, তা'দের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাই রে! এই দেখ্ না হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পারিয়া কৃশ্চিয়ান হ'য়ে যাচ্ছে। মনে করিস্‌নি, কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি, 'ছুঁস্‌নে' 'ছুঁস্‌নে'। দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ্? কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝেঁটা—মার্ লাথি! ইচ্ছা হয়, তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত, কাঙ্গাল দীন-দরিদ্র আছিস্' বলে, তা'দের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠ্‌লে মা জাগ্‌বেন না। আমরা এদের

অন্নবস্ত্রের সুবিধা করতে পারলুম না, তবে আর কি রইল? হায়! এরা দুনিয়াদারীর কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে, সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে, আমি দিব্যচক্ষে দেখ্ছি, এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হ'লে, কোনও দেশ কোনকালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না, ইহা নিশ্চিত জান্বি।"

স্বামিজী স্বীয় কর্ম-জীবনে এই ক্লান্তিহীন সেবাব্রতকে প্রকটিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই না আজ তাঁহার আবেগাকুল আহ্বানে জাতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে? তাই না 'ভীরু বাঙ্গালী' তাহার শতাব্দীর দৌর্বল্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া দুর্ভিক্ষ, বন্যা, প্লেগ, মহামারীর সহিত সংগ্রাম করিতেছে, আর আগামী ভবিষ্যৎ যুগের বক্ষে যে দিন এই মহাপুরুষের ঈপ্সিত সেবাব্রতী শূরবীরগণ আবির্ভূত হইয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন, সেদিনও অদূরবর্তী বলিয়া বোধ হইতেছে। কবির ভবিষ্যদ্বাণী—

"বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,
বাঙ্গালীর ছেলে, বাঘে ও বলদে ঘটাবে সমন্বয়।"

নিশ্চয় সার্থক হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব নিকটবর্তী বলিয়া স্বামিজী কাশী হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কাশীর জলবায়ুর গুণে স্বামিজী কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু মঠে আসিয়া রোগ এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের দিন সমস্ত আনন্দ-কোলাহলের উপর একটা বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। অনেকেই স্বামিজীর দর্শন-কামনায় আগমন করিয়াছিলেন, সঙ্কল্প সিদ্ধির কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহারা হতাশ হইলেন। স্বামিজী সর্বসাধারণের মধ্যে বহির্গত হইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভাতে দুই চারজন আগন্তুকের সহিত বাক্যালাপ করিয়া এত ক্লান্তিবোধ করিলেন যে, তাঁহাকে আর বাহিরে আসিতে দেওয়া হইল না।

মঠের বিশাল প্রাঙ্গণ জনপূর্ণ। কোথাও বা কীর্তন হইতেছে, কোথাও বা প্রসাদ বিতরণ হইতেছে। এ আনন্দোৎসবে স্বামিজী যোগদান করিতে পারিলেন না ভাবিয়া অনেকেই বিষণ্ণ হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী সেদিন স্বামিজীর নিকট বসিয়াছিলেন। স্বামিজীর ক্রমবর্ধমান রোগযন্ত্রণা ও দেহের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ ম্লান হইল, বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। স্বামিজী শিষ্যের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"কি ভাবছিস্? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভিতর ভাবগুলির কিছু কিছুও যদি ঢুকুতে (প্রবিষ্ট করাইতে) পেরে থাকি, তা' হলেই জানব, দেহটা ধরা সার্থক হ'য়েছে।"

কিছুক্ষণ পরে ভগিনী নিবেদিতা কয়েকজন ইংরাজ-মহিলাসহ আসিয়া গুরু-দর্শনান্তে স্বল্পকাল মধ্যেই বিদায় লইলেন। স্বামিজীর কষ্ট হইবে মনে করিয়া তিনি তাঁহার নিকট বেশীক্ষণ থাকিলেন না। বেলা আড়াইটার পর শরৎবাবু একবার উৎসব-প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করিয়া আসিয়া স্বামিজীকে উৎসবের কথা বলিতে লাগিলেন। শিষ্যের মুখে পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছে শুনিয়া তিনি দেখিবার জন্য বহু কষ্টে জানালার শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়া সেই জনসঙ্ঘের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; বলিলেন, "বড় জোর ত্রিশ হাজার।" অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কিয়ৎকাল পরেই তিনি পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুরের জন্মোৎসব লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিলেন যে, বর্তমানে যে প্রণালীতে উৎসব চলিতেছে, ইহা না করিয়া চার পাঁচ দিনব্যাপী উৎসবের অনুষ্ঠান করিলে বেশ হয়। প্রথম দিন শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় দিন বেদ বেদান্তের বিচার ও মীমাংসা, তৃতীয় দিন প্রশ্নোত্তর সভা, চতুর্থ দিন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও তৎপ্রদর্শিত আদর্শ ও পন্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা এবং সর্বশেষ দিনে প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবা। উৎসব উপলক্ষে যাহাতে ঠাকুরের জীবন-গঠনোপযোগী ভাবসকল সাধারণ লোকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মহোৎসবের অনুষ্ঠান যদি তাঁহার ভাবপ্রচারের কেন্দ্ররূপে পরিবর্তিত না হয়, তাহা হইলে কতকগুলি লোক মিলিয়া হৈ চৈ করিলেই ঠাকুরের ভাব প্রচার হইল, ইহা মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র। সাময়িক ধর্ম-ভাবের উত্তেজনায় কীর্তন নৃত্যাদি দ্বারা বিশেষ কিছুই হইবে না।

ক্রমাগত ঔষধ সেবন এবং নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাকিয়া স্বামিজী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, গভীর দার্শনিক তত্ত্বাদি আলোচনা হইবে আশঙ্কায় তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রদান করেন না, অনেকেই প্রত্যহ ব্যর্থকাম হইয়া বিষণ্ণ মনে মঠ হইতে ফিরিয়া যান। একদিন তিনি গুরুভ্রাতাগণকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ, এ দেহ রাখিয়া আর কি হইবে, পরকল্যাণ-সাধনে পাত হইয়া যাউক। ঠাকুর অসহ্য রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পরহিতায় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমারও কি তাহা করা উচিত নয়? তৃণ সম অকিঞ্চিৎকর এ দেহ থাক্, আর যাক্, আমি গ্রাহ্য করি না। সত্যান্বেষী ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনা করিতে যে আমার কত আনন্দ হয়, তাহা তোমরা কল্পনায়ও আনিতে পারিবে না। আমার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের আত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে সাহায্য করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত নহি।”

স্বামিজী যখনই একটু ভালবোধ করিতেন, তখনই কোন না কোন কাজ করিতেন। অলসভাবে বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব ছিল। মার্চ মাসের প্রথম হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, এই চারিমাস কাল দৈহিক অসুস্থতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি নানাভাবে যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। যখন তিনি একাগ্র মনে কোন কার্যে নিযুক্ত হইতেন, তখন তিনি যে রুগ্ন, এ কথা যেন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতেন। এই সময়ে তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিবার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র, একখানিও সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

স্বামিজী আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া-কলাপের একান্ত বিরোধী ছিলেন। মঠের নিত্য-নৈমিত্তিক ঠাকুরপূজা যথাসম্ভব সাদাসিধা ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া তিনি ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণকে অধিকাংশ সময় সাধনা, শাস্ত্রালাপ, বেদাদি পাঠ ইত্যাদিতে ক্ষেপণ করিতে বলিতেন। মঠের দৈনন্দিন শৃঙ্খলা রক্ষার্থ তিনি প্রত্যেক কার্যের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। মঠের প্রত্যেকের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন, কেহ ইচ্ছা করিয়া কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মহা বিরক্ত হইতেন এবং কঠোর ভাষায় তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেন।

রাত্রি তিনটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া স্বামিজী ধ্যানমগ্ন হইতেন। ধ্যানের কক্ষে তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট ছিল। অন্যান্য সন্ন্যাসী ও বাল-ব্রহ্মচারিগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিতেন। স্বামিজী যতক্ষণ না গাত্রোত্থান করেন, ততক্ষণ কাহারও উঠিবার অধিকার ছিল না, আর প্রয়োজনও হইত না। মহাপুরুষ-

গণের পবিত্র চিন্তাপ্রবাহের প্রভাবে প্রত্যেকেরই মন বাহ্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখীন হইত। এক অভূতপূর্ব আনন্দের অনুভূতিতে চিত্ত ভরিয়া উঠিত। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী একদিন বলিয়াছিলেন, “নরেনের সংগে ধ্যান করতে বসলে যেমন জমে, আমি যখন একা একা বসি, তখন তেমন হয় না।” কখনও স্বামিজী দুই ঘণ্টারও অধিক ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। তারপর ‘শিব’ ‘শিব’ বলিতে বলিতে আসন হইতে উত্থিত হইয়া ঠাকুর-প্রণাম করিয়া শ্যামা-সংগীত বা শিব-সংগীত বিশেষ গাহিতে গাহিতে নীচে নামিয়া আসিতেন এবং প্রাংগণোপরি পাদচারণা করিতেন। বদনে ধ্যানসম্ভূত অপূর্ব প্রশান্তি, বিশাল আয়ত লোচনদ্বয় ভাবাবেগে ঈষল্লোহিত, অর্ধবাহ্যদশায় ভ্রূক্ষেপহীন গমনভংগী প্রভৃতি দর্শন করিয়া মনে হইত, যেন সত্যই ইনি এ পৃথিবীর লোক নহেন।

অতঃপর শাস্ত্রপাঠ আরম্ভ হইত, স্বামিজী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শিষ্যগণের বিচার শ্রবণ করিতেন এবং জটিল স্থানগুলি স্বয়ং মীমাংসা করিয়া দিতেন। প্রভাতে উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিত। স্বামিজী স্বয়ং শিষ্যবৃন্দকে কিছুদিন হইতে পাণিনি ও লঘুকৌমুদী পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে ভোজনান্তে পুনরায় পাঠ চলিত। অপরাহ্নে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণ কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে কেহ বা ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, কেহ বা গৃহস্থালির কার্যে ব্যাপৃত হইতেন। সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলেই সকলে ধ্যানঘরে একত্র হইতেন। কেহ ধ্যানের সময় অনুপস্থিত থাকিলে স্বামিজী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। কোন ব্রহ্মচারী শারীরিক অসুস্থতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে মঠের দৈনন্দিন নিয়মাবলী লংঘন করিলে সেদিনের মত মঠের আহার পাইতেন না। পার্শ্ববর্তী গ্রামে ভিক্ষা করিয়া সেদিনের মত উদরপূর্তি করিতে হইত। স্বামিজী একদিকে যেমন উদার দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন, অপরদিকে তেমনি কঠোর ন্যায়পরায়ণ ও নির্মম ছিলেন। ব্যক্তিবিশেষের, তা’ সে যতই প্রিয়পাত্র হউক না কেন, ক্ষুদ্রতম ত্রুটিটিকেও তিনি ক্ষমা করিতেন না। তিনি জানিতেন, উদারতা ও ক্ষমার বাড়াবাড়ি হইলে মঠের আদর্শ ভবিষ্যতে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। এইকালে বহির্জগতের যশঃ-সম্মান, প্রতিপত্তি ইত্যাদির বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি ‘মানুষ গঠনকল্পে’ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এইরূপে এপ্রিল ও মে মাস অতীত হইল। ভারতে ও ভারতেতর প্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারক সন্ন্যাসিগণ উৎসাহের সহিত প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। স্বামিজীর নবীন কর্মোৎসাহ ও ভাব-ভংগী প্রভৃতি দর্শন করিয়া কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি মহাযাত্রার আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

জুন মাসের প্রথম হইতেই স্বামিজী মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কোন বিষয়ে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতেন না। দৈবাৎ কেহ কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিরক্তির সহিত তাঁহাদিগকে স্বয়ং মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য আদেশ দিতেন। আচার্য, নেতা, গুরু, শিক্ষাদাতা প্রভৃতি উপাধিগুলি ধীরে ধীরে ত্যাগ করিয়া এইকালে তিনি প্রায় অধিকাংশ সময়েই ধ্যানানন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। উত্তরোত্তর বর্ধিত ধ্যানাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ চিন্তিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “ও যেদিন নিজকে চিন্‌তে পার্‌বে, সেদিন আর দেহ থাক্‌বে না।” সেই কথাই বারে বারে সকলের মনে হইতে লাগিল। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, “এই সময় একদিন স্বামিজী জনৈক গুরুভ্রাতার সহিত অতীতের কথা আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আচ্ছা স্বামিজী! আপনি কে, তা’ কি বুঝতে পেরেছেন?’

সহসা স্বামিজী উত্তর করিলেন, 'হ্যাঁ, এখন আমি বুঝেছি।' স্বামিজীর গম্ভীর ভাব দেখিয়া কেহ আর প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না বটে, কিন্তু সকলেই বুঝিলেন যে, এখন যে-কোন মুহূর্তে তিনি দেহত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু এইকালে তাঁহার দেহ হইতে রোগের সমুদয় লক্ষণগুলি তিরোহিত হইয়াছিল। চিন্তিত ও বিষণ্ণ গুরুভ্রাতাগণের সহিত হাস্য-পরিহাস, ক্রীড়া-কৌতুকে তিনি সর্বদাই ছলনা করিতেন। তিনি যে সত্যই দেহত্যাগ করিবেন, কেহ বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেন না।"

দেহত্যাগের এক সপ্তাহ পূর্বে আচার্যদেব, স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে একখানি পঞ্জিকা আনিবার আদেশ দিলেন। তিনি স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া পঞ্জিকাখানি স্বীয় কক্ষে রাখিয়া দিলেন। মাঝে মাঝে তিনি উহা গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন: তখন তাঁহার মুখভাব দেখিয়া মনে হইত, যেন তিনি কোন বিশেষ কাজের জন্য একটি দিন নির্বাচন করিতে চাহেন, অথচ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। স্বামিজীর দেহান্ত হইবার পর তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামিজীর পঞ্জিকা দেখিবার কি প্রয়োজন ছিল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে একজন শিষ্যকে পঞ্জিকা পাঠ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তারপর কতকগুলি দিন পাঠ করিবার পর ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "থাক্, আর দরকার নাই।" স্বামিজীও শ্রীগুরুর পন্থা অনুসরণ করিয়া মহাযাত্রার দিন নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, স্বামিজীকে পঞ্জিকা আলোচনা করিতে দেখিয়া কাহারও একথা ক্ষণকালের জন্যও মনে উদয় হইল না।

দেহত্যাগের তিনদিন পূর্বে স্বামিজী বিস্তৃত মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে, যেখানে এখন তাঁহার সমাধি মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে, উক্ত স্থানটি অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আমার দেহান্ত হইলে ঐখানে অগ্নিসৎকার করিও।" সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা নীরবে শুনিলেন, কোন প্রশ্ন করিবার কথা কাহারও মনে উদয় হইল না।

বুধবার দিবস একাদশী। স্বামিজী উপবাস করিয়াছেন। প্রাতর্ভোজনের সময় শিষ্যগণকে স্বয়ং পরিবেশন করিয়া আহার করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কাঁঠালের বিচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, ভাত ও দুগ্ধ—ইহাই আহারের উপাদান। আহারকালে স্বামিজী কৌতুকালাপে সকলকে হাসাইতে লাগিলেন। স্বামিজীর প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া শিষ্যগণ বড়ই আনন্দিত হইলেন। স্বামিজী যখন বালকের মত ক্রীড়াকৌতুকে রত হইতেন, উচ্চহাস্যে মধুর ব্যবহারে সকলের সহিত সরলভাবে মিশিতেন, তখন তাঁহার সম্মুখে কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ হইত না; কিন্তু যখন গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার নিকট দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পর্যন্ত ভয়ে বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। আহারান্তে সকলে গাত্রোত্থান করিলে স্বামিজী স্বয়ং ভৃঙ্গার হইতে তাঁহাদের হস্ত ও মুখ প্রক্ষালনার্থ জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন এবং আচমনান্তে তোয়ালে দিয়া তাঁহাদের হাতমুখ মুছিয়া দিতে লাগিলেন।

"এ কি করিতেছেন স্বামিজী? এসব কাজ আমার করা উচিত। আমি আপনার সেবক, আপনার সেবা গ্রহণ করিতে পারি না", আপত্তি শুনিয়া মহাপুরুষ গম্ভীরস্বরে স্বর্গের মাধুর্য ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "যীশুখৃষ্ট কি তাঁহার শিষ্যগণের পদ ধৌত করিয়া দেন নাই?"

"কিন্তু সে যে শেষ দিন", উত্তর মনে আসিল, কিন্তু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ উচ্চারণ করিতে অক্ষম হইল, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিল মাত্র।

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া স্বামিজী আজ সকলের সহিত একত্রে ধ্যান করিতে গেলেন না, অতীতের কথা তুলিয়া নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলেন। পরদিবস অমাবস্যা ও শনিবার বলিয়া মঠে শ্রীশ্রীকালীপূজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পূজার আয়োজন সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা শক্তিসাধক ও তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় মঠে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্বামিজী আনন্দিত হইলেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বামিজী তখনই স্বামী শুদ্ধানন্দ ও বোধানন্দজীকে পূজার আবশ্যক বন্দোবস্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর কিঞ্চিৎ চা পান করিয়া মঠের ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরেই দেখা গেল, ঠাকুরঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এরূপভাবে তিনি তো কোনদিনই দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া দেন না, ইহার কারণ কি? কে বলিবে! সুদীর্ঘ তিনঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইলে একটি শ্যামা সংগীত গাহিবার পর, ভাবানন্দে মগ্ন মহাপুরুষ ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া অবতরণ করিলেন। "মন, চল নিজ নিকেতনে" গানটি গুনগুন করিয়া গাহিতে গাহিতে মঠের প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। আজ মনে হয় সেই দিনের কথা, যেদিন প্রথম গুরু-শিষ্য সাক্ষাৎ। সেদিন বালক নরেন্দ্রনাথ ভাবানন্দে গদ্‌গদ হইয়া দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র দেবালয়ে এই গানটি গাহিয়াছিলেন আর সম্মুখে অর্ধ-বাহ্যদশায় উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ সাশ্রুনয়নে তাঁহার কৈশোর-লাবণ্যোজ্জ্বল স্নিগ্ধ-মুখচ্ছবির প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া ছিলেন। সেদিন বালকের নয়নে ছিল সকরুণ মৌনমিনতি! সংসারের শাঠ্য, প্রবঞ্চনা, অন্যায়, অবিচারের শত শত শোচনীয় চিত্র দর্শনে ব্যথিত-হৃদয় বালক সেদিন চাহিয়াছিল—মুক্তি, নির্বাণ, ভগবদ্দর্শন। আজ সেই নয়নে গভীর সমবেদনাকাতর, কল্যাণবর্ষী শুভ্রদৃষ্টি, বদনে ব্রহ্মবিদের উদ্ভাসিত জ্যোতিঃ জগৎকল্যাণব্রতে পূর্ণ আত্মদানের অনিন্দিত মহিমা, সিদ্ধ-সংকল্প মহাযোগীর অসীম প্রশান্তি! সে একদিন, আর আজ আর একদিন! আর এতদুভয়ের মধ্যভাগে কি বিপুল চেষ্টা, কি সুমহান্ প্রয়াস! পাদচারণা করিতে করিতে আত্মস্থ মহাযোগী কি তাহাই ভাবিতেছেন? আপনা-আপনি একান্তে তিনি ঈষৎ অনুচ্চস্বরে যেন কি বলিতেছেন। স্বামী প্রেমানন্দজী অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি শুনিতে পাইলেন, স্বামিজী আপন মনে বলিতেছেন, "যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকিত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত, বিবেকানন্দ কি করিয়াছে!! কিন্তু কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিবে।"—স্বামী প্রেমানন্দজী চমকিত হইলেন! কারণ তিনি জানিলেন, স্বামিজীর মন উচ্চতম ভাবভূমিতে আরূঢ় না হইলে এসব কথা তিনি কখনও তো বলেন না। মহামায়ার খেলা কে বুঝিবে? সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ স্বামী প্রেমানন্দও দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহাদের বড় আদরের গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দ আজ দেহত্যাগের সংকল্প লইয়া যোগারূঢ় হইয়াছেন!

নিয়মিত সময়ে আহারের ঘণ্টাধ্বনি হইবামাত্র স্বামিজী ঠাকুরঘরের নিম্নতলের বারান্দায় সকলের সহিত একত্র মিলিত হইয়া আহারে উপবেশন করিলেন। স্বামিজী অসুখের পর হইতে সাধারণতঃ সকলের সহিত একত্র আহার করিতেন না। আজ সহসা সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়াও কাহারও হৃদয়ে কোন সন্দেহের উদয় হইল না, বরং অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামিজীর সহিত একত্র আহার করিবার সৌভাগ্য লাভ

করিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। স্বামিজী স্বাভাবিক আগ্রহের সহিত আহার করিতে লাগিলেন এবং গুরুভ্রাতাগণের সহিত কৌতুকালাপে রত হইলেন। কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ তাঁহার শরীর যথেষ্ট ভাল বোধ হইতেছে।

ভোজনান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়াই স্বামিজী ব্রহ্মচারিবৃন্দকে সংস্কৃত ক্লাসে আহবান করিলেন। অন্যান্য দিন আড়াইটা তিনটার সময় পাঠ আরম্ভ হইত, আজ একটা বাজিতে পনর মিনিট গত না হইতেই পাঠ আরম্ভ হইল। লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ পাঠ চলিতে লাগিল, বিষয়টি নীরস হইলেও সুদীর্ঘ তিন-ঘণ্টাকালের মধ্যে কেহ কোনপ্রকার বিরক্তি বোধ করেন নাই। কখনও হাস্যোদ্দীপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প দিয়া, কখনও সূত্রগুলির বিভিন্ন প্রকার কৌতুকাবহ ব্যাখ্যা করিয়া কঠিন কঠিন স্থলগুলিও স্বামিজী সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামিজী বলিলেন, এইরূপ গল্প, উপমা ও কৌতুকের সহিত তিনি একদিন তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু দাশরথি সান্ন্যাল (হাইকোর্টের উকীল) মহাশয়কে একরাত্রের মধ্যে ইংলণ্ডের ইতিহাস শিক্ষা দিয়াছিলেন। ব্যাকরণ অধ্যাপনা সমাপ্ত হইলে স্বামিজীকে কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত বোধ হইল।

অপরাহ্নে স্বামিজী, স্বামী প্রেমানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া মঠের বাহিরে ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সেদিন উভয়ে গল্প করিতে করিতে বেলুড় বাজার পর্যন্ত গিয়াছিলেন। নানাকথার সহিত বেদ বিদ্যালয়ের কথাও উঠিল। স্বামী প্রেমানন্দ প্রশ্ন করিলেন, "স্বামিজী! বেদপাঠে কি উপকার সাধিত হইবে?" স্বামিজী তৎক্ষণাৎ গভীর ভাবপূর্ণ অথচ স্বল্প কথায় উত্তর দিলেন, "অন্ততঃ ইহা অনেক কুসংস্কার বিনষ্ট করিবে।"

ভ্রমণান্তে স্বামিজী ফিরিয়া আসিয়া মঠের বারান্দায় উপবেশন করিলেন এবং সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের সহিত বিশ্রম্ভালাপে রত হইলেন এবং কনিষ্ঠ-গণকে সস্নেহে কুশলপ্রশ্ন করিয়া সময়োচিত উপদেশাদি দিতে লাগিলেন। সন্ধ্যারতির সময় আগত দেখিয়া ব্রহ্মচারিবৃন্দ একে একে স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরঘরে প্রস্থান করিলেন। আচার্যদেব ধীরে ধীরে দ্বিতলে স্বীয় শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন।

একজন ব্রহ্মচারী সর্বদাই স্বামিজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহাকে স্বামিজী সমস্ত দরজা-জানালাগুলি খুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। বাহিরে জমাট অন্ধকার, ভাগীরথীবক্ষে বিচূর্ণিত আলোকপ্রতিবিম্ব মৃদু-তরঙ্গে দুলিয়া কাঁপিতেছে। ঊর্ধ্বে, অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ বক্ষে ধারণ করিয়া আকাশ নিস্তব্ধ, আত্মমগ্ন বিবেকানন্দ ধীরে ধীরে পূর্বদিকের বাতায়নে দাঁড়াইয়া দক্ষিণেশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন! সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁহার দিব্যদৃষ্টি কি দেখিতেছিল—কে বলিবে? বহুদিন পূর্বে কাশীপুরের বাগানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ যে অনুভূতির দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, আজ কি কর্মশ্রান্ত সন্ন্যাসীর নির্নিমেষ দৃষ্টির সম্মুখে তাহা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতেছে? বিবেকানন্দের জ্ঞানদৃষ্টির সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত "কাগজের মতো পাতলা" যে আবরণ ছিল, সেই রহস্য-যবনিকাখানি ধীরে ধীরে উত্তোলিত হইয়া কি চরম আত্মোপলব্ধির আনন্দ-নিকেতন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! বহুক্ষণ পর যেন সম্বিৎ পাইয়া বিবেকানন্দ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারিজীকে বাহিরে বসিয়া জপ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং জপমালা হস্তে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। একঘণ্টা পর আসন হইতে

উত্থিত হইয়া স্বামিজী কক্ষ-কুট্টিমে শায়িত হইলেন এবং ব্রহ্মচারীকে আহবান করিয়া বাতাস করিতে বলিলেন।

জপমালাহস্তে শায়িত মহাপুরুষের দেহ নিস্পন্দ ও স্থির। রাত্রি তখন ৯টা বাজিয়াছে, এমন সময় তাঁহার হস্ত কম্পিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত শিশুর মত অস্ফুটস্বরে একটু ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। দুইটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তক উপাধান হইতে হেলিয়া পড়িল। স্বামিজীকে তদবস্থায় দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্রহ্মচারী নিম্নতলে গিয়া বয়স্ক সন্ন্যাসিগণকে সংবাদ প্রদান করিলেন। তাঁহারা আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, যোগিবর অনন্ত নিদ্রায় শায়িত! অমানিশার অন্ধ তিমিরাবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে জগন্মাতা তাঁহার রণশ্রান্ত বীরপুত্রকে ব্যগ্রবাহু প্রসারিত করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন!

* * * *

যাহা চক্ষের সম্মুখে ছিল তাহা চক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল। কি উদ্দেশ্যে সংসার-রঙ্গমঞ্চে কে এই অভিনয় করিল, কে বিবেকানন্দ—কে রামকৃষ্ণ পরমহংস? মৃত্যুর যবনিকায় নেপথ্যভূমি আবৃত। কালস্রোতের কতদূর পর্যন্ত গিয়া এই অভিনয়ের পরিসমাপ্তি? মানবের ক্ষুদ্রজ্ঞান কি অতীত, কি ভবিষ্যৎ—কোন-দিকেই শেষ পর্যন্ত পেঁাছিতে পারে না। বর্তমানকে ধরিয়া রাখিবার জন্য তাই এত প্রাণপণ; কিন্তু আজ যাহা আছে, কাল তাহা থাকে না, শুধু বহিয়া চলে অনন্ত কালস্রোত; শুধু মাঝে মাঝে গর্জিয়া উঠে উত্তাল তরঙ্গমালা।

বাঙ্গালীর জীবন-স্রোতে রাজা রামমোহন হইতে অনেকগুলি তরঙ্গের উত্থান ও পতন আমরা নিরীক্ষণ করিতেছি। শতাব্দীর শেষ ও প্রথমভাগে আবার এই এক তরঙ্গাভিঘাত। দক্ষিণেশ্বরবাহিনীর পূর্বতীরে একদিন ইহার উৎপত্তি, বেলুড়বাহিনীর পশ্চিমতীরে আর একদিন ইহার বিলয়। ইহার দুর্নিবার বেগে আটলাণ্টিকের দুস্তর লবণাম্বুরাশির উভয়তীর প্রকম্পিত, প্রতিধ্বনিত। বুঝা গেল গঙ্গায় স্রোত আছে, আর বাঙ্গালী মরে নাই! কিন্তু যাহা চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, আবার দেখিতে দেখিতে ডুবিয়া যায়, তাহা শুধু বর্তমানেই আবদ্ধ নহে...অথচ ইহার অতীত ও ভবিষ্যৎ আমরা সম্পূর্ণ জানিতে পারি না। কে বলিবে, স্বামী বিবেকানন্দ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, কে তাঁহাকে আনিয়াছিল? আর কে-ই বা বলিতে পারে, এই অভ্যুদয়ের পরিসমাপ্তি কবে—কতদূরে—কোথায়?

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

পরিশিষ্ট

স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম বক্তৃতা

ধর্ম মহাসম্মেলনের প্রতি সম্ভাষণ

(১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)

আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃমণ্ডলী,

আপনারা আমাদিগকে যে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন, তাহার প্রত্যুত্তর দিতে উঠিয়া আমার হৃদয় এক অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসীসঙ্ঘের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। সর্ববিধ ধর্মের জননীস্বরূপা সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিরূপে এবং সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটি কোটি হিন্দুর পক্ষ হইতে আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

এই সভামঞ্চে কতিপয় বক্তা প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সকল দূরদেশাগত ব্যক্তিরাও পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ বিভিন্ন দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইবার গৌরবের অধিকারী হইবেন। ইঁহাদিগকেও আমি ধন্যবাদ দিতেছি। যে ধর্ম সমগ্র জগৎকে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সকল মতের সর্বজনীন স্বীকৃতি শিক্ষা দিয়াছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গৌরব বোধ করিয়া থাকি। আমরা কেবল সর্বজনীন পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী নহি, আমরা সকল ধর্মই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সর্বদেশের উৎপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে জাতিধর্মনির্বিশেষে আশ্রয় দিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্যতম বলিয়া গর্বিত। আমি আপনাদিগকে গর্বের সহিত বলিব, যে বৎসর রোমকগণ য়াহুদীদের পবিত্র দেবালয় ধ্বংস করিয়া ফেলে, সেই বৎসর হতাবশিষ্ট ইজরাইলবংশীয়দের দক্ষিণ ভারতে আমরাই সাদরে বক্ষে স্থান দিয়াছিলাম। যে ধর্ম জোরোয়াস্তরপন্থী মহান পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে আশ্রয় দিয়াছিল এবং অদ্যাবধি লালনপালন করিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্বিত।

যে স্তোত্রটি প্রতিদিন কোটি কোটি নরনারী পাঠ করেন, যাহা আমি বাল্যকাল হইতেই আবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত, তাহার একটি শ্লোক আপনাদিগকে বলিতেছি—

> “রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
> নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥”

“নদনদীসকল যেমন বিভিন্ন পথ দিয়া সমুদ্রাভিমুখে বহিয়া যায়, তেমনি রুচির বৈচিত্র্যহেতু সরল কুটিল নানাপথগামী মানুষের, হে প্রভো, তুমিই একমাত্র গন্তব্যস্থল।”

এই সর্বধর্ম সম্মেলন, যাহা ইতোপূর্বে আর কখনও আহূত হয় নাই, তাহা একাধারে গীতা-প্রচারিত মহান সত্যের পোষকতা করিয়া সমগ্র জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিতেছে—

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥”

“যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহার নিকট সেইভাবেই প্রকাশিত হই। হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার নির্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে।”

সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং তাহার ফলস্বরূপ উন্মত্ত ধর্মান্ধতা বহুকাল এই সুন্দর ধরণীর উপর আধিপত্য করিয়াছে। এইগুলি জগতে হিংস্র উপদ্রব করিয়াছে, বারম্বার ইহাকে নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছে, মানব-সভ্যতা উৎসন্নে দিয়াছে এবং এক একটা জাতিকে নৈরাশ্যে অভিভূত করিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর দানব যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ বর্তমান অপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। কিন্তু ঐগুলির মৃত্যুকাল আসন্ন এবং আমি সর্বান্তঃকরণে ভরসা করি, এই মহাসমিতির উদ্বোধনে আজ প্রভাতের যে ঘণ্টাধ্বনি হইল, তাহা ধর্মোন্মত্ততার মৃত্যুবার্তা জগতে ঘোষণা করুক; একই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস, তরবারি বা লেখনী দ্বারা পরপীড়নের দুর্গতির অবসান হউক।